অবনীন্দ্র রচনাবলী

অবনীন্দ্র রচনাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রকাশ ভবন

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিজ্ঞপ্তি

বাংলা ভাষার ও সংস্কৃতির ইতিহাসে অবনীন্দ্রনাথ এক শ্রদ্ধেয় ঐতিহ্য। তাঁর সমগ্র রচনা কয়েকটি পৃথক খণ্ডে সংকলিত হবে। পূর্বে প্রকাশিত প্রথম খণ্ডে সংকলিত হয়েছিল তাঁর স্মৃতিকথাগুলি। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হল তাঁর শিশু সাহিত্যমূলক অনেকগুলি রচনা। পূর্বে গ্রন্থভুক্ত হয়নি, সাময়িক পত্রে বিক্ষিপ্ত এমন কয়েকটি রচনাও এখানে সংযোজিত হয়েছে।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীশঙ্খ ঘোষ, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমতী মিলাডা গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির সহায়তা ছাড়া এ বই প্রকাশ সম্ভব হত না। তাছাড়া শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত, শ্রীরাণা বসু ও শ্রীসুবিমল লাহিড়ীর কাছে নানাবিধ আনুকূল্য পাওয়া গেছে। এঁদের সকলের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ ত্বরান্বিত করার ইচ্ছা থাকলেও নানা অনিবার্য কারণে এই খণ্ড প্রকাশে অনেক বিলম্ব হল। এজন্য আমরা বিশেষ কুণ্ঠিত। পরবর্তী খণ্ডগুলির প্রকাশ ত্বরান্বিত করার অবশ্যই চেষ্টা করা হবে।

সূচীপত্র

চি ত্র সূ চী

শকুন্তলা

শকুন্তলা

এক নিবিড় অরণ্য ছিল। তাতে ছিল বড়ো বড়ো বট, সারিসারি তাল তমাল, পাহাড় পর্বত, আর ছিল— ছোটো নদী মালিনী।

মালিনীর জল বড়ো স্থির— আয়নার মতো। তাতে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙা মেঘের ছায়া— সকলি দেখা যেত। আর দেখা যেত গাছের তলায় কতগুলি কুটিরের ছায়া।

নদীতীরে যে নিবিড় বন ছিল তাতে অনেক জীবজন্তু ছিল। কত হাঁস, কত বক, সারাদিন খালের ধারে বিলের জলে ঘুরে বেড়াত। কত ছোটো ছোটো পাখি, কত টিয়াপাখির ঝাঁক গাছের ডালে ডালে গান গাইত, কোটরে কোটরে বাসা বাঁধত। দলে দলে হরিণ, ছোটো ছোটো হরিণশিশু, কুশের বনে, ধানের খেতে, কচি ঘাসের মাঠে খেলা করত। বসন্তে কোকিল গাইত, বর্ষায় ময়ূর নাচত।

এই বনে তিন হাজার বছরের এক প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় মহর্ষি কণ্বদেবের আশ্রম ছিল। সেই আশ্রমে জটাধারী তপস্বী কণ্ব আর মা-গৌতমী ছিলেন, তাঁদের পাতার কুটির ছিল, পরনে বাকল ছিল, গোয়াল-ভরা গাই ছিল, চঞ্চল বাছুর ছিল, আর ছিল বাকল-পরা কতগুলি ঋষিকুমার।

তারা কণ্বদেবের কাছে বেদ পড়ত, মালিনীর জলে তর্পণ করত, গাছের ফলে অতিথিসেবা করত, বনের ফুলে দেবতার অঞ্জলি দিত।

আর কী করত?

বনে বনে হোমের কাঠ কুড়িয়ে বেড়াত, কালো গাই ধলো গাই মাঠে চরাতে যেত। সবুজ মাঠ ছিল তাতে গাই-বাছুর চরে বেড়াত, বনে ছায়া ছিল তাতে রাখাল-ঋষিরা খেলে বেড়াত। তাদের ঘর গড়বার বালি ছিল, ময়ূর গড়বার মাটি ছিল, বেণুবাঁশের বাঁশি ছিল, বটপাতার ভেলা ছিল; আর ছিল— খেলবার সাথী বনের হরিণ,

গাছের ময়ূর ; আর ছিল— মা-গৌতমীর মুখে দেবদানবের যুদ্ধ কথা, তাত কণ্বের মুখে মধুর সামবেদ গান।

সকলি ছিল, ছিল না কেবল— আঁধার ঘরের মাণিক— ছোটো মেয়ে— শকুন্তলা। একদিন নিশুতি রাতে অপ্সরী মেনকা তার রূপের ডালি— দুধের বাছা— শকুন্তলা-মেয়েকে সেই তপোবনে ফেলে রেখে গেল। বনের পাখিরা তাকে ডানায় ঢেকে বুকে নিয়ে সারা রাত বসে রইল।

বনের পাখিদেরও দয়ামায়া আছে, কিন্তু সেই মেনকা পাষাণীর কি কিছু দয়া হল !

খুব ভোরবেলায় তপোবনের যত ঋষিকুমার বনে বনে ফল ফুল কুড়তে গিয়েছিল। তারা আমলকী বনে আমলকী, হরীতকী বনে হরীতকী, ইংলী ফলের বনে ইংলী কুড়িয়ে নিলে ; তারপরে ফুলের বনে পূজার ফুল তুলতে তুলতে পাখিদের মাঝে ফুলের মতো সুন্দর শকুন্তলা মেয়েকে কুড়িয়ে পেলে। সবাই মিলে তাকে কোলে করে তাত কণ্বের কাছে নিয়ে এল। তখন সেই সঙ্গে বনের কত পাখি, কত হরিণ, সেই তপোবনে এসে বাসা বাঁধলে।

শকুন্তলা সেই তপোবনে, সেই বটের ছায়ায় পাতার কুটিরে, মা-গৌতমীর কোলে-পিঠে মানুষ হতে লাগল।

তারপর শকুন্তলার যখন বয়স হল তখন তাত কণ্ব পৃথিবী খুঁজে শকুন্তলার বর আনতে চলে গেলেন। শকুন্তলার হাতে তপোবনের ভার দিয়ে গেলেন।

শকুন্তলার আপনার মা-বাপ তাকে পর করলে, কিন্তু যারা পর ছিল তারা তার আপনার হল। তাত কণ্ব তার আপনার, মা-গৌতমী তার আপনার, ঋষিবালকেরা তার আপনার ভাইয়ের মতো। গোয়ালের গাইবাছুর— সে-ও তার আপনার, এমন-কি— বনের লতাপাতা তারাও তার আপনার ছিল। আর ছিল— তার বড়োই আপনার দুই প্রিয়সখী অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা ; আর ছিল একটি মা-হারা হরিণশিশু— বড়োই ছোটো— বড়োই চঞ্চল। তিন সখীর আজকাল অনেক

কাজ— ঘরের কাজ, অতিথি-সেবার কাজ, সকালে-সন্ধ্যায় গাছে জল দেবার কাজ, সহকারে মল্লিকালতার বিয়ে দেবার কাজ; আর শকুন্তলার দুই সখীর আর একটি কাজ ছিল— তারা প্রতিদিন মাধবীলতায় জল দিত আর ভাবত, কবে ওই মাধবীলতায় ফুল ফুটবে, সেই দিন সখী শকুন্তলার বর আসবে।

এ-ছাড়া আর কী কাজ ছিল?— হরিণশিশুর মতো নির্ভয়ে এ-বনে সে-বনে খেলা করা, ভ্রমরের মতো লতাবিতানে গুন্-গুন্ গল্প করা, নয় তো মরালীর মতো মালিনীর হিম জলে গা ভাসানো; আর প্রতিদিন সন্ধ্যার আঁধারে বনপথে বনদেবীর মতো তিন সখীতে ঘরে ফিরে আসা—এই কাজ।

একদিন—দক্ষিণ বাতাসে সেই কুসুমবনে দেখতে দেখতে প্রিয় মাধবীলতার সর্বাঙ্গ ফুলে ভরে উঠল। আজ সখীর বর আসবে বলে চঞ্চল হরিণীর মতো চঞ্চল অনসূয়া প্রিয়ম্বদা আরো চঞ্চল হয়ে উঠল।

দুষ্মন্ত

যে-দেশে ঋষির তপোবন ছিল, সেই দেশের রাজার নাম ছিল—দুষ্মন্ত।

সেকালে এত বড় রাজা কেউ ছিল না। তিনি পুব-দেশের রাজা, পশ্চিম-দেশের রাজা, উত্তর-দেশের রাজা, দক্ষিণ-দেশের রাজা, সব রাজার রাজা ছিলেন। সাত-সমুদ্র-তের-নদী— সব তাঁর রাজ্য। পৃথিবীর এক রাজা— রাজা দুষ্মন্ত। তাঁর কত সৈন্যসামন্ত ছিল, হাতিশালে কত হাতি ছিল, ঘোড়াশালে কত ঘোড়া ছিল, গাড়ি-খানায় কত সোনা রূপোর রথ ছিল, রাজমহলে কত দাস দাসী ছিল; দেশ জুড়ে তাঁর সুনাম ছিল, ক্রোশ জুড়ে সোনার রাজপুরী ছিল, আর ব্রাহ্মণকুমার মাধব্য সেই রাজার প্রিয় সখা ছিল।

যেদিন তপোবনে মল্লিকার ফুল ফুটল, সেই দিন সাত-সমুদ্র-তের-নদীর রাজা, রাজা দুষ্মন্ত, প্রিয়সখা মাধব্যকে বললেন— 'চল বন্ধু, আজ মৃগয়ায় যাই।'

মৃগয়ার নামে মাধব্যের যেন জ্বর এল। গরিব ব্রাহ্মণ রাজবাড়িতে রাজার হালে থাকে, দুবেলা থাল-থাল লুচি মণ্ডা, ভার-ভার ক্ষীর দই দিয়ে মোটা পেট ঠাণ্ডা রাখে, মৃগয়ার নামে বেচারার মুখ এতটুকু হয়ে গেল, বাঘ ভালুকের ভয়ে প্রাণ কেঁপে উঠল।

'না' বলবার যো কী, রাজার আজ্ঞা!

অমনি হাতিশালে হাতি সাজল, ঘোড়াশালে ঘোড়া সাজল, কোমর বেঁধে পালোয়ান এল, বর্শা হাতে শিকারী এল, ধনুক হাতে ব্যাধ এল, জাল ঘাড়ে জেলে এল। তারপর সারথি রাজার সোনার রথ নিয়ে এল, সিংহদ্বারে সোনার কপাট ঝনঝনা দিয়ে খুলে গেল।

রাজা সোনার রথে শিকারে চললেন।

দুপাশে দুই রাজহস্তী চামর ঢোলাতে ঢোলাতে চলল, ছত্রধর

রাজছত্র ধরে চলল, জয়ঢাক বাজতে বাজতে চলল, আর সর্বশেষে প্রিয়সখা মাধব্য এক খোঁড়া ঘোড়ায় হট্‌হট্ করে চললেন।

ক্রমে রাজা এ-বন সে-বন ঘুরে শেষে মহাবনে এসে পড়লেন। গাছে গাছে ব্যাধ ফাঁদ পাততে লাগল, খালে বিলে জেলে জাল ফেলতে লাগল, সৈন্য সামন্ত বন ঘিরতে লাগল— বনে সাড়া পড়ে গেল।

গাছে গাছে কত পাখি, কত পাখির ছানা পাতার ফাঁকে ফাঁকে কচি পাতার মতো ছোটো ডানা নাড়ছিল, রাঙা ফলের মতো ডালে দুলছিল, আকাশে উড়ে যাচ্ছিল, কোটরে ফিরে আসছিল, কিচমিচ করছিল। ব্যাধের সাড়া পেয়ে, বাসা ফেলে, কোটর ছেড়ে, কে কোথায় পালাতে লাগল।

মোষ গরমের দিনে ভিজে কাদায় পড়ে ঠাণ্ডা হচ্ছিল, তাড়া পেয়ে— শিং উঁচিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে গহন বনে পালাতে লাগল। হাতি শুঁড়ে করে জল ছিটিয়ে গা ধুচ্ছিল, শালগাছে গা ঘষছিল, গাছের ডাল ঘুরিয়ে মশা তাড়াচ্ছিল, ভয় পেয়ে— শুঁড় তুলে, পদ্মবন দলে, ব্যাধের জাল ছিঁড়ে পালাতে আরম্ভ করলে। বনে বাঘ হাঁকার দিয়ে উঠল, পর্বতে সিংহ গর্জন করে উঠল, সারা বন কেঁপে উঠল।

কত পাখি, কত বরা, কত বাঘ, কত ভালুক, কেউ জালে ধরা পড়ল, কেউ ফাঁদে বাঁধা পড়ল, কেউ বা তলোয়ারে কাটা গেল; বনে হাহাকার পড়ে গেল। বনের বাঘ বন দিয়ে, জলের কুমির জল দিয়ে, আকাশের পাখি আকাশ ছেয়ে পালাতে আরম্ভ করলে।

ফাঁদ নিয়ে ব্যাধ পাখির সঙ্গে ছুটল, তীর নিয়ে বীর বাঘের সঙ্গে গেল, জাল ঘাড়ে জেলে মাছের সঙ্গে চলল, রাজা সোনার রথে এক হরিণের সঙ্গে ছুটলেন। হরিণ প্রাণভয়ে হাওয়ার মতো রথের আগে দৌড়িয়েছে, সোনার রথ তার পিছনে বিদ্যুতের বেগে চলেছে। রাজার সৈন্য-সামন্ত, হাতি, ঘোড়া, প্রিয়সখা মাধব্য, কতদূরে কোথায় পড়ে রইল। কেবল রাজার রথ আর বনের হরিণ নদীর ধার দিয়ে, বনের ভিতর দিয়ে, মাঠের উপর দিয়ে ছুটে চলল।

যখন গহন বনে এই শিকার চলছিল তখন সেই তপোবনে সকলে

নির্ভয়ে ছিল। গাছের ডালে টিয়াপাখি লাল ঠোঁটে ধান খুঁটছিল, নদীর জলে মনের সুখে হাঁস ভাসছিল, কুশবনে পোষা হরিণ নির্ভয়ে খেলা করছিল; আর শকুন্তলা, অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা— তিন সখী কুঞ্জবনে গুন্-গুন্ গল্প করছিল।

এই তপোবনে সকলে নির্ভয়, কেউ কারো হিংসা করে না। মহাযোগী কণ্বের তপোবনে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। হরিণশিশু ও সিংহশাবক এক বনে খেলা করে। এ-বনে রাজাদেরও শিকার করা নিষেধ। রাজার শিকার— সেই হরিণ— ঊর্ধ্বশ্বাসে এই তপোবনের ভিতর চলে গেল। রাজাও অমনি ধনুঃশর ফেলে ঋষিদর্শনে চললেন।

সেই তপোবনে সোনার রথে পৃথিবীর রাজা, আর মাধবীকুঞ্জে রূপসী শকুন্তলা—দুজনে দেখা হল!

এদিকে মাধব্য কী বিপদেই পড়েছে! আর সে পারে না! রাজভোগ না হলে তার চলে না, নরম বিছানা ছাড়া ঘুম হয় না, পালকি ছাড়া সে এক পা চলে না, তার কি সারাদিন ঘোড়ার পিঠে চড়ে 'ওই বরা যায়, ওই বাঘ পালায়' করে এ-বন সে-বন ঘুরে বেড়ানো পোষায়? পল্বলের পাতা-পচা কষা জলে কি তার তৃষ্ণা ভাঙে? ঠিক সময় রাজভোগ না পেলে সে অন্ধকার দেখে, তার কি সারাদিনের পর একটু আধপোড়া মাংসে পেট ভরে? পাতার বিছানায় মশার কামড়ে তার কি ঘুম হয়! বনে এসে ব্রাহ্মণ মহা মুশকিলে পড়েছে! সমস্ত দিন ঘোড়ার পিঠে ফিরে সর্বাঙ্গে দারুণ ব্যথা, মশার জ্বালায় রাত্রে নিদ্রা নেই, মনে সর্বদা ভয়— ওই ভালুক এল, ওই বুঝি বাঘে ধরলে! ভয়ে ভয়ে বেচারা আধখানা হয়ে গেছে।

রাজাকে কত বোঝাচ্ছে— 'মহারাজ, রাজ্য ছারেখারে যায়, শরীর মাটি হল, আর কেন? রাজ্যে চলুন।'

রাজা তবু শুনলেন না, শকুন্তলাকে দেখে অবধি রাজকার্য ছেড়ে, মৃগয়া ছেড়ে, তপস্বীর মতো সেই তপোবনে রইলেন। রাজ্যে রাজার মা ব্রত করছেন, রাজাকে ডেকে পাঠালেন, তবু রাজ্যে ফিরলেন না,

কত ওজর-আপত্তি করে মাধব্যকে সব সৈন্যসামন্ত সঙ্গে মা-র কাছে পাঠিয়ে দিয়ে একলা সেই তপোবনে রইলেন।

মাধব্য রাজবাড়িতে মনের আনন্দে রাজার হালে আছে, আর এদিকে পৃথিবীর রাজা বনবাসীর মতো বনে বনে 'হা শকুন্তলা! হো শকুন্তলা!' বলে ফিরছে। হাতের ধনুক, তূণের বাণ কোন বনে পড়ে আছে! রাজবেশ নদীর জলে ভেসে গেছে, সোনার অঙ্গ কালি হয়েছে, দেশের রাজা বনে ফিরছে।

আর শকুন্তলা কী করছে?

নিকুঞ্জবনে পদ্মের বিছানায় বসে পদ্মপাতায় মহারাজাকে মনের কথা লিখছে। রাজাকে দেখে কে জানে তার মন কেমন হল! একদণ্ড না দেখলে প্রাণ কাঁদে, চোখের জলে বুক ভেসে যায়। দুই সখী তাকে পদ্মফুলে বাতাস করছে, গলা ধরে কত আদর করছে, আঁচলে চোখ মোছাচ্ছে, আর ভাবছে— এইবার ভোর হল, বুঝি সখীর রাজা ফিরে এল।

তারপর কী হল?

দুঃখের নিশি প্রভাত হল, মাধবীর পাতায় পাতায় ফুল ফুটল, নিকুঞ্জের গাছে গাছে পাখি ডাকল, সখীদের পোষা হরিণ কাছে এল।

আর কী হল?

বনপথে রাজা-বর কুঞ্জে এল।

আর কী হল?

পৃথিবীর রাজা আর বনের শকুন্তলা— দুজনে মালা-বদল হল। দুই সখীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।

তারপর কী হল?

তারপর কতদিন পরে সোনার সাঁঝে সোনার রথ রাজাকে নিয়ে রাজ্যে গেল, আর আঁধার বনপথে দুই প্রিয়সখী শকুন্তলাকে নিয়ে ঘরে গেল।

তপোবনে

রাজা রাজ্যে চলে গেলেন, আর শকুন্তলা সেই বনে দিন গুনতে লাগল।

যাবার সময় রাজা নিজের মোহর আংটি শকুন্তলাকে দিয়ে গেলেন, বলে গেলেন— 'সুন্দরী, তুমি প্রতিদিন আমার নামের একটি করে অক্ষর পড়বে, নামও শেষ হবে আর বনপথে সোনার রথ তোমাকে নিতে আসবে।'

কিন্তু হায়, সোনার রথ কই এল ?

কতদিন গেল, কত রাত গেল ; দুষ্মন্ত নাম কতবার পড়া হয়ে গেল, তবু সোনার রথ কই এল ? হায় হায়, সোনার সাঁঝে সোনার রথ সেই যে গেল আর ফিরল না !

পৃথিবীর রাজা সোনার সিংহাসনে, আর বনের রানী কুটির-দুয়ারে— দুজনে দুইখানে।

রাজার শোকে শকুন্তলার মন ভেঙে পড়ল। কোথা রইল অতিথি-সেবা, কোথা রইল পোষা হরিণ, কোথা রইল সাধের নিকুঞ্জবনে প্রাণের দুই প্রিয়সখী ! শকুন্তলার মুখে হাসি নেই, চোখে ঘুম নেই ! রাজার ভাবনা নিয়ে কুটির-দুয়ারে পাষাণ-প্রতিমা বসে রইল।

রাজার রথ কেন এল না ?

কেন রাজা ভুলে রইলেন ?

রাজা রাজ্যে গেলে একদিন শকুন্তলা কুটির-দুয়ারে গালে হাত দিয়ে বসে-বসে রাজার কথা ভাবছে— ভাবছে আর কাঁদছে, এমন সময় মহর্ষি দুর্বাসা দুয়ারে অতিথি এলেন, শকুন্তলা জানতেও পারলে

না, ফিরেও দেখলে না। একে দুর্বাসা মহা অভিমানী, একটুতেই মহা রাগ হয়, কথায়-কথায় যাকে-তাকে ভস্ম করে ফেলেন, তার উপর শকুন্তলার এই অনাদর— তাঁকে প্রণাম করলে না, বসতে আসন দিলে না, পা ধোবার জল দিলে না!

দুর্বাসার সর্বাঙ্গে যেন আগুন ছুটল, রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—'কী! অতিথির অপমান? পাপীয়সী, এই অভিসম্পাত করছি— যার জন্যে আমার অপমান করলি সে যেন তোকে কিছুতে না চিনতে পারে।'

হায়, শকুন্তলার কি তখন জ্ঞান ছিল যে দেখবে কে এল, কে গেল! দুর্বাসার একটি কথাও তার কানে গেল না।

মহামানী মহর্ষি দুর্বাসা ঘোর অভিসম্পাত করে চলে গেলেন— সে কিছুই জানতে পারলে না, কুটির-দুয়ারে আনমনে যেমন ছিল তেমনি রইল।

অনসূয়া প্রিয়ম্বদা দুই সখী উপবনে ফুল তুলছিল, ছুটে এসে দুর্বাসার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। কত সাধ্য-সাধনা করে, কত কাকুতি-মিনতি করে, কত হাতে-পায়ে ধরে দুর্বাসাকে শান্ত করলে!

শেষে এই শাপান্ত হল— 'রাজা যাবার সময় শকুন্তলাকে যে-আংটি দিয়ে গেছেন সেই আংটি যদি রাজাকে দেখাতে পারে তবেই রাজা শকুন্তলাকে চিনবেন; যতদিন সেই আংটি রাজার হাতে না-পড়বে ততদিন রাজা সব ভুলে থাকবেন।'

দুর্বাসার অভিশাপে তাই পৃথিবীর রাজা সব ভুলে রইলেন!

বনপথে সোনার রথ আর ফিরে এল না!

এদিকে দুর্বাসাও চলে গেলেন আর তাত কণ্বও তপোবনে ফিরে এলেন। সারা পৃথিবী খুঁজে শকুন্তলার বর মেলেনি। তিনি ফিরে এসে শুনলেন সারা পৃথিবীর রাজা বনে এসে তার গলায় মালা দিয়েছেন। তাত কণ্বের আনন্দের সীমা রইল না, তখনি শকুন্তলাকে রাজার কাছে পাঠাবার উদ্‌যোগ করতে লাগলেন। দুঃখে অভিমানে

শকুন্তলা মাটিতে মিশে ছিল, তাকে কত আদর করলেন, কত আশীর্বাদ করলেন।

উপবনে দুই সখী যখন শুনলে শকুন্তলা শ্বশুরবাড়ি চলল, তখন তাদের আর আহ্লাদের সীমা রইল না।

প্রিয়ম্বদা কেশর-ফুলের হার নিলে, অনসূয়া গন্ধ-ফুলের তেল নিলে; দুই সখীতে শকুন্তলাকে সাজাতে বসল। তার মাথায় তেল দিলে, খোঁপায় ফুল দিলে, কপালে সিঁদুর দিলে, পায়ে আল্‌তা দিলে, নতুন বাকল দিলে; তবু তো মন উঠল না! সখীর এ কি বেশ করে দিলে? প্রিয়সখী শকুন্তলা পৃথিবীর রানী, তাঁর কি এই সাজ?— হাতে মৃণালের বালা, গলায় কেশরের মালা, খোঁপায় মল্লিকার ফুল, পরনে বাকল?— হায়, হায়, মতির মালা কোথায়? হীরের বালা কোথায়? সোনার মল কোথায়? পরনে শাড়ি কোথায়?

বনের দেবতারা সখীদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন।

বনের গাছ থেকে সোনার শাড়ি উড়ে পড়ল, পায়ের মল বেজে পড়ল। বনদেবতারা পলকে বনবাসিনী শকুন্তলাকে রাজ্যেশ্বরী মহারানীর সাজে সাজিয়ে দিলেন।

তারপর যাবার সময় হল। হায়, যেতে কি পা সরে, মন কি চায়?

শকুন্তলা কোনদিকে যাবে— সোনার পুরীতে রানীর মতো রাজার কাছে চলে যাবে?— না, তিন সখীতে বনপথে আজন্মকালের তপোবনে ফিরে যাবে?

এদিকে শুভলগ্ন বয়ে যায়, ওদিকে বিদায় আর শেষ হয় না। কুঞ্জবনে মল্লিকা মাধবী কচি-কচি পাতা নেড়ে ফিরে ডাকছে, মা-হারা হরিণশিশু সোনার আঁচল ধরে বনের দিকে টানছে, প্রাণের দুই প্রিয়সখী গলা ধরে কাঁদছে। একদণ্ডে এত মায়া এত ভালোবাসা কাটানো কি সহজ?

মা-হারা হরিণশিশুকে তাত কণ্বের হাতে, প্রিয় তরুলতাদের প্রিয়সখীদের হাতে সঁপে দিতে কত বেলাই হয়ে গেল।

তপোবনের শেষে বটগাছ, সেইখান থেকে তাত কণ্ব ফিরলেন !

দুই সখী কেঁদে ফিরে এল। আসবার সময় শকুন্তলার আঁচলে রাজার সেই আংটি বেঁধে দিলে, বলে দিলে— 'দেখিস, ভাই, যত্ন করে রাখিস।'

তারপর বনের দেবতাদের প্রণাম করে, তাত কণ্বকে প্রণাম করে শকুন্তলা রাজপুরীর দিকে চলে গেল।

পরের মেয়ে পর হয়ে পরের দেশে চলে গেল— বনখানা আঁধার করে গেল !

ঋষির অভিশাপ কখনো মিথ্যে হয় না। রাজপুরে যাবার পথে শকুন্তলা একদিন শচীতীর্থের জলে গা ধুতে গেল। সাঁতার-জলে গা ভাসিয়ে, নদীর জলে ঢেউ নাচিয়ে শকুন্তলা গা ধুলে। রঙ্গভরে অঙ্গের শাড়ি জলের উপর বিছিয়ে দিলে ; জলের মতো চিকণ আঁচল জলের সঙ্গে মিশে গেল, ঢেউয়ের সঙ্গে গড়িয়ে গেল। সেই সময়ে দুর্বাসার শাপে রাজার সেই আংটি শকুন্তলার চিকণ আঁচলের এক কোণ থেকে অগাধ জলে পড়ে গেল, শকুন্তলা জানতেও পারলে না।

তারপর ভিজে কাপড়ে তীরে উঠে, কালো চুল এলো করে, হাসিমুখে শকুন্তলা, বনের ভিতর দিয়ে রাজার কথা ভাবতে ভাবতে শূন্য আঁচল নিয়ে রাজপুরে চলে গেল, আংটির কথা মনেই পড়ল না।

রাজপুরে

দুর্বাসার শাপে রাজা শকুন্তলাকে একেবারে ভুলে বেশ সুখে আছেন। সাত ক্রোশ জুড়ে রাজার সাত মহল বাড়ি, তার এক এক মহলে এক এক রকম কাজ চলছে।

প্রথম মহলে রাজসভা— সেখানে সোনার থামে সোনার ছাদ, তার তলায় সোনার সিংহাসন; সেখানে দোষী-নির্দোষের বিচার চলছে।

তারপর দেবমন্দির— সেখানে সোনার দেয়ালে মানিকের পাখি, মুক্তোর ফল, পান্নার পাতা। মাঝখানে প্রকাণ্ড হোমকুণ্ড, সেখানে দিবারাত্রি হোম হচ্ছে। তারপর অতিথিশালা— সেখানে সোনার থালায় দুসন্ধ্যা লক্ষ লক্ষ অতিথি খাচ্ছে।

তারপর নৃত্যশালা— সেখানে নাচ চলেছে, শানের উপর সোনার নূপুর রুনুঝুনু বাজছে, স্ফটিকের দেয়ালে অঙ্গের ছায়া তালে তালে নাচছে।

সংগীতশালায় গান চলছে, সোনার পালঙ্কে পৃথিবীর রাজা রাজা-দুষ্মন্ত বসে আছেন, দক্ষিণ-দুয়ারি ঘরে দক্ষিণের বাতাস আসছে; শকুন্তলার কথা তাঁর মনেই নেই। হায়, দুর্বাসার শাপে, সুখের অন্তঃপুরে সোনার পালঙ্কে রাজা সব ভুলে রইলেন।

আর শকুন্তলা কত ঝড়বৃষ্টিতে, কত পথ চলে, রাজার কাছে এল, রাজা চিনতেও পারলেন না; বললেন— 'কন্যে, তুমি কেন এসেছ? কী চাও? টাকা-কড়ি চাও, না, ঘর-বাড়ি চাও? কী চাও?'

শকুন্তলা বললে— 'মহারাজ, আমি টাকা চাই না, কড়িও চাই না, ঘড়-বাড়ি কিছুই চাই না, আমি চাই তোমায়। তুমি আমার রাজা, আমার গলায় মালা দিয়েছ, আমি তোমায় চাই।'

রাজা বললেন— 'ছি ছি, কন্যে, এ কী কথা! তুমি হলে

বনবাসিনী তপস্বিনী, আমি হলেম রাজ্যেশ্বর মহারাজা, আমি তোমায় কেন মালা দেব? টাকা চাও টাকা নাও, ঘর-বাড়ি চাও তাই নাও, গায়ের গহনা চাও তাও নাও। রাজ্যেশ্বরী হতে চাও— এ কেমন কথা?'

রাজার কথায় শকুন্তলার প্রাণ কেঁপে উঠল, কাঁদতে কাঁদতে বললে— 'মহারাজ, সে কী কথা! আমি যে সেই শকুন্তলা— আমায় ভুলে গেলে? মনে নেই, মহারাজা, সেই মাধবীর বনে একদিন আমরা তিন সখীতে গুন্‌গুন্ গল্প করছিলুম, এমন সময় তুমি অতিথি এলে; সখীরা তোমায় পা-ধোবার জল দিলে, আমি আঁচলে ফল এনে দিলেম, তুমি হাসিমুখে তাই খেলে। তারপর একটা পদ্মপাতায় জল নিয়ে আমার হরিণশিশুকে খাওয়াতে গেলে, সে ছুটে পালাল, তুমি কত ডাকলে, কত মিষ্টি কথা বললে কিছুতে এল না। তারপর আমি ডাকতেই আমার কাছে এল, আমার হাতে জল খেল, তুমি আদর করে বললে— দুইজনেই বনের প্রাণী কিনা তাই এত ভাব!— শুনে সখীরা হেসে উঠল, আমি লজ্জায় মরে গেলাম। তারপর, মহারাজা, তুমি কতদিন তপস্বীর মতো সে বনে রইলে। বনের ফল খেয়ে, নদীর জল খেয়ে কতদিন কাটালে। তারপর একদিন পূর্ণিমা রাতে মালিনীর তীরে নিকুঞ্জ বনে আমার কাছে এলে, আমার গলায় মালা দিলে— মহারাজ, সে-কথা কি ভুলে গেলে?

যাবার সময় তুমি মহারাজ, আমার হাতে আংটি পরিয়ে দিলে; প্রতিদিন তোমার নামের একটি করে অক্ষর পড়তে বলে দিলে, বলে গেলে— নামও শেষ হবে আর আমায় নিতে সোনার রথ পাঠাবে। কিন্তু মহারাজ, সোনার রথ কই পাঠালে, সব ভুলে রইলে? মহারাজ, এমনি করে কি কথা রাখলে?'

বনবাসিনী শকুন্তলা রাজার কাছে কত অভিমান করলে, রাজাকে কত অনুযোগ করলে, সেই কুঞ্জবনের কথা, সেই দুই সখীর কথা, সেই হরিণশিশুর কথা— কত কথাই মনে করিয়ে দিলে, তবু রাজার মনে পড়ল না। শেষে রাজা বললেন— 'কই, কন্যা, দেখি তোমার

সেই আংটি? তুমি যে বললে আমি তোমায় আংটি দিয়েছি, কই দেখাও দেখি কেমন আংটি?'

শকুন্তলা তাড়াতাড়ি আঁচল খুলে আংটি দেখাতে গেল, কিন্তু হায়, আঁচল শূন্য!

রাজার সেই সাতরাজার ধন এক মানিকের বরণ-আংটি কোথায় গেল!

এতদিনে দুর্বাসার শাপ ফলল। হায়, রাজাও তার পর হলেন, পৃথিবীতে আপনার লোক কেউ রইল না!

'মা-গো!'—বলে শকুন্তলা রাজসভায় শানের উপর ঘুরে পড়ল; তার কপাল ফুটে রক্ত ছুটল, রাজসভায় হাহাকার পড়ে গেল।

সেই সময় শকুন্তলার সেই পাষাণী মা মেনকা স্বর্গপুরে ইন্দ্রসভায় বীণা বাজিয়ে গান গাইছিল। হঠাৎ তার বীণার তার ছিঁড়ে গেল, গানের সুর হারিয়ে গেল, শকুন্তলার জন্যে প্রাণ কেঁদে উঠল, অমনি সে বিদ্যুতের মতো মেঘের রথে এসে রাজার সভা থেকে শকুন্তলাকে কোলে তুলে একেবারে হেমকূট পর্বতে নিয়ে গেল।

সেই হেমকূট পর্বতে কশ্যপের আশ্রমে স্বর্গের অপ্সরাদের মাঝে কতদিনে শকুন্তলার একটি রাজচক্রবর্তী রাজকুমার হল।

সেই কোল-ভরা ছেলে পেয়ে শকুন্তলার বুক জুড়ল।

শকুন্তলা তো চলে গেল। এদিকে রাজবাড়ির জেলেরা একদিন শচীতীর্থের জলে জাল ফেলতে আরম্ভ করলে। রূপোলি রঙের সরলপুটি, চাঁদের মতো পায়রা-চাঁদা, সাপের মতো বাণমাছ, দাড়াওয়ালা চিংড়ি, কাঁঠা-ভরা বাটা কত কী জালে পড়ল। সোনালি রূপোলি মাছে নদীর পাড় মাছের ঝুড়ি যেন সোনায় রূপোয় ভরে গেল। সারাদিন জেলেদের জালে কত রকমের কত যে মাছ পড়ল তার আর ঠিকানা নেই। শেষে ক্রমে বেলা পড়ে এল; নীল আকাশ, নদীর জল, নগরের পথ আঁধার হয়ে এল; জাল গুটিয়ে জেলেরা ঘরে চলল।

এমন সময় এক জেলে জাল ঘাড়ে নদীতীরে দেখা দিল। প্রকাণ্ড জালখানা মাথার উপর ঘুরিয়ে নদীর উপর উড়িয়ে দিলে; মেঘের মতো কালো জাল আকাশে ঘুরে, নদীর এ-পার ও-পার দু-পার জুড়ে জলে পড়ল। সেই সময় মাছের সর্দার, নদীর রাজা, বুড়ো মাছ রুই অন্ধকারে সন্ধ্যার সময় সেই নদী-ঘেরা কালো জালে ধরা পড়ল। জেলে পাড়ায় রব উঠল— জাল কাটবার গুরু, মাছের সর্দার, বুড়ো রুই এতদিনে জালে পড়েছে। যে যেখানে ছিল নদীতীরে ছুটে এল। তারপর অনেক কষ্টে মাছ ডাঙায় উঠল। এত বড়ো মাছ কেউ কখনো দেখেনি। আবার যখন সেই মাছের পেট চিরতে সাতরাজার ধন এক মানিকের আংটি জ্বলন্ত আগুনের মতো ঠিক্‌রে পড়ল তখন সবাই অবাক হয়ে রইল। যার মাছ তার আনন্দের সীমা রইল না।

গরিব জেলে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলে। মাছের ঝুড়ি, ছেঁড়া জাল জলে ফেলে মানিকের আংটি সেকরার দোকানে বেচতে চলল। রাজা শকুন্তলাকে যে-আংটি দিয়েছিলেন— এ সেই আংটি। শচীতীর্থে গা-ধোবার সময় তার আঁচল থেকে যখন জলে পড়ে যায় তখন রুইমাছটা খাবার ভেবে গিলে ফেলেছিল।

জেলের হাতে রাজার মোহর আংটি দেখে সেকরা কোটালকে খবর দিলে। কোটাল জেলেকে মারতে-মারতে রাজসভায় হাজির করলে। বেচারা জেলে রাজদরবারে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে কেমন করে মাছের পেটে আংটি পেয়েছে নিবেদন করলে।

রাজমন্ত্রী দেখলেন সত্যিই আংটিতে মাছের গন্ধ। জেলে ছাড়া পেয়ে মোহরের তোড়া বখশিশ নিয়ে নাচতে নাচতে বাড়ি গেল।

এদিকে আংটি হাতে পড়তেই রাজার তপোবনের কথা সব মনে পড়ে গেল।

শকুন্তলার শোকে রাজা যেন পাগল হয়ে উঠলেন। বিনা দোষে তাকে দূর করে দিয়ে প্রাণ যেন তুষের আগুনে পুড়তে লাগল। মুখে অন্য কথা নেই, কেবল—'হা শকুন্তলা!— হা শকুন্তলা!'

আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে, কিছুতে সুখ নেই; রাজকার্যে

সুখ নেই, অন্তঃপুরে সুখ নেই, উপবনে সুখ নেই— কোথাও সুখ নেই।

সংগীতশালায় গান বন্ধ হল, নৃত্যশালায় নাচ বন্ধ হল, উপবনে উৎসব বন্ধ হল।

রাজার দুঃখের সীমা রইল না।

একদিকে বনবাসিনী শকুন্তলা কোলভরা ছেলে নিয়ে হেমকূটের সোনার শিখরে বসে রইল, আর একদিকে জগতের রাজা, রাজা-দুষ্মন্ত জগৎজোড়া শোক নিয়ে ধূলায় ধূসর পড়ে রইলেন।

কতদিন পরে দেবতার কৃপা হল।

স্বর্গ থেকে ইন্দ্রদেবের রথ এসে রাজাকে দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে স্বর্গপুরে নিয়ে গেল। সেখানে নন্দনবনে কত দিন কাটিয়ে দৈত্যদের সঙ্গে কত যুদ্ধ করে, মন্দারের মালা গলায় পরে, রাজা রাজ্যে ফিরছেন— এমন সময় দেখলেন, পথে হেমকূট পর্বত, মহর্ষি কশ্যপের আশ্রম। রাজা মহর্ষিকে প্রণাম করবার জন্য সেই আশ্রমে চললেন।

এই আশ্রমে অনেক তাপস, অনেক তপস্বিনী থাকতেন, অনেক অপ্সর, অনেক অপ্সরা থাকত। আর থাকত— শকুন্তলা আর তার পুত্র রাজপুত্র সর্বদমন।

রাজা দুষ্মন্ত যেমন দেশের রাজা ছিলেন তাঁর সেই রাজপুত্র তেমনি বনের রাজা ছিল। বনের যত জীবজন্তু তাকে বড়োই ভালোবাসত।

সেই বনে সাত ক্রোশ জুড়ে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ ছিল, তার তলায় একটা প্রকাণ্ড অজগর দিনরাত্রি পড়ে থাকত। এই গাছতলায় সর্বদমনের রাজসভা বসত।

হাতিরা তাকে মাথায় করে নদীতে নিয়ে যেত, শুঁড়ে করে জল ছিটিয়ে গা ধুইয়ে দিত, তারপর তাকে সেই সাপের পিঠে বসিয়ে দিত —এই তার রাজসিংহাসন। দুদিকে দুই হাতি পদ্মফুলের চামর

দোলাত, অজগর ফণা মেলে মাথায় ছাতা ধরত। ভালুক ছিল মন্ত্রী, সিংহ ছিল সেনাপতি, বাঘ চৌকিদার, শেয়াল ছিল কোটাল; আর ছিল—শুক-পাখি তার প্রিয়সখা, কত মজার মজার কথা বলত, দেশ-বিদেশের গল্প করত। সে পাখির বাসায় পাখির ছানা নিয়ে খেলা করত, বাঘের বাসায় বাঘের কাছে বসে থাকত— কেউ তাকে কিছু বলত না। সবাই তাকে ভয়ও করত, ভালোও বাসত।

রাজা যখন সেই বনে এলেন তখন রাজপুত্র একটা সিংহশিশুকে নিয়ে খেলা করছিল, তার মুখে হাত পুরে দাঁত গুনছিল, তাকে কোলে পিঠে করছিল, তার জটা ধরে টানছিল। বনের তপস্বিনীরা কত ছেড়ে দিতে বলছিলেন, কত মাটির ময়ূরের লোভ দেখাচ্ছিলেন, শিশু কিছুতেই শুনছিল না।

এমন সময় রাজা সেখানে এলেন, সিংহশিশুকে ছাড়িয়ে সেই শিশুকে কোলে নিলেন; দুষ্টু শিশু রাজার কোলে শান্ত হল।

সেই রাজশিশুকে কোলে করে রাজার বুক যেন জুড়িয়ে গেল। রাজা তো জানেন না যে এ শিশু তাঁরই পুত্র। ভাবছেন— পরের ছেলেকে কোলে করে মন কেন এমন হল, এর উপর কেন এত মায়া হল?

এমন সময় শকুন্তলা অঞ্চলের নিধি কোলের বাছাকে খুঁজতে খুঁজতে সেইখানে এলেন।

রাজারানীতে দেখা হল, রাজা আবার শকুন্তলাকে আদর করলেন, তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলেন। দেবতার কৃপায় এতদিনে আবার মিলন হল, দুর্বাসার শাপান্ত হল। কশ্যপ অদিতিকে প্রণাম করে রাজারানী রাজপুত্র কোলে রাজ্যে ফিরলেন।

তারপর কতদিন সুখে রাজত্ব করে, রাজপুত্রকে রাজ্য দিয়ে, রাজারানী সেই তপোবনে তাত কণ্বের কাছে, সেই দুই সখীর কাছে, সেই হরিণশিশুর কাছে, সেই সহকার এবং মাধবীলতার কাছে ফিরে গেলেন এবং তাপস তাপসীদের সঙ্গে সুখে জীবন কাটিয়ে দিলেন।

ক্ষীরের পুতুল

ক্ষীরের পুতুল

এক রাজার দুই রানী, দুও আর সুও। রাজবাড়িতে সুওরানীর বড়ো আদর, বড়ো যত্ন। সুওরানী সাতমহল বাড়িতে থাকেন। সাতশো দাসী তাঁর সেবা করে, পা ধোয়ায়, আলতা পরায়, চুল বাঁধে। সাত মালঞ্চের সাত সাজি ফুল, সেই ফুলে সুওরানী মালা গাঁথেন। সাত সিন্দুক-ভরা সাত-রাজার-ধন মানিকের গহনা, সেই গহনা অঙ্গে পরেন। সুওরানী রাজার প্রাণ।

আর দুওরানী— বড়োরানী, তাঁর বড়ো অনাদর, বড়ো অযত্ন। রাজা বিষ নয়নে দেখেন। একখানি ঘর দিয়েছেন— ভাঙাচোরা, এক দাসী দিয়েছেন— বোবা-কালা। পরতে দিয়েছেন জীর্ণ শাড়ি, শুতে দিয়েছেন— ছেঁড়া কাঁথা। দুওরানীর ঘরে রাজা একটি দিন আসেন, একবার বসেন, একটি কথা কয়ে উঠে যান।

সুওরানী— ছোটোরানী, তাঁরই ঘরে রাজা বারোমাস থাকেন।

একদিন রাজা রাজমন্ত্রীকে ডেকে বললেন— মন্ত্রী, দেশবিদেশ বেড়াতে যাব, তুমি জাহাজ সাজাও।

রাজার আজ্ঞায় রাজমন্ত্রী জাহাজ সাজাতে গেলেন। সাতখানা জাহাজ সাজাতে সাত মাস গেল। ছ'খানা জাহাজে রাজার চাকর-বাকর যাবে, আর সোনার চাঁদোয়া-ঢাকা সোনার জাহাজে রাজা নিজে যাবেন।

মন্ত্রী এসে খবর দিলেন— মহারাজ, জাহাজ প্রস্তুত।

রাজা বললেন— কাল যাব।

মন্ত্রী ঘরে গেলেন।

ছোটোরানী— সুওরানী রাজ-অন্তঃপুরে সোনার পালঙ্কে শুয়েছিলেন, সাত সখী সেবা করছিল, রাজা সেখানে গেলেন। সোনার

পালঙ্কে মাথার শিয়রে বসে আদরের ছোটোরানীকে বললেন— রানী, দেশ-বিদেশ বেড়াতে যাব, তোমার জন্য কী আনব ?

রানী ননীর হাতে হীরের চুড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বললেন— হীরের রঙ বড়ো শাদা, হাত যেন শুধু দেখায়। রক্তের মতো রাঙা আট-আট গাছা মানিকের চুড়ি পাই তো পরি।

রাজা বললেন— আচ্ছা রানী, মানিকের দেশ থেকে মানিকের চুড়ি আনব।

রানী রাঙা পা নাচিয়ে নাচিয়ে, পায়ের নূপুর বাজিয়ে বাজিয়ে বললেন— এ নূপুর ভালো বাজে না। আগুনের বরন নিরেট সোনার দশ গাছা মল পাই তো পরি।

রাজা বললেন— সোনার দেশ থেকে তোমার পায়ের সোনার মল আনব।

রানী গলার গজমতি হার দেখিয়ে বললেন— দেখ রাজা, এ মুক্তো বড়ো ছোটো, শুনেছি কোন দেশে পায়রার ডিমের মতো মুক্তো আছে, তারি একছড়া হার এনো।

রাজা বললেন— সাগরের মাঝে মুক্তোর রাজ্য, সেখান থেকে গলার হার আনব। আর কী আনব রানী ?

তখন আদরিনী সুওরানী সোনার অঙ্গে সোনার আঁচল টেনে বললেন— মা গো, শাড়ি নয় তো বোঝা ! আকাশের মতো নীল, বাতাসের মতো ফুরফুরে, জলের মতো চিকন শাড়ি পাই তো পরে বাঁচি।

রাজা বললেন— আহা, আহা, তাই তো রানী, সোনার আঁচলে সোনার অঙ্গে ছড় লেগেছে, ননীর দেহে ব্যথা বেজেছে। রানী, হাসিমুখে বিদায় দাও, আকাশের মতো নীল, বাতাসের মতো ফুরফুরে, জলের মতো চিকন শাড়ি আনিগে।

ছোটোরানী হাসিমুখে রাজাকে বিদায় করলেন।

রাজা বিদায় হয়ে জাহাজে চড়লেন— মনে পড়ল দুখিনী বড়োরানীকে।

দুওরানী— বড়োরানী, ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে কাঁদছেন, রাজা সেখানে এলেন।

ভাঙা ঘরের ভাঙা দুয়ারে দাঁড়িয়ে বললেন— বড়োরানী, আমি বিদেশ যাব। ছোটোরানীর জন্যে হাতের বালা, গলার মালা, পায়ের মল, পরনের শাড়ি আনব। তোমার জন্যে কী আনব? বলে দাও যদি কিছু সাধ থাকে।

রানী বললেন— মহারাজ, ভালোয় ভালোয় তুমি ঘরে এলেই আমার সকল সাধ পূর্ণ হয়। তুমি যখন আমার ছিলে তখন আমার সোহাগও অনেক ছিল, সাধও অনেক ছিল। সোনার শাড়ি অঙ্গে পরে সাতমহল বাড়িতে হাজার হাজার আলো জ্বালিয়ে সাতশো সখীর মাঝে রানী হয়ে বসবার সাধ ছিল, সোনার পিঞ্জরে শুক-শারীর পায়ে সোনার নূপুর পরিয়ে দেবার সাধ ছিল। মহারাজ, অনেক সাধ ছিল, অনেক সাধ মিটেছে। এখন আর সোনার গহনায় সোনার শাড়িতে কী কাজ? মহারাজ, আমি কার সোহাগে হীরের বালা হাতে পরব? মোতির মালা গলায় দেব? মানিকের সিঁথি মাথায় বাঁধব? মহারাজ, সেদিন কি আর আছে! তুমি সোনার গহনা দেবে, সে সোহাগ তো ফিরে দেবে না! আমার সে সাতশো দাসী সাতমহল বাড়ি তো ফিরে দেবে না! বনের পাখি এনে দেবে, কিন্তু, মহারাজ, সোনার খাঁচা তো দেবে না! ভাঙা ঘরে সোনার গহনা চোর-ডাকাতে লুটে নেবে, ভাঙা খাঁচায় বনের পাখি কেন ধরা দেবে? মহারাজ, তুমি যাও, যাকে সোহাগ দিয়েছ তার সাধ মেটাও গে, ছাই সাধে আমার কাজ নেই।

রাজা বললেন— না রানী, তা হবে না, লোকে শুনলে নিন্দে করবে। বল তোমার কী সাধ?

রানী বললেন— কোন লাজে গহনার কথা মুখে আনব? মহারাজ, আমার জন্যে পোড়ারমুখ একটা বাঁদর এনো।

রাজা বললেন— আচ্ছা রানী, বিদায় দাও।

তখন বড়োরানী— দুওরানী ছেঁড়া কাঁথায় লুটিয়ে পড়ে

কাঁদতে কাঁদতে রাজাকে বিদায় দিলেন। রাজা গিয়ে জাহাজে চড়লেন।

সন্ধ্যাবেলা সোনার জাহাজ সোনার পাল মেলে অগাধ সাগরের নীল জল কেটে সোনার মেঘের মতো পশ্চিম মুখে ভেসে গেল।

ভাঙা ঘরে দুওরানী নীল সাগরের পারে চেয়ে, ছেঁড়া কাঁথায় পড়ে রইলেন। আর আদরিনী সুওরানী সাতমহল অন্তঃপুরে, সাতশো সখীর মাঝে, গহনার কথা ভাবতে ভাবতে, সোনার পিঞ্জরে সোনার পাখির গান শুনতে শুনতে, সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে পড়লেন।

রাজাও জাহাজে চড়ে দুঃখিনী বড়োরানীকে ভুলে গেলেন। বিদায়ের দিনে ছোটোরানীর সেই হাসিহাসি মুখ মনে পড়ে আর ভাবেন— এখন রানী কী করছেন ? বোধ হয় চুল বাঁধছেন। এবার রানী কী করছেন ? বুঝি রাঙা পায়ে আলতা পরছেন। এবার রানী সাত মালঞ্চে ফুল তুলছেন, এবার বুঝি সাত মালঞ্চের সাত সাজি ফুলে রানী মালা গাঁথছেন আর আমার কথা ভাবছেন। ভাবতে ভাবতে বুঝি দুই চক্ষে জল এল, মালা আর গাঁথা হল না। সোনার সুতো, ফুলের সাজি পায়ের কাছে পড়ে রইল ; বসে বসে সারা রাত কেটে গেল, রানীর চোখে ঘুম এল না।

সুওরানী— ছোটোরানী রাজার আদরিনী, রাজা তারই কথা ভাবেন। আর বড়োরানী রাজার জন্যে পাগল, তাঁর কথা একবার মনেও পড়ে না।

এমনি করে জাহাজে দেশ-বিদেশে রাজার বারো-মাস কেটে গেল।

তেরো মাসে রাজার জাহাজ মানিকের দেশে এল।

মানিকের দেশে সকলই মানিক। ঘরের দেওয়াল মানিক, ঘাটের শান মানিক, পথের কাঁকর মানিক। রাজা সেই মানিকের দেশে সুয়োরানীর চুড়ি গড়ালেন। আট হাজার মানিকের আটগাছি চুড়ি, পরলে মনে হয় গায়ের রক্ত ফুটে পড়ছে।

রাজা সেই মানিকের চুড়ি নিয়ে, সোনার দেশে এলেন। সেই সোনার দেশে স্যাক্‌রার দোকানে নিরেট সোনার দশগাছা মল গড়ালেন। মল জ্বলতে লাগল যেন আগুনের ফিন্‌কি, বাজতে লাগল যেন বীণার ঝংকার— মন্দিরার রিনি-রিনি।

রাজা মানিকের দেশে মানিকের চুড়ি নিয়ে, সোনার দেশে সোনার মল গড়িয়ে, মুক্তোর রাজ্যে এলেন।

সে দেশে রাজার বাগানে দুটি পায়রা। তাদের মুক্তোর পা, মানিকের ঠোঁট, পান্নার গাছে মুক্তোর ফল খেয়ে মুক্তোর ডিম পাড়ে। দেশের রানী সন্ধ্যাবেলা সেই মুক্তোর মালা গাঁথেন, রাতের বেলায় খোঁপায় পরেন, সকাল বেলায় ফেলে দেন।

দাসীরা সেই বাসি মুক্তোর হার এক জাহাজ রুপো নিয়ে বাজারে বেচে আসে।

রাজা এক জাহাজ রুপো দিয়ে সুওরানীর গলায় দিতে সেই মুক্তোর এক ছড়া হার কিনলেন।

তারপর মানিকের চুড়ি নিয়ে, সোনার দেশে সোনার মল গড়িয়ে, মুক্তোর রাজ্যে মুক্তোর হার গাঁথিয়ে, ছ'মাস পরে রাজা এক দেশে এলেন। সে দেশে রাজকন্যের উপবনে নীল মানিকের গাছে নীল গুটিপোকা নীলকান্ত মণির পাতা খেয়ে, জলের মতো চিকন, বাতাসের মতো ফুরফুরে, আকাশের মতো নীল রেশমের গুটি বাঁধে। রাজার মেয়ে সারা রাত ছাদে বসে, আকাশের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে, সেই নীল রেশমে শাড়ি বোনেন। একখানি শাড়ি বুনতে ছ'মাস যায়। রাজকন্যে একটি দিন সেই আকাশের মতো নীল, বাতাসের মতো ফুরফুরে, জলের মতো চিকন শাড়ি পরে শিবের মন্দিরে মহাদেব নীলকণ্ঠের পূজা করেন। ঘরে এসে শাড়ি ছেড়ে দেন, দাসীরা যার কাছে সাত জাহাজ সোনা পায় তার কাছে শাড়ি বেচে। রাজা সাত জাহাজ সোনা দিয়ে আদরিনী সুওরানীর শখের শাড়ি কিনলেন।

তারপর আর ছ'মাসে রাজার সাতখানা জাহাজ সাত সমুদ্র তেরো

নদী পার হয়ে ছোটোরানীর মানিকের চুড়ি, সোনার মল, মুক্তোর মালা, সাধের শাড়ি নিয়ে দেশে এল। তখন রাজার মনে পড়ল বড়োরানী বাঁদর চেয়েছেন।

রাজা মন্ত্রীকে বললেন— মন্ত্রীবর, বড়ো ভুল হয়েছে। বড়োরানীর বাঁদর আনা হয়নি, তুমি একটা বাঁদরের সন্ধানে যাও।

রাজমন্ত্রী একটা বাঁদরের সন্ধানে চলে গেলেন। আর রাজা শ্বেতহস্তী চড়ে লোকারণ্য রাজপথ দিয়ে, ছোটোরানীর সাধের গহনা শখের শাড়ি নিয়ে অন্তঃপুরে চলে গেলেন।

ছোটোরানী সাত-মহল বাড়ির সাত-তলার উপরে সোনার আয়না সামনে রেখে, সোনার কাঁকুইয়ে চুল চিরে, সোনার কাঁটা সোনার দড়ি দিয়ে খোঁপা বেঁধে সোনার চেয়াড়িতে সিঁদুর নিয়ে ভুরুর মাঝে টিপ পরছেন, কাজল-লতায় কাজল পেড়ে চোখের পাতায় কাজল পরছেন, রাঙা পায়ে আলতা দিচ্ছেন, সখীরা ফুলের থালা নিয়ে, পানের বাটা নিয়ে রাজরানী ছোটোরানীর সেবা করছে— রাজা সেখানে এলেন।

স্ফটিকের সিংহাসনে রানীর পাশে বসে বললেন— এই নাও, রানী! মানিকের দেশে মানিকের ঘাট, মানিকের বাট— সেখান থেকে হাতের চুড়ি এনেছি। সোনার দেশে সোনার ধুলো, সোনার বালি— সেখান থেকে পায়ের মল এনেছি। মুক্তোর রাজ্যে মুক্তোর পা, মানিকের ঠোঁট, দুটি পাখি মুক্তোর ডিম পাড়ে। দেশের রানী সেই মুক্তোর হার গাঁথেন, রাতের বেলায় খোঁপায় পরেন, ভোরের বেলায় ফেলে দেন। রানী, তোমার জন্যে সেই মুক্তোর হার এনেছি। রানী, এক দেশে রাজার মেয়ে, এক-খী রেশমে সাত-খী সুতো কেটে নিশুতি রাতে ছাদে বসে ছ'টি মাসে একখানি শাড়ি বোনেন, এক দিন পরে পুজো করেন, ঘরে এসে ছেড়ে দেন। রানী, আমি সেই রাজার মেয়ের দেশ থেকে সাত জাহাজ সোনা দিয়ে রাজকন্যার হাতে বোনা শাড়ি এনেছি। তুমি একবার চেয়ে দেখ! পৃথিবী খুঁজে গায়ের গহনা, পরনের শাড়ি আনলুম, একবার পরে দেখ!

রানী তখন ত্ব'হাতে আটগাছা চুড়ি পরলেন ; মানিকের চুড়ি রানীর হাতে ঢিলে হল, হাতের চুড়ি কাঁধে উঠল।

রানী তখন হু'পায়ে দশ-গাছা মল পরলেন; রাঙা পায়ে সোনার মল আল্‌গা হল, হু'পা যেতে দশ গাছা মল শানের উপর খসে পড়ল। রানী মুখ ভার করে মুক্তোর হার গলায় পরলেন ; মুক্তোর দেশের মুক্তোর হার রানীর গলায় খাটো হল, হার পরতে গলার মাস কেটে গেল। রানী ব্যথা পেলেন।

সাত-পুরু করে শখের শাড়ি অঙ্গে পরলেন ; নীল রেশমের নীল শাড়ি হাতে বহরে কম পড়ল। রানীর চোখে জল এল।

তখন মানিনী ছোটোরানী আট হাজার মানিকের আটগাছা চুড়ি খুলে ফেলে, নিরেট সোনার দশগাছা মল পায়ে ঠেলে, মুক্তোর মালা শখের শাড়ি ধুলোয় ফেলে বললেন— ছাই গহনা! ছাই এ শাড়ি! কোন্ পথের কাঁকর কুড়িয়ে এ চুড়ি গড়ালে? মহারাজ, কোন্ দেশের ধুলো বালিতে এ মল গড়ালে? ছি ছি, এ কার বাসি মুক্তোর বাসি হার! এ কোন্ রাজকন্যার পরা শাড়ি! দেখলে যে ঘৃণা আসে, পরতে যে লজ্জা হয়! নিয়ে যাও মহারাজ, এ পরা-শাড়ি পরা-গহনায় আমার কাজ নেই।

রানী অভিমানে গোসা-ঘরে খিল দিলেন। আর রাজা মলিন-মুখে সাত জাহাজ সোনা দিয়ে কেনা সেই সাধের গহনা, শখের শাড়ি নিয়ে রাজসভায় এলেন।

রাজমন্ত্রী রাজসিংহাসনের এক পাশে, রাজ্যের মাঠ-ঘাট দোকান-পাট সন্ধান করে, যাত্নকরের দেশের এক বণিকের জাহাজ থেকে, কানা-কড়ি দিয়ে একটি বাঁদরছানা কিনে বসে আছেন।

রাজা এসে বললেন— মন্ত্রীবর, আশ্চর্য হলুম! মাপ দিয়ে ছোটোরানীর গায়ের গহনা, পরনের শাড়ি আনলুম, সে শাড়ি, সে গহনা, রানীর গায়ে হল না!

তখন সেই বনের বানর রাজার পায়ে প্রণাম করে বললে—বড়ো ভাগ্যবতী পুণ্যবতী না হলে দেবকন্যের হাতে বোনা, নাগকন্যের হাতে

গাঁথা, মায়া-রাজ্যের এ মায়া-গহনা, মায়া-শাড়ি, পরতে পায় না। মহারাজ, রাজভাণ্ডারে তুলে রাখ, যাকে বৌ করবে তাকে পরতে দিও।

বানরের কথায় রাজা অবাক হলেন। হাসতে হাসতে মন্ত্রীকে বললেন— মন্ত্রী বানরটা বলে কি? ছেলেই হল না, বৌ আনব কেমন করে? মন্ত্রী, তুমি স্যাকরার দোকানে ছোটোরানীর নতুন গহনা গড়তে দাওগে, তাঁতির তাঁতে রানীর শাড়ি বুনতে দাওগে। এ গহনা, এ শাড়ি, রাজভাণ্ডারে তুলে রাখ; যদি বৌ ঘরে আনি তাকে পরতে দেব। রাজমন্ত্রী স্যাকরার দোকানে ছোটোরানীর নতুন গহনা গড়াতে গেলেন। আর, রাজা সেই বাঁদর-কোলে বড়োরানীর কাছে গেলেন।

দুঃখিনী বড়োরানী, জীর্ণ আঁচলে পা মুছিয়ে, ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় রাজাকে বসতে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন— মহারাজ, বোসো। আমার এই ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় বোসো। আমার আর কী আছে তোমায় বসতে দেব? হায়, মহারাজ, কতদিন পরে তুমি ফিরে এলে, আমি এমনি অভাগিনী তোমার জন্যে ছেঁড়া কাঁথা পেতে দিলুম।

রানীর কথায় রাজার চোখে জল এল। ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় বসে বড়োরানীর কোলে বাঁদর-ছানা দিয়ে বললেন— মহারানী, তোমার এ ছেঁড়া কাঁথা ভাঙা ঘর, ছোটোরানীর সোনার সিংহাসন, সোনার ঘরের চেয়ে লক্ষগুণে ভালো। তোমার এ ভাঙা ঘরে আদর আছে, যত্ন আছে, দুটো মিষ্টি কথা আছে; সেখানে তা তো নেই। রানী, সাত জাহাজ সোনা দিয়ে গায়ের গহনা, পরনের শাড়ি দিয়েছি, ছোটোরানী পায়ে ঠেলেছে; আর কানাকড়ি দিয়ে তোমার বাঁদর এনেছি, তুমি আদর করে কোলে নিয়েছ। রানী, আমি আর তোমায় দুঃখ দেব না। এখন বিদায় দাও, আমি আবার আসব রানী। কিন্তু দেখো, ছোটোরানী যেন জানতে না-পারে! তোমার কাছে এসেছি শুনলে আর রক্ষে রাখবে না! হয় তোমায়, নয়তো আমায়, বিষ খাওয়াবে।

রাজা বড়োরানীকে প্রবোধ দিয়ে গেলেন। আর বড়োরানী সেই ভাঙা ঘরে দুধকলা দিয়ে সেই বাঁদরের ছানা মানুষ করতে লাগলেন।

এমনি করে দিন যায়। ছোটোরানীর সাতমহলে সাতশো দাসীর মাঝে দিন যায়; আর বড়োরানীর ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় বাঁদর-কোলে দিন যায়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চলে গেল। বড়োরানীর যে দুঃখ সেই দুঃখই রইল, মোটাচালের ভাত, মোটাসুতোর শাড়ি আর ঘুচল না। বড়োরানী সেই ভাঙা ঘরে দুঃখের দুঃখী, সাথের সাথী বনের বানরকে কোলে নিয়ে, ছোটোরানীর সাতমহল বাড়ি, সাতখানা ফুলের বাগানের দিকে চেয়ে কাঁদেন। বানর বড়োরানীকে যখন দেখে তখনি রানীর চোখে জল, একটি দিন হাসতে দেখে না।

একদিন বানর বললে—হ্যাঁ মা, তুই কাঁদিস কেন? তোর কিসের দুঃখ? রাজবাড়ির দিকে চেয়ে চেয়ে কেন কাঁদিস, মা? ওখানে তোর কে আছে?

রানী বললেন— ওরে বাছা, ওখানে আমার সব আছে। আমার সাতমহল বাড়ি আছে, সাতশো দাসী আছে, সাত সিন্দুক গহনা আছে, সাতখানা মালঞ্চ আছে। আর বাছা, ওই সাতমহল বাড়িতে রাজার ছোটোরানী আমার এক সতীন আছে। সেই রাক্ষসী আমার রাজাকে যাদু করে আমার সাতমহল বাড়ি, সাতশো দাসী, সাত সিন্দুক গহনা, কেড়ে নিয়ে ওই ফুলের মালঞ্চে সোনার মন্দিরে সুখে আছে; আমার সর্বস্বধন রাজাকে নিয়ে আমায় পথের কাঙালিনী করেছে। ওরে বাছা, আমার কিসের দুঃখ! আমি রাজার মেয়ে ছিলুম, রাজার বৌ হলুম। সাতশো দাসী পেলুম, সাতমহল বাড়ি পেলুম, মনের মতো রাজস্বামী পেলুম। সব পেলুম, তবু কে জানে কার অভিশাপে, চিরদিনে পেলুম না কেবল রাজার কোলে দিতে সোনারচাঁদ রাজপুত্র! হায়, কত জন্মে কত পাপ করেছি, কত লোকের কত সাধে বাদ সেধেছি, কত মায়ের প্রাণে ব্যথা দিয়েছি, তাই এ জন্মে সোনার সংসার সতীনকে দিয়ে, রানীর গরবে, স্বামীর সোহাগে,

রাজপুত্রের আশায় ছাই দিয়ে পথের কাঙালিনী হয়েছি! বাছারে, বড়ো পাষাণী তাই এতদিন এত অপমান, এত যন্ত্রণা, বুকে সয়ে বেঁচে আছি!

দুঃখের কথা বলতে বলতে রানীর চক্ষের জলে বুক ভেসে গেল। তখন সেই বনের বানর রানীর কোলে উঠে বসে চোখের জল মুছে দিয়ে রানীকে বললে— মা, তুই কাঁদিসনে। আমি তোর দুঃখ ঘোচাব, তার সাতমহল বাড়ি দেব, সাতখানা মালঞ্চ দেব, সাতশো দাসী ফিরে দেব, তোকে সোনার মন্দিরে রাজার পাশে রানী করে কোলে নিতে সোনারচাঁদ ছেলে দেব তবে আমার নাম বাঁদর। আমি যা বলি যদি তা করতে পারিস, তবে তোর রাজবাড়িতে যেমন ঐশ্বর্য যেমন আদর ছিল তেমনি হবে।

বানরের কথায় রানীর চোখের কোণে জল, ঠোঁটের কোণে হাসি এল। রানী কেঁদে কেঁদে হেসে বললেন— ওরে বাছা, দেবতার মন্দিরে কত বলি দিয়েছি, তীর্থে তীর্থে কত না পুজো দিয়েছি, তবু একটি রাজপুত্র কোলে পাইনি। তুই কী তপস্যা করে, কোন দেবতার বরে, বনের বানর হয়ে আমাকে রাজরানী করে রাজপুত্র কোলে এনে দিবি? বাছা থাক্, আমার রাজা সুখে থাক্, আমার যে দুঃখ সেই দুঃখই থাক্, তোর এ অসাধ্য-সাধনে কাজ নেই। রাত হল তুই ঘুম যা।

বানর বললে— না মা, আমার কথা না-শুনলে ঘুম যাব না।

রানী বললেন— ওরে তুই ঘুমো, রাত যে অনেক হল! পূর্ব-পশ্চিমে মেঘ উঠল, আকাশ-ভেঙে বৃষ্টি এল, রাজ্য-জুড়ে ঘুম এল, তুই আমার ঘুমো। কাল যা বলবি তাই শুনব, আজ তুই ঘুম যা। ভাঙা ঘরে দ্বার দিয়েছি— ঝড় উঠেছে, ঘরের মাঝে কাঁথা পেতেছি— শীত লেগেছে, তুই দুধের বাছা, আমার কোলে, বুকের কাছে, ঘুম যা।

বানর রানীর বুকে মাথা রেখে ঘুম গেল। রানী ছেঁড়া কাঁথায় মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন।

এমনি করে রাত কাটল। ছোটোরানীর সোনার পালঙ্কে, ফুলের বিছানায়, রাজার পাশে রাত কাটল; আর বড়োরানীর জলে ঝড়ে, ভাঙা ঘরে, ছেঁড়া কাঁথায় রাত কাটল।

সকাল হল। রাজবাড়িতে প্রহরীখানায় প্রহর বাজল, নাকরা-খানায় নবৎ বাজল, রাজারানীর ঘুম ভাঙল।

রাজা সোনার ভৃঙ্গারে স্ফটিকজলে মুখ ধুয়ে, রাজবেশ অঙ্গে পরে, রাজ-দরবারে নেবে গেলেন। আর ছোটোরানী সোনার পালঙ্কে, ফুলের বিছানায়, ফুলের পাখায় হাওয়া খেতে খেতে পাশ ফিরে ঘুম গেলেন।

আর বড়োরানী কী করলেন?

ভাঙা ঘরে সোনার রোদ মুখে পড়ল, রানী উঠে বসলেন। এদিক দেখলেন ওদিক দেখলেন, এপাশ দেখলেন, ওপাশ দেখলেন— বানর নেই! রানী এ-ঘর খুঁজলেন ও-ঘর খুঁজলেন ঘরের চাল খুঁজলেন, গাছের ডাল খুঁজলেন— বানর নেই! বড়োরানী কাঁদতে লাগলেন।

বানর কোথা গেল?

বানর ভাঙা ঘরে ঘুমন্ত রানীকে একলা রেখে, রাত না-পোহাতে রাজ-দরবারে চলে গেল।

রাজা বার দিয়ে দরবারে বসেছেন। চারিদিকে সভাসদ মন্ত্রী, দুয়ারে সিপাই-সান্ত্রী, আশে-পাশে লোকের ভিড়। রানীর বানর সেই লোকের ভিড় ঠেলে, সিপাই-সান্ত্রীর হাত এড়িয়ে, রাজার পায়ে প্রণাম করে বললে— মহারাজ, বড়ো সুখবর এনেছি, মায়ের আমার ছেলে হবে।

রাজা বললেন— ওরে বানর বলিস কী? এ কথা কি সত্য? বড়োরানী দুওরানী তার ছেলে হবে? দেখিস এ কথা যদি মিথ্যা হয় তো তোকেও কাটব আর তোর মা দুওরানীকেও কাটব।

বানর বললে— মহারাজ, সে ভাবনা আমার। এখন আমায় খুশি কর, আমি বিদায় হই।

রাজা গলার গজমোতি হার খুলে দিয়ে বানরকে বিদায় করলেন।

বানর নাচতে নাচতে ভাঙা ঘরে দুওরানী পড়ে পড়ে কাঁদছেন— সেখানে গেল।

দুওরানীর চোখের জল, গায়ের ধুলো মুছিয়ে বানর বললে— এই দেখ্ মা, তোর জন্যে কী এনেছি! তুই রাজার রানী, গলায় দিতে হার পাসনে, কাঠের মালা কিনে পরিস, এই মুক্তোর মালা পর!

রানী বানরের হাতে গজমোতি হার দেখে বললেন— এই হার তুই কোথা পেলি? এ যে রাজার গলার গজমোতি হার! যখন রানী ছিলুম রাজার জন্যে গেঁথেছিলুম, তুই এ হার কোথা পেলি? বল্ বানর, রাজা কি এ হার ফেলে দিয়েছেন, রাজপথে কি কুড়িয়ে পেলি?

বানর বললে— না মা, কুড়িয়ে পাইনি। তোর হাতে গাঁথা রাজার গলার গজমোতি হার কুড়িয়ে কি পাওয়া যায়?

রানী বললেন— তবে কি রাজার ঘরে চুরি করলি?

বানর বললে— ছি ছি মা, চুরি কি করতে আছে! আজ রাজাকে সু-খবর দিয়েছি তাই রাজা হার দিয়ে খুশি করেছেন।

রানী বললেন— ওরে বাছা, তুই যে দুঃখীর সন্তান, বনের বানর! ভাঙা ঘরে দুঃখিনীর কোলে শুয়ে, রাজাকে দিতে কি সুখের সন্ধান পেলি যে রাত না-পোহাতে রাজবাড়িতে ছুটে গেলি?

বানর বললে— মা আমি স্বপ্ন পেয়েছি আমার যেন ভাই হয়েছে, তোর কোলে খোকা হয়েছে; সেই খোকা যেন রাজসিংহাসনে রাজা হয়েছে। তাই ছুটে রাজাকে খবর দিলুম— রাজামহাশয়, মায়ের খোকা হবে। তাইতে রাজা খুশি হয়ে গলার হার খুলে দিলেন।

রানী বললেন— ওরে, রাজা আজ শুনলেন ছেলে হবে, কাল শুনবেন মিছে কথা! আজ রাজা গলায় দিতে হার দিলেন কাল যে মাথা নিতে হুকুম দেবেন! হায় হায়, কী করলি? একমুঠো খেতে পাই, একপাশে পড়ে থাকি, তবু বছর গেলে রাজার দেখা

পাই, তুই আমার তাও ঘোচালি? ওরে তুই কী সর্বনাশ করলি? মিছে খবর কেন রটালি? এ জঞ্জাল কেন ঘটালি?

বানর বললে— মা তোর ভয় কী, ভাবিস কেন? এ দশমাস চুপ করে থাক্, সবাই জানুক— বড়োরানীর ছেলে হবে। তারপর রাজা যখন ছেলে দেখবেন তখন তোর কোলে সোনারচাঁদ ছেলে দেব, তুই রাজাকে দেখাস। এখন চল, বেলা হল, খিদে পেয়েছে।

রানী বললেন— চল্ বাছা চল্। বাটি পুরে জল রেখেছি, গাছের ফল এনেছি, খাবি চল্।

রানী ভাঙা পিঁড়েয় বানরকে খাওয়াতে বসলেন।

আর রাজা ছোটোরানীর ঘরে গেলেন।

ছোটোরানী কুস্বপ্ন দেখে জেগে উঠে সোনার পালঙ্কে বসে বসে ভাবছেন, এমন সময় রাজা এসে খবর দিলেন— আরে শুনেছ ছোটো-রানী, বড়োরানীর ছেলে হবে! বড়ো ভাবনা ছিল রাজসিংহাসন কাকে দেব, এতদিনে ভাবনা ঘুচল। যদি ছেলে হয় তাকে রাজা করব, আর যদি মেয়ে হয়, তবে তার বিয়ে দিয়ে জামাইকে রাজ্য দেব। রানী, বড়ো ভাবনা ছিল, এতদিনে নিশ্চিন্ত হলুম।

রানী বললেন— পারিনে বাপু, আপনার জ্বালায় বাঁচিনে, পরের ভাবনা!

রাজা বললেন— সে কী রানী? এমন সুখের দিনে এমন কথা বলতে হয়? রাজপুত্র কোলে পাব, রাজ সিংহাসনে রাজা করব, এ কথা শুনে মুখ-ভার করে? রানী, রাজবাড়িতে সবার মুখে হাসি, তুমি কেন অকল্যাণ কর?

রানী বললেন— আর পারিনে! কার ছেলে রাজা হবে, কার মেয়ে রাজ্য পাবে, কে রাজসিংহাসনে বসবে, এত ভাবনা ভাবতে পারিনে। নিজের জ্বালায় মরি, পরের ছেলে মোলো বাঁচল তার খবর রাখিনে। বাবারে, সকালবেলা বকে বকে ঘুম হল না, মাথা ধরল, যাই নেয়ে আসি।

রাগভরে ছোটোরানী আটগাছা চুড়ি, দশগাছা মল্ ঝমঝমিয়ে একদিকে চলে গেলেন।

রাজার বড়ো রাগ হল, রাজকুমারকে ছোটোরানী মর্ বললে। রাজা মুখ আঁধার করে বার-মহলে চলে এলেন। রাজা-রানীতে ঝগড়া হল। রাজা আর ছোটোরানীর মুখ দেখলেন না, বড়োরানীর ঘরেও গেলেন না— ছোটোরানী শুনে যদি বিষ খাওয়ায়, বড়োরানীকে প্রাণে মারে! রাজা বার-মহলে একলা রইলেন।

এক মাস গেল, দুমাস গেল, দুমাস গিয়ে তিন মাস গেল, রাজা-রানীর ভাব হল না। ঝগড়ায় ঝগড়ায় চার মাস কাটল। পাঁচ মাসে দুওরানীর পোষা বানর রাজার সঙ্গে দেখা করলে। রাজা বললেন— কী হে বানর, খবর কী?

বানর বললে— মহারাজ, মায়ের বড়ো দুঃখ! মোটা চালের ভাত মুখে রোচে না, মা আমার না-খেয়ে কাহিল হলেন।

রাজা বললেন— এ কথা তো আমি জানিনে। মন্ত্রীবর, যাও এখনি সরু চালের ভাত, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন, সোনার থালে সোনার বাটিতে বড়োরানীকে পাঠিয়ে দাও। আজ থেকে আমি যা খাই বড়োরানীও তাই খাবেন। যাও মন্ত্রী, বানরকে হাজার মোহর দিয়ে বিদায় কর।

মন্ত্রী বানরকে বিদায় করে রান্নাঘরে গেলেন। আর রানীর বানর মোহরের তোড়া নিয়ে রানীর কাছে এল।

রানী বললেন— আজ আবার কোথা ছিলি? এতখানি বেলা হল নাইতে পেলুম না, রাঁধব কখন, খাব কখন?

বানর বললে— মা আর তোকে রাঁধতে হবে না। রাজবাড়ি থেকে সোনার থালায় সোনার বাটিতে সরু চালের ভাত, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন আসবে, তাড়াতাড়ি নেয়ে আয়।

রানী নাইতে গেলেন। বানর একমুঠো মোহর নিয়ে বাজারে গেল। ষোলো থান মোহরে ষোলো জন ঘরামি নিলে, ষোলো গাড়ি খড় নিলে, ষোলোশো বাঁশ নিলে। সেই ষোলোশো বাঁশ দিয়ে, ষোলো গাড়ি খড় দিয়ে, ষোলোজন ঘরামি খাটিয়ে, চক্ষের নিমেষে দুওরানীর

বানর ভাঙাঘর নতুন করলে। শোবার ঘরে নতুন কাঁথা পাতলে, খাবার ঘরে নতুন পিঁড়ি পাতলে, রাজবাড়ির ষোলো বামুনে রানীর ভাত নিয়ে এল ; ষোলো মোহর বিদায় পেলে।

দুওরানী নেয়ে এলেন। এসে দেখলেন— ঘর নতুন! ঘরের চাল নতুন! চালের খড় নতুন! মেঝেয় নতুন কাঁথা! আল্‌নায় নতুন শাড়ি! রানী অবাক হলেন। বানরকে বললেন— বাছা, ভাঙা ঘর দেখে ঘাটে গেলুম, এসে দেখি নতুন ঘর! কেমন করে হল?

বানর বলল— মা, রাজামশায় মোহর দিয়েছেন। সেই মোহরে ভাঙা ঘর নতুন করেছি, ছেঁড়া কাঁথা নতুন করেছি, নতুন পিঁড়ে পেতেছি, তুই সোনার থালে গরম ভাত, সোনার বাটিতে তপ্ত দুধ খাবি চল্।

রানী খেতে বসলেন। কতদিন পরে সোনার থালায় ভাত খেলেন, সোনার ঘটিতে মুখ ধুলেন, সোনার বাটায় পান খেলেন, তবু মনে সুখ পেলেন না। রানী রাজভোগ খান আর ভাবেন— আজ রাজা সোনার থালে ভাত পাঠালেন, কাল হয়তো মশানে নিয়ে মাথা কাটবেন।

এমনি করে ভয়ে-ভয়ে এক মাস, দুমাস, তিন মাস গেল। বড়োরানীর নতুন ঘর পুরোনো হল, ঘরের চাল ফুটো হল, চালের খড় উড়ে গেল। বানর রাজার সঙ্গে দেখা করলে।

রাজা বললেন— কী বানর, কী মনে করে?

বানর বললে— মহারাজ, ভয়ে কব না নির্ভয়ে কব?

রাজা বললেন— নির্ভয়ে কও।

বানর বললে—মহারাজ, ভাঙা ঘরে মা আমার বড়ো দুঃখ পান। ঘরের দুয়োর ফাটা, চালে খড় নেই, শীতের হিম ঘরে আসে। মা আমার গায়ে দিতে লেপ পান না, আগুন জ্বালতে কাঠ পান না, সারা রাত শীতে কাঁপেন।

রাজা বললেন— তাইতো! তাইতো! একথা বলতে হয়। বানর তোর মাকে রাজবাড়িতে নিয়ে আয়, আমি মহল সাজাতে বলি।

বানর বললে— মহারাজ, মাকে আনতে ভয় হয়, ছোটোরানী বিষ খাওয়াবে।

রাজা বললেন— সে ভয় নেই। নতুন মহলে রানীকে রাখব, মহল ঘিরে গড় কাটাব, গড়ের দুয়ারে পাহারা বসাব, ছোটোরানী আসতে পাবে না। সে মহলে বড়োরানী থাকবেন, বড়োরানীর বোবাকালা দাই থাকবে, আর বড়োরানীর পোষা ছেলে তুই থাকবি।

বানর বললে— মহারাজ, যাই তবে মাকে আনি।

রাজা বললেন— যাও মন্ত্রী, মহল সাজাও গে।

মন্ত্রী লক্ষ লক্ষ লোক লাগিয়ে একদিনে বড়োরানীর নতুন মহল সাজালেন।

দুওরানী ভাঙা ঘর ছেড়ে, ছেঁড়া কাঁথা ছেড়ে, সোনার শাড়ি পরে নতুন মহলে এলেন। সোনার পালঙ্কে বসলেন, সোনার থালে ভাত খেলেন, দীন-দুঃখীকে দান দিলেন, রাজ্যে জয় জয় হল; রাগে ছোটোরানীর সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল।

ডাকিনী ব্রাহ্মণী— ছোটোরানীর 'মনের কথা', প্রাণের বন্ধু। ছোটোরানী বলে পাঠালেন— মনের কথাকে আসতে বল্, কথা আছে।

রানী ডেকেছেন— ডাকিনী বুড়ি তাড়াতাড়ি চলে এল।

রানী বললেন— এস ভাই, মনের কথা, কেমন আছ? কাছে বোসো।

ডাকিনী ব্রাহ্মণী ছোটোরানীর পাশে বসে বললে— কেন ভাই, ডেকেছ কেন? মুখখানি ভার-ভার, চোখের কোণে জল, হয়েছে কী?

রানী বললেন— হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু! সতীন আবার ঘরে ঢুকেছে, সে সোনার শাড়ি পরেছে, নতুন মহল পেয়েছে, রাজার প্রেয়সী রানী হয়েছে! ভিখারিনী দুওরানী এত দিনে সুওরানীর রানী হয়ে রাজমহল জুড়ে বসেছে! বামুন সই, দেখে অঙ্গ জ্বলে গেল, আমায় বিষ দে খেয়ে মরি, সতীনের এ আদর প্রাণে সয় না।

ব্রাহ্মণী বললে— ছি! ছি! সই। ও কথা কি মুখে আনে!

কোন্ দুঃখে বিষ খাবে ? দুওরানী আজ রানী হয়েছে, কাল ভিখারিনী হবে, তুমি যেমন সুওরানী তেমনি থাকবে।

সুওরানী বললেন— না-ভাই, বাঁচতে আর সাধ নাই। আজ বাদে কাল দুওরানীর ছেলে হবে, সে ছেলে রাজা হবে! লোকে বলবে আহা, দুওরানী রত্নগর্ভা, রাজার মা হল! আর দেখনা, পোড়ামুখী সুওরানী মহারাজার সুওরানী হল, তবু রাজার কোলে দিতে ছেলে পেলে না! ছি! ছি! অমন অভাগীর মুখ দেখেনা, নাম করলে সারাদিন উপোস যায়! ভাই, এ গঞ্জনা প্রাণে সবে না। তুই বিষ দে, হয় আমি খাই, নয়তো সতীনকে খাওয়াই।

ব্রাহ্মণী বললে— চুপ কর রানী, কে কোন্ দিকে শুনতে পাবে। ভাবনা কী ? চুপি চুপি বিষ এনে দেব, দুওরানীকে খেতে দিও। এখন বিদায় দাও, বিষের সন্ধানে যাই।

রানী বললেন— যাও ভাই। কিন্তু দেখো, বিষ যেন আসল হয়, খেতে-না-খেতে বড়োরানী ঘুরে পড়বে।

ডাকিনী বললে— ভয় নেই গো, ভয় নেই! আজ বাদে কাল বড়োরানীকে বিষ খাওয়াব, জন্মের মতো মা হবার সাধ ঘোচাব, তুমি নির্ভয়ে থাক।

ডাকিনী বিষের সন্ধানে গেল। বনে বনে খুজে খুজে ভর-সন্ধ্যাবেলা ঝোপের আড়ালে ঘুমন্ত সাপকে মন্ত্রে বশ করে, তার মুখ থেকে কালকূট বিষ এনে দিল।

ছোটোরানী সেই বিষে মুগের নাড়ু, ক্ষীরের ছাঁচ, মতিচুর মেঠাই গড়ালেন। একখানা থালা সাজিয়ে ডাকিনী ব্রাহ্মণীকে বললেন— ভাই এক কাজ কর্, এই বিষের নাড়ু, বড়োরানীকে বেচে আয়।

ব্রাহ্মণী থালা হাতে বড়োরানীর নতুন মহলে গেল।

বড়োরানী বললেন— আয় লো আয়, এতদিন কোথায় ছিলি ? দুওরানী বলে কি ভুলে থাকতে হয় ?

ডাকিনী বললে— সে কী গো! তোমাদের খাই, তোমাদের

পরি, তোমাদের কি ভুলতে পারি? এই দেখ, তোমার জন্যে যতন করে মুগের নাড়ু, ক্ষীরের ছাঁচ, মতিচুর মেঠাই এনেছি।

রানী দেখলেন, বুড়ি ব্রাহ্মণী বড়ো যত্ন করে, থালা সাজিয়ে সামগ্রী এনেছে। খুশি হয়ে তার দুহাতে দুমুঠো মোহর দিয়ে বিদায় করলেন, ব্রাহ্মণী হাসতে হাসতে চলে গেল।

রানী ক্ষীরের ছাঁচ ভেঙে খেলেন, জিবের স্বাদ গেল। মুগের নাড়ু মুখে দিলেন, গলা কাঠ হল। মতিচুর মেঠাই খেলেন, বুক যেন জ্বলে গেল। বানরকে ডেকে বললেন— ব্রাহ্মণী আমায় কী খাওয়ালে! গা-কেমন করছে, বুঝি আর বাঁচব না।

বানর বললে— চল্ মা, খাটে শুবি, অসুখ সারবে।

রানী উঠে দাঁড়ালেন, সাপের বিষ মাথায় উঠল। রানী চোখে আঁধার দেখলেন, মাথা টলে গেল, সোনার প্রতিমা শানের উপর ঘুরে পড়লেন।

বানর রানীর মাথা কোলে নিলে, হাত ধরে নাড়ি দেখলে, চোখের পাতা খুলে চোখ দেখলে— রানী অজ্ঞান, অসাড়!

বানর সোনার প্রতিমা বড়োরানীকে সোনার খাটে শুইয়ে দিয়ে ওষুধের সন্ধানে বনে ছুটে গেল। বন থেকে কে জানে কী লতাপাতা, কোন গাছের কী শিকড় এনে নতুন শিলে বেটে বড়োরানীকে খাওয়াতে লাগল।

রাজবাড়িতে খবর গেল— বড়োরানী বিষ খেয়েছেন। রাজা উঠতে-পড়তে রানীর মহলে এলেন। রাজমন্ত্রী ছুটতে ছুটতে সঙ্গে এলেন। রাজবৈদ্য মন্তর আওড়াতে আওড়াতে তারপর এলেন। তারপর রাজার লোক-লস্কর, দাসী-বাঁদী যে যেখানে ছিল হাজির হল।

বানর বললে— মহারাজ, এত লোক কেন এনেছ? আমি মাকে ওষুধ দিয়েছি, মা আমার ভালো আছেন, একটু ঘুমোতে দাও। এত লোককে যেত বল।

রাজা বিষের নাড়ু পরখ করিয়ে রাজবৈদ্যকে বিদায় করলেন।

রাজ্যের ভার দিয়ে রাজমন্ত্রীকে বিদায় করলেন। বড়োরানীর মহলে নিজে রইলেন।

তিন দিন, তিন রাত বড়োরানী অজ্ঞান। চার দিনে জ্ঞান হল, বড়োরানী চোখ মেলে চাইলেন।

বানর রাজাকে এসে খবর দিলে— মহারাজ, বড়োরানী সেরে উঠেছেন, তোমার একটি রাজচক্রবর্তী ছেলে হয়েছে।

রাজা বানরকে হীরের হার খুলে দিয়ে বললেন— চল বানর, বড়োরানীকে আর বড়োরানীর ছেলেকে দেখে আসি।

বানর বললে— মহারাজ, গণনা করেছি ছেলের মুখ এখন দেখলে তোমার চক্ষু অন্ধ হবে। ছেলের বিয়ে হলে মুখ দেখো, এখন বড়োরানীকে দেখে এস ছোটোরানী কী দুর্দশা করেছে।

রাজা দেখলেন— বিষের জ্বালায় বড়োরানীর সোনার অঙ্গ কালি হয়ে গেছে, রানী পাতাখানার মতো পড়ে আছেন. রানীকে আর চেনা যায় না!

রাজা রাজবাড়িতে এসে ছোটোরানীকে প্রহরী-খানায় বন্ধ করলেন, আর ডাকিনী বুড়িকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে, উল্‌টো গাধায় চড়িয়ে দেশের বার করে দিলেন।

তারপর হুকুম দিলেন— মন্ত্রীবর, আজ বড়ো শুভদিন, এতদিন পরে রাজচক্রবর্তী ছেলে পেয়েছি। তুমি পথে পথে আলো জ্বালাও, ঘরে ঘরে বাজি পোড়াও, দীন-দুঃখী ডেকে রাজভাণ্ডার লুটিয়ে দাও, রাজ্যে যেন একটিও ভিখারী না-থাকে।

মন্ত্রী রাজার আজ্ঞায় নগরের পথে পথে আলো দিলেন, ঘরে ঘরে বাজি পোড়ালেন, দীন-দুঃখীকে রাজভাণ্ডার লুটিয়ে দিলেন, রাজ্যে জয়-জয়কার হল।

এমনি করে নিত্য নতুন আমোদে, দেবতার মন্দিরে পূজা দিয়ে, মা কালীর পায়ে বলি দিয়ে দেখতে দেখতে দশ বৎসর কেটে গেল।

রাজা বানরকে ডেকে বললেন— দশ বৎসর তো পূর্ণ হল এখন ছেলে দেখাও!

বানর বললে— মহারাজ, আগে ছেলের বৌ ঠিক কর, তারপর তার বিয়ে দাও, তারপর মুখ দেখো ! এখন ছেলে দেখলে অন্ধ হবে।

রাজা বানরের কথায় দেশ-বিদেশে ভাট পাঠালেন। কত দেশের কত রাজকন্যার সন্ধান এল, একটিও রাজার মনে ধরল না। শেষে পাটলী দেশের রাজার ভাট সোনার কৌটায় সোনার প্রতিমা রাজকন্যার ছবি নিয়ে এল ! কন্যার অঙ্গের বরন কাঁচা সোনা, জোড়া-ভুরু— বাঁকাধনু, দুটি চোখ টানা-টানা, দুটি ঠোঁট হাসি-হাসি, এলিয়ে দিলে মাথার কেশ পায়ে পড়ে। রাজার সেই কন্যা পছন্দ হল।

বানরকে ডেকে বললেন— ছেলের বৌ ঠিক করেছি, কাল শুভদিনে শুভলগ্নে বিয়ে দিতে যাব।

বানর বললে— মহারাজ, কাল সন্ধ্যাবেলা, বেহারা দিয়ে বরের পাল্‌কি মায়ের দুয়ারে পাঠিয়ে দিও, বরকে নিয়ে বিয়ে দিতে যাব।

রাজা বললেন— দেখো বাপু, দশ বৎসর তোমার কথা শুনেছি, কাল ছেলে না-দেখালে অনর্থ করব।

বানর বললে, মহারাজ, সে ভাবনা নেই। তুমি বেহাই-বাড়ি চলে যাও, আমরা কাল বর নিয়ে যাব।

রাজা পাছে রানীর ছেলেকে দেখে ফেলেন, পাছে চক্ষু অন্ধ হয়, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি বেহাই-বাড়ি চলে গেলেন।

আর বানর নতুন-মহলে বড়োরানীর কাছে গেল।

বড়োরানী ছেলের বিয়ে শুনে অবধি পড়ে পড়ে কাঁদছেন আর ভাবছেন— ছেলে কোথা পাব, এবার রাজাকে কী ছলে ভোলাব !

বানর এসে বললে, মা গো মা, ওঠ্। চেলীর জোড় আন্, মাথার টোপর আন্, ক্ষীরের ছেলে গড়ে দে, বর সাজিয়ে বিয়ে দিয়ে আনি।

রানী বললেন— বাছারে, প্রাণে কি তোর ভয় নেই ? কোন সাহসে ক্ষীরের পুতুল বর সাজিয়ে বিয়ে দিতে যাবি ? রাজাকে কী ছলে ভোলাবি ? বাছা কাজ নেই, ছল করে রাজার প্রেয়সী হলুম, সেই পাপে সতীন বিষ খাওয়ালে, ভাগ্যে-ভাগ্যে বেঁচে উঠেছি, আবার

কোন্ সাহসে রাজার সঙ্গে ছল করব ? বাছা ক্ষান্ত দে, কেন আর পাপের বোঝা বাড়াস ! তুই রাজাকে ডেকে আন্, আমি সব কথা খুলে বলি।

বানর বললে— রাজাকে পাব কোথা ? দুদিনের পথ কনের বাড়ি, রাজা সেখানে গেছেন। তুই কথা রাখ, ক্ষীরের বর গড়ে দে। রাজা পথ চেয়ে আছেন কখন বর আসবে, বর না-এলে বড়ো অপমান। মা তুই ভাবিসনে, ক্ষীরের পুতুল বিয়ে দিতে পাঠালি, যদি ষষ্ঠীর কৃপা হয় তবে ষষ্ঠীদাস ষেঠের বাছা কোলে পাবি।

রানী বানরের ভরসায় বুক বেঁধে মনের মতো ক্ষীরের ছেলে গড়লেন। তাকে চেলীর জোড় পরালেন, সোনার টোপর পরালেন, জরির জুতো পায়ে দিলেন।

বানর চুপি চুপি ক্ষীরের বর পাল্কিতে তুলে রঙিন ঢাকা নামিয়ে দিলে, বরের কেবল দুখানি ছোটো পা, দুপাটি জরির জুতো দেখা যেতে লাগল।

ষোলো জন কাহার বরের পাল্কি কাঁধে তুল্লে। বানর মাথায় পাগড়ি, কোমরে চাদর বেঁধে, নিশেন উড়িয়ে, ঢাক বাজিয়ে, আলো জ্বালিয়ে, ক্ষীরের পুতুলের বিয়ে দিতে গেল। রানী আঁধার পুরে একলা বসে বিপদ-ভঞ্জন বিঘ্নহরণকে ডাকতে লাগলেন।

এদিকে বর নিয়ে ষোলো কাহার, মশাল নিয়ে মশালধারী, ঢাক ঢোল নিয়ে ঢাকী ঢুলী, ঘোড়ায় চড়ে বরযাত্রী— সারারাত বাঁশি বাজিয়ে, আলো জ্বালিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে দিগ্‌নগরে এসে পড়ল।

দিগ্‌নগরে দিঘির ধারে ভোর হল। মশাল পুড়ে-পুড়ে নিবে গেল, ঘোড়া ছুটেছুটে বেদম হল, কাহার পাল্কি বয়ে হয়রান হল, ঢাক পিটে পিটে ঢাকীর হাতে খিল্ ধরল।

বানর দিঘির ধারে তাঁবু ফেলতে হুকুম দিলে। দিঘির ধারে ষষ্ঠীতলায় বরের পাল্কি নামিয়ে কাহারদের ছুটি দিলে, মন্ত্রীকে ডেকে বলে দিলে— মন্ত্রীমশায়, রাজার হুকুম বরকে যেন কেউ না দেখে, আজকের দিনে বর দেখলে বড়ো অমঙ্গল।

মন্ত্রী রাজার হুকুম জারি করলেন। রাজার লোকজন দিঘির জলে নেয়ে, রেঁধে-বেড়ে খেয়ে, তাঁবুর ভিতর শুয়ে রইল, বটগাছের দিকে এল না। গাঁয়ের বৌ-ঝি ষষ্ঠীঠাকরুণের পুজো দিতে এল, রাজার পাহারা হাঁকিয়ে দিলে।

সেদিন বটতলায় ষষ্ঠীঠাকরুনের পুজো হল না। ষষ্ঠীঠাকরুন খিদের জ্বালায় অস্থির হলেন, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হল। বানর মনে মনে হাসতে লাগল।

এমনি বেলা অনেক হল। ষষ্ঠীঠাকরুনের মুখে জলবিন্দু পড়ল না, ঠাকরুন কাঠামোর ভিতর ছট্‌ফট করতে লাগলেন, ঠাকরুনের কালো বেড়াল মিউ-মিউ করে কাঁদতে লাগল। বানর তখন মনে-মনে ফন্দি এঁটে পাল্‌কির দরজা খুলে রেখে আড়ালে গেল।

ষষ্ঠীঠাকরুন ভাবলেন— আঃ আপদ গেল! কাঠফাটা রোদে কাঠামো থেকে বার হয়ে নৈবেদ্যের ছোলাটা কলাটা সন্ধান করতে লাগলেন। খুঁজতে খুঁজতে দেখেন, পাল্‌কির ভিতর ক্ষীরের পুতুল। ঠাকরুন আর লোভ সামলাতে পারলেন না, মনে-মনে ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসিকে স্মরণ করলেন।

দিগ্‌নগরে যখন দিন, ঘুমের দেশে তখন রাত। ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি সারারাত দিগ্‌নগরে ষষ্ঠীরদাস যেঠের-বাছা ছেলেদের চোখে ঘুম দিয়ে, সকালবেলা ঘুমের দেশে রাজার মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে, অনেক বেলায় একটুখানি চোখ বুজেছেন, এমন সময় ষষ্ঠীঠাকরুনের ডাক পড়ল। ঘুমের দেশে ঘুমপাড়ানি মাসি জেগে উঠলেন, ঘুমপাড়ানি পিসি উঠে বসলেন, দুই বোনে ঘুমের দেশ ছেড়ে দিগ্‌নগরে এলেন। ষষ্ঠীর পায়ে প্রণাম করে বললেন— ঠাকরুন, দিনে-দুপুরে ডেকেছেন কেন?

ঠাকরুন বললেন— বাছারা, এতখানি বেলা হল এখনও ভোগ পাইনি। তোরা একটি কাজ কর, দেশের যে যেখানে আছে ঘুম পাড়িয়ে দে, আমি ডুলির ভিতর ক্ষীরের পুতুলটি খেয়ে আসি।

ষষ্ঠীঠাকরুনের কথায় মাসি-পিসি মায়া করলেন, দেশের লোক

ঘুমিয়ে পড়ল। মাঠের মাঝে রাখাল, ঘরের মাঝে খোকা, খোকার পাশে খোকার মা, খেলাঘরে খোকার দিদি ঘুমিয়ে পড়ল। ষষ্ঠী-তলায় রাজার লোকজন, পাঠশালায় গাঁয়ের ছেলেপিলে ঘুমিয়ে পড়ল। রাজার মন্ত্রী হুঁকোর নল মুখে ঘুমিয়ে পড়লেন, গাঁয়ের গুরু বেত হাতে ঢুলে পড়লেন। দিগ্‌নগরে দিনে-দুপুরে রাত এল। মাসি-পিসি সবার চোখে ঘুম দিলেন— জেগে রইল গাঁয়ের মাঝে রাস্তার শেয়াল-কুকুর, দিঘির ধারে রাজার হাতি-ঘোড়া, বনের মাঝে বনের পাখি, গাছের ডালে রানীর বানর। আর জেগে রইল, ষষ্ঠীরদাস বনের বেড়াল, জলের বেড়াল, গাছের বেড়াল, ঘরের বেড়াল। ষষ্ঠীঠাকরুন তখন ডুলি খুলে ক্ষীরের ছেলে হাতে নিলেন। ক্ষীরের গন্ধে গাছ থেকে কাঠবেড়াল নেমে এল, বন থেকে বনবেড়াল ছুটে এল, জল থেকে উদ্‌বেড়াল উঠে এল, কুনোবেড়াল কোণ ছেড়ে ষষ্ঠীতলায় চলে এল।

ষষ্ঠীঠাকরুন ক্ষীরের ছেলের দশটি আঙুল বেড়ালদের খেতে দিলেন। নিজে ক্ষীরের হাত, ক্ষীরের পা, ক্ষীরের বুক পিঠ মাথা খেয়ে, ক্ষীরের দুটি কান মাসি-পিসির হাতে দিয়ে বিদায় করলেন।

মাসি-পিসি ঘুমের দেশে চলে গেলেন, দিগ্‌নগরে দিঘির ঘাটে বরযাত্রীর ঘুম ভাঙল, গাঁয়ের ভিতর ঘরে ঘরে গ্রামবাসীর ঘুম ভাঙল। ষষ্ঠীঠাকরুন তাড়াতাড়ি মুখ মুছে কাঠামোয় ঢুকতে যাবেন, এমন সময় বানর গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে বললে— ঠাকরুন, পালাও কোথা, আগে ক্ষীরের ছেলে দিয়ে যাও! চুরি করে ক্ষীর খাওয়া ধরা পড়েছে, দেশ-বিদেশে কলঙ্ক রটাব।

ঠাকরুন ভয় পেয়ে বললেন— আঃ মর! এ মুখপোড়া বলে কী! সর্ সর্, আমি পালাই, লোকে আমায় দেখতে পাবে!

বানর বললে— তা হবে না, আগে ছেলে দাও তবে ছেড়ে দেব। নয় তো কাঠামো-সুদ্ধ আজ তোমায় দিঘির জলে ডুবিয়ে যাব, দেবতা হয়ে ক্ষীর চুরির শাস্তি হবে।

ঠাকরুন লজ্জায় মরে গেলেন, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—

বাছা চুপ কর্, কে কোন্ দিকে শুনতে পাবে ? তোর ক্ষীরের ছেলে খেয়ে ফেলেছি ফিরে পাব কোথা ? ওই বটতলায় আমার ছেলেরা খেলা করছে, তোর যেটিকে পছন্দ সেটিকে নিয়ে বিয়ে দিগে যা, আমার বরে দুওরানী তাকে আপনার ছেলের মতো দেখবে, এখন আমায় ছেড়ে দে।

বানর বললে— কই ঠাকরুণ, বটতলায় তো ছেলেরা নেই! আমায় দিব্যচক্ষু দাও তবে তো ষষ্ঠীরদাস ষেঠের বাছাদের দেখতে পাব! ষষ্ঠীঠাকরুণ বানরের চোখে হাত বোলালেন, বানরের দিব্যচক্ষু হল।

বানর দেখলে— ষষ্ঠীতলা ছেলের রাজ্য, সেখানে কেবল ছেলে— ঘরে ছেলে, বাইরে ছেলে, জলে স্থলে, পথে ঘাটে, গাছের ডালে, সবুজ ঘাসে যেদিকে দেখে সেইদিকেই ছেলের পাল, মেয়ের দল। কেউ কালো, কেউ সুন্দর, কেউ শ্যামলা। কারো পায়ে নূপুর কারো কাঁকালে হেলে, কারো গলায় সোনার দানা। কেউ বাঁশি বাজাচ্ছে কেউ ঝুমঝুমি ঝুম্‌ঝুম্ করছে, কেউবা পায়ের নূপুর বাজিয়ে বাজিয়ে কচি হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে। কারো পায়ে লাল জুতুয়া, কারো মাথায় রাঙা টুপি, কারো গায়ে ফুলদার লক্ষ টাকার মলমলি চাদর। কোনো ছেলে রোগা-রোগা, কোনো ছেলে মোটাসোটা, কেউ দস্যি, কেউ লক্ষ্মী। একদল কাঠের ঘোড়া টক্‌বক্ হাঁকাচ্ছে, একদল দিঘির জলে মাছ ধরছে, একদল বাঁধের জলে নাইতে নেমেছে, একদল তলায় ফুল কুড়চ্ছে, একদল গাছের ডালে ফল পাড়ছে, চারিদিকে খেলাধুলো, মারামারি, হাসিকান্না। সে এক নতুন দেশ, স্বপ্নের রাজ্য! সেখানে কেবল ছুটোছুটি, কেবল খেলাধুলো; সেখানে পাঠশালা নেই, পাঠশালের গুরু নেই, গুরুর হাতে বেত নেই। সেখানে আছে দিঘির কালো জল তার ধারে সর বন, তেপান্তর মাঠ তার পরে আমকাঁঠালের বাগান, গাছে গাছে ন্যাজঝোলা টিয়েপাখি, নদীর জলে গোল-চোখ বোয়াল মাছ, কচু বনে মশার ঝাঁক। আর আছেন বনের ধারে বনগাঁ-বাসী মাসি-

পিসি, তিনি খৈয়ের মোয়া গড়েন, ঘরের ধারে ডালিম গাছটি তাতে প্রভু নাচেন। নদীর পারে জন্তীগাছটি তাতে জন্তী ফল ফলে, সেখানে নীল ঘোড়া মাঠে মাঠে চরে বেড়াচ্ছে, গৌড় দেশের সোনার ময়ূর পথে ঘাটে গড়াগড়ি যাচ্ছে। ছেলেরা সেই নীল ঘোড়া নিয়ে, সেই সোনার ময়ূর দিয়ে ঘোড়া সাজিয়ে, ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজিয়ে, ডুলি চাপিয়ে, কমলাপুলির দেশে পুটুরানীর বিয়ে দিতে যাচ্ছে। বানর কমলাপুলির দেশে গেল। সে টিয়েপাখির দেশ, সেখানে কেবল ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়েপাখি, তারা দাঁড়ে বসে ধান খোঁটে, গাছে বসে কেঁচ্‌মেচ্‌ করে, আর সে-দেশের ছেলেদের নিয়ে খেলা করে। সেখানে লোকেরা গাই-বলদে চাষ করে, হীরে দিয়ে দাঁত ঘষে! সে এক নতুন দেশ— সেখানে নিমেষে সকাল, পলকে সন্ধ্যা হয়, সে দেশের কাণ্ডই এক! ঝুরঝুরে বালির মাঝে চিক্‌চিকে জল, তারি ধারে এক পাল ছেলে দোলায় চেপে ছ-পণ কড়ি গুণতে গুণতে মাছ ধরতে এসেছে; কারো পায়ে মাছের কাঁটা ফুটেছে, কারো চাঁদমুখে রোদ পড়েছে। জেলেদের ছেলে জাল মুড়ি দিয়ে ঘুম দিচ্ছে— এমন সময় টাপুর-টুপুর বিষ্টি এল, নদীতে বান এল; অমনি সেই ছেলের পাল, সেই কাঠের দোলা, সেই ছ-পণ কড়ি ফেলে, কোন্‌ পাড়ায় কোন্‌ ঘরের কোণে ফিরে গেল। পথের মাঝে তাদের মাছগুলো চিলে কেড়ে নিলে, কোলা ব্যাঙে ছিপগুলো টেনে নিলে, খোকা-বাবুরা ক্ষেপ্ত হয়ে ঘরে এলেন, মা তপ্ত দুধ জুড়িয়ে খেতে দিলেন। আর সেই চিক্‌চিকে জলের ধারে ঝুর্‌ঝুরে বালির চরে শিবঠাকুর এসে নৌকো বাঁধলেন, তাঁর সঙ্গে তিন কন্যে— এক কন্যে রাঁধলেন বাড়লেন, এক কন্যে খেলেন আর এক কন্যে না-পেয়ে বাপের বাড়ি গেলেন। বানর তার সঙ্গে বাপের বাড়ির দেশে গেল। সেখানে জলের ঘাটে মেয়েগুলি নাইতে এসেছে, কালো কালো চুলগুলি ঝাড়তে লেগেছে। ঘাটের দুপাশে দুই রুই কাতলা ভেসে উঠল, তার একটি গুরুঠাকুর নিলেন, আর একটি নায়ে ভরা দিয়ে টিয়ে আসছিল সে নিলে। তাই দেখে ভোঁদড় টিয়েকে এক হাতে নিয়ে

আর মাছকে এক হাতে নিয়ে নাচতে আরম্ভ করলে, ঘরের দুয়োরে খোকার মা খোকাবাবুকে নাচিয়ে নাচিয়ে বললেন— ওরে ভোঁদড় ফিরে চা, খোকার নাচন দেখে যা।

বানর দেখলে— ছেলেটি বড়ো সুন্দর, যেন সোনার চাঁদ, তাড়াতাড়ি ছেলেটিকে কেড়ে নিলে! অমনি ষষ্ঠীতলার সেই স্বপ্নের দেশ কোথায় মিলিয়ে গেল, ন্যাজঝোলা টিয়েপাখি আকাশ সবুজ করে কোন্ দেশে উড়ে গেল, শিবঠাকুরের নৌকো কোন্ দেশে ভেসে গেল। ঘাটের মেয়েরা ডুরে শাড়ি ঘুরিয়ে পরে চলে গেল। ষষ্ঠীর দেশে কুনোবেড়াল কোমর বেঁধে, শাশুড়ি ভোলাতে উড়কি ধানের মুড়কি নিয়ে, চার মিন্‌সে কাহার নিয়ে, চার মাগী দাঁসী সঙ্গে, আম-কাঁঠালের বাগান দিয়ে পুঁটুরানীকে শ্বশুর-বাড়ি নিয়ে যেতে যেতে আমতলার অন্ধকারে মিশে গেল। তেঁতুল গাছের ভোঁদড়গুলো নাচতে নাচতে পাতার সঙ্গে মিলিয়ে গেল— দেশটা যেন মাটির নিচে ডুবে গেল।

বানর দেখলে— কোথায় ষষ্ঠীঠাকরুণ, কোথায় কে! বটতলায় দিঘির ধারে ছেলে কোলে একলা দাঁড়িয়ে আছে! তখন বানর লোকজন ডেকে সেই সোনার চাঁদ ছেলেটিকে পাল্‌কি চড়িয়ে, আলো জ্বালিয়ে বাদ্যি বাজিয়ে সন্ধ্যাবেলা দিগ্‌নগর ছেড়ে গেল।

এদিকে পাটলি দেশে বেয়াইবাড়ি বসে বসে রাজা ভাবছেন— বানর এখনো এল না? আমার সঙ্গে ছল করলে? রাজ্যে গিয়ে মাথা কাটব। বিয়ের কনেটি ভাবছে— না জানি বর দেখতে কেমন? কনের মা-বাপ ভাবছে— আহা, বুকের বাছা পর হয়ে কার ঘরে চলে যাবে! রাজবাড়ির চাকর-দাসীরা ভাবছে কাজ কখন সারা হবে, ছাদে উঠে বর দেখব। এমন সময় গুরু গুরু ঢোল বাজিয়ে, পোঁ পোঁ বাঁশি বাজিয়ে, টক্‌বক্ ঘোড়া হাঁকিয়ে ঝক্‌মক্ আলো জ্বালিয়ে, বানর বর নিয়ে এল। রাজা ছেলেকে হাত ধরে সভায় বসালেন, কনের বাপ বিয়ের সভায় মেয়ের হাত জামাইয়ের হাতে সঁপে দিলেন,

পাড়া-পড়শী বরকে বরণ করলে, দাস-দাসী শাঁক বাজালে, হুলু দিলে— বরকনের বিয়ে হল।

রাজা ছেলের বিয়ে দিয়ে তার পরদিন বৌ ছেলে নিয়ে, বাঁশি বাজিয়ে, ঘোড়া হাঁকিয়ে বানরের সঙ্গে দেশে ফিরলেন। পাটলি দেশের রাজার বাড়ি এক রাত্তিরে শূন্য হয়ে গেল, মা-বাপের কোলের মেয়ে পরের ঘরে চলে গেল।

এদিকে রাজার দেশে বড়রানী দুদিন দুরাত কেঁদে কেঁদে, ভেবে ভেবে, ভোর বেলা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন ষষ্ঠীঠাকরুন বলছেন, রানী, ওঠ্। চেয়ে দেখ্ তোর কোলের বাছা ঘরে এল। রানী ঘুম ভেঙে উঠে বসলেন, দুয়ারে শুনলেন দাসীরা ডাকছে ওঠ গো রানী ওঠ, পাটের শাড়ি পর, বৌ-বেটা বরণ করগে!

রানী পাটের শাড়ি পরে বাইরে এলেন। এসে দেখলেন সত্যিই রাজা বৌ-বেটা এনেছেন! হাসিমুখে বর-কনেকে কোলে নিলেন, ষষ্ঠীর বরে দুঃখের দিনের ক্ষীরের ছেলের কথা মনে রইল না, ভাবলেন ছেলের জন্য ভেবে ভেবে ক্ষীরের ছেলে স্বপ্ন দেখেছি।

রাজা এসে ছেলেকে রাজ্য যৌতুক দিলেন, সেই রাজ্যে বানরকে মন্ত্রী করে দিলেন, আর ছেলের বৌকে মায়ারাজ্যের সেই আট হাজার মানিকের আটগাছি চুড়ি, দশশো ভরি সোনার সেই দশগাছা মল পরিয়ে দিলেন। কন্যের হাতে মানিকের চুড়ি যেন রক্ত ফুটে পড়ল, পায়ে মল রিনিঝিনি বাজতে লাগল, ঝিকিমিকি জ্বলতে লাগল।

হিংসেয় ছোটোরানী বুক ফেটে মরে গেল।

রাজকাহিনী

শিলাদিত্য

শিলাদিত্যের যখন জন্ম হয়নি, যে সময়ে বল্লভীপুরে রাজা কনক সেনের বংশের শেষ রাজা রাজত্ব করছিলেন, সেই সময় বল্লভীপুরে সূর্যকুণ্ড নামে একটি অতি পবিত্র কুণ্ড ছিল। সেই কুণ্ডের একধারে প্রকাণ্ড সূর্যমন্দিরে এক অতিবৃদ্ধ পুরোহিত বাস করতেন। তাঁর একটিও পুত্রকন্যা কিংবা বন্ধুবান্ধব ছিল না। অনন্ত আকাশে সূর্যদেব যেমন একা, তেমনি আকাশের মতো নীল প্রকাণ্ড সূর্যকুণ্ডের তীরে আদিত্য-মন্দিরে সূর্য-পুরোহিত তেজস্বী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বড়োই একাকী, বড়োই সঙ্গীহীন ছিলেন। মন্দিরে দীপ-দান, ঘণ্টাধ্বনি, উদয় অস্ত দুই সন্ধ্যা আরতি, সকল ভারই তাঁর উপর— ভৃত্য নেই, অনুচর নেই, একটি শিষ্যও নেই! বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একাই প্রতিদিন ত্রিশ সের ওজনের পিতলের প্রদীপে দুই সন্ধ্যা সূর্যদেবের আরতি করতেন; প্রতিদিনই সেই শীর্ণ হাতে রাক্ষস রাজার রাজমুকুটের মতো মন্দিরের প্রকাণ্ড ঘণ্টা বাজাতেন; আর মনে-মনে ভাবতেন, যদি একটি সঙ্গী পাই, তবে এই বৃদ্ধ বয়সে তার হাতে সমস্ত ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

সূর্যদেব ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। একদিন পৌষ মাসের প্রথমে ঘন কুয়াশায় চারিদিক অন্ধকার ছিল, সূর্যদেব অস্ত গেছেন, বৃদ্ধ পুরোহিত সন্ধ্যার আরতি শেষ করে ভীমের বুকপাটাখানার মতো প্রকাণ্ড মন্দিরের লোহার কপাট বহুকষ্টে বন্ধ করছেন, এমন সময় ম্লানমুখে একটি ব্রাহ্মণ-কন্যা তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হল— পরনে ছিন্নবাস, কিন্তু অপূর্ব সুন্দরী! বোধ হল যেন শীতের ভয়ে একটি সন্ধ্যাতারা সূর্যমন্দিরে আশ্রয় চায়! ব্রাহ্মণ দেখলেন কন্যাটি সুলক্ষণা, অথচ তার বিধবার বেশ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন— 'কে তুমি? কী চাও?' তখন সেই ব্রাহ্মণ-বালিকা কমলকলির মতো ছোটো দুইখানি হাত জোড় করে বললে— 'প্রভু, আমি আশ্রয় চাই;

ব্রাহ্মণ-কন্যা, গুর্জর দেশের বেদবিদ ব্রাহ্মণ দেবাদিত্যের একমাত্র কন্যা আমি, নাম সুভাগা ; বিয়ের রাতে বিধবা হয়েছি, সেই দোষে দুর্ভাগী বলে সকলে মিলে আমায় আমাদের দেশের বার করেছে। প্রভু, আমার মা ছিলেন, এখন মা-ও নেই, আমায় আশ্রয় দাও।' ব্রাহ্মণ বললেন— 'আরে অনাথিনী, এখানে কোন সুখের আশায় আশ্রয় চাস ? আমার অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, আমি যে নিতান্ত দরিদ্র, বন্ধুহীন !'

ব্রাহ্মণ মনে-মনে এই কথা বললেন বটে, কিন্তু কে যেন তাঁর মনের ভিতর বলতে লাগল—'হে দরিদ্র, হে বন্ধুহীন, এই বালিকাকে তোমার বন্ধু কর, আশ্রয় দাও।' ব্রাহ্মণ একবার মনে করলেন আশ্রয় দিই ; আবার ভাবলেন— যে মন্দিরে আশি বৎসর ধরে একা এই সূর্যদেবের পূজা করলাম, আজ শেষ-দশায় আবার কার হাতে তাঁর পূজার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। ব্রাহ্মণ ইতস্তত করতে লাগলেন। তখন সহসা সন্ধ্যার সমস্ত অন্ধকার ভেদ করে পৃথিবীর পশ্চিম পার থেকে একবিন্দু সূর্যের আলো সেই দুঃখিনী বালিকার মুখখানিতে এসে পড়ল। ভগবান আদিত্যদেব যেন নিজের হাতে দেখিয়ে দিলেন— এই আমার সেবাদাসী ! হে আমার প্রিয় ভক্ত, এই বালিকাকে আশ্রয় দাও, যেন চিরদিন এই দুঃখিনী বিধবা আমার সেবায় নিযুক্ত থাকে। ব্রাহ্মণ জোড়হস্তে সূর্যদেবকে প্রণাম করে, দেবাদিত্য ব্রাহ্মণের কন্যা সুভাগাকে সূর্যমন্দিরে আশ্রয় দিলেন।

তারপরে কতদিন কেটে গেল, সুভাগা তখন মন্দিরের সমস্ত কাজই শিখেছেন, কেবল ননীর মতো কোমল হাতে ত্রিশ সের ওজনের সেই আরতির প্রদীপটা কিছুতেই তুলতে পারলেন না বলে আরতির কাজটা বৃদ্ধকেই করতে হত। একদিন সুভাগা দেখলেন, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের জীর্ণ শরীর যেন ভেঙে পড়েছে— আরতির প্রদীপ শীর্ণ হাতে টলে পড়ছে। সেই দিন সুভাগা বল্লভীপুরের বাজারে গিয়ে এক সের ওজনের একটি ছোটো প্রদীপ নিয়ে এসে বললেন— 'পিতা, আজ সন্ধ্যার সময় এই প্রদীপে সূর্যদেবের আরতি করুন।' ব্রাহ্মণ

একটু হেসে বললেন— 'সকালে যে প্রদীপে দেবতার আরতি আরম্ভ করেছি, সন্ধ্যাতেও সেই প্রদীপে দেবতার আরতি করা চাই! নতুন প্রদীপ তুলে রাখ, কাল নতুন দিনে নতুন প্রদীপে সূর্যদেবের আরতি হবে।' সেইদিন ঠিক দ্বিপ্রহরে সূর্যের আলোয় যখন সমস্ত পৃথিবী আলোময় হয়ে গেছে, সেই সময় ব্রাহ্মণ সুভাগাকে সূর্যমন্ত্র শিক্ষা দিলেন— যে-মন্ত্রের গুণে সূর্যদেব স্বয়ং এসে ভক্তকে দর্শন দেন, যে-মন্ত্র জীবনে একবার ছাড়া দুইবার উচ্চারণে নিশ্চয় মৃত্যু। তারপর সন্ধিক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকারে আরতিশেষে নিভন্ত প্রদীপের মতো ব্রাহ্মণের জীবন-প্রদীপ ধীরে-ধীরে নিভে গেল— সূর্যদেব সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার করে অস্ত গেলেন। সুভাগা একলা পড়লেন।

প্রথম দিনকতক সুভাগা বৃদ্ধের জন্য কেঁদে-কেঁদে কাটালেন। তারপর দিনকতক নিজের হাতে জঙ্গল পরিষ্কার করে মন্দিরের চারিদিকে ফলের গাছ, ফুলের গাছ লাগাতে কেটে গেল। আরও কতকদিন মন্দিরের পাথরের দেওয়াল মেজে-ঘষে পরিষ্কার করে তার গায়ে লতা, পাতা, ফুল, পাখি, হাতি, ঘোড়া, পুরাণ, ইতিহাসের পট লিখতে চলে গেল। শেষে সুভাগার হাতে আর কোনো কাজ রইল না। তখন তিনি সেই ফলের বাগানে, ফুলের মালঞ্চে একা-একাই ঘুরে বেড়াতেন। ক্রমে যখন সেই নতুন বাগানে দুটি-একটি ফল পাকতে আরম্ভ হল, দুটি-একটি ফুল ফুটতে লাগল, তখন ক্রমে দু-একটি ছোটো পাখি, গুটিকতক রঙিন প্রজাপতি, সেই সঙ্গে একপাল ছোটো-বড়ো ছেলে-মেয়ে দেখা দিলে। প্রজাপতি শুধু একটুখানি ফুলের মধু খেয়ে সন্তুষ্ট ছিল, পাখি শুধু দু-একটা পাকা ফল ঠোকরাত মাত্র; কিন্তু সেই ছেলের পাল ফুল ছিঁড়ে, ফল পেড়ে, ডাল ভেঙে চুরমার করত। সুভাগা কিন্তু কাকেও কিছু বলতেন না, হাসিমুখে সকল উৎপাত সহ্য করতেন। গাছের তলায় সবুজ ঘাসে নানা রঙের কাপড় পরে ছোটো-ছোটো ছেলে-মেয়ে খেলে বেড়াত, দেখতে দেখতে সুভাগার দিনগুলো আনমনে কেটে যেত। ক্রমে বর্ষা এসে পড়ল— চারিদিকে কালো মেঘের ঘটা বিদ্যুতের ছটা, আর গুরুগুরু গর্জন— সেই সময়

একদিন ক্ষুরের মতো পুবের হাওয়া সুভাগার নতুন বাগানে ফুলের বোঁটা কেটে, গাছের পাতা ঝরিয়ে, তার সাধের মালঞ্চ শূন্যপ্রায় করে শনশন শব্দে চলে গেল। পাখির ঝাঁক হাওয়ার মুখে উড়ে গেল, প্রজাপতির ভাঙা ডানা ফুলের পাপড়ির মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, ছেলের পাল কোথায় অদৃশ্য হল। সুভাগা তখন সেই ধারা শ্রাবণে একা বসে-বসে বাপমায়ের কথা, শ্বশুরশাশুড়ীর নিষ্ঠুরতা, আর বিয়ের রাত্রে সুন্দর বরের হাসিমুখের কথা মনে করে কাঁদতে লাগলেন; আর মনে মনে ভাবতে লাগলেন— 'হায় এই নির্জনে সঙ্গীহীন বিদেশে কেমন করে সারাজীবন একা কাটাব।' হরিণের চোখের মতো সুভাগার কালো-কালো দুটি বড়ো-বড়ো চোখ অশ্রুজলে ভরে উঠল। তিনি পুবে দেখলেন অন্ধকার, পশ্চিমে অন্ধকার, উত্তরে, দক্ষিণে— চারিদিকে অন্ধকার; মনে পড়ল, এমনি অন্ধকারে একদিন তিনি সেই মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আজও সেদিনের মতো অন্ধকার— সেই বাদলার হাওয়া, সেই নিঃশব্দ প্রকাণ্ড সূর্যমন্দির— কিন্তু হায়, কোথায় আজ সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, যিনি সেই দুর্দিনে অনাথিনী অভাগিনী সুভাগাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন! সুভাগার কালো চোখ থেকে দুটি ফোঁটা জল দুটি বিন্দু বৃষ্টির মতো অন্ধকারে ঝরে পড়ল। সুভাগা মন্দিরের সমস্ত দুয়ার বন্ধ করে প্রদীপ জ্বালিয়ে ঠাকুরের আরতি করলেন। তারপর কী জানি কী মনে করে, সুভাগা সেই সূর্যমূর্তির সম্মুখে ধ্যানে বসলেন। ক্রমে সুভাগার দুটি চক্ষু স্থির হয়ে এল, চারিদিক থেকে ঝড়ের ঝনঝনা, মেঘের কড়মড়ি, ক্রমে যেন দূর হতে বহুদূরে সরে গেল! সুভাগার মনে আর কোনো শোক নেই, কোনো দুঃখ নেই। তাঁর মনের অন্ধকার যেন সূর্যের তেজে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। সুভাগা ধীরে-ধীরে, ভয়ে-ভয়ে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে শেখা সেই সূর্যমন্ত্র উচ্চারণ করলেন; তখন সমস্ত পৃথিবী যেন জেগে উঠল, সুভাগা যেন শুনতে পেলেন, চারিদিকে পাখির গান বাঁশির তান, আনন্দের কোলাহল! তারপর গুরুগুরু গভীর গর্জনে সমস্ত আকাশ কাঁপিয়ে, চারিদিক

আলোয় আলোময় করে সেই মন্দিরের পাথরের দেওয়াল, লোহার দরজা যেন আগুনে-আগুনে গলিয়ে দিয়ে সাতটা সবুজ ঘোড়ার-পিঠে আলোর রথে কোটি কোটি আগুনের সমান জ্যোতির্ময় আলোময় সূর্যদেব দর্শন দিলেন। সে আলো সে জ্যোতি মানুষের চোখে সহ্য হয় না। সুভাগা দুহাতে মুখ ঢেকে বললেন—'হে দেব, রক্ষা কর, ক্ষমা কর, সমস্ত পৃথিবী জ্বলে যায়!' সূর্যদেব বললেন—'ভয় নেই, ভয় নেই। বৎসে, বর প্রার্থনা কর।' বলতে-বলতে সূর্যদেবের আলো ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এল, শুধু একটুখানি রাঙা আভা সধবার সিঁদুরের মতো সুভাগার সিঁথি আলো করে রইল। তখন সুভাগা বললেন— 'প্রভু, আমি পতিপুত্রহীনা, বিধবা অনাথিনী, বড়ই একাকিনী, আমাকে এই বর দাও যেন এই পৃথিবীতে আমার আর না থাকতে হয়; সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে আজই তোমার চরণতলে আমার মরণ হোক!' সূর্যদেব বললেন—'বৎসে, দেবতার বরে মৃত্যু হয় না দেবতার অভিশাপে মৃত্যু হয়, তুমি বর প্রার্থনা কর!' তখন সুভাগা সূর্যদেবকে প্রণাম করে বললেন—'প্রভু, যদি বর দিলে, তবে আমাকে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে দাও, আমি তাদের মানুষ করি! ছেলেটি তোমারি মতো তেজস্বী হবে, মেয়েটি হবে যেন চাঁদের কণার মতো সুন্দরী।'

সূর্যদেব তথাস্তু বলে অন্তর্ধান করলেন। ধীরে-ধীরে সুভাগার চোখে ঘুম এল, সুভাগা পাষাণের উপর আঁচল পেতে শুয়ে পড়লেন। চারিদিকে ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। তখন ভোর হয়ে এসেছে, সুভাগা ঘুমের ঘোরে শুনতে লাগলেন, তার সেই ভাঙা মালঞ্চে দুটি ছোটো পাখি কী সুন্দর গান ধরেছে। ক্রমে সকাল বেলার একটুখানি সোনার আলো সুভাগার চোখে পড়ল, তিনি তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন, আঁচলে টান পড়ল, চেয়ে দেখলেন কচি দুটি ছেলে-মেয়ে কোলের কাছে ঘুমিয়ে আছে। সূর্যদেবের বর সফল হল—সুভাগা দেবতার মতো সুন্দর সন্তান দুটি কোলে নিলেন। সকল

লোকের চোখের আড়ালে নির্জন মন্দিরে জন্ম হল বলে, সুভাগা দুজনের নাম দিলেন, গায়েব, গায়েবী।

সুভাগা গায়েব আর গায়েবীকে বুকে নিয়ে মন্দিরের বাইরে এলেন ; তখন পূবে সূর্যদেব উদয় হচ্ছিলেন, পশ্চিমে চাঁদ অস্ত যাচ্ছিলেন। সুভাগা দেখলেন, গায়েবের মুখে সূর্যের আলো ক্রমেই ফুটে উঠতে লাগল, আর গায়েবীর কালো চুলে চাঁদের জ্যোৎস্না ধীরে-ধীরে নিভে গেল। তিনি মনে-মনে বুঝলেন, গায়েবীকে এই পৃথিবীতে বেশিদিন ধরে রাখা যাবে না।

গায়েব ক্রমশ যখন বড়ো হয়ে পাঠশালায় যেতে আরম্ভ করলেন, সেই সময় গায়েবী মায়ের কাছে বসে মন্দিরের কাজকর্ম শিখতে লাগলেন। গায়েব যেমন দুরন্ত দুর্দান্ত, গায়েবী তেমনি শিষ্ট শান্ত। গায়েবীর সঙ্গে কত ছোটো-ছোটো মেয়ে সেধে-সেধে খেলা করতে আসত, কিন্তু গায়েবের উৎপাতে পাঠশালার সকল ছেলে অস্থির হয়ে উঠেছিল। শেষে তারা সকলে মিলে একদিন পরামর্শ করলে —গায়েব আমাদের চেয়ে লেখায়, পড়ায়, গায়ের জোরে সকল বিষয়ে বড়ো ; এস আমরা সকলে মিলে গায়েবকে রাজা করি, আর আমরা তার প্রজা হই ; তাহলে গায়েব আর আমাদের উপর অত্যাচার করতে পারবে না। এই বলে সকলে মিলে গায়েবকে রাজা বলে কাঁধে করে নৃত্য আরম্ভ করলে। গায়েব হাসিখুশিতে সেই সকল ছোটো-ছোটো ছেলের কাঁধে বসে আছেন, এমন সময়ে একটি খুব ছোটো ছেলে বলে উঠল—'আমি রাজার পূজারী। মন্ত্র পড়ে গায়েবকে রাজটীকা দেব।' তখন সেই ছেলের পালে গায়েবকে একটা মাটির ঢিবির উপর বসিয়ে দিলে। গায়েব সত্যি রাজার মতো সেই মাটির সিংহাসনে বসে আছেন, এমন সময়, সেই ছোটো ছেলেটি তাঁর কপালে তিলক টেনে দিয়ে বললে— 'গায়েব, তোমার নাম জানি, বল তোমার মায়ের নাম কী? বাপের নাম কী?' গায়েব বললেন—'আমার নাম গায়েব, আমার বোনের নাম গায়েবী— মায়ের নাম সুভাগা। আমার বাপের নাম

—কী ?' গায়েব জানেন না যে তিনি সূর্যদেবের বরপুত্র। নাম বলতে পারলেন না, লজ্জায় অধোবদন হলেন, চারিদিকে ছেলের পাল হো-হো করে হাততালি দিতে লাগল, লজ্জায় গায়েবের মুখ লাল হয়ে উঠল। তখন এক পদাঘাতে সেই মাটির সিংহাসন চূর্ণ করে চড়-চাপড়ে ছোটো ছেলেদের ফোলাগাল বেশি করে ফুলিয়ে, রাগে কাঁপতে-কাঁপতে গায়েব একেবারে দেবমন্দিরে উপস্থিত হলেন। সুভাগা গায়েবীর হাতে পিতলের একটি ছোটো প্রদীপ দিয়ে কেমন করে সূর্যদেবের আরতি করতে হয় শিখিয়ে দিচ্ছিলেন ; এমন সময় ঝড়ের মতো গায়েব এসে পিতলের প্রদীপটা কেড়ে নিয়ে টান মেরে ফেলে দিলেন। নিরেট পিতলের প্রদীপ পাথরের দেয়ালে লেগে ঝনঝন শব্দে চুরমার হয়ে গেল, সেইসঙ্গে সূর্যদেবের মূর্তি-আঁকা একখানা কালো পাথর সেই দেয়াল থেকে খসে পড়ল। সুভাগা বললেন—'আরে উন্মাদ, কী করলি ? সূর্যদেবের মঙ্গল-আরতি ছারখার করে দেবতার অপমান করলি ?' গায়েব বললেন—'দেবতাও বুঝিনে, সূর্যও বুঝিনে ; বল, আমি কার ছেলে ? না হলে আজ তোমার সূর্যমূর্তি কুণ্ডের জলে ডুবিয়ে দেব।' যদিও প্রকাণ্ড সেই সূর্যমূর্তি ভীম এলেও তুলতে পারতেন না তবু গায়েবের বীরদর্প দেখে সুভাগার মনে হল —কী জানি কী করে! তিনি তাড়াতাড়ি গায়েবের দুটি হাত ধরে বললেন—'বাছা শান্ত হ, স্থির হ, আর সূর্যদেবের অপমান করিস্‌নে ; পিতার নামে কী কাজ ? আমি তোর মা আছি, গায়েবী তোর বোন, আর তোর কিসের অভাব ?' গায়েব তখন কাঁদতে-কাঁদতে বললেন—'তবে কি মা, আমি নীচ, জঘন্য, অপবিত্র পথের ধুলো, ভিখারীর অধম ?' কথাগুলো তীরের মতো সুভাগার বুকে বাজল, তিনি দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন ; মনে মনে ভাবলেন— হায় ভগবান, কী করলে ? এ দুরন্ত ছেলেকে কেমন করে বোঝাই, কী বলে প্রবোধ দিই ? গায়েব গায়েবী নীচ নয়, অপবিত্র নয়, সূর্যের সন্তান, সকলের

চেয়ে পবিত্র, এ কথায় কে বিশ্বাস করবে? সুভাগার সূর্যমন্ত্রের কথা একবার স্মরণ হল, কিন্তু যখন ভাবলেন যে, দুইবার মন্ত্র উচ্চারণ করলে নিশ্চয় মৃত্যু— এই কচি বয়সে গায়েব গায়েবীকে একা ফেলে পৃথিবী ছেড়ে চিরকালের মতো চলে যেতে হবে— তখন তাঁর মায়ের প্রাণ কেঁদে উঠল। সুভাগা বললেন—'বাছা কথা রাখ, ক্ষান্ত দে, চল্ আমরা অন্য দেশে চলে যাই, সূর্যদেবকেই তোদের পিতা বলে জেনে রাখ।' গায়েব ঘাড় নাড়লেন, বিশ্বাস হয় না। তখন সুভাগা বললেন—'তবে মন্দিরের সমস্ত দরজা বন্ধ কর, এখনি তোদের পিতাকে দেখতে পাবি, কিন্তু হায়, আমাকে আর ফিরে পাবি না।' সুভাগার দুই চক্ষে জল পড়তে লাগল। গায়েবী বললে—'ভাই, মাকে কেন কষ্ট দাও?' গায়েব উত্তর না দিয়ে মন্দিরের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিলেন। সুভাগা দুজনের হাত ধরে সূর্যমূর্তির সম্মুখে গিয়ে ধ্যানে বসলেন। এই মন্দিরে একাকিনী সুভাগা একদিন মৃত্যু ইচ্ছা করে যে মন্ত্র নির্ভয়ে উচ্চারণ করেছিলেন, কালসর্পের মতো সেই সূর্যমন্ত্র আজ উচ্চারণ করতে তাঁর মায়ের প্রাণে কতই ভয়, কতই ব্যথা! সূর্যদেব দর্শন দিলেন— সমস্ত মন্দির যেন রক্তের স্রোতে ভাসিয়ে প্রচণ্ড মূর্তিতে দর্শন দিলেন। সুভাগা বললেন—'প্রভু গায়েব গায়েবী কার সন্তান?' সূর্যদেব একটিও কথা কইলেন না। দেখতে-দেখতে সূর্যের প্রচণ্ড তেজে ভিখারিনী সুভাগার সুন্দর শরীর জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেল। গায়েবী কেঁদে উঠল—'মা, মা!' গায়েব জিজ্ঞাসা করলেন—'মা কোথায়?' সূর্যদেব কোনোই উত্তর করলেন না, কেবল পাষাণের উপর সেই রাশীকৃত ছাই দেখিয়ে দিলেন! গায়েব বুঝলেন মা আর নেই। রাগে দুঃখে তাঁর চোখে আগুন ছুটল। গায়েব মন্দিরের কোণ থেকে সূর্যমূর্তি-আঁকা পাথরখানা কুড়িয়ে সূর্যদেবকে ছুঁড়ে মারলেন। যমরাজের মহিষের মাথাটার মতো সেই কালো পাথর সূর্যদেবের মুকুটে লেগে জ্বলন্ত

কয়লার মতো একদিকে ঠিকরে পড়ল— সঙ্গে-সঙ্গে গায়েব মূর্ছিত হলেন।

অনেকক্ষণ পরে গায়েব যখন জেগে উঠলেন, তখন সূর্যদেব অন্তর্ধান করেছেন, মাথার কাছে শুধু গায়েবী বসে আছে। গায়েব জিজ্ঞাসা করলেন—'সূর্যদেব কোথায়?' গায়েবী তখন সেই কালো পাথরখানা দেখিয়ে বলল—'ওই নাও ভাই আদিত্যশিলা। এই পাথর তুমি যার উপর ফেলবে তার নিশ্চয় মৃত্যু। সূর্যদেব এটি তোমায় দিয়ে গেছেন, আর বলেছেন তুমি তাঁরই ছেলে, আজ থেকে তোমার নাম হল শিলাদিত্য। তোমার বংশ সূর্যবংশ নাম দিয়ে পৃথিবী শাসন করবে, আর তুমি মনে-মনে ডাকলেই ওই সূর্যকুণ্ড থেকে সাতটা ঘোড়ার পিঠে সূর্যের রথ তোমার জন্যে উঠে আসবে! রথের নাম সপ্তাশ্বরথ। যাও ভাই, সপ্তাশ্বরথে আদিত্যশিলা-হাতে পৃথিবী জয় করে এস।' গায়েব বললেন—'তোকে কোথা রেখে যাব বোন?' গায়েবী বললে—'ভাই, আমাকে এই মন্দিরে রেখে যাও, আমি বাগানের ফল, কুণ্ডের জল খেয়ে জীবন কাটাব। তারপর তুমি যখন রাজা হবে, আমায় এই মন্দির থেকে রাজবাড়িতে নিয়ে যেও।'

গায়েব মহা আনন্দে গায়েবীকে সেই মন্দিরে বন্ধ রেখে সাত ঘোড়ার রথে পৃথিবী জয় করতে চলে গেলেন। আর গায়েবী সেই রাশীকৃত ছাই সূর্যকুণ্ডের জলে ঢেলে দিয়ে 'মারে! ভাইরে!' বলে পাষাণের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল।

সেদিন গভীর রাত্রে যখন আকাশে তারা ছিল না, পৃথিবীতে আলো ছিল না, সেই সময় হঠাৎ সূর্যমন্দির ঝনঝন শব্দে একবার কেঁপে উঠল। তারপর আশি মন কালো পাথরের প্রকাণ্ড সূর্যমূর্তিকে নিয়ে আর ননীর পুতুলের মতো সুন্দরী গায়েবীকে নিয়ে, আধখানা মন্দির ক্রমে মাটির নিচে চলে যেতে লাগল! গায়েবী প্রাণভয়ে পালাবার চেষ্টা করলে। বৃথা চেষ্টা। গায়েবী দেয়াল ধরে ওঠবার চেষ্টা করলে, পাথরের দেয়ালে পা রাখা যায় না—

কাচের সমান। তখন গায়েবী 'ভাইরে!' বলে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তারপর সব শেষ, সব অন্ধকার।

কতদিন চলে গেছে, গায়েব সেই সপ্তাশ্বরথে পৃথিবী ঘুরে দেশবিদেশ থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করে, শেষে বল্লভীপুরের রাজাকে সেই আদিত্যশিলা দিয়ে সম্মুখযুদ্ধে সংহার করে শিলাদিত্য নাম নিয়ে, রাজসিংহাসনে বসে, পাঠশালার সঙ্গীদের কাউকে মন্ত্রী কাউকে-বা সেনাপতি করে, যত নিষ্কর্মা বুড়ো কর্মচারীদের তাড়িয়ে দিলেন। তারপর হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনির মাঝখানে শিলাদিত্য চন্দ্রাবতী নগরের রাজকন্যা পুষ্পবতীকে বিয়ে করে, শ্বেতপাথরের শয়নমন্দিরে বিশ্রাম করতে গেলেন। ক্রমে রাত্রি যখন গভীর হল, কোনো দিকে সাড়া শব্দ নেই, পায়ের ধারে চামরধারিণী চামর-হাতে ঢুলে পড়েছে, মাথার শিয়রে সোনার প্রদীপ নিভ-নিভ হয়েছে, সেই সময় শিলাদিত্য তাঁর ছোটো বোন গায়েবীর কচি মুখখানি স্বপ্নে দেখলেন, তাঁর মনে হল যেন অনেক, অনেক দূর থেকে সেই মুখখানি তাঁর দিকে চেয়ে আছে : আর সেই সূর্যমন্দিরের দিক থেকে কে যেন ডাকছে— 'ভাইরে, ভাইরে, ভাইরে!'

শিলাদিত্য চিৎকার করে জেগে উঠলেন। তখন ভোর হয়েছে, তিনি তৎক্ষণাৎ রথে চড়ে সৈন্যসামন্ত নিয়ে সূর্যমন্দিরে উপস্থিত হলেন ; দেখলেন ভীমের বর্ম-দুখানার মতো মন্দিরের দুখানা কপাট একেবারে বন্ধ— কতকালের লতাপাতা সেই মন্দিরের দুয়ার যেন লোহার শিকলে বেঁধে রেখেছে। শিলাদিত্য নিজের হাতে সেই লতাপাতা সরিয়ে মন্দিরের দুয়ার খুলে ফেললেন— দিনের আলো পেয়ে এক ঝাঁক বাদুড় ঝটাপট করে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। শিলাদিত্য মন্দিরে প্রবেশ করলেন ; চেয়ে দেখলেন, যেখানে সূর্যদেবের মূর্তি ছিল সেখানে প্রকাণ্ড একখানা অন্ধকার কালো পর্দার মতো সমস্ত ঢেকে রেখেছে। শিলাদিত্য ডাকলেন—'গায়েবী! গায়েবী! কোথায় গায়েবী?' অন্ধকার থেকে উত্তর এল—'হায়

গায়েবী! কোথা গায়েবী!' শিলাদিত্য মশাল আনতে হুকুম দিলেন ; সেই মশালের আলোয় শিলাদিত্য দেখলেন— উত্তর-দিকটা শূন্য করে সূর্যমূর্তির সঙ্গে-সঙ্গে মন্দিরের আধখানা যেন পাতালে চলে গেছে ; কেবল কালো পাথরের সাতটা ঘোড়ার মুণ্ডু বাসুকির ফণার মতো মাটির উপর জেগে আছে। যে-ঘরে শিলাদিত্য গায়েবীর সঙ্গে খেলা করেছেন, যে-ঘরে সারাদিন খেলার পর দুটি ভাইবোন গুর্জর দেশের গল্প শুনতে-শুনতে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়তেন, যেখানে দেবদারু গাছের মতো পিতলের সেই আরতিপ্রদীপ ছিল, সে সকল ঘরের চিহ্নমাত্র নেই। শিলাদিত্য সেই প্রকাণ্ড গহ্বরের মুখে দাঁড়িয়ে ডাকলেন—'গায়েবী! গায়েবী।' তাঁর সেই করুণ সুর, সেই অন্ধকার গহ্বরে ঘুরে ফিরে ক্রমে দূর থেকে দূরে পাতালের মুখে চলে গেল। গায়েব নিঃশ্বাস ফেলে রাজমন্দিরে ফিরে এলেন।

সেইদিন রাজ-আজ্ঞায় রাজ-কর্মকারেরা পুরু সোনার পাত দিয়ে সেই প্রকাণ্ড মন্দির আগাগোড়া মুড়ে দিতে লাগল। শিলাদিত্য সে-মন্দিরে আর অন্যমূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন না। সেই অন্ধকার গহ্বর থেকে সূর্যের ঘোড়াগুলি যেমন আধখানা জেগেছিল, তেমনি রইল। তারপর শিলাদিত্য পাহাড় কেটে শ্বেতপাথর আনিয়ে সূর্যকুণ্ডের চারিদিক সুন্দর করে বাঁধিয়ে দিলেন। যখনি কোনো যুদ্ধ উপস্থিত হয়, শিলাদিত্য সেই সূর্যকুণ্ডের তীরে সূর্যের উপাসনা করতেন ; তখনি তাঁর জন্য সপ্তাশ্বরথ জল থেকে উঠে আসত। শিলাদিত্য সেই রথে যখন যে যুদ্ধে গিয়েছেন, সেই যুদ্ধেই তাঁর জয় হয়েছে। শেষে একজন বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী যাকে তিনি সব চেয়ে বিশ্বাস করতেন, সব চেয়ে ভালোবাসতেন, সে-ই তাঁর সর্বনাশ করলে। সেই মন্ত্রী ছাড়া পৃথিবীতে কেউ জানত না যে, শিলাদিত্যের জন্য সূর্যকুণ্ড থেকে সপ্তাশ্বরথ উঠে আসে।

সিন্ধুপারে শ্যামনগর থেকে পারদ নামে অসভ্য একদল যবন যখন বল্লভীপুর আক্রমণ করলে, তখন সেই বিশ্বাসঘাতক, তুচ্ছ পয়সার লোভে সেই অসভ্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে, গো-রক্তে সেই পবিত্র কুণ্ড

অপবিত্র করলে। শিলাদিত্য যুদ্ধের দিন যখন সেই সূর্যকুণ্ডের তীরে সূর্যের উপাসনা করতে লাগলেন, তখন আগেকার মতো নীল জল ভেদ করে দেবরথ উঠে এল না ; শিলাদিত্য সাতটা ঘোড়ার সাতটা নাম ধরে বার-বার ডাকলেন, কিন্তু হায়, কুণ্ডের জল যেমন স্থির তেমনি রইল! শিলাদিত্য হতাশ হয়ে রাজ-রথে শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হলেন, কিন্তু সেই যুদ্ধেই তাঁর প্রাণ গেল। সমস্ত দিন যুদ্ধের পর সূর্যদেবের সঙ্গে-সঙ্গে সূর্যের বরপুত্র শিলাদিত্য অস্ত গেলেন। বিধর্মী শত্রু সোনার মন্দির চূর্ণ করে বল্লভীপুর ছারখার করে চলে গেল।

গোহ

প্রকাণ্ড বটগাছের মাঝে পাতায়-ঢাকা ছোটোখাটো পাখির বাসাটি যেমন, গগনস্পর্শী বিন্ধ্যাচলের কোলে চন্দ্রাবতীর শ্বেতপাথরের রাজপ্রাসাদও তেমনি সুন্দর, তেমনি মনোরম ছিল। ম্লেচ্ছদের সঙ্গে যুদ্ধের কিছুদিন পূর্বে শিলাদিত্য একদিন জনকতক রাজপুত-বীরকে সঙ্গে দিয়ে চন্দ্রাবতীর রাজকন্যা গর্ভবতী রানী পুষ্পবতীকে সেই চন্দ্রাবতীর রাজপ্রাসাদে বাপমায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মনে বড়ো ইচ্ছা ছিল যে, যুদ্ধের পর শীতকালটা বিন্ধ্যাচলের শিখরে নির্জনে সেই শ্বেতপাথরের প্রাসাদে রানী পুষ্পবতীকে নিয়ে আরামে কাটাবেন; তারপর রানীর ছেলে হলে দুজনে একসঙ্গে রাজপুত্রকে কোলে নিয়ে বল্লভীপুরে ফিরবেন। কিন্তু হায়, বিধাতা সে-সাধে বাদ সাধলেন, বিধর্মী শত্রুর বিষাক্ত একটা তীর তাঁর প্রাণের সঙ্গে বুকের সমস্ত আশা বিদীর্ণ করে বাহির হয়ে গেল— শিলাদিত্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারালেন। তাঁর আদরের মহিষী পুষ্পবতী চন্দ্রাবতীর সুন্দর প্রাসাদে একাকিনী পড়ে রইলেন।

বিন্ধ্যাচলের গায়ে রাজ-অন্তঃপুরে যেদিকে পুষ্পবতীর ঘর ছিল, ঠিক তার সম্মুখে, পাহাড় থেকে পঞ্চাশ গজ নিচে, বল্লভীপুরে যাবার পাকা রাস্তা। পুষ্পবতী সেইবার চন্দ্রাবতীতে এসে, যত্ন করে নিজের ঘরখানির ঠিক সম্মুখে দেওয়ালের মতো সমান সেই পাহাড়ের গায়ে পঁচিশ গজ উপরে যেন শূন্যের মাঝখানে ছোটো শ্বেতপাথরের বারাণ্ডা বসিয়েছিলেন। সেইখানে বসে, রাস্তার দিকে চেয়ে, তিনি প্রতিদিন একখানি রুপোর চাদরে সোনার সুতোয়, সবুজ রেশমে, সবুজ ঘোড়ায়-চড়া সূর্যের মূর্তি সোনার ছুঁচ দিয়ে সেলাই করতেন আর মনে-মনে ভাবতেন— মহারাজা যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে, পাখির পালকের মতো হালকা এই পাগড়িটি মহারাজের মাথায় নিজের হাতে বেঁধে দেব;

তারপর দুজনে মিলে পঁচিশ গজ ভাঙনের গায়ে— পাতলা একখানি মেঘের মতো শাদা শ্বেতপাথরের সেই বারাণ্ডায় বসে মহারাজের মুখে যুদ্ধের গল্প শুনব।

মাঝে-মাঝে পুষ্পবতী দেখতেন সেই বল্লভীপুরের রাস্তার বহুদূরে একটি বল্লমের মাথা ঝকমক করে উঠত; তারপর কালো ঘোড়ার পিঠে বল্লভীপুরের রাজদূত দূর থেকে হাতের বল্লম মাটির দিকে নামিয়ে অন্তঃপুরের বারাণ্ডায় রাজরানী পুষ্পবতীকে প্রণাম করে তীরবেগে চন্দ্রাবতীর সিংহদ্বারের দিকে চলে যেত।

যেদিন দাসীর হাতে মহারাজা শিলাদিত্যের চিঠি পুষ্পবতীর কাছে আসত, পুষ্পবতী সেদিন সমস্ত কাজ ফেলে শূন্যের উপরে সেই বারাণ্ডায় মহারাজার সেই চিঠি হাতে বসে থাকতেন।

সেই আনন্দের দিনে যখন কোনো বুড়ো জাঠ গান গেয়ে মাঠের দিকে যেতে-যেতে, কোনো রাখাল বালক পাহাড়ের নিচে ছাগল চরাতে চরাতে, চন্দ্রাবতীর রাজকুমারীকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করত, তখন পুষ্পবতী কারো হাতে এক ছড়া পান্নার চিক, কারো হাতে-বা একগাছা সোনার মল ফেলে দিতেন।

রাজকুমারীর প্রসাদ মাথায় ধরে হাজার-হাজার আশীর্বাদ করতে-করতে সেই সকল রাজভক্ত প্রজা সকালবেলায় কাজে যেত; সন্ধ্যাবেলায় সেই রাজদূত কালো ঘোড়ার পিঠে বল্লম-হাতে মহারানী পুষ্পবতীর চিঠি নিয়ে বল্লভীপুরের দিকে ফিরে যেত।

পুষ্পবতী নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় পাহাড়ে-পাহাড়ে কালো ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ অনেকক্ষণ ধরে শুনতে পেতেন— কখনো কোনো বুড়ো জাঠের মেঠো গান আর সেই সঙ্গে রাখাল বালকের মিষ্টি সুর সন্ধ্যার হাওয়ায় ভেসে আসত! তারপর বিন্ধ্যাচলের শিখরে বিন্ধ্যবাসিনী ভবানীর মন্দিরে সন্ধ্যাপূজার ঘোর ঘণ্টা বেজে উঠত, তখন পুষ্পবতী মহারাজের সেই চিঠি খোঁপার ভিতর লুকিয়ে রেখে পাটের শাড়ি পরে দেবীর পূজায় বসতেন; আর মনে-মনে বলতেন—'হে মা চামুণ্ডে, হে মা ভবানী, মহারাজকে ভালোয়-ভালোয় যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে আনো।

ভগবতী, আমার যে ছেলে হবে, সে যেন মহারাজেরই মতো তেজস্বী হয়, তাঁরই মতো যেন নিজের রানীকে খুব ভালোবাসে।' হায় মানুষের সকল ইচ্ছা পূর্ণ হয় না! পুষ্পবতী রাজারই মতো তেজস্বী ছেলে পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মনে যে বড়ো সাধ ছিল— সেই শ্বেতপাথরের বারাণ্ডায় বসে মহারাজের মুখে যুদ্ধের গল্প শুনবেন— তাঁর যে বড়ো সাধ ছিল নিজের হাতে মহারাজের মাথায় হাওয়ার মতো পাতলা সেই সুন্দর চাদরখানি জড়িয়ে দেবেন— সে সাধ কোথায় পূর্ণ হল? তাঁর সে মনের ইচ্ছা মনেই রইল, এ জন্মে আর মহারাজের সঙ্গে দেখা হল না।

যে-দিন বল্লভীপুরে শিলাদিত্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন সেই দিন চন্দ্রাবতীর রাজপ্রাসাদে রানী পুষ্পবতী মায়ের কাছে বসে সেই রুপোর চাদরে ছুঁচের কাজ করছিলেন। কাজ প্রায় শেষ হয়েছিল, কেবল সূর্যমূর্তির নিচে সোনার অক্ষরে শিলাদিত্যের নামটি লিখতে বাকি ছিল মাত্র।

পুষ্পবতী যত্ন করে নিজের কালো চুলের চেয়ে মিহি, আগুনের চেয়ে উজ্জ্বল, একগাছি সোনার তার, সরু হতেও সরু একটি সোনার ছুঁচে পরিয়ে একটি ফোঁড় দিয়েছেন মাত্র, আর চাঁপার কলির মতো পুষ্পবতীর কচি আঙুলে সেই সোনার ছুঁচ বোলতার হুলের মতো বিঁধে গেল। যন্ত্রণায় পুষ্পবতীর চোখে জল এল; তিনি চেয়ে দেখলেন একটি ফোঁটা রক্ত জ্যোৎস্নার মতো পরিষ্কার সেই রুপোর চাদরে রাঙা এক টুকরো মণির মতো ঝকঝক করছে। পুষ্পবতী তাড়াতাড়ি নির্মল জলে সেই রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলতে চেষ্টা করলেন; জলের ছিটে পেয়ে সেই একবিন্দু রক্ত ক্রমশ-ক্রমশ বড় হয়ে, একটুখানি ফুলের গন্ধ যেমন সমস্ত হাওয়াকে গন্ধময় করে, তেমনি পাতলা ফুরফুরে চাদরখানি রক্তময় করে ফেলল।

সেই রক্তের দিকে চেয়ে পুষ্পবতীর প্রাণ কেঁপে উঠল; তিনি ছলছল চোখে মায়ের দিকে চেয়ে বললেন—'মা, আমাকে বিদায়

দাও, আমি বল্লভীপুরে ফিরে যাই, আমার প্রাণ কেমন করছে, বুঝিবা সেখানে সর্বনাশ ঘটল!' রাজরানী বললেন—'আর কটা দিন থেকে যা, ছেলেটি হয়ে যাক।' পুষ্পবতী বললেন—'না, না, না, মা!'

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা বল্লভীপুরের আশিজন রাজপুত বীর, আর দুটো উটের পিঠে নীল রেশমী-মোড়া একখানি ছোটো ডুলি, বড়ো রাস্তা ধরে বল্লভীপুরের দিকে চলে গেল। চন্দ্রাবতীর রাজপ্রাসাদ শূন্য করে রাজকুমারী পুষ্পবতী বিদায় নিলেন।

চন্দ্রাবতী থেকে বল্লভীপুর যেতে হলে প্রকাণ্ড একটা মরুভূমি পার হতে হয়। মালিয়া-পাহাড়ের নিচে বীরনগর পর্যন্ত চন্দ্রাবতীর পাকা রাস্তা, তারপর মরুভূমির উপর দিয়ে আগুনের মতো বালি ভেঙে, উটে চড়ে বল্লভীপুরে যেতে হয়, আর অন্য পথ নেই। পুষ্পবতী সেই পথের শেষে মরুভূমির সম্মুখে এসে শুনতে পেলেন যে, শিলাদিত্য আর নেই। বিধর্মী ম্লেচ্ছ বল্লভীপুর ধ্বংস করেছে। পুষ্পবতীর চোখে এক ফোঁটা জল পড়ল না, তাঁর মুখে একটিও কথা সরল না, কেবল তাঁর বুকের ভিতরটা সম্মুখের সেই মরুভূমির মতো ধূ-ধূ করতে লাগল; তিনি লক্ষ লক্ষ টাকার হীরের গহনা গা থেকে খুলে বালির উপর ছড়িয়ে দিলেন, সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেললেন। তারপর উদাস প্রাণে বিধবার বেশ ধরে শিলাদিত্যের আদরের মহিষী পুষ্পবতী সন্ন্যাসিনীর মতো সেই মালিয়া-পাহাড়ের প্রকাণ্ড গহ্বরে আশ্রয় নিলেন।

মরুপারে দশমাস দশদিন পূর্ণ হলে সন্ন্যাসিনী রানীর কোলে অন্ধকার গুহায়, রাজপুত্রের জন্ম হল। নাম রইল গোহ।

রানী পুষ্পবতী সেইদিন বীরনগর থেকে তাঁর ছেলেবেলার প্রিয়সখী ব্রাহ্মণী কমলাবতীকে ডেকে পাঠিয়ে সেই আশিজন রাজপুত বীরের সম্মুখে তাঁর বড়ো সাধের রাজপুত্র গোহকে সঁপে দিয়ে বললেন—'প্রিয় সখী, তোমার হাতে আমার গোহকে সঁপে দিলুম, তুমি মায়ের মতো একে মানুষ কোরো। তোমায় আর

কী বলব ভাই? দেখ রাজপুত্রকে কেউ না অযত্ন করে! আর ভাই, যখন চিতার আগুনে আমার এই দেহ ছাই হয়ে যাবে, তখন আমার সেই একমুঠো ছাই কার্তিক পূর্ণিমায় কাশীর ঘাটে গঙ্গাজলে ঢেলে দিও— যেন আমাকে জন্মান্তরে আর বিধবা না হতে হয়।' ঝরঝর করে কমলাবতীর চোখে জল পড়তে লাগল।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা সেই আশিজন রাজভক্ত রাজপুত চন্দনের কাঠে চিতা জ্বালিয়ে চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াল; শিলাদিত্যের মহিষী, রাজপুত রানী, সন্ন্যাসিনী, সতী পুষ্পবতী হাসিমুখে জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিলেন। দেখতে-দেখতে ফুলের মতো সুন্দর পুষ্পবতীর কোমল শরীর পুড়ে ছাই হল। চারিদিকে রব উঠল—'জয় মহারানীর জয়! জয় সতীর জয়!' কমলাবতী ঘুমন্ত গোহকে এক কোলে, আর সেই ছাই মুঠো এক হাতে নিয়ে, চোখের জল মুছতে-মুছতে বীরনগরে ফিরে গেলেন; সঙ্গে সঙ্গে সেই আশিজন রাজপুত-বীর রাজপুত্রকে ঘিরে সেদিন থেকে বীরনগরে বাসা নিলেন।

চন্দ্রাবতীর রাজরানী অনেকবার গোহকে চন্দ্রাবতীতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বল্লভীপুরের তেজস্বী সেই রাজপুত-বীরের দল গোহকে কিছুতেই ছেড়ে দেননি। তাঁরা বলতেন—'আমাদের মহারানী আমাদের হাতে রাজপুত্রকে সঁপে গেলেন, আমরাই তাঁকে পালন করব। বল্লভীপুরের রাজকুমার বল্লভীপুরের রাজপুতদের রাজা হয়ে এই মরুভূমিতেই থাকুন! এই তাঁর রাজপ্রসাদ।'

গোহ সেই বীরনগরে কমলাবতীর ঘরে মানুষ হতে লাগলেন।

কমলাবতী গোহকে ব্রাহ্মণের ছেলের মতো নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত করতে চেষ্টা করতেন; কিন্তু বীরের সন্তান গোহের লেখাপড়া পছন্দ হত না, তিনি বনে-বনে, পাহাড়ে-পাহাড়ে, কোনো দিন ভীলদের সঙ্গে ভীলবালকের মতো, কোনো দিন-বা সেই রাজপুত-বীরদের সঙ্গে রাজার মতো, কখনো ঘোড়ায় চড়ে মরুভূমির উপর সিংহ শিকার করে, কখনো বা জাল ঘাড়ে বনে-বনে হরিণের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতেন।

মালিয়া পাহাড়ের নিচে বীরনগর। সেখানে যত শিষ্ট, শান্ত, নিরীহ ব্রাহ্মণের বাস, আর পাহাড়ের উপরে যেখানে বাঘ ডেকে বেড়ায়, হরিণ চরে বেড়ায়, যেখানে অন্ধকারে সাপের গর্জন, দিবা-রাত্রি ঝরনার ঝর্ঝর, আশ্চর্য-আশ্চর্য ফুলের গন্ধ, প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড বনের ছায়া, সেখানে সেই সকল অন্ধকার বনে-বনে, ভীলরাজ মাণ্ডলিক, সাপের মতো কালো, বাঘের মতো জোরালো, সিংহের মতো তেজস্বী, অথচ ছোটো একটি ছেলের মতো সত্যবাদী, বিশ্বাসী, সরলপ্রাণ ভীলের দল নিয়ে রাজত্ব করতেন।

গোহ একদিন সেই সকল ভীল-বালকদের সঙ্গে ভীল রাজত্বে ঘোড়ায় চড়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে বল্লম-হাতে বাঘের ছাল-পরা হাজার-হাজার ভীল-বালক, ঘোড়ায়-চড়া সেই রাজপুত রাজকুমারকে ঘিরে 'আমাদের রাজা এসেছে রে! রাজা এসেছে রে!' বলে, মাদল বাজিয়ে নাচতে-নাচতে ঘরে-ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ক্রমে সেই ছেলের পাল গোহকে নিয়ে রাজবাড়িতে উপস্থিত হল। তখন খোড়ো চালের রাজবাড়ি থেকে ভীলদের রাজা বুড়ো মাণ্ডলিক বেরিয়ে এসে বললেন—'হাঁ রে, কোথায় রে তোদের নতুন রাজা?' ছেলের পাল গোহকে দেখিয়ে দিলে। তখন সেই বুড়ো ভীল গোহকে অনেকক্ষণ দেখে বললেন—'ভালো রে ভালো, নতুন রাজার কপালে তিলক লিখে দে।' তখন একজন ভীল-বালক নিজের আঙুল কেটে বুড়ো রাজা মাণ্ডলিকের সামনে, রক্তের ফোঁটা দিয়ে গোহের কপালে রাজতিলক টেনে দিল, ভীলদের নিয়মে সে রক্তের তিলক মুছে দেয়, এমন সাধ্য কারো নেই।

গোহ সত্য-সত্যই রাজা হয়ে ভীলদের রাজসভায় বুড়োরাজার কাঠের রাজসিংহাসনের ঠিক নিচে একখানি ছোটো পিঁড়ির উপর বসলেন। এই পিঁড়িখানি অনেকদিন শূন্য পড়ে ছিল; কারণ মাণ্ডলিক চিরদিন নিঃসন্তান। তাঁর দীনদুঃখী সামান্য প্রজা, তাদের ঘর-আলো-করা কালো বাঘের মতো কালো ছেলে; কিন্তু হায়, রাজার ঘর চিরদিন অন্ধকার, চিরকাল শূন্য ছিল! সেদিন যখন

সমস্ত ভীলদের মধ্যস্থলে রক্তের তিলক পরে গোহ যুবরাজ হয়ে পিঁড়েয় বসলেন, তখন বুড়ো মাণ্ডলিকের দুই চক্ষু সেই সুন্দর রাজকুমারের দিকে চেয়ে আনন্দে ভেসে গেল।

ভীলরাজের এক ছোটো ভাই ছিলেন। দশ বৎসর আগে একদিন কী-জানি-কী নিয়ে দুই ভাইয়ের খুব ঝগড়া হয়েছিল, সেই থেকে বিচ্ছেদ, দেখাশোনা পর্যন্ত বন্ধ ছিল। গোহ যুবরাজ হবার দিন মাণ্ডলিকের ছোটো ভাই হিমালয় পর্বত থেকে ভীল রাজত্বে হঠাৎ ফিরে এলেন, এসে দেখলেন, রাজপুতের ছেলে যুবরাজের আসন জুড়ে বসেছে। রাগে তাঁর সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল, তিনি রাজসভার মাঝে মাণ্ডলিককে ডেকে বললেন—'এ রে ভাইয়া! বুড়ো হয়ে তুই কি পাগল হয়েচিস? বাপের রাজ্যি ছেলেতে পাবে, তোর ছেলে হল না, তোর পরে আমি রাজা; রাজপুতের ছেলেকে পিঁড়েয় বসালি কী বলে।' মাণ্ডলিক বললেন—'ভাইজি, ঠাণ্ডা হ।' ভাই-রাজ বললেন—'ঠাণ্ডা হব যেদিন তোরে আগুনে পোড়াব।' এই বলে মাণ্ডলিকের ভাইজি রাগে ফুলতে-ফুলতে রাজসভা থেকে বেরিয়ে গেলেন। মাণ্ডলিক বললেন—'দূর হ, আজ হতে তুই আমার শত্রু হলি।' তারপর সোজা হয়ে সিংহাসনে বসে গোহকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে সমস্ত ভীল সর্দারদের ডেকে গোহের কপালে হাত দিয়ে শপথ করালেন, যেন সেইদিন থেকে সমস্ত ভীল-সর্দার বিপদে-আপদে সুখে-দুঃখে গোহকে রক্ষা করে— গোহের শত্রু যেন তাদেরও শত্রু হয়। তারপর রাজসভা ভঙ্গ হল। অনেক আমোদ-আহ্লাদ করে গোহ বীরনগরে ফিরে গেলেন।

সেইদিন কী ভেবে গভীর রাত্রে ভীলরাজ মাণ্ডলিক গোহের কাছে চুপি চুপি গিয়ে বললেন—'গোহ, আমি তোকে ছেলের মতো ভালোবাসি, তোকে আমি রাজা করেছি, তোর ছুরিখানা আমায় দে, আমি নিজের হাতে তোর শত্রুকে মেরে আসব।' গোহ কোমর থেকে নিজের নাম-লেখা ধারালো ছুরি খুলে দিলেন।

ভীলরাজ সেই ছুরি হাতে বেরিয়ে পড়লেন। পাহাড়ের গায়ে

তখন জোনাকি জ্বলছে, ঝিঁঝি ডাকছে, দূরে-দূরে দু-একটা বাঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে। মাণ্ডলিক সেই ছুরি হাতে রাতদুপুরে ভাই-রাজার দরজায় ঘা দিলেন— কারো সাড়াশব্দ নেই! ভীলরাজ ধীরে-ধীরে ভাইয়ের ঘরে প্রবেশ করলেন; দেখলেন, তাঁর ছোটো ভাই সামান্য ভীলের মতো মাটির উপরে এক-হাতে মুখ ঢেকে পড়ে আছেন।

ভীলরাজের প্রাণে যেন হঠাৎ ঘা লাগল; তিনি কালো-পাথরের পুতুলটির মতো ছোটো ভাইয়ের সুন্দর শরীর মাটির উপর পড়ে থাকতে দেখে আর চোখের জল রাখতে পারলেন না! মনে ভাবলেন আমি কী নিষ্ঠুর! হায়, ছোটো ভাইয়ের রাজ্য পরকে দিয়েছি, আবার কিনা শত্রু ভেবে ঘুমন্ত ভাইকে মারতে এসেছি!

মাণ্ডলিক কুড়ি বৎসরের সেই ভীল-রাজকুমারের মাথার শিয়রে বসে ডাকলেন—'ভাইয়া!' একবার ডাকলেন, দুবার ডাকলেন, তারপর মুখের কাছ থেকে তার নিটোল হাতখানি সরিয়ে নিয়ে ডাকলেন—'ভাইয়া।' —কোনোই উত্তর পেলেন না। তখন বুড়ো রাজা ছোটো ভাইয়ের মুখের কাছে মুখ রেখে তার কোঁকড়া-কোঁকড়া কালো চুলে হাত বুলিয়ে বললেন—'ভাইয়া রাগ করেছিস? ভাইয়া আমার সঙ্গে কথা কইবিনে ভাইয়া? আমি তোর জন্যে হিমালয়ের আধখানা জয় করে রেখেছি, সেইখানে তোকে রাজা করব; তুই উঠে বস, কথা ক! ওরে ভাই, কেন তুই এই দশ বছর আমায় ছেড়ে পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়ালি! কেন আমার কাছে-কাছে চোখে-চোখে রইলিনে ভাই? আমি সাধ করে কি রাজপুতের ছেলেকে ভালোবেসেছি? তুই ছেড়ে গেলে আমার যে আর কেউ ছিল না; সে সময়ে গোহ আমার শূন্য ঘর আলো করেছিল। ভাই ওঠ্, আমি তোর রাজত্ব কেড়ে নিয়েছি, আবার তোকে শত্রু বলে মারতে এসেছি, এই নে ছুরিখানা— আমার বুকে বসিয়ে দে, সব গোল মিটে যাক!'

মাণ্ডলিক ভায়ের হাতে ছুরিখানা জোর করে গুঁজে দিলেন।

ধারালো ছুরি ভাই-রাজের মুঠো থেকে খসে পড়ল— বুড়ো রাজা চমকে উঠলেন, ছোটো ভাইয়ের গা-টা যেন বড়োই ঠাণ্ডা বোধ হল! কান পেতে শুনলেন, নিঃশ্বাসের শব্দ নেই! তিনি 'ভাইয়া! ভাইয়া!' বলে চিৎকার করে উঠলেন।

তাঁর সমস্ত রাগ মাটির উপর মরা-ভাইকে ছেড়ে রাজসিংহাসনে গোহের উপরে গিয়ে পড়ল। গোহ্ যদি না থাকত, তবে তো আজ দশ বৎসর পরে তিনি ছোটো ভাইটিকে বুকে ফিরে পেতেন; তবে কি আজ ভীলরাজকুমার রাজ্যহারা হয়ে রাগে-দুঃখে বুক-ফেটে মারা পড়ত? মাণ্ডলিক অনেকক্ষণ ধরে ছোটো ভাইটির বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন; কিন্তু হায়, খাঁচা ফেলে পাখি যেমন উড়ে যায়, তেমনি সেই ভীল বালকের সুন্দর শরীর শূন্য করে প্রাণপাখি অনেকক্ষণ উড়ে গেছে।

মাণ্ডলিক আর সে ঘরে বসে থাকতে পারলেন না, ছুরি হাতে সদর দরজা খুলে বাইরে দাঁড়ালেন। তাঁর প্রাণ যেন কেঁদে-কেঁদে বলতে লাগল—'গোহ রে তুই কী করলি? আমার রাজ্য নিলি, রাজসিংহাসন নিলি, ভায়ে-ভায়ে বিচ্ছেদ ঘটালি; গোহ তুই কি শেষে আমার শত্রু হলি?' হঠাৎ পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে দুটি ভীলের মেয়ে গলা ধরাধরি করে চলে গেল। একজন বলে গেল—'আহা কী সুন্দর রাজা দেখছিস ভাই!' আর একজন বললে—'নতুন রাজা যখন আমার হাত ধরে নাচতে লেগেছিল, তখন তার মুখখানা যেন চাঁদপারা দেখলুম।' মাণ্ডলিক নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলেন হায়, এরি মধ্যে আমার প্রজারা বুড়ো রাজাটাকে ছেঁড়া কাপড়ের মতো ছেড়ে ফেলেছে! ভীলরাজের মনে হল যেন পৃথিবীতে তাঁর আর কেউ নেই।

তিনি শূন্য মনে পূর্ণিমার প্রকাণ্ড চাঁদখানার দিকে চেয়ে রইলেন; সেই সময় কালো ঘোড়ায় চড়ে দুইজন রাজপুত ভীলরাজের সামনে দিয়ে চলে গেল। একজন বললে—'ভাই, রাজকুমার আজ শুভদিনে ভীলরাজত্বের সিংহাসনে না বসে সকলের সামনে যুবরাজের আসনে

বসে রইলেন কেন?' অন্যজন বললে—'গোহ প্রতিজ্ঞা করেছেন, যতদিন বুড়ো বেঁচে থাকবেন ততদিন তিনি যুবরাজের মতো তাঁর পায়ের কাছে বসবেন।' মাণ্ডলিকের প্রাণ যেন আনন্দে পরিপূর্ণ হল; তিনি হাসি-মুখে মনে-মনে বললেন—'ধন্য গোহ! ধন্য তার ভালবাসা।' হঠাৎ সেই অন্ধকারে কার নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। মাণ্ডলিক ফিরে দেখলেন, ছোটো ভাইয়ের প্রকাণ্ড শিকারী কুকুরটা নিঃশব্দে অন্ধকারে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে! বুক যেন তাঁর ফেটে গেল, তিনি 'ভাই রে!' বলে পাহাড়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়লেন। পাথরের গায়ে লেগে গোহের সেই ছুরি, শিকারী কুকুরের দাঁতের মতো ভীলরাজের বুকে সজোরে বিঁধে গেল— পাহাড়ে-পাহাড়ে শিয়ালের পাল চিৎকার করে উঠল— হায় হায়, হায় হায় হায়, হায় হায় হায়!

পরদিন সকালে একজন রাজপুত পাহাড়ের পথে বীরনগরে যেতে-যেতে এক জায়গায় দেখতে পেলেন—ভীলরাজের রক্তমাখা দেহ, বুকে মহারাজ গোহের ছুরি বেঁধা! রাজপুত সেই ছুরি হাতে গোহের কাছে এসে বললেন—'মহারাজ করেছ কী! আশ্রয়দাতা চিরবিশ্বাসী ভীলরাজকে খুন করেছ?' গোহ তৎক্ষণাৎ সেই রাজপুতের মাথা কেটে ফেলতে হুকুম দিলেন। তারপর সেই রক্তমাখা ছুরি কোমরে গুঁজে, দুই হাতে চক্ষের জল মুছে, ভাই-রাজার সঙ্গে প্রাণের চেয়ে প্রিয় মাণ্ডলিককে চিতার আগুনে তুলে দিয়ে, সূর্যবংশের রাজপুত্র গোহ ভীলরাজের রাজসিংহাসনে বসে রাজত্ব করতে লাগলেন।

বাপ্পাদিত্য

তুষের আগুন যেমন প্রথম ধিক-ধিক, শেষে হঠাৎ ধূ-ধূ করে জ্বলে ওঠে, তেমনি গোহের পর থেকে রাজপুতদের উপর ভীলদের রাগ ক্রমে ক্রমে অল্পে-অল্পে বাড়তে-বাড়তে একদিন দাউ-দাউ করে পাহাড়ে-পাহাড়ে, বনে-বনে দাবানলের মতো জ্বলে উঠল।

গোহের সুন্দর মুখ, অসীম দয়া, অটল সাহসের কথা মনে রেখে ভীলেরা আট-পুরুষ পর্যন্ত রাজপুত রাজাদের সমস্ত অত্যাচার সহ্য করেছিল। যদি কোনো রাজপুত রাজা শিকারে যেতে পথের ধারে কোনো ভীলের কালো গায়ে বল্লমের খোঁচায় রক্তপাত করে চলে যেতেন, তবে তার মনে পড়ত— রাজা গোহ একদিন তাদেরই বংশের একজনকে বাঘের মুখের থেকে বাঁচিয়ে এনে নিজের হাতে তার বুকের রক্ত মুছে দিয়েছিলেন। যখন কোনো রাজকুমার, কোনো-একদিন শখ করে গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে তামাশা দেখতেন, তখন তাদের মনে পড়ত— এক বছর— দুর্ভিক্ষের দিনে রাজা গোহ তাঁর প্রকাণ্ড রাজবাড়ি, পরিপূর্ণ ধানের গোলা আশ্রয়হীন দীনদুঃখী ভীল-প্রজাদের জন্য সারা বৎসর খুলে রেখেছিলেন! ভাগ্য-দোষে যুদ্ধে জয় না হলে যেদিন কোনো কাপুরুষ যুবরাজ বিশ্বাসঘাতক বলে সেনাপতিদের মাথা একটির পর একটি হাতির পায়ের তলায় চূর্ণ করে ফেলতেন, সেদিন সমস্ত ভীল-বাহিনী চক্ষের জল মুছে ভাবত— হায় রে হায়, মহারাজ গোহ ছিলেন, যিনি যুদ্ধের সময় ভায়ের মতো তাদের যত্ন করতেন, মায়ের মতো তাদের রক্ষা করতেন, বীরের মতো সকলের আগে চলতেন!

এত অত্যাচার, এত অপমান, তবু সেই বিশ্বাসী ভীল-প্রজাদের সরল প্রাণ আট-পুরুষ পর্যন্ত বিশ্বাসে, রাজভক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল! কিন্তু যখন বাপ্পাদিত্যের পিতা নাগাদিত্য

রাজসিংহাসনে বসে ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করলেন ; যখন গরীব প্রজাদের গ্রাম জ্বালিয়ে, খেত উজাড় করে তাঁর মন সন্তুষ্ট হল না ; তিনি যখন হাজার-হাজার ভীলের মেয়ে দাসীর মতো রাজপুতের ঘরে-ঘরে বিলিয়ে দিতে লাগলেন, যখন প্রতিদিন নতুন-নতুন অত্যাচার না হলে তাঁর ঘুম হত না, শেষে সমস্ত ভীলের প্রাণের চেয়ে প্রিয় তাদের একমাত্র আমোদ— বনে-বনে পশু শিকার— যেদিন নাগাদিত্য নতুন আইন করে একেবারে বন্ধ করলেন, সেদিন তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ল।

নাগাদিত্য ভীল-প্রজাদের উপর এই নতুন আইন জারি করে সমস্ত রাত্রি সুখের স্বপ্নে কাটিয়ে সকালে উঠে দেখলেন, দিনটা বেশ মেঘলা মেঘলা, ঠাণ্ডা হাওয়া ছেড়েছে, কোনোদিকে ধুলো নেই, শিকারের বেশ সুবিধা। নাগাদিত্য তৎক্ষণাৎ হাতি সাজিয়ে দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সেদিন রাজার সঙ্গে কেবল রাজপুত! দলের পর দল, বড়ো-বড়ো ঘোড়ায় চড়ে রাজপুত! সামান্য ভীলের একটি ছোটো ছেলের পর্যন্ত যাবার হুকুম নেই! শিকার দেখলে খাঁচার ভিতরে চিতাবাঘ যেমন ছটফট করে আজ শিকারের দিনে ঘরের ভিতর বসে থেকে ভীলদের প্রাণ তেমনিই ছটফট করছে—এই কথা ভেবে নিষ্ঠুর নাগাদিত্যের মন আনন্দে নৃত্য করতে লাগল।

মহারাজ নাগাদিত্য দলবল নিয়ে ভেরি বাজিয়ে হৈ-হৈ শব্দে পর্বতের শিখরে চড়লেন ; বজ্রের মতো ভয়ংকর সেই ভেরির আওয়াজ শুনে অন্যদিন মহিষের পাল জল ছেড়ে পালাত, বনের পাখি বাসা ছেড়ে আকাশে উঠত, হাজার-হাজার হরিণ প্রাণ-ভয়ে পথ ভুলে ছুটতে-ছুটতে যেখানে শিকারী সেইখানে এসে উপস্থিত হত, ঘুমন্ত সিংহ জেগে উঠত, বাঘ হাঁকার দিত— শিকারীরা কেউ বল্লম-হাতে মহিষের পিছনে, কেউ খাঁড়া-হাতে সিংহের সন্ধানে ছুটে চলত ; কিন্তু নাগাদিত্য আজ বারবার ভেরি বাজালেন, বারবার শিকারীর দল চিৎকার করে উঠল, তবু সেই প্রকাণ্ড বনে একটিও বাঘের

গর্জন, একটিও পাখির ঝটাপট কিংবা হরিণের ক্ষুরের খুটখাট শোনা গেল না— মনে হল, সমস্ত পাহাড় যেন ঘুমিয়ে আছে! রাগে নাগাদিত্যের দুই চক্ষু লাল হয়ে উঠল। তিনি দলবলের দিকে ফিরে বললেন—'ঘোড়া ফেরাও। অসন্তুষ্ট ভীল-প্রজা এ বনের সমস্ত পশু অন্য পাহাড়ে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। চল, আজ গ্রামে-গ্রামে, নগরে-নগরে পশুর সমান ভীলের দল শিকার করিগে।'

মহারাজার রাজহস্তী শুঁড় দুলিয়ে কান কাঁপিয়ে পাহাড়ের উপর ইদরপুরের দিকে ফিরে দাঁড়াল—তার পিঠের উপর সোনার হাওদা, জরির বিছানা হীরের মতো জ্বলে উঠল, তার চারিদিকে ঘোড়ায়-চড়া রাজপুতের দুশো বল্লম সকালের আলোয় ঝকমক করতে লাগল! নাগাদিত্য হুকুম দিলেন—'চালাও!' তখন কোথা থেকে গভীর গর্জনে, সমস্ত পাহাড় যেন ফাটিয়ে দিয়ে প্রকাণ্ড একটা কালো বাঘ, যেন একজন ভীল সেনাপতির মতো, সেই অত্যাচারী রাজার পথ আগলে পাহাড়ের সুঁড়ি পথে রাজহস্তীর সম্মুখে এসে দাঁড়াল! নাগাদিত্য মহা আনন্দে ডান হাতে বল্লম নিয়ে হাতির পিঠে ঝুঁকে বসলেন। কিন্তু তাঁর হাতের বল্লম হাতেই রইল— বনের অন্ধকার থেকে কালো চামরে সাজানো প্রকাণ্ড একটা তীর তাঁর বুকের একদিক থেকে আর-একদিক ফাটিয়ে দিয়ে শনশন শব্দে বেরিয়ে গেল! অত্যাচারী নাগাদিত্য ভীলদের হাতে প্রাণ হারালেন। তারপর চারিদিক থেকে হাজার-হাজার কালো বাঘের মতো কালো-কালো ভীল ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে রাজপুতের রক্তে পাহাড়ের গা রাঙা করে তুললে; একজনও রাজপুত বেঁচে রইল না, কেবল সোনার সাজ-পরা মহারাজ নাগাদিত্যের কালো একটা পাহাড়ী ঘোড়া অন্ধকার সমুদ্রের সমান ভীল-সৈন্যের মাঝ দিয়ে ঝড়ের মতো রাজবাড়ির দিকে বেরিয়ে গেল।

রাজমহিষী তখন ইদরপুরে কেল্লার ছাদে রাজকুমার বাপ্পাকে কোলে নিয়ে সন্ধ্যার হাওয়ায় বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন, আর এক-

একবার যে পাহাড়ে মহারাজ শিকারে গিয়েছেন, সেইদিকে চেয়ে দেখছিলেন! এক সময় হঠাৎ পাহাড়ের দিকে একটা গোলমাল উঠল, তারপর রানী দেখলেন, সেই পাহাড়ে-রাস্তায়, বনের অন্ধকার থেকে, মহারাজের কালো ঘোড়াটি তীরের মতো ছুটে বেরিয়ে ঝড়ের মতো কেল্লার দিকে ছুটে আসতে লাগল— পিছনে তার শত-শত ভীল—কারো হাতে বল্লম, কারো হাতে বা তীর-ধনুক! মহারানী দেখলেন, কালো ঘোড়ার মুখ থেকে শাদা ফেনা চারিদিকে মুক্তোর মতো ঝরে পড়ছে, তার বুকের মাঝ থেকে রক্তের ধারা রাস্তার ধূলোয় ছড়িয়ে যাচ্ছে; তারপর দেখলেন, আগুনের মতো একটি তীর তার কালো-চুলের ভিতর দিয়ে ধনুকের মতো তার সুন্দর বাঁকা ঘাড় সজোরে বিঁধে ঘোড়াটিকে মাটির সঙ্গে গেঁথে ফেলল; রাজার ঘোড়া কেল্লার দিকে মুখ ফিরিয়ে ধুলোর উপর ধড়ফড় করতে লাগল। ঠিক সেই সময় মহারানীর মাথার উপর দিয়ে একটা বল্লম শনশন শব্দে কেল্লার ছাদের উপর এসে পড়ল। রাজমহিষী ঘুমন্ত বাপ্পাকে ওড়নার আড়ালে ঢেকে তাড়াতাড়ি উপর থেকে নেমে এলেন। চারিদিকে অস্ত্রের ঝনঝনি আর যুদ্ধের চিৎকার উঠল—সূর্যদেব মালিয়া-পাহাড়ের পশ্চিম পারে অস্ত গেলেন।

সে রাত্রি কী ভয়ানক রাত্রি! সেই মালিয়া-পাহাড়ের উপর অসংখ্য ভীল, আর মাঝে গুটিকতক রাজপুত প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগলেন; আর অন্ধকার রাজপুরে নাগাদিত্যের বিধবা মহিষী পাঁচ বৎসরের রাজকুমার বাপ্পাকে বুকে নিয়ে নির্জন ঘরে বসে রইলেন! তিনি কতবার কত দাসীর নাম ধরে ডাকলেন—কারো সাড়া-শব্দ নেই। মহারাজের খবর জানবার জন্য তিনি কতবার কত প্রহরীকে চিৎকার করে ডাকলেন, কিন্তু তারা সকলেই যুদ্ধে ব্যস্ত, মহারানীর ঘরের ভিতর দিয়ে ছুটে গেল, তবু তাঁর কথায় কর্ণপাতও করলে না! রানী তখন আকুল হৃদয়ে কোলের বাপ্পাকে ছোটো একখানি উটের কম্বলে ঢেকে নিয়ে অন্দরমহলের চন্দনকাঠের প্রকাণ্ড দরজা সোনার

চাবি দিয়ে খুলে বাইরে উঁকি মেরে দেখলেন— রাত্রি অন্ধকার, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের খিলান, তার মাঝে গজদন্তের কাজ করা বড়ো-বড়ো দরজা খোলা— হাঁ-হাঁ করছে: অত বড়ো রাজপুরী যেন জনমানব নেই !

মহারানী অবাক হয়ে এক-হাতে বাপ্পাকে বুকে ধরে আর হাতে সোনার চাবির গোছা নিয়ে খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ সেই অন্ধকারে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল ; চামড়ার জুতো পরা রাজপুত বীরের মচমচ পায়ের শব্দ নয় ; রুপোর বাঁকি-পরা রাজদাসীর ঝিনিঝিনি পায়ের শব্দ নয়, কাঠের খড়ম-পড়া পঁচাত্তর বৎসরের বুড়ো রাজপুরোহিতের খটাখট পায়ের শব্দ নয়— এ যেন চোরের মতো, সাপের মতো খুসখাস, খিটখাট পায়ের শব্দ ! মহারানী ভয় পেলেন। দেখতে-দেখতে অসুরের মতো একজন ভীল-সর্দার তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হল ! মহারানী জিজ্ঞাসা করলেন— 'কে তুই ? কী চাস ?' ভীল সর্দার বাঘের মতো গর্জন করে বললে—'জানিসনে আমি কে ? আমি সেই দুঃখী ভীল, যার মেয়েকে তোর মহারাজা দাসীর মতো চিতোরের রাজাকে দিয়ে দিয়েছে। আজ কি সুখের দিন। এই হাতে নাগাদিত্যের বুকে বল্লম বসিয়েছি, আর এই হাতে তার ছেলেসুদ্ধ মহারানীকে দাসীর মতো বেঁধে নিয়ে যাব।' মহারানীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। 'ভগবান রক্ষা কর।' বলে তিনি সেই নিরেট সোনার বড়ো-বড়ো চাবির গোছা সজোরে ভীল-সর্দারের কপালে ছুঁড়ে মারলেন। দুরন্ত ভীল 'মা রে!' বলে চিৎকার করে ঘুরে পড়ল ; মহারানী কচি বাপ্পাকে বুকে ধরে রাজপুরী থেকে বেরিয়ে পড়লেন—তাঁর প্রাণের আধখানা মহারাজ নাগাদিত্যের জন্য হাহাকার করতে লাগল, আর আধখানা এই মহাবিপদে প্রাণের বাপ্পাকে রক্ষা করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল।

রানী পথ চলতে লাগলেন— পাথরে পা কেটে গেল, শীতে হাত জমে গেল, অন্ধকারে বারবার পথ ভুল হতে লাগল— তবু রানী পথ চললেন। কত দূর! কত দূর!—পাহাড়ের পথ কত দূর ? কোথায় চলে গেছে, তার যেন শেষ নেই ! রানী কত পথ চললেন,

তবু সে পথের শেষ নেই! ক্রমে ভোর হয়ে গেল, রাস্তার আশে-পাশে বীরনগরের তু-একটি ব্রাহ্মণের বাড়ি দেখা দিতে লাগল। পাহাড়ী হাওয়া বরফের মতো ঠাণ্ডা পাখিরাও তখন জাগেনি, এমন সময় নাগাদিত্যের মহিষী রাজপুত্র বাপ্পাকে কোলে নিয়ে সেই বীরনগরের ব্রাহ্মণী কমলাবতীর বাড়ির দরজায় ঘা দিলেন। আটপুরুষ আগে, একদিন শিলাদিত্যের মহিষী পুষ্পবতী প্রাণের কুমার গোহকে এই বীরনগরের কমলাবতীর হাতে সঁপে গিয়েছিলেন; আর আজ আবার কত কাল পরে সেই কমলাবতীর নাতির নাতি বৃদ্ধ রাজপুরোহিতের হাতে গোহর বংশের গিহ্লোট-রাজকুমার বাপ্পাকে সঁপে দিয়ে নাগাদিত্যের মহিষী চিতার আগুনে ঝাঁপ দিলেন।

সকালে বৃদ্ধ পুরোহিত রাজপুত্রকে আশ্রয় দিলেন, আর সেইদিন সন্ধ্যার সময় একটি ভীলের মেয়ে ছোটো-ছোটো তুটি ছেলে কোলে তাঁরই ঘরে আশ্রয় নিলে। এদের পূর্বপুরুষ সর্বপ্রথমে নিজের আঙুল কেটে রাজপুত গোহের কপালে রক্তের রাজ-তিলক টেনে দিয়েছিল— আজ রাজপুত রাজার সঙ্গে তাদেরও সর্বনাশ হয়ে, বিদ্রোহ ভীলেরা তাদের ঘর তুয়োর জ্বালিয়ে দিয়ে তাদের তিনটিকে পাহাড়ের উপর থেকে দূর করে দিলে। রাজপুরোহিত সেই তিনটি ভীল আর রাজকুমার বাপ্পাকে নিয়ে বীরনগর ছেড়ে ভাণ্ডীরের কেল্লায় যতুবংশের আর এক ভীলের রাজত্বে কিছুদিন কাটালেন। কিন্তু সেখানেও ভীল রাজা; সেখানেও ভয় ছিল— কোন দিন কোন ভীল মা-হারা বাপ্পাকে খুন করে। ব্রাহ্মণ যে মহারানীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন, বিপদে-সম্পদে অনাথ বাপ্পাকে রক্ষা করবেন। তিনি একেবারে ভীল রাজত্ব ছেড়ে তাদের কটিকে নিয়ে নগেন্দ্রনগরে চলে গেলেন। একদিকে সমুদ্রের তিনটে ঢেউয়ের মতো ত্রিকূট পাহাড়, আর একদিকে মেঘের মতো অন্ধকার পরাশর অরণ্য, মাঝখানে নগেন্দ্রনগর, কাছাকাছি শোলাঙ্কি বংশের একজন রাজপুত রাজার রাজবাড়ি। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেই নগেন্দ্রনগরে ব্রাহ্মণ-পাড়ার গা ঘেঁষে ঘর বাঁধালেন। সেই ভীলের মেয়ে তাঁর

ঘরের সমস্ত কাজ করতে লাগল, আর রাজপুত্র বাপ্পা সেই দুটি ভাই —ভীল বালিয় ও দেবকে নিয়ে মাঠে-মাঠে বনে-বনে গরু চরিয়ে রাখাল-বালকদের সঙ্গে রাখালের মতো খেলে বেড়াতে লাগলেন। রাজপুরোহিত কারো কাছে প্রকাশ করলেন না যে, বাপ্পা রাজার ছেলে; কেবল একটি তামার কবচে আগাগোড়া সমস্ত পরিচয় নিজের হাতে লিখে বাপ্পার গলায় বেঁধে দিলেন— তাঁর মনে বড়ো ভয় ছিল পাছে কোনো ভীল বাপ্পার সন্ধান পায়।

ক্রমে বাপ্পা যখন বড়ো হয়ে উঠলেন; যখন মাঠে-মাঠে খোলা হাওয়ায় ছুটোছুটি করে, পাহাড়ে-পাহাড়ে ওঠা-নামাতে রাজপুত্র বাপ্পার সুন্দর শরীর দিন-দিন লোহার মতো শক্ত হয়ে উঠল; যখন তিনি ক্ষেপা মোষ এক হাতে ঠেকিয়ে রাখতে পারতেন; সমস্ত রাখাল-বালক যখন রাজপুত্র বলে না জেনেও রাজার মতো বাপ্পাকে ভয়, ভক্তি, সেবা করতে লাগল তখন ব্রাহ্মণ অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন। তখন তিনি বাপ্পার শরীরের সঙ্গে মনকেও গড়ে তুলতে লাগলেন। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় একলা ঘরে বাপ্পার কাছে বসে সেই মালিয়া পাহাড়ের গল্প, সেই ভীল-বিদ্রোহের গল্প,সেই রানী পুষ্পবতী, মহারাজ শিলাদিত্য, রাজকুমার গোহ, তাঁর প্রিয়বন্ধু মাণ্ডলিকের কথা একে-একে বলতে লাগলেন। শুনতে-শুনতে কখনো বাপ্পার চোখে জল আসত, কখনো বা রাগে মুখ লাল হয়ে উঠত, কখনো ভয়ে প্রাণ কাঁপত। বাপ্পা সারা-রাত্রি কখনো সূর্যের মন্ত্র, কখনো পাহাড়ের ভীলের যুদ্ধ, স্বপ্নে দেখে জেগে উঠতেন, মনে ভাবতেন— আমিও কবে হয়তো রাজা হব, লড়াই করব।

এমনি ভাবে দিন কাটছিল। সেই সময় একদিন শ্রাবণ মাসে নতুন-নতুন ঘাসের উপর গরুগুলি চরতে দিয়ে বনের পথে বাপ্পাদিত্য একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। সেদিন ঝুলন-পর্ব, রাজপুতদের বড়ো আনন্দের দিন; সকাল না হতে দলে-দলে রাখাল নতুন কাপড় পরে, কেউ ছোটো ভাইবোনকে কোলে করে, কেউ বা দইয়ের ভার কাঁধে

নিয়ে, একজন তামাশা দেখতে অন্যজন বা পয়সা করতে, নগেন্দ্র-নগরের রাজপুত-রাজার বাড়ির দিকে মেলা দেখতে ছুটল। বাপ্পা প্রকাণ্ড বনে একলা রইলেন; তাঁর প্রাণের বন্ধু, দুটি ভাই— ভীল বালিয় আর দেব, দিদির হাত ধরে এই আনন্দের দিনে বাপ্পাকে কতবার ডাকল— 'ভাই, তুই কি রাজবাড়ি যাবি?' বাপ্পা শুধু ঘাড় নাড়লেন— 'না, যাব না।' হয়তো তাঁর মনে হয়েছিল— আমার ভাই নেই, বোন নেই, মা নেই, আমি কার হাত ধরে কাকে নিয়ে আজ কিসের আনন্দের মেলা দেখতে যাব? কিন্তু যখন বালিয় আর দেব ভীলনীদিদির সঙ্গে-সঙ্গে হাসতে-হাসতে চলে গেল, যখন সকালের রোদ মেঘের আড়ালে ঢেকে গেল, বাপ্পার একটি মাত্র গাই চরতে-চরতে যখন মাঠের পর মাঠ পার হয়ে বনের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল, যখন বনে আর সাড়া শব্দ নেই, কেবল মাঝে-মাঝে ঝিঁঝির ঝিনিঝিনি, পাতার ঝুরুঝুরু, সেই সময় বাপ্পার বড়োই একা-একা ঠেকতে লাগল। তিনি উদাস প্রাণে ভীলনীদিদির মুখে শোনা ভীল-রাজত্বের একটি পাহাড়ী গান, ছোটো একটি বাঁশের বাঁশিতে বাজাতে লাগলেন। সেই গানের কথা বোঝা গেল না, কেবল ঘুমপাড়ানি গানের মতো তার বুনো সুরটা মেঘলা দিনে বাদলা হাওয়ায় মিশে স্বপনের মতো বাপ্পার চারিদিকে ভেসে বেড়াতে লাগল! আজ যেন তাঁর মনে পড়তে লাগল— ঐ পশ্চিমের দিকে, যেখানে মেঘের কোলে সূর্যের আলো ঝিকিমিকি জ্বলছে, যেখানে কালো কালো মেঘ পাথরের মতো জমাট বেঁধে রয়েছে, সেইখানে সেই অন্ধকার আকাশের নিচে, তাঁদের যেন বাড়ি ছিল; সেই বাড়ির ছাদে চাঁদের আলোয় তিনি মায়ের হাত ধরে বেড়িয়ে বেড়াতেন; সে বাড়ি কী সুন্দর! সে চাঁদের কী চমৎকার আলো! মায়ের কেমন হাসিমুখ! সেখানে সবুজ ঘাসে হরিণছানা চরে বেড়াত; গাছের উপরে টিয়ে পাখি উড়ে বসত; পাহাড়ের গায়ে ফুলের গোছা ফুটে থাকত— তাদের কী সুন্দর রঙ, কী সুন্দর গলা! বাপ্পা সজল নয়নে মেঘের দিকে চেয়ে-চেয়ে বাঁশের বাঁশিতে ভীলের গান বাজাতে

লাগলেন— বাঁশির করুণ সুর কেঁদে-কেঁদে, কেঁপে-কেঁপে বন থেকে বনে ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সেই বনের একধারে আজ ঝুলন-পূর্ণিমায় আনন্দের দিনে, শোলাঙ্কিবংশের রাজার মেয়ে সখীদের নিয়ে খেলে বেড়াচ্ছিলেন। রাজকুমারী বললেন— 'শুনেছিস ভাই, বনের ভিতর রাখাল-রাজা বাঁশি বাজাচ্ছে!' সখীরা বললে— 'আয় ভাই, সকলে মিলে চাঁপা গাছে দোলা খাটিয়ে ঝুল্‌নো-খেলা খেলি আয়!' কিন্তু দোলা খাটাবার দড়ি নেই যে! সেই বৃন্দাবনের মতো গহন বন, সেই বাদল দিনের গুরু গর্জন, সেই দূরে বনে রাখালরাজের মধুর বাঁশি, সেই সখীদের মাঝে শ্রীরাধার সমান রূপবতী রাজনন্দিনী, সবই আজ যুগ-যুগান্তরের আগেকার বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-রাধার প্রথম ঝুলনের মতো! এমন দিন কি ঝুলনা বাঁধার একগাছি দড়ির অভাবে বৃথা যাবে? রাজনন্দিনী গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন। আবার সেই বাঁশি, পাখির গানের মতো, বনের এপার থেকে ওপার আনন্দের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে বেজে উঠল! রাজকুমারী তখন হীরে-জড়ানো হাতের বালা সখীর হাতে দিয়ে বললেন— 'যা ভাই, এই বালার বদলে ঐ রাখালের কাছ থেকে একগাছা দড়ি নিয়ে আয়।'

রাজকুমারীর সখী সেই বালা-হাতে বাপ্পার কাছে এসে বললে— 'এই বালার বদলে রাজকুমারীকে একগাছা দড়ি দিতে পার?' হাসতে-হাসতে বাপ্পা বললেন— 'পারি, যদি রাজকুমারী আমায় বিয়ে করে!'

সেই দিন সেই নির্জন বনে, রাজকুমারীর হাতে সেই হীরের বালা পরিয়ে দিয়ে রাজকুমার বাপ্পা চাঁপাগাছে ঝুলনা বেঁধে নিয়ে রাজকন্যার হাত ধরে বসলেন। চারিদিকে যত সখী দোলার উপর বর-কনেকে ঘিরে-ঘিরে ঝুলনের গান গেয়ে ফিরতে লাগল— 'আজ কী আনন্দ! আজ কী আনন্দ!' খেলা শেষ হল, সন্ধ্যা হল, রাজকুমারী বনের রাখালকে বিয়ে করে রাজবাড়িতে ফিরে গেলেন; আর বাপ্পা ফুলে-ফুলে প্রফুল্ল চাঁপার তলায় বসে ঝুলন-পূর্ণিমার প্রকাণ্ড

চাঁদের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলেন— আজ কী আনন্দ! আজ কী আনন্দ!

হঠাৎ একটুখানি পুবের হাওয়া গাছের পাতা কাঁপিয়ে ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে হু-হু শব্দে পশ্চিমদিকে চলে গেল। সেই সঙ্গে বড়ো-বড়ো বৃষ্টির ফোঁটা টুপটাপ করে চাঁপাগাছের সবুজ পাতার উপরে ঝরে পড়ল। বাপ্পা আকাশের দিকে চেয়ে দেখলেন— পশ্চিমদিক থেকে একখানা কালো মেঘ ক্রমশ পূর্বদিকে এগিয়ে চলেছে— মাঝে-মাঝে গুরুগুরু গর্জন আর ঝিকিমিকি বিদ্যুৎ হানছে! বাপ্পা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন, মনে পড়ল, ঘরে ফিরতে হবে। দুধের মতো শাদা তাঁর ধবলী গাই বনের মাঝে ছাড়া আছে। তিনি চাঁপাগাছ থেকে ছাদন খুলে নিয়ে ধবলী গাইটির সন্ধানে চললেন। তখন চারিদিকে অন্ধকার, মাঝে-মাঝে গাছে-গাছে রাশি-রাশি জোনাকি-পোকা হীরের মতো ঝকঝক করছে, আর, জায়গায়-জায়গায় ভিজে মাটির নরম গন্ধ বনস্থল পরিপূর্ণ করছে। বাপ্পা সেই অন্ধকার বনের পথে-পথে ধবলীর সন্ধানে ফিরতে লাগলেন। হঠাৎ এক জায়গায়, ঘন বেতের বনের আড়ালে বাপ্পা দেখলেন— এক তেজোময় ঋষি ধ্যানে বসে আছেন ; ঠিক তাঁর সম্মুখে মহাদেবের নন্দীর মতো তাঁর ধবলী গাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর সেই শাদা গাইয়ের গাঢ় দুধ সুধার মতো একটি শ্বেতপাথরের শিবের মাথায় আপনা-আপনি ঝরে পড়ছে। বাপ্পা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ক্রমে ধ্যানভঙ্গে মহর্ষির দুটি চোখ সকাল-বেলায় পদ্মের পাপড়ির মতো ধীরে-ধীরে খুলে গেল। মহর্ষি মহাদেবকে প্রণাম করে এক অঞ্জলি দুধের ধারা পান করলেন। তারপর বাপ্পার দিকে ফিরে বললেন— 'শোনো বৎস, আমি মহর্ষি হারীত। তোমায় আশীর্বাদ করছি— তুমি দীর্ঘজীবী হও, পৃথিবীর রাজা হও। তোমার ধবলীর দুধের ধারায় আজ আমি বড়োই তুষ্ট হয়েছি। আজ আমার মহা-প্রস্থানের দিন, এই শেষদিনে তোমায় আর কী দেব ? এই ভগবতী ভবানীর খাঁড়া, এই অক্ষয় ধনুঃশর— এই খাঁড়া পাহাড়ও বিদীর্ণ

করে, এই ধনুঃশর পৃথিবী জয় করে দেয়— এই দুটি তুমি লও। আর বৎস, ভগবান একলিঙ্গের এই শ্বেতপাথরের মূর্তিটি সঙ্গে রেখ, সর্বদা এঁর পূজা করবে। আজ হতে তোমার নাম হল— একলিঙ্গকা দেওয়ান। তোমার বংশে যত রাজা, এই নামেই সিংহাসনে বসবে।' তারপর নিজের হাতে বাপ্পার গলায় চামড়ার পৈতা জড়িয়ে দিয়ে মহর্ষি সমাধিতে বসলেন। দেখতে-দেখতে তাঁর পবিত্র শরীর আগুনের মতো ধূ-ধূ করে জ্বলে গেল। বাপ্পা কোমরে খাঁড়া, হাতে ধনুঃশর, মাথায় একলিঙ্গের মূর্তি ধরে ধবলী গাইয়ের পিছনে-পিছনে ফিরে চললেন— মেঘের গুরুগুরু, দেবতার দুন্দুভির মতো, সমস্ত আকাশ জুড়ে বাজতে লাগল।

তখন ভোর হয়ে এসেছে, মেলা-শেষে মলিন মুখ যে যার ঘরে ফিরছে, বাপ্পা সেই যাত্রীদের সঙ্গে ঘরে ফিরলেন।

কিছুদিন পরেই বাপ্পাকে নগেন্দ্রনগর ছেড়ে যেতে হল। ঝুলন-পূর্ণিমার খেলাচ্ছলে দুজনে বিয়ে হবার পর বিদেশ থেকে রাজকুমারীর বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এক ব্রাহ্মণ রাজসভায় উপস্থিত হলেন। সেদিন সন্ধ্যাবেলা নগেন্দ্রনগরে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে ব্রাহ্মণ রাজকন্যার হাত দেখে গুণে বলেছেন আগেই নাকি কোন বিদেশীর সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে হয়ে গেছে। আজ রাজার গুপ্তচর সেই বিদেশীর সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে— রাজা তার মাথা আনতে হুকুম দিয়েছেন। কথাটা শুনে বাপ্পার মন অস্থির হয়ে উঠল, ভাবনায়-ভাবনায় সমস্ত রাত্রি কাটিয়ে ভোরে উঠে তিনি দেশ ছেড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। যাবার সময় বাপ্পা তাঁর পালক-পিতা পঁচাশি বৎসরের সেই রাজপুরোহিতের কাছে সমস্ত কথা প্রকাশ করে বললেন— 'পিতা, আমায় বিদায় দাও। আমি তো এখন বড়ো হয়েছি, আমার জন্যে তোমরা কেন বিপদে পড় ?' ব্রাহ্মণ বললেন— 'বৎস, তুমি জানো না তুমি কে ; তুমি রাজপুত্র, তোমার মা তোমাকে আমার হাতে সঁপে গেছেন ; আমি আজ এই অল্প-বয়সে একা ভিখারীর মতো তোমাকে কেমন করে বিদায় করব ?' বাপ্পা তখন ভগবতীর সেই খাঁড়া আর অক্ষয়

ধনুঃশর দেখিয়ে বললেন— 'পিতা, বিদেশে এরাই আমার সহায়, আর আছেন একলিঙ্গজী ;' ব্রাহ্মণ তখন আনন্দে দুই হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন— 'যাও বৎস, তুমি রাজার ছেলে, রাজারই মতো ধনুঃশর হাতে পেয়েছ! আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করছি— পৃথিবীর রাজা হও। যদি কেউ তোমার পরিচয় চায়, তবে গলার কবচ খুলে দেখিয়ে দিও কোন পবিত্র বংশে তোমার জন্ম, তোমার পূর্বপুরুষেরা কোন রাজসিংহাসন উজ্জ্বল করে গেছেন! যাও বৎস, সুখে থাক!'

ব্রাহ্মণের কাছে বিদায় হয়ে বাপ্পা ভীলনীদিদির কাছে বিদায় নিতে চললেন কিন্তু সেখানে বিদায় নেওয়া ততটা সহজ হল না। অনেক কাঁদাকাটার পর ভীলনীদিদি বললেন— 'বাপ্পা রে, যদি যাবি তবে তোর দুই ভাই— বালিয় ও দেবকে সাথে নে। ওরে বাপ্পা, তোকে একা ছেড়ে দিতে প্রাণ আমার কেমন কেমন করে যে!' তারপর তিনজনের হাতে তিন-তিনখানি পোড়া রুটি দিয়ে ভীলনীদিদি তিনটি ভাইকে বিদায় করলেন। বালিয় ও দেবকে সঙ্গে নিয়ে বাপ্পা গহন বনে চলে গেলেন। সেখানে বড়ো-বড়ো পাথরের থামের মতো প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি আকাশের দিকে ঠেলে উঠেছে, কোথাও ময়ূর-ময়ূরী বন আলো করে উড়ে বেড়াচ্ছে ; কোথাও আস্ত ছাগল গিলে প্রকাণ্ড একটা অজগর স্থির হয়ে পড়ে ; কোথাও বাঘের গর্জন, কোথাও বা পাখির গান ; এক জায়গায় সবুজ ঘাসে সোনার রোদ, তার-জায়গায় কাজলের সমান নীল অন্ধকার। বালিয় ও দেবকে সঙ্গে নিয়ে বাপ্পা কখনো বনের মনোহর শোভা দেখতে দেখতে, কখনো মহা-মহা বিপদের মাঝখান দিয়ে ভগবতী ভবানীর খাঁড়া হাতে নির্ভয়ে চললেন।

সেই প্রকাণ্ড পরাশর অরণ্য পার হতে তাঁর তিন দিন, তিন রাত কেটে গেল ; রাজপুত্র বাপ্পা সেই তিন দিন তিনখানি পোড়া রুটি খেয়ে কাটিয়ে দিলেন। তারপর গ্রামের পর গ্রাম, দেশের পর দেশ পার হয়ে, কত বর্ষা কত শীত, পথে-পথে কাটিয়ে, বাপ্পা মেবারের মৌর্যবংশীয় রাজা মানের রাজধানী চিতোর নগরে উপস্থিত হলেন।

সেখানে তখন মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধের মহা আয়োজন হচ্ছে। হাতির পিঠে, উটের উপরে গোলাগুলি চাল-ডাল, তাম্বু-কানাত; গরুর গাড়িতে অস্ত্র-শস্ত্র, খাবার-দাবার; বড়ো-বড়ো জালায় খাবার জল রাঁধবার ঘি তোলা হচ্ছে; রাস্তায় রাস্তায় রাজপুত সৈন্য মাথায় পাগড়ি, হাতে বল্লম ঘুরে বেড়াচ্ছে। চারিদিকে রাজার চর মুসলমানের সন্ধানে-সন্ধানে ফিরছে। মহারাজ মান নিজে সামন্ত-রাজাদের নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন দেখে বেড়াচ্ছেন— চারদিকে হৈ-হৈ পড়ে গেছে।

এত গোলমাল, এত লোকজন, এমন প্রকাণ্ড নগর, এত বড়ো-বড়ো পাথরের বাড়ি বাপ্পা এ পর্যন্ত কখনো দেখেননি। নগেন্দ্রনগরে বাড়ি ছিল বটে কিন্তু তার মাটির দেয়াল; সেখানেও মন্দির ছিল, কিন্তু সে কত ছোটো! বাপ্পা আশ্চর্য হয়ে রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে রইলেন, বালিয় আর দেব বড়ো-বড়ো হাতি দেখে অবাক হয়ে হাঁ করে রইল। সেই সময়ে রাজা মান ঘোড়ায় চড়ে সেই রাস্তায় উপস্থিত হলেন; শাদা ঘোড়ার সোনার সাজ মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে, মাথায় রাজছত্র ঝলমল করছে, দুইদিকে দুইজন ময়ূর-পাখার চামর দোলাচ্ছে! বাপ্পা ভাবলেন— রাজার সঙ্গে দেখা করবার এই ঠিক সময়। তিনি তৎক্ষণাৎ বালিয় ও দেবের হাত ধরে রাস্তার মাঝে উপস্থিত হয়ে ভগবতী ভবানীর খাঁড়া কপালে স্পর্শ করে মহারাজকে প্রণাম করলেন। রাজা মান জিজ্ঞাসা করলেন— 'কে তুমি কী চাও?' বাপ্পা বললেন— 'আমি রাজপুত রাজার ছেলে, আপনার আশ্রয়ে রাজার মতো থাকতে চাই!' এই ভিখারী আবার রাজার ছেলে! চারিদিকে বড়ো-বড়ো সর্দার মুখ টিপে হাসতে লাগলেন, কিন্তু রাজা মান বাপ্পার প্রকাণ্ড শরীর, সুন্দর মুখ, অক্ষয় ধনুঃশর আর সেই ভবানীর খাঁড়া দেখেই বুঝেছিলেন— এ কোনো ভাগ্যবান, ভগবান কৃপা করে এই মুসলমান যুদ্ধের সময় এই বীরপুরুষকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। মানরাজা তৎক্ষণাৎ নিজের জরির শাল বাপ্পার গায়ে পরিয়ে দিয়ে একটা কালো ঘোড়া বাপ্পার জন্যে আনিয়ে দিলেন। বাপ্পা বললেন—

'মহারাজ, আমার ভীল ভাইদের জন্যে ঘোড়া আনিয়ে দিন !' তারপর, বালিয় ও দেবকে ঘোড়ায় চড়িয়ে বাপ্পা সেই কালো ঘোড়ায় উঠে বসলেন— সমস্ত সৈন্যসামন্ত ও সেনাপতির মাথার উপর বাপ্পার প্রকাণ্ড শরীর, সমুদ্রের মাঝে পাহাড়ের মতো, প্রায় আধখানা জেগে রইল ; তখন রাস্তার লোক দেখে বলতে লাগল— 'হ্যাঁ বীর বটে ; যেমন চেহারা, তেমনি শরীর !' চারিদিকে ধন্য-ধন্য পড়ে গেল ; কেবল রাজার যত সেনাপতি মাথার উপরে রাজবেশ মোড়া সেই ভিখারীকে দেখে মান-রাজার উপর মনে-মনে অসন্তুষ্ট হলেন। রাজা দিন-দিন বাপ্পাকে যতই সুনয়নে দেখতে লাগলেন, যতই তাকে আদর অভ্যর্থনা করতে লাগলেন, ততই সেনাপতিদের মন হিংসার আগুনে পুড়তে লাগল।

ক্রমে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধের দিন উপস্থিত হল। সেইদিন রাজসভায় দেশ-বিদেশের যত সামন্ত-রাজা, যত বুড়ো-বুড়ো সেনাপতি একমত হয়ে মান-রাজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললেন— 'মহারাজ, আমরা অনেক সময় অনেক যুদ্ধে তোমার জন্য প্রাণ দিতে গিয়েছি, সে কেবল তুমি আমাদের ভালোবাসতে বলে, আমাদের বিশ্বাস করতে বলে ; যদি মহারাজ, আজ তুমি সেই ভালোবাসা ভুলে একজন পথের ভিখারীকে আমাদের সকলের উপরে বসালে, বাপ্পা আজ যদি তোমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়, সকলের চেয়ে বিশ্বাসী হল—তবে আমাদের আর কাজ কী ? বাপ্পাকেই এই মুসলমান যুদ্ধে সেনাপতি কর ; আমাদের বীরত্ব তো অনেকবার দেখা আছে, এবার নতুন সেনাপতি কেমন করে যুদ্ধ করেন দেখা যাক !' মহারাজ মান চিরবিশ্বাসী রাজভক্ত সর্দারদের মুখে হঠাৎ এই নিষ্ঠুর কথা শুনে বজ্রাহতের মতো স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, তাঁর আর কথা বলবার শক্তি থাকল না। তখন সেই প্রকাণ্ড রাজসভায় এই বিদ্রোহী সর্দারদের মধ্যস্থলে পনেরো বৎসরের বীর-বালক বাপ্পাদিত্য উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'শুনুন মহারাজ ! আজ রাজস্থানের প্রধান-প্রধান সর্দারেরা রাজসভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন—এ ঘোর বিপদের সময় বাপ্পাই এবার

সেনাপতি হয়ে যুদ্ধ চালান ; তবে তাই হোক !' রাজা মান হতাশের মতো চারিদিকে চেয়ে দেখলেন ; তারপর ধীরে-ধীরে বললেন— 'তবে তাই হোক ।' তারপর একদিক দিয়ে মূর্ছিতপ্রায় মান-রাজা চাকরের কাঁধে ভর দিয়ে অন্তঃপুরে চলে গেলেন ; আর একদিক দিয়ে বাপ্পাদিত্য সৈন্য সাজাতে বাহির হলেন !

বিদ্রোহী-সর্দারদের মাথা হেঁট হল। তাঁরা মনে ভেবেছিলেন যে, পনেরো বৎসরের বালক বাপ্পা যুদ্ধে যেতে কখনোই সাহস পাবে না— সভার মাঝে অপমান হবে ; কিন্তু যখন সেই বীর-বালক নির্ভয়ে হাসিমুখে এই ভয়ংকর যুদ্ধের ভার রাজার কাছে চেয়ে নিলে, তখন তাঁদের বিস্ময়ের সীমা রইল না । তাঁরা আরও আশ্চর্য হলেন, যখন সেই বাপ্পা— যাঁকে তাঁরা একদিন পথের ভিখারী বলে ঘৃণা করেছেন— পনেরো বৎসরের সেই বালক বাপ্পা— যুদ্ধ জয় করে কোটি-কোটি রাজপুত-প্রজার আশীর্বাদ, জয়জয়কারের মধ্যে একদিন শুভদিনে শুভক্ষণে সমস্ত রাজস্থানের রাজমুকুটের সমান রাজপুতের রাজধানী চিতোর নগরে ফিরে এলেন ! সেদিন সমস্ত রাজস্থান বেড়ে কী আনন্দ, কী উৎসাহ !

নতুন সেনাপতি বাপ্পা সমস্ত রাজস্থানকে ভয়ংকর মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা করে যেদিন চিতোর নগরে ফিরে এলেন, সেদিন রাজা মানের বুড়ো বুড়ো সর্দারেরা ক্ষুণ্ণ মনে রাজসভা ছেড়ে গেলেন । মহারাজ মান তাঁদের ফিরিয়ে আনতে কতবার চেষ্টা করলেন, কাকুতি-মিনতি, এমন কি শেষে রাজগুরুকে পর্যন্ত তাঁদের কাছে পাঠালেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, সর্দারেরা দূতের মুখে বলে পাঠালেন— 'আমরা মহারাজের নিমক খেয়েছি, এক বৎসর পর্যন্ত আমরা শত্রুতা করব না, বৎসর শেষ হলে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা হবে ।'

সেই এক বৎসর কত ভীষণ ষড়যন্ত্র কত ভয়ংকর পরামর্শে কেটে গেল ! এক বৎসর পরে সেই বিদ্রোহী সর্দারের দুষ্ট পরামর্শে রাজা মানকে ভুল বুঝে বাপ্পা তাঁদের সকলের সেনাপতি হয়ে যুদ্ধে চললেন । রাজা মান যখন শুনলেন বাপ্পা তাঁর রাজসিংহাসন কেড়ে নিতে

আসছেন; যখন শুনলেন যে-বাপ্পাকে তিনি পথের ধুলো থেকে একদিন রাজসিংহাসনের দিকে তুলে নিয়েছিলেন, যার দীনহীন বেশ একদিন তিনি রাজবেশ দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলেন, যাকে তিনি প্রাণের চেয়েও প্রিয় ভেবেছিলেন— হায় রে! সেই অনাথ আজ সমস্ত কৃতজ্ঞতা ভুলে তাঁরই রাজছত্র কেড়ে নিতে আসছে, তখন তাঁর দুই চক্ষে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল।

তিনি সেই বৃদ্ধ বয়সে একা একদল রাজভক্ত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে গেলেন; সেই যুদ্ধই তাঁর শেষ যুদ্ধ; যুদ্ধক্ষেত্রে বাপ্পার হাতে মান-রাজা প্রাণ দিলেন।

ষোলো বৎসরের বাপ্পা দেববন্দরের রাজকন্যাকে বিয়ে করে হিন্দুমুকুট, হিন্দু-সূর্য, রাজগুরু, চাকুয়া উপাধি নিয়ে চিতোরের রাজসিংহাসনে বসলেন। বালিয় ও দেব দুটি ভাই ভীল, বাপ্পার কপালে রাজতিলক টেনে দিয়ে দুখানা গ্রাম বকশিশ পেলে। বাপ্পা সেদিন নিয়ম করে দিলেন যে, তাঁর বংশের যত রাজা সকলকেই এই দুই ভীলের বংশাবলীর হাতে রাজটীকা নিয়ে সিংহাসনে বসতে হবে। আজও সেই নিয়ম চলে আসছে। এই নতুন নিয়ম বাপ্পা রাজস্থানে যখন প্রচলিত করলেন, তখন এই ভীলের হাতে রাজটীকা নেবার কথা যে শুনলে, সেই মনে ভাবলে নতুন রাজার এ একটা নতুন খেয়াল; কিন্তু মান রাজার সভাপণ্ডিতেরা ভাবলেন, ইনি কি তবে গিহ্লোট-রাজকুমার গোহের বংশীয়?— সূর্যবংশেই তো ভীলের হাতে রাজটীকা নেবার নিয়ম ছিল জানি! মহারাজ বাপ্পা নাগাদিত্যের মহিষী চিতোর-রাজকুমারীর ছেলে নয়তো? রাজা মান, বাপ্পার মায়ের ভাই মামা নয়তো? ছি! ছি! বাপ্পা কি অধর্ম করলেন —চোরের মতন মামার সিংহাসন আপনি নিলেন? এমন নিষ্ঠুর রাজার রাজত্বে থাকাও যে মহাপাপ! পণ্ডিতেরা আর রাজসভার মুখো হলেন না—একে-একে চিতোর ছেড়ে অন্য দেশে চলে গেলেন! হায়, তাঁরা যদি জানতেন বাপ্পা কত নির্দোষ; বাপ্পা স্বপ্নেও ভাবেননি রাজা মান তাঁর মামা। তিনি তাঁর পালক পিতা সেই রাজ-

পুরোহিতের কাছে ভীল-বিদ্রোহ, রাজা গোহ, গায়েব গায়েবীর গল্প শুনতেন বটে, কিন্তু তিনি জানতেন না, যার নিষ্ঠুর অত্যাচারে সরল ভীলেরা একদিন ক্ষেপে উঠেছিল, সেই মহারাজ নাগাদিত্য তাঁর পিতা ; তিনি জানতেন না যে, তাঁরই পূর্বপুরুষ রাজকুমার গোহ, যাঁকে পুষ্পবতী ব্রাহ্মণী কমলাবতীর হাতে সঁপে দিয়ে চিতার আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। বাপ্পা ভাবতেন তিনি কোনো সামান্য রাজ্যের রাজপুত্র।

রাজা হবার পর বাপ্পা যখন দেববন্দরের রাজকন্যাকে বিয়ে করে ফিরে আসেন, তখন বাণমাতা দেবীর সোনার মূর্তি সঙ্গে এনেছিলেন। চিতোরের রাজপ্রাসাদে শ্বেত-পাথরের মন্দিরে সোনার সেই দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে প্রতিদিন দুই সন্ধ্যা পুজো করতেন।

অনেক দিন কেটে গেছে, বাপ্পা প্রায় বুড়ো হয়েছেন, সেই সময় একদিন ভক্তিভরে বাণমাতাকে প্রণাম করে উঠবার সময় বাপ্পার গলা থেকে ছেলেবেলার সেই তামার কবচ ছিঁড়ে পড়ল। বাপ্পা বড়ো হয়ে উঠেছিলেন কিন্তু সুতোয় বাঁধা তামার কবচটি তাঁর গলায় যেমন, তেমনই ছিল— অনেকদিনের অভ্যাসে মনেই পড়ত না যে, গলায় একটা কিছু আছে। আজ যখন হীরামোতির কুড়িগাছা হারের নিচে থেকে সেই পুরোনো কবচখানি পায়ের তলায় ছিঁড়ে পড়ল, তখন বাপ্পা চমকে উঠে ভাবলেন, এ কী! এতদিন আমার মনেই ছিল না যে এতে লেখা আছে আমি কে, কোথায় ছিলুম! আজ সব সন্ধান পাওয়া যাবে! বাপ্পা প্রফুল্ল-মুখে সেই তামার কবচ মহারানীর হাতে এনে দিয়ে বললেন— 'পড় তো শুনি।' বাপ্পা নিজে এক অক্ষরও পড়তে জানতেন না। মহারানী বাপ্পার পায়ের কাছে বসে পড়তে লাগলেন। কবচের এক পিঠে লেখা রয়েছে— 'বাসস্থান ত্রিকূট পর্বত, নগেন্দ্রনগর, পরাশর-অরণ্য।' বাপ্পা হাসিমুখে রানীর কাঁধে হাত রেখে বললেন— 'এই আমার ছেলে-বেলার দেশ, এইখানে কত খেলা খেলেছি! সেই ত্রিকূট পাহাড়, সেই আশি বৎসরের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গম্ভীর মুখ, নগেন্দ্রনগরে ঝুলন-

পূর্ণিমায় সেই জ্যোৎস্না-রাত্রি, সেই শোলাঙ্কি-রাজকুমারীর মধুর হাসি, স্বপ্নের মতো আমার এখনো মনে আসে! আমি কতবার কত লোককে জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু পৃথিবীতে তিনটে-চুড়ো পাহাড় কত আছে, কে তার সন্ধান পাবে! আমি যদি বলতে পারতেম যে সেই মেঘের মতো তিনটে পাহাড়ের ঢেউকে 'ত্রিকূট' বলে, যদি বলতে পারতেম সেই ছোটো শহরের নাম নগেন্দ্রনগর, যদি জানতে পারতেম সেই ঘন বন, যেখানে আমি রাখালদের সঙ্গে খেলে বেড়াতাম, যেখানে ঝুলন-পূর্ণিমায় শোলাঙ্কি-রাজকুমারীকে বিয়ে করেছিলেম, সেটি পরাশর-অরণ্য, তবে কোনো গোলই হত না; হায় হায়! জন্মাবধি লেখা-পড়া না শিখে এই ফল! এতকাল পরে কি আর সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, সেই শোলাঙ্কি-রাজনন্দিনীকে ফিরে পাব? পড় তো শুনি আর কী লেখা আছে?' রানী কবচের আর-এক পিঠ উল্‌টে পড়তে লাগলেন — 'জন্মস্থান মালিয়া-পাহাড়, পিতা নাগাদিত্য, মাতা চিতোর কুমারী, নাম বাপ্পা।'

মহারানীর বড়ো-বড়ো চোখ মহাবিস্ময়ে আরও বড়ো হয়ে উঠল— তিনি তামার সেই কবচ হাতে বাপ্পার পায়ের তলায় ফুলের বিছানার মতো সুন্দর গালিচায় অবাক হয়ে বসে রইলেন; আর গজদন্তের পালঙ্কের উপর বাপ্পা ডান হাতের আঙুলে এক ফোঁটা রক্তের মতো বড়ো একখানা প্রবালের আঙটির দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলেন, হায়-হায়! কী পাপ করেছি! এই হাতে পিতৃহন্তা ভীলদের শাসন না করে, মামার প্রাণহন্তা হয়ে আমি সিংহাসনে বসেছি। 'মহারানী! আমি মহাপাপী, আমি চিতোরের সিংহাসনে বসবার উপযুক্ত নই। এখন পিতৃহত্যার প্রতিশোধ আর আত্মীয়-বধের প্রায়শ্চিত্ত আমার জীবনের ব্রত হল।'

একলিঙ্গের দেওয়ান বাপ্পা সেইদিনই সকলের কাছে বিদায় হয়ে, দশ হাজার দেওয়ানী ফৌজ নিয়ে চিতোর থেকে বের হলেন। তাঁর সমস্ত রাগ মালিয়া-পাহাড়ে ভীল রাজত্বের উপর গিয়ে পড়ল। বাপ্পা মালিয়া পাহাড় জয় করে, ভীল-রাজত্ব ছারখার করে চলে গেলেন।

তারপর দেশ-বিদেশ— কাশ্মীর, কাবুল, ইস্পাহান, কান্দাহার, ইরান, তুরান জয় করলেন। বাপ্পার সকল সাধ পূর্ণ হল ; মালিয়া পাহাড় জয় করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধের সাধ পূর্ণ হল, আধখানা পৃথিবী চিতোর সিংহাসনের অধীনে এনে আত্মীয়বধের কষ্ট অনেকটা দূর হল, কিন্তু তবু মনের শান্তি প্রাণের আরাম কোথায় পেলেন ? বাপ্পা যখন সমস্ত দিন যুদ্ধের পর শ্রান্ত হয়ে নিজের শিবিরে বসে থাকতেন, যখন নিস্তব্ধ যুদ্ধক্ষেত্র কোনো দিন পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় আলোময় হয়ে যেত, তখন বাপ্পার সেই ঝুলন-পূর্ণিমার রাত্রে চাঁপাগাছের ঝুলনায় শোলাঙ্কি-রাজকুমারীর হাসি-মুখ মনে পড়ত ; যখন কোনো নতুন দেশ জয় করে বাপ্পা সেখানকার নতুন রাজপ্রাসাদে সোনার পালঙ্কে নহবতের মধুর সুর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তেন, তখন সেই পূর্ণিমার রাতে চাঁপাগাছের চারিদিকে ঘিরে-ঘিরে রাজকুমারীর সখীদের সেই ঝুলন-গান স্বপ্নের সঙ্গে বাপ্পার প্রাণে ভেসে আসত। শেষে যেদিন তিনি নগেন্দ্রনগরে গিয়ে দেখলেন তাঁদের পাতার কুটীর মাটির দেওয়াল মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, যখন দেখলেন শোলাঙ্কি-রাজবাড়ি জনশূন্য, নিস্তব্ধ অন্ধকার হয়ে পড়ে আছে— সে রাজকুমারীও নেই সে সখীও নেই, তখন বাপ্পার মন একেবারে ভেঙে গেল, তিনি শান্তিহারা পাগলের মতো সেই দিগ্বিজয়ী সৈন্য নিয়ে শান্তির আশায় এদেশ-ওদেশ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন ; চিতোরের প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ, শূন্য সিংহাসন আর অন্দরে একা মহারানীকে নিয়ে পড়ে রইল।

এইরকম দেশ-বিদেশে ঘুরতে-ঘুরতে বাপ্পা একদিন বল্লভীপুরে গায়নী-নগরে— যেখানে দুটি ভাই-বোন গায়েব-গায়েবী পৃথিবীর আলো প্রথম দেখেছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হলেন। একদিন ষোল বৎসর বয়সে রাজা মানের সেনাপতি হয়ে বাপ্পা মুসলমান সুলতান সেলিমের সমস্ত সৈন্য এই গায়নী-নগর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে চিতোর ফিরে গিয়েছিলেন ; আজ কত বৎসর পরে যখন কালো চুলে পাক ধরেছে, যখন চোখের কোলে কালি পড়েছে, গায়ের মাংস লোল হয়ে এসেছে, পৃথিবী যখন তাঁর কাছে অনেকটা পুরোনো হয়ে এসেছে,

সেই সময় বাপ্পা আর একবার সেই গায়নী-নগরে ফিরে এলেন। গায়নী-নগর দেখে বাপ্পার সেই দুটি ভাই-বোন গায়েব-গায়েবীর গল্প মনে পড়ল।

বাপ্পাদিত্য সেই সূর্যকুণ্ডের জলে সূর্য-পূজা করে গায়নীর রাজ-প্রাসাদে শ্বেতপাথরের শয়ন-মন্দিরে বিশ্রাম করতে গেলেন। হঠাৎ অর্ধেক রাত্রে কার একটি মধুর গান শুনতে-শুনতে বাপ্পার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি শয়নমন্দির থেকে পাথরের ছাদে বেরিয়ে দাঁড়ালেন। সম্মুখে মুসলমানদের প্রকাণ্ড মসজিদ জ্যোৎস্নার আলোয় ধপধপ করছে। আকাশে আধখানি চাঁদ; চারিদিক নিশুতি। বাপ্পা জ্যোৎস্নার আলোয় দাঁড়িয়ে গান শুনতে লাগলেন। তাঁর মনে হল, এ গান যেন কোথায় শুনেছেন! হঠাৎ দক্ষিণের হাওয়ায় গানের কথা আরো স্পষ্ট হয়ে বাপ্পার কানের কাছে ভেসে এল; বাপ্পা চমকে উঠে শুনলেন— 'আজ কী আনন্দ!' ঝুলত ঝুলনে শ্যামর চন্দ!'— এ যে সেই গান! নগেন্দ্রনগরে রাজপুত-রাজকুমারীর ঝুলন গান!

বাপ্পা ছাদের উপর ঝুকে দাঁড়ালেন; নিচে দেখলেন এক ভিখারিণী রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাইছে— 'আজ কী আনন্দ!' বাপ্পা তৎক্ষণাৎ সেই ভিখারিণীকে ডেকে পাঠালেন। সেই চাঁদের আলোয় নির্জন শ্বেতপাথরের ছাদে পথের ভিখারিণী রাজ্যেশ্বর বাপ্পার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। বাপ্পা জিজ্ঞাসা করলেন— 'কে তুমি? তুমি কি নগেন্দ্রনগরের শোলাঙ্কি-রাজকুমারী? তুমি কি কখনো ঝুলন-পূর্ণিমায় এক রাখাল-বালককে বিয়ে করেছিলে?' ভিখারিণী অনেকক্ষণ একদৃষ্টে বাপ্পার মুখের দিকে চেয়ে রইল, তারপর একটুখানি হেসে বললে— 'মহারাজ, অর্ধেক-রাত্রে ভিখারিণীকে ডেকে এ কী তামাশা!' বাপ্পা বললেন— 'তবে কি তুমি রাজকুমারী নও?' ভিখারিণী নিঃশ্বাস ফেলে বললে— 'আমি একদিন রাজকুমারী ছিলাম বটে, আজ ভিখারিণী। মহারাজ আমি মুসলমান নবাব সেলিমের কন্যা! একদিন পনেরো বৎসর বয়সে তুমি আমাদের রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলে, সেদিন আমি এই রাজপ্রাসাদের এই ছাদের উপর থেকে

তোমায় দেখেছিলাম— কী সুন্দর মুখ, কী প্রকাণ্ড শরীর! আর আজ তোমায় কী দেখছি! সে শরীর নেই, সে হাসি নেই! এমন দশা তোমার কে করলে? কোন রাজপুত-কুমারীর আশায় তুমি পাগলের মতো দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছ?' বাপ্পা বললেন—'সে কথা থাক; তুমি আবার সেই গান গাও।' ভিখারিণী গাইতে লাগল—'আজ কী আনন্দ! ঝুলত ঝুলনে শ্যামর চন্দ।' বাপ্পা সমস্ত দুঃখ ভুলে সেই ভিখারিণীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। গান শেষ হল; বাপ্পা বললেন— 'নবাবজাদী তোমায় কী দেব বল?' ভিখারিণী বললে— 'আমার যদি রাজ্য থাকত তবে তোমায় বলতেম আমায় বিয়ে করে তোমার বেগম কর— কিন্তু সে আশা এখন নেই, এখন আমি ভিখারিণী যে! আমাকে তোমার বাঁদী করে কাছে-কাছে রাখ!' বাপ্পা বললেন— 'তুমি বাঁদী হবার যোগ্য নও, আমি তোমায় বেগম করব, তুমি চিরদিন আমার কাছে বসে এই গান গাইবে।'

তার পরদিন সেই মুসলমান কন্যাকে বিয়ে করে বাপ্পা খোরাসান দেশে চলে গেলেন। সেখানে গুলবাগে খাসমহলে গোলাবের ফোয়ারার ধারে সিরাজির পেয়ালা হাতে বেগম-সাহেবার মুখে আরবী গজল আর সেই হিন্দুস্থানের ঝুলন-গান শুনতে-শুনতে বাপ্পা প্রাণের আরাম, মনের শান্তি পেয়েছিলেন কিনা কে জানে!

একশত বৎসর বয়সে বাপ্পার মৃত্যু হল। পূর্বদিকে— হিন্দুস্থানে তাঁর হিন্দু মহিষী, হিন্দু প্রজারা; পশ্চিমে ইরানীস্থানে তাঁর মুসলমানী বেগম আর পাঠানের দল, হিন্দুরা তাদের মহারাজকে চিতায় তুলে দিতে চাইলে, আর নৌসেরা পাঠানের দল তাঁকে মুসলমানের কবর দিতে ব্যস্ত হল। শেষে যখন একপিঠে সূর্যের স্তব আর একপিঠে আল্লার দোয়া লেখা প্রকাণ্ড কিংখাবের চাদর বাপ্পার ওপর থেকে খুলে নেওয়া হল, তখন সেখানে আর কিছুই দেখা গেল না— কেবল রাশি-রাশি পদ্মফুল আর গোলাপফুল। চিতোরের মহারানী সেই পদ্মফুল বাণমাতাজীর মন্দিরে মানস-সরোবরের জলে রেখে দিলেন। ইরানী

বেগম একটি গোলাপফুল শখের গুলবাগে খাসমহলের মাঝে গোলাপ জলের ফোয়ারার ধারে পুঁতে দিলেন ; আর সেইদিন হিন্দুস্থান ও ইরানীস্থানের মধ্যস্থলে হিন্দুকুশ পর্বতের শিখরে হীরে-জহরতে মোড়া এক রাজার শরীর চিতার উপরে তুলে দিয়ে এক সন্ন্যাসিনী বললেন— 'সখী, তোরা সেই গান গা।' চারিদিকে চার সন্ন্যাসিনী ঘিরে-ঘিরে গাইতে লাগল— 'আজ কী আনন্দ।'

সন্ন্যাসিনী সেই শোলাঙ্কি-রাজকুমারী ; আর সেই রাজদেহ বাপ্পার মৃতদেহ— দুজনে চিরদিন দুজনের সন্ধানে ফিরেছিলেন, কিন্তু ইহলোকে মিলন হয়নি।

পদ্মিনী

বাপ্পাদিত্যের সময় মুসলমানেরা ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণ করেন। তারপর থেকে সূর্যবংশের অনেক রাজা অনেকবার চিতোরের সিংহাসনে বসেছেন, রাজ-সিংহাসন নিয়ে কত ভায়ে ভায়ে বিচ্ছেদ, কত মহা-মহা যুদ্ধ, কত রক্তপাত, কত অশ্রুপাতই হয়ে গেছে; কিন্তু এত রাজা, এত যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে কেবল জনকতক রাজার নাম আর গুটিকতক যুদ্ধের কথা সমস্ত রাজপুতের প্রাণে এখনো সোনার অক্ষরে লেখা রয়েছে। তার মধ্যে একজন হচ্ছেন মহারাজ খোমান— যিনি চব্বিশবার মুসলমানের হাত থেকে চিতোরকে রক্ষা করেছিলেন, যিনি আরব্য উপন্যাসের সেই বোগদাদের খালিফ হারুন অল রশিদের ছেলে আল মামুনকে চিতোরের রাজপ্রাসাদে অনেকদিন বন্দী রেখেছিলেন, আশীর্বাদ করতে হলে এখনো যাঁর নাম করে রাজপুতেরা বলে— 'খোমান তোমায় রক্ষা করুন।' আর একজন রাজা মহারাজ সমরসিংহ— যেমন বীর তেমনি ধার্মিক। তিনি যখন নাগা-সন্ন্যাসীর মতো মাথার উপর ঝুঁটি বেঁধে পদ্মবীজের মালা গলায় ভবানীর খাঁড়া হাতে নিয়ে রাজ-সিংহাসনে বসতেন, তখন বোধ হত যেন সত্যই ভগবান একলিঙ্গের দেওয়ান কৈলাস থেকে পৃথিবীতে রাজত্ব করতে এসেছেন। তখনকার দিল্লীশ্বর চৌহান পৃথ্বীরাজের হাত থেকে শাহাবুদ্দীন ঘোরি যখন দিল্লীর সিংহাসনের সঙ্গে অর্ধেক-ভারতবর্ষ কেড়ে নিতে এসেছিলেন, সেই সময় এই মহারাজ সমরসিংহ তেরো হাজার রাজপুত আর নিজের ছেলে কল্যাণকে নিয়ে অর্ধেক ভারতবর্ষের রাজা পৃথ্বীরাজের পাশে-পাশে কাগার নদীর তীরে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। সেই যুদ্ধই তাঁর শেষ যুদ্ধ। পৃথ্বীরাজ সমরসিংহের প্রাণের বন্ধু— তাঁর আদরের মহিষী মহারানী পৃথার ছোটো ভাই। দুইজনে বড়ো ভালোবাসা

ছিল। তাই বুঝি এই শেষ যুদ্ধে সমরসিংহ জন্মের মতো বন্ধুত্বের সমস্ত ধার শুধে দিয়ে চলে গেলেন। যখন যুদ্ধের দিনে প্রলয়ের ঝড়-বৃষ্টির মাঝে পৃথ্বীরাজের লক্ষ-লক্ষ হাতি-ঘোড়া, সৈন্য-সামন্ত ছিন্ন-ভিন্ন, ছারখার হয়ে গেল, যখন জয়ের আর কোনো আশা নেই, প্রাণের মায়া কাটাতে না পেরে যখন প্রায় সমস্ত রাজাই পৃথ্বীরাজকে বিপদের মাঝে রেখে একে-একে নিজের রাজত্বের মুখে পালিয়ে চললেন, তখন একমাত্র সমরসিংহ স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, রাজ-মুকুট, রাজসিংহাসন তুচ্ছ করে প্রাণের বন্ধু পৃথ্বীরাজের জন্য মুসল-মানের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। আগে সেই ধর্মাত্মা মহাবীর সমরসিংহ, তাঁর ষোলো বছরের ছেলে কল্যাণ, আর সেই তেরো হাজার রাজপুতের বুকের রক্তে কাগার নদীর বালুচর রাঙা হয়ে গেল, তবে পৃথ্বীরাজ বন্দী হলেন, তবে দিল্লীর হিন্দু-সিংহাসন মুসল-মান বাদশা শাহাবুদ্দীনের হস্তগত হল। এখন সে শাহাবুদ্দীন কোথায়, কোথায় বা সেই দিল্লীর রাজতক্ত! কিন্তু যে ধর্মাত্মা বন্ধুর জন্যে নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করলেন, সেই মহাবীর সমরসিংহের নাম রাজপুত-কবিদের সুন্দর গানের মধ্যে চিরকাল অমর হয়ে আছে, এখনো রাজপুতানায় সেই গান গেয়ে কত লোক রাস্তায়-রাস্তায় ভিক্ষা করে।

সমরসিংহের পর থেকে প্রায় একশ বৎসর কেটে গেছে। চিতোরের রাজসিংহাসনে তখন রানা লক্ষ্মণসিংহ আর দিল্লীতে পাঠান-বাদশা আল্লাউদ্দীন। সেই সময় একদিন রানা লক্ষ্মণসিংহের কাকা ভীমসিংহ, সিংহল-দ্বীপের রাজকুমারী পদ্মিনীকে বিয়ে করে সমুদ্রপার থেকে চিতোরে ফিরে এলেন! পদ্মের সৌরভ যেমন সমস্ত সরোবর প্রফুল্ল করে ক্রমে দিগদিগন্তে ছড়িয়ে যায়, তেমনি কমলালয়া লক্ষ্মীর সমান সুন্দরী সেই পদ্মমুখী রাজপুত-রানী পদ্মিনীর রূপের মহিমা, গুণের গরিমা দিনে দিনে সমস্ত ভারতবর্ষ আমোদ করলে! কি দীনদুঃখীর সামান্য কুটির, কি রাজাধিরাজের রাজপ্রাসাদ— এমন সুন্দরী, হেন গুণবতী কোথাও নেই।

এই আশ্চর্য সুন্দরী পদ্মিনীকে নিয়ে ভীমসিংহ যখন চিতোরের এক ধারে শাদা-পাথরে বাঁধানো সরোবরের মধ্যস্থলে, রাজ-অন্তঃপুরের শীতল কোঠায় সুখে দিন কাটাচ্ছিলেন, সেই সময়ে একদিন দিল্লীতে তখনকার পাঠান-বাদশাহ আল্লাউদ্দীন, খাসমহলের ছাদে গজদন্তের খাটিয়ায় বসে বসন্তের হাওয়া খাচ্ছিলেন। আকাশে চাঁদ উঠেছিল, পাশে শরবতের পেয়ালা-হাতে পিয়ারী বেগম বসেছিলেন, পায়ের কাছে বেগমের এক নতুন বাঁদী সারঙ্গীর সুরে গান গাইছিল। বাদশা হঠাৎ বলে উঠলেন, 'কী ছাই, আরবী গজল। হিন্দুস্থানের গান গাও!' তখন পিয়ারী বেগমের নতুন বাঁদী নতুন করে সারঙ্গী বেঁধে নতুন সুরে গাইতে লাগল—'হিন্দুস্থানে এক ফুল ফুটেছিল— তার দোসর নেই, জুড়ি নেই। সে কী ফুল, আহা সে যে পদ্মফুল, সে যে পদ্মফুল— চারিদিকে নীল জল, মাঝে সেই পদ্মফুল! দেবতারা সে ফুলের দিকে চেয়েছিল, মানুষে সে ফুলের দিকে চেয়েছিল, চারিদিকে অপার সিন্ধু তরঙ্গভঙ্গে গর্জন করছিল! কার সাধ্য সমুদ্র পার হয়, কার সাধ্য যে রাজার বাগিচায় সে ফুল তোলে! সে রাজার ভয়ে দেবতারাও কম্পমান!' আল্লাউদ্দীন বলে উঠলেন, 'আমি হিন্দুস্থানের বাদশা, আমি কোনো রাজারও তোয়াক্কা রাখি না, কোনো দেবতাকেও ভয় করি না। পিয়ারী! আমি কালই সেই পদ্মফুল তুলতে যাব!' বাঁদী আবার গাইতে লাগল—'কে সেই ভাগ্যবান সিন্ধু হল পার? কে সে গুণবান তুলল সে ফুল?— মেবারের রাজপুত-বীরের সন্তান— রানা ভীমসিংহ— নির্ভয়, সুন্দর!'

আল্লাউদ্দীন কিংখাবের সিংহাসনে সোজা হয়ে বসলেন, আনন্দের সুরে গান শেষ হল—'আজ চিতোরের অন্তঃপুরে যে ফুল বিরাজে, কবি যার নাম গায় ভারতে, তার দোসর কোথা? জগতে তার জুড়ি কই? ধন্য রানা ভীমসিংহ! জয় রাজরানী— চিতোরের রাজ-উদ্যানে প্রফুল্ল পদ্মিনী!' আল্লাউদ্দীনের কানে অনেকক্ষণ ধরে বাজতে লাগল—'চিতোরের রাজ-উদ্যানে প্রফুল্ল পদ্মিনী!' তিনি আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে বলে উঠলেন, 'বাঁদী তুই কি স্বচক্ষে

পদ্মিনীকে দেখেছিস ? সে কি সত্যই সুন্দরী ?' বাঁদী উত্তর করলে, 'জাহাঁপনা ! দিল্লী আসবার আগে আমি চিতোরে নাচ গান করে জীবন কাটাতেম ; পদ্মিনীর বিয়ের রাত্রে আমি রানীর মহলে নেচে এসেছি।'

আল্লাউদ্দীন গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন ; কিছুক্ষণ পরে বলে উঠলেন, 'পিয়ারী আমার ইচ্ছে করে পদ্মিনীকে এই খাসমহলে নিয়ে আসি।' পিয়ারী বেগম বলে উঠলেন, 'শাহেনশা, আমার সাধ যায়, আকাশের চাঁদটাকে সোনার কৌটায় পুরে রাখি !' কথাটা আল্লাউদ্দীনের ভালো লাগল না। দিল্লীর বাদশা, যাঁর মুঠোর ভিতর অর্ধেক ভারতবর্ষ, তিনি কি একজন রাজপুত-রানীকে ধরে আনতে পারেন না ? শাহেনশা মুখ গম্ভীর করে উঠে গেলেন— মনে-মনে বলে গেলেন, 'থাক পিয়ারী, যদি পদ্মিনীকে আনতে পারি তবে তোমাকে তার বাঁদী হয়ে থাকতে হবে।'

তার পরদিন লক্ষ-লক্ষ সৈন্য নিয়ে আল্লাউদ্দীন চিতোরের মুখে চলে গেলেন। পাঠান সৈন্য যে-দিক দিয়ে গেল সেই দিকে পথের দুই ধারে, ধানের খেত, লোকের বসতি ছারখার করে যেতে লাগল।

তখন বসন্তকাল। সমস্ত চিতোর জুড়ে দিকে-দিকে আনন্দের রোল উঠেছে—'হোরি হ্যায় ! হোরি হ্যায় !' ঘরে-ঘরে আবিরের ছড়াছড়ি, হাসির হো-হো আর বাসন্তী রঙের বাহার। সেই ফাগুনে, ভরা আনন্দ আর হাসি-খেলার মাঝখানে, একদিন চিতোরে খবর পৌঁছল আল্লাউদ্দীন আসছেন— ঝড়ের মুখে প্রদীপের মতো চিতোরের সমস্ত আনন্দ একনিমেষে নিবে গেল ! তখন কোথায় রইল রানার রাজসভায় ধ্রুপদ খেয়ালে হোরি বর্ণনা, কোথায় রইল রানীদের অন্দরে 'ফাগুনমে হোরি মচাও' বলে মিষ্টি সুরে মধুর গান, কোথায় লালে-লাল রাস্তায় দলে-দলে হাসি-তামাশা আর কোথায় বা গোপালজীর মন্দির থেকে রাগ বসন্তে নওবতের সুর !

আবিরে গোলাপে লালে-লাল চিতোরের ঘরে-ঘরে অস্ত্রশস্ত্রের

ঝনঝনার সঙ্গে আর-এক ভয়ংকর খেলার আয়োজন চলতে লাগল— সে খেলা লোকের প্রাণ নিয়ে খেলা— তাতে বুকের রক্ত, ছুরির ঘা, কামানের গর্জন আর যুদ্ধের খোলা মাঠ! শেষে একদিন পাঠান-বাদশার কালো নিশান শকুনির মতো মেবারের মরুভূমির উপর দেখা দিলে। ভীমসিংহ হুকুম দিলেন, 'কেল্লার দরজা বন্ধ কর।' ঝনঝন শব্দে চিতোরের সাতটা ফটক তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

আল্লাউদ্দীন ভেবেছিলেন— যাব আর পদ্মিনীকে কেড়ে আনব; কিন্তু এসে দেখলেন, বুকের পাঁজর প্রাণের চারিদিক যেমন ঢেকে রাখে, তেমনি রাজপুতের তলোয়ার পদ্মিনীর চারিদিক দিবারাত্রি ঘিরে রয়েছে। সমুদ্র পার হওয়া সহজ, কিন্তু এই সাতটা ফটক পার হয়ে চিতোরের মাঝখান থেকে পদ্মিনীকে কেড়ে আনা অসম্ভব। পাঠান বাদশা পাহাড়ের নিচে তাঁবু গাড়বার হুকুম দিলেন।

সেইদিন গভীর রাত্রে যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন শেষ করে রানা ভীমসিংহ পদ্মিনীর কাছে এসে বললেন, 'পদ্মিনী তুমি কি সমুদ্র দেখতে চাও? যেমন অনন্ত নীল সমুদ্রের ধারে তোমাদের রাজ-প্রাসাদ ছিল, তেমনি সমুদ্র?' পদ্মিনী বললেন, 'তামাশা রাখ, তোমাদের এ মরুভূমির দেশে আবার সমুদ্র পেলে কোথা থেকে?' ভীমসিংহ পদ্মিনীর হাত ধরে কেল্লার ছাদে উঠলেন। অন্ধকার আকাশ—চন্দ্র নেই, তারা নেই, পদ্মিনী দেখলেন সেই অন্ধকার আকাশের নীচে আর একখানা কালো অন্ধকার কেল্লার সম্মুখ থেকে মরুভূমির ওপর পর্যন্ত জুড়ে রয়েছে। পদ্মিনী বলে উঠলেন, 'রানা, এখানে সমুদ্র ছিল, আমি তো জানি না, মাগো, শাদা-শাদা ঢেউ উঠছে দেখ।' ভীমসিংহ হেসে বললেন, 'পদ্মিনী, এ যে-সে সমুদ্র নয়; এ পাঠান-বাদশার চতুরঙ্গ সৈন্যবল! ঐ দেখ, তরঙ্গের পর তরঙ্গের মতো শিবিরশ্রেণী; জলের কল্লোলের মতো ঐ শোন সৈন্যের কোলাহল! আজ আমার মনে হচ্ছে, সেই নীল সমুদ্র যার বুকের মাঝ থেকে আমি একটি সোনার পদ্মফুলের মতো তোমায় ছিঁড়ে এনেছি, সেই সমুদ্র যেন আজ এই চতুরঙ্গিণী মূর্তি ধরে

তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে এসেছে। কেমন করে যে এই বিপদসাগর পার হব ভাবছি।' ভীমসিংহ আরও বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ একটা কালো-পেঁচা চিৎকার করে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল; তার প্রকাণ্ড দুখানা কালো ডানার ঠাণ্ডা বাতাস অন্ধকার ছাদে রানা-রানীর মুখের উপর কার যেন দুখানা ঠাণ্ডা হাতের মতো বুলিয়ে গেল। পদ্মিনী চমকে উঠে রানার হাত ধরে নেমে গেলেন। সমস্ত রাত ধরে তাঁর মন বলতে লাগল—একী অলক্ষণ! একী অলক্ষণ!

তার পরদিন পুবের আকাশে ভোরের আলো সবে মাত্র দেখা দিয়েছে, এমন সময় একজন রাজপুত সওয়ার পাঠান-শিবিরে উপস্থিত হল। বাদশা আল্লাউদ্দীন তখন রুপোর কুর্সিতে বসে তশবী-দানা জপ করছিলেন; খবর হল, 'রানা লক্ষ্মণসিংহের দূত হাজির।' বাদশা হুকুম দিলেন, 'হাজির হোনে কো কহো।' রানার দূত তিনবার কুর্নিশ করে বাদশার সামনে দাঁড়িয়ে বললে, 'রানা জানতে চান বাদশার সঙ্গে তাঁর কিসের বিবাদ যে আজ এত সৈন্য নিয়ে তিনি চিতোরে উপস্থিত হলেন?' আল্লাউদ্দীন উত্তর করলেন, 'রানার সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা নেই, আমি রানার খুড়ো ভীমসিংহের কাছে পদ্মিনীকে ভিক্ষা চাইতে এসেছি, তাকে পেলেই দেশে ফিরব।' দূত উত্তর করলে, 'শাহেনশা, আপনি রাজপুত-জাতকে চেনেন না, সেই জন্য এমন কথা বলছেন। রানার কথা ছেড়ে দিন, আমরা দুঃখী রাজপুত, আমরাও প্রাণ দিতে পারি তবু মান খোয়াতে পারি না; আপনি রানীর আশা পরিত্যাগ করুন, বরং শাহেনশার যদি অন্য-কিছু নেবার থাকে তবে—' আল্লাউদ্দীন দূতের কথায় বাধা দিয়ে বললেন, 'হিন্দুস্থানের বাদশার এক কথা— হয় পদ্মিনী, নয় যুদ্ধ।' রানার দূত পিছু হটে তিনবার কুর্নিশ করে বিদায় হল।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা চিতোরের রাজসভায় সমস্ত রাজপুত-সর্দার একত্র হলেন, কী করে চিতোরকে মুসলমানের হাত থেকে রক্ষা করা যায়? রাজস্থানের রাজ-মুকুটের সমান চিতোর; রাজপুতের

প্রাণের চেয়ে প্রিয় চিতোর। মুসলমানেরা প্রায় ভারতবর্ষ গ্রাস করেছে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধে কত বড়ো-বড়ো হিন্দুরাজার রাজত্ব ছারখার হয়ে একেবারে লোপ পেয়ে গেছে, কিন্তু চিতোরের সিংহাসন সেই পুরাকালের মতো এখনো অটল, এখনো স্বাধীন আছে। কী করে আজ এই ঘোর বিপদে চিতোরের উদ্ধার করা যায়? অনেকক্ষণ ধরে অনেক পরামর্শ তর্ক-বিতর্ক চলল। শেষে রানা ভীমসিংহ উঠে বললেন, 'পদ্মিনীর জন্যে যখন চিতোরের এই সর্বনাশ উপস্থিত তখন না হয় পদ্মিনীকেই পাঠানের হাতে দেওয়া যাক, আমার তাতে কোনো দুঃখ নেই; চিতোর আগে না পদ্মিনী আগে!' কথাটা বলে ভীমসিংহ একবার রাজসভার এক পারে, যেখানে শ্বেতপাথরের জালির পিছনে চিতোরের রানীরা বসেছিলেন, সেইদিকে চেয়ে দেখলেন; তারপর সিংহাসনের দিকে ফিরে বললেন, 'মহারানা কী বলেন?' লক্ষ্মণসিংহ বললেন, 'যদি সমস্ত সর্দারের তাই মত হয়, তবে তাই করা কর্তব্য।' তখন সেই রাজভক্ত রাজপুত সর্দারের প্রধান রাজসভায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'রানার বিপদে আমাদের বিপদ, রানার অপমানে আমাদের অপমান। পদ্মিনী শুধু ভীমসিংহের নন, তিনি আমাদের রানীও বটে। কেমন করে আমরা তাঁকে পাঠানের বেগম হতে পাঠিয়ে দেব? পৃথিবীসুদ্ধ লোক বলবে, রাজস্থানে এমন পুরুষ ছিল না যে তারা রানীর হয়ে লড়ে? মহারানা, আমরা প্রস্তুত, হুকুম হলে যুদ্ধে যাই!' মহারানা হুকুম দিলেন, 'আপাতত যুদ্ধের প্রয়োজন নেই, সাবধানে কেল্লার দরজা বন্ধ রাখ, আল্লাউদ্দীন যতদিন পারে চিতোর ঘিরে বসে থাকুক!' সভাস্থলে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। চারিদিকে চিতোরের সমস্ত সামন্ত-সর্দার তলোয়ার খুলে দাঁড়ালেন, সমস্ত রাজসভা একসঙ্গে বলে উঠল, 'জয় মহারানার জয়! জয় ভীমসিংহের জয়! জয় পদ্মিনীর জয়!' রাজসভা ভঙ্গ হল। সেই সময় রাজসভার এক-পারে, শ্বেতপাথরের জালির আড়াল থেকে সোনার পদ্মফুল লেখা একখানি লাল রুমাল সেই রাজভক্ত সর্দারের মাঝে এসে পড়ল। সর্দারেরা পদ্মিনীর হাতের

সেই লাল রুমাল বল্লমের আগায় বেঁধে 'রানীর জয়!' বলে রাজসভা থেকে বিদায় হলেন।

তারপর, দিন কাটতে লাগল। আল্লাউদ্দীন লক্ষ-লক্ষ সৈন্য নিয়ে চিতোরের কেল্লা ঘিরে বসে রইলেন। বাদশার আশা ছিল যে কেল্লার ভিতর বন্ধ থেকে রাজপুতদের খাবার ফুরিয়ে যাবে, তখন তারা প্রাণের দায়ে পদ্মিনীকে পাঠিয়ে দিয়ে সন্ধি করবে; কিন্তু দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ক্রমে সংবৎসর কেটে গেল, তবু সন্ধির নামগন্ধ নেই। বর্ষা, শীত কেটে গিয়ে গ্রীষ্মকাল এসে পড়েছে, পাঠান সৈন্যেরা দিল্লীতে ফেরবার জন্যে অস্থির হতে লাগল। এমন গরমের দিনে দিল্লীতে চাঁদনি-চৌকে কত মজা! সেখানে কাফিখানায় কত আমোদ চলেছে! আর তারা কিনা, কী বর্ষা, কী হিম, এই হিন্দুর-মুল্লুকে এসে খোলা মাঠে পড়ে রয়েছে! এখানে না পাওয়া যায় ভালো পান তামাক, না আছে ফুলের বাগিচা, না আছে একটা লোকের মিষ্টি গলা— যার গান শুনলে ভুলে থাকা যায়। এখানকার লোকগুলোও যেমন কাঠখোট্টা, তাদের গান-গুলোও তেমনি বেসুরো, পানগুলোও তেমনি পুরু, তামাকটাও তেমনি কড়ুয়া। এ হিঁদুর মুল্লুকে আর মন টেকে না।

আল্লাউদ্দীন দেখলেন, নিষ্কর্মা বসে থেকে তাঁর সৈন্যরা ক্রমে বিরক্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর ইচ্ছা আরো কিছুদিন চিতোর ঘিরে বসে থাকেন; যে কোনো উপায়ে হোক সৈন্যদের স্থির রাখতে হবে। বাদশা তখন এক-একদিনে এক-এক দল সৈন্য নিয়ে শিকার করে বেড়াতে লাগলেন। সেই সময় একদিন শিকার শেষে আল্লাউদ্দীন শিবিরে ফিরে আসছেন। একদিকে সবুজ জনারের খেত সন্ধ্যার অন্ধকারে কাজলের মতো নীল হয়ে এসেছে, আর একদিকে পাহাড়ের উপর চিতোরের কেল্লা মেঘের মতো দেখা যাচ্ছে, মাঝে শুঁড়ি পথ, সেই পথে প্রথমে শিকারী পাঠানের দল বড়ো বড়ো হরিণ ঘাড়ে গাইতে গাইতে চলেছে, তার পর বড়ো-বড়ো আমীর-ওমরা কেউ হাতির পিঠে, কেউ ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন, সব শেষে বাদশা আল্লাউদ্দীন— এক

হাতে ঘোড়ার লাগাম আর হাতে সোনার জিঞ্জীর-বাঁধা প্রকাণ্ড একটা শিকরে পাখি! বাদশা ভাবতে-ভাবতে চলেছেন— এতদিন হয়ে গেল তবু তো চিতোর দখল হল না; সৈন্যেরা দিল্লী ফেরবার জন্যে ব্যস্ত, আর কতদিন তাদের ভুলিয়ে রাখা যায়? যে পদ্মিনীর জন্যে এত সৈন্য নিয়ে এত কষ্ট সয়ে বিদেশে এলেন, সে পদ্মিনীকে তো একবার চোখেও দেখতে পেলেন না। বাদশা একবার বাঁ-হাতের উপর প্রকাণ্ড শিকরে পাখিটার দিকে চেয়ে দেখলেন। হয়তো তাঁর মনে হচ্ছিল— যদি কোনো রকমে দুখানা ডানা পাই, তবে এই বাজটার মতো চিতোরের মাঝখান থেকে পদ্মিনীকে ছোঁ মেরে নিয়ে আসি! হঠাৎ সন্ধ্যার অন্ধকারে ডানার একটুখানি ঝটাপট সেই ঘুমন্ত শিকরে পাখির কানে পৌঁছল, সে ডানা ঝেড়ে ঘাড় ফুলিয়ে বাদশার হাতে সোজা হয়ে বসল। আল্লাউদ্দীন বুঝলেন, তাঁর শিকারী বাজ, নিশ্চয়ই কোনো শিকারের সন্ধান পেয়েছে। তিনি আকাশে চেয়ে দেখলেন, মাথার উপর দিয়ে দুখানি পান্নার টুক্‌রোর মতো এক-জোড়া শুক-শারী উড়ে চলেছে। বাদশা ঘোড়া থামিয়ে বাজের পা থেকে সোনার জিঞ্জীর খুলে নিলেন; তখন সেই প্রকাণ্ড পাখি বাদশার হাত ছেড়ে নিঃশব্দে অন্ধকার আকাশে উঠে কালো দুখানা ডানা ছড়িয়ে দিয়ে শিকারীদের মাথার উপরে একবার স্থির হয়ে দাঁড়াল, তারপর একেবারে তিনশো গজ আকাশের উপর থেকে, এক টুকরো পাথরের মতো সেই দুটি শুক-শারীর মাঝে এসে পড়ল। বাদশা দেখলেন একটি পাখি ভয়ে চিৎকার করতে-করতে সন্ধ্যার আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর একটি পাখি প্রকাণ্ড সেই বাজের থাবার ভিতর ছটফট করছে। তিনি শিস দিয়ে বাজ পাখিকে ফিরে ডাকলেন, পোষা বাজ শিকার ছেড়ে বাদশার হাতে উড়ে এল; আর ভয়ে মৃতপ্রায় সেই সবুজ শুক ঘুরতে-ঘুরতে মাটিতে পড়ল। বাদশা আনন্দে সেই তোতা-পাখি তুলে নিতে হুকুম দিয়ে শিবিরের দিকে ঘোড়া ছোটালেন! আর সেই তোতাপাখির জোড়া-পাখিটি প্রথমে করুণ সুরে ডাকতে-ডাকতে সেই শিকারীদের সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যার

আকাশ দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে উড়ে চলল! শেষে, ক্রমে-ক্রমে আস্তে-আস্তে, ভয়ে-ভয়ে যে ওমরাহের হাতে একটি খাঁচায় ডানা-ভাঙা তার সঙ্গী তোতা ছটফট করছিল, সেই খাঁচার উপর নির্ভয়ে এসে বসল। ওমরাহ আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেন, 'কী আশ্চর্য সাহস! তোতার বিপদ দেখে তুতী এসে আপনি ধরা দিয়েছে!' আল্লাউদ্দীন তখন পদ্মিনীর কথা ভাবতে-ভাবতে চলেছিলেন; হঠাৎ ওমরাহের মুখে এই কথা শুনে তাঁর মনে হল— যদি ভীমসিংহকে ধরা যায়, তবে হয়তো সেই সঙ্গে রানী পদ্মিনীও ধরা দিতে পারেন।

বাদশা শিবিরে এসে সমস্ত রাত্রি ভীমসিংহকে বন্দী করবার ফন্দি আঁটতে লাগলেন। দু-একদিন পরেই রানার সঙ্গে কথাবার্তা স্থির হল যে আল্লাউদ্দীন সমস্ত পাঠান সৈন্য নিয়ে বিনা-যুদ্ধে দিল্লীতে ফিরে যাবেন, তার বদলে একমাত্র তিনি একখানি আয়নার ভিতরে রাজপুত-রানী পদ্মিনীকে একবার দেখতে পাবেন, আর চিতোরের কেল্লার ভিতর বাদশা যতক্ষণ একা থাকবেন ততক্ষণ তাঁর কোনো বিপদ না ঘটে সেজন্য স্বয়ং মহারানা দায়ী রইলেন। বাদশা চিতোর যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। শিকার যে এত শীঘ্র ফাঁদে পা দেবে, আল্লাউদ্দীন স্বপ্নেও ভাবেননি; তিনি মহা আনন্দে পাঠান-ওমরাহদের নিয়ে সমস্ত পরামর্শ স্থির করলেন! তারপর বৈকালে গোলাপ-জলে স্নান করে, কিংখাবের জামাজোড়া, মোতির কণ্ঠমালা, হীরে-পান্নার শিরপ্যাঁচ পরে শাহেনশা শাদা ঘোড়ার উপর সোনার রেকাবে পা দিয়ে বসলেন— সঙ্গে প্রায় দুশোজন পাঠান-বীর— যারা প্রাণের ভয় রাখে না, যুদ্ধই যাদের ব্যবসা। বাদশা ঘোড়ায় চড়ে একা পাহাড় ভেঙে কেল্লার দিকে উঠে গেলেন; আর সেই পাঠান সওয়ারেরা পাহাড়ের নিচে থেকে প্রথমে নিজের শিবিরে ফিরে গেল, তারপর আবার একে-একে সন্ধ্যার অন্ধকারে কেল্লার কাছে ফিরে এসে পথের ধারে প্রকাণ্ড একটা আমবাগানের তলায় লুকিয়ে রইল।

সূর্যদেব যখন চিতোরের পশ্চিমদিকে প্রকাণ্ড একখানা মেঘের আড়ালে অস্ত গেলেন, সেই সময় পাঠান বাদশা আল্লাউদ্দীন রানা

ভীমসিংহের হাত ধরে পদ্মিনীর মহলে শ্বেতপাথরের রাজদরবারে উপস্থিত হলেন। সেখানে আর জনমানব ছিল না— কেবল হাজার-হাজার মোমবাতির আলো, সেই শ্বেতপাথরের রাজমন্দিরে, যেন আর-একটা নতুন দিনের সৃষ্টি করেছিল। রানা ভীম সেই ঘরে সোনার মছনদে বাদশাকে বসিয়ে তাঁর হাতে এক পেয়ালা সরবৎ দিয়ে বললেন, 'শাহেনশা, একটু আমিল ইচ্ছা করুন।' আল্লাউদ্দীন সেই আমিলের পেয়ালা হাতে ভাবতে লাগলেন— যদি এতে বিষ থাকে, তবে তো সর্বনাশ! রাজপুতের মেয়েরা শুনেছি, শত্রুর হাতে অপমান হবার ভয়ে অনেক সময় এই রকম আমিল খেয়ে প্রাণ দিয়েছে। বাদশা পেয়ালা হাতে ইতস্তত করতে লাগলেন। রানা ভীম আল্লাউদ্দীনের মনের ভাব বুঝে একটু হেসে বললেন, 'শাহেনশা, বিষের ভয় করবেন না। মহারানা স্বয়ং যখন আপনার কোনো বিপদ না ঘটে সে জন্য দায়ী, তখন আজ যদি আপনি সমস্ত চিতোর একা ঘুরে আসেন, তবু একজন রাজপুত আপনার গায়ে হাত তুলতে সাহস পাবে না! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। অতিথিকে আমরা দেবতার মতো মনে করি।' আল্লাউদ্দীন তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'রানা, আমি সে কথা ভাবছিনে। আমি ভাবছিলেম, আজ যেমন নির্ভয়ে আমি তোমার উপর বিশ্বাস করছি, তেমনি তুমিও আমাকে বিশ্বাস করতে পার কি না?' আল্লাউদ্দীন মুখে এই কথা বললেন বটে কিন্তু সেই আমিলের পেয়ালায় চুমুক দিতে তাঁর প্রাণ কাঁপতে লাগল। তিনি অল্পে-অল্পে সমস্ত আমিলটুকু নিঃশেষ করে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। শেষে যখন দেখলেন বিষের জ্বালার বদলে তাঁর শরীর মন বরং আনন্দে প্রফুল্ল হয়ে উঠল, তখন বাদশা ভীম-সিংহের দিকে ফিরে বললেন, 'তবে আর বিলম্ব কেন? এখন একবার সেই আশ্চর্য সুন্দরী পদ্মিনী রানীকে দেখতে পেলেই খুশি হয়ে বিদায় হই।'

তখন রানা ভীম আলিপো দেশের প্রকাণ্ড একখানা আয়নার সম্মুখ থেকে একটা পর্দা সরিয়ে দিলেন। কাকচক্ষু জলের মতো নির্মল

সেই আয়নার ভিতর পদ্মিনীর রূপের ছটা, হাজার-হাজার বাতির আলো যেন আলোময় করে প্রকাশ হল! বাদশা দেখতে লাগলেন সে কী কালো চোখ! সে কী সুটানা ভুরু! পদ্মের মৃণালের মতো কেমন কোমল দুখানি হাত! বাঁকা মল-পরা কী সুন্দর দুখানি রাঙা পা! ধানী রঙের পেশোয়াজে মুক্তোর ফুল, গোলাপী ওড়নায় সোনার পাড়, পান্নার চুড়ি, নীলার আংটি, হীরের চিক্! বাদশা আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন— একি মানুষ না পরী? আল্লাউদ্দীন আর স্থির থাকতে পারলেন না; তিনি মছনদ ছেড়ে সেই প্রকাণ্ড আয়নার ভিতর ছায়া-পদ্মিনীকে ধরবার জন্য দুহাত বাড়িয়ে ছুটে চললেন; গ্রহণের রাত্রে রাহু যেমন চাঁদকে গ্রাস করতে যায়! ভীমসিংহ বলে উঠলেন— 'শাহেনশা, পদ্মিনীকে স্পর্শ করবেন না।' রানার মনে হল, রাজ-দরবারের একদিকে বসে সত্যই তাঁর পুণ্যবতী রানী পদ্মিনী যেন পাঠানের হাতে অপমান হবার ভয়ে কাঁপছে! রাগে রানার দুইচক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে উঠল, তিনি সেই ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উঠে সোনার একটা পেয়ালা সেই আয়নাখানার ঠিক মাঝখানে সজোরে ছুঁড়ে মারলেন— ঝনঝন শব্দে সাত হাত উঁচু চমৎকার সেই আয়না চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ল। আল্লাউদ্দীন চমকে উঠে তিন পা পিছিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি মনে বুঝলেন, পাগলের মতো রানীর দিকে ছুটে যাওয়াটা বড়োই অভদ্রতা হয়েছে, এজন্য রানার কাছে ক্ষমা চাওয়া দরকার।

বাদশা ভীমসিংহের দিকে ফিরে বললেন, 'রানা, আমার অন্যায় হয়েছে, আমার মহলে এসে যদি কেউ এমন অভদ্রতা করত, তাহলে হয়তো আমি তার মাথা কেটে ফেলতে হুকুম দিতুম। আমায় ক্ষমা করুন।' তারপর অনেক তোষামোদ, অনেক অনুনয়-বিনয়ে রানাকে সন্তুষ্ট করে গভীর রাত্রে আল্লাউদ্দীন ভীমসিংহের কাছে বিদায় চাইলেন। পেয়ালার পর পেয়ালা আমিল খেয়ে একেই রানার প্রাণ খুলে গিয়েছিল, তার উপর দিল্লীর বাদশা তাঁর কাছে যখন ক্ষমা চাইলেন, তখন তাঁর মন একেবারে গলে গেল— রানা আদর

করে নতুন বন্ধু দিল্লীর বাদশাহকে কেল্লার বাইরে পৌঁছে দিতে চললেন।

অমাবস্যার রাত্রি, আকাশে শুধু তারার আলো, পৃথিবীতে কালো অন্ধকার ; ঘরে-ঘরে দরজা বন্ধ— সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর নগরের লোক ঘুমিয়ে আছে ; চিতোরের রাজপথে জনমানব নেই, আল্লাউদ্দীন সেই জনশূন্য রাজপথ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন, সঙ্গে রানা ভীম আর কুড়িজন রাজপুত সেপাই।

আজ রানার মনে বড় আনন্দ— চিতোরের প্রধান শত্রু আল্লা-উদ্দীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল, আর কখনো চিতোরকে পাঠানের অত্যাচার সহ্য করতে হবে না। রানা যখন ভাবলেন, কাল সকালে পাঠান-সৈন্য চিতোর ছেড়ে চলে যাবে, যখন ভাবলেন চিতোরের সমস্ত প্রজা কাল থেকে নির্ভয়ে রানা-রানীর জয়-জয়কার দিয়ে, যে যার কাজে লাগবে, তখন তাঁর মন আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। তিনি মহা উল্লাসে বাদশার পাশে-পাশে ঘোড়ায় চড়ে কেল্লার ফটক পার হলেন। তখন রাত্রি আরও অন্ধকার হয়েছে ; পাহাড়ের গায়ে বড়ো-বড়ো নিম-গাছ কালো-কালো দৈত্যের মতো রাস্তার দুই ধারে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। আর কোথাও কোনো শব্দ নেই, কেবল কেল্লার উপর থেকে এক একবার প্রহরীদের হৈ-হৈ আর পাথরের রাস্তায় সেই বাইশটা ঘোড়ার খুরের খটাখট।

আল্লাউদ্দীন ভীমসিংহকে নিয়ে কথায়-কথায় ক্রমে পাহাড়ের নিচে এলেন। সেখানে একদিকে জনারের খেত, আর-একদিকে আমবাগান, মাঝে মেঠো রাস্তা। এই রাস্তার দুইধারে প্রায় দুশো পাঠান আল্লাউদ্দীনের হুকুম মতো লুকিয়েছিল। ভীমসিংহ যেমন এইখানে এলেন অমনি হঠাৎ চারিদিক থেকে পাঠান-সৈন্য তাঁকে ঘিরে ফেলল ; তারপর সেই অন্ধকার রাত্রে শত-শত শত্রুর মাঝে কুড়িজন মাত্র রাজপুত তাদের রানাকে উদ্ধার করবার জন্য প্রাণপণে যুঝতে লাগল! কিন্তু বৃথা! বাজপাখি যেমন ছোঁ-মেরে শিকার নিয়ে যায়, তেমনি পাঠান আল্লাউদ্দীন রাজপুতদের মাঝখান থেকে রানা

ভীমকে বন্দী করে নিয়ে গেলেন। কুড়িজনের মধ্যে পাঁচজন মাত্র রাজপুত চিতোরে ফিরল। প্রতিপদের সকালবেলায় সমস্ত চিতোরে রাষ্ট্র হল— ভীমসিংহ বন্দী হয়েছেন ; পদ্মিনীকে না দিয়ে তাঁর মুক্তি নেই।

আল্লাউদ্দীন যখন শিবিরে পৌঁছলেন, তখন রাত্রি আড়াই প্রহর। তিনি ভীমসিংহকে সাবধানে বন্ধ রাখতে হুকুম দিয়ে নিজের কানাতে বিশ্রাম করতে গেলেন। আজ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, রানা যখন ধরা পড়েছেন, তখন পদ্মিনী আর কোথায় যায়! হিন্দুর মেয়ে স্বামীর জন্যে প্রাণ দিতে পারে, বাদশার বেগম হতে কি রাজী হবে না? পদ্মিনীকে না পেলে রানাকে কিছুতেই ছাড়া হবে না! —আল্লাউদ্দীন মনে-মনে এই প্রতিজ্ঞা করে সোনার খাটিয়ায় দুধের ফেনার মতো ধপধপে বিছানায় শুয়ে হিন্দুরানী পদ্মিনীর কথা ভাবতে-ভাবতে শেষ রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লেন। সকাল হলে বাদশা মনে ভাবলেন, এইবার পদ্মিনী আসছেন। সকাল গিয়ে দুপুর কেটে সন্ধ্যা হল, পদ্মিনী এলেন না। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত চলে গেল, তবু পদ্মিনীর দেখা নেই। বাদশা অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর মনে হতে লাগল এ-ভীমসিংহ কি আসল ভীমসিংহ নয়? আমি কি ভুল করে সামান্য কোনো সর্দারকে বন্দী করে এনেছি? আল্লা-উদ্দীন বন্দী রানাকে হুজুরে হাজির করতে হুকুম দিলেন। লোহার শিকলে বাঁধা রানা ভীম বাঁধা-সিংহের মতো বাদশার দরবারে উপস্থিত হলেন। শাহেনশা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমিই কি পদ্মিনীর ভীমসিংহ?' রানা উত্তর করলেন, 'পাঠান! এতে তোমার সন্দেহ হচ্ছে কেন?' আল্লাউদ্দীন বললেন, 'যদি তুমি সত্যই ভীমসিংহ তবে তোমাকে উদ্ধার করবার জন্য রাজপুতদের কোনোই চেষ্টা দেখছি না যে?' রানা বললেন, 'যে মূর্খ নিজের বুদ্ধির দোষে মিথ্যাবাদী পাঠানের হাতে বন্দী হয়েছে, তার সঙ্গে চিতোরের মহারানা বোধ হয় আর কোনো সম্বন্ধ রাখতে চান না!' কথাটা শুনে বাদশার মনে খটকা লাগল— যদি, সত্যই ভীমসিংহকে পাঠানের

হাতে ছেড়ে দিয়ে থাকেন? আল্লাউদ্দীন মহা ভাবিত হয়ে দরবার ছেড়ে উঠে গেলেন।

সেই দিন শেষ রাত্রে চিতোরের উপরে কেল্লার খোলা ছাদে পদ্মিনী গালে হাত দিয়ে একা দাঁড়িয়ে ছিলেন! নীল পদ্মের মতো তাঁর দুটি সুন্দর চোখ, পাঠান শিবিরের দিকে— যেখানে ভীমসিংহ বন্দী ছিলেন, সেই দিকে চেয়ে ছিল। আকাশ তখনো পরিষ্কার হয়নি, পূর্বদিকে সূর্যের আলো সোনার তারের মতো দেখা দিয়েছে, এমন সময় দুজন রাজপুত-সর্দার পদ্মিনীর পায়ে এসে প্রণাম করলেন। একজনের নাম গোরা, আরেকজনের নাম বাদল। গোরার বয়স পঞ্চাশের উপর, আর তার বড়ো-ভাইয়ের ছেলে বাদলের বয়স বছর বারো। গোরা বাদল দুজনেই পদ্মিনীর বাপের বাড়ির লোক। রাজকুমারী পদ্মিনী যখন ভীমসিংহের রানী হয়ে সিংহল ছেড়ে চলে আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে এই গোরা এক-হাতে তলোয়ার, আর হাতে মা-বাপ-হারা কচি বাদলকে নিয়ে দেশ ছেড়ে চিতোরে এসেছিলেন। পদ্মিনী জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহারানা কি আমার কথা-মতো কাজ করতে রাজী হয়েছেন?' গোরা বললেন, 'তাঁরই হুকুমে রানীজীকে পাঠানশিবিরে পাঠাবার বন্দোবস্ত করার জন্যে এমনি বাদশার সঙ্গে দেখা করতে চলেছি।' পদ্মিনী একটু হেসে বললেন, 'যাও বাদশাকে বোলো, আমার জন্যে যেন দিল্লীতে একটা নতুন মহল বানিয়ে রাখেন।'

গোরা বাদল বিদায় নিলেন। দেখতে-দেখতে সমস্ত পৃথিবী প্রকাশ করে সূর্যদেব উদয় হলেন। পদ্মিনী দেখলেন, আল্লাউদ্দীনের লাল রেশমের প্রকাণ্ড শিবির সকালবেলায় সূর্যের আলোয় ক্রমে-ক্রমে রক্তময় হয়ে উঠল! তিনি বাদশাহের সেই কানাতের দিকে চেয়ে-চেয়ে বলে উঠলেন—'ধূর্ত পাঠান, তোতে-আমাতে আজ যুদ্ধ আরম্ভ হল। দেখি, কার কতদূর ক্ষমতা!'

সেদিন শুক্রবার, মুসলমানদের জুম্মা। আল্লাউদ্দীন ফজিরের নমাজ করে দরবারে বসেছেন, এমন সময় মহারানার চিঠি নিয়ে

গোরা বাদল উপস্থিত হলেন। বাদশা মহারানার মোহর করা চিঠি হাতে নিয়ে পড়তে লাগলেন।' তাতে লেখা রয়েছে—'পদ্মিনীকে বাদশার হাতে দেওয়াই স্থির হল, তার বদলে রানা ভীমসিংহের মুক্তি চাই! আরও, রাজরানী পদ্মিনী সামান্য স্ত্রীলোকের মতো দিল্লীতে যেতে পারেন না, তাঁর প্রিয় সখীরাও যাতে পদ্মিনীর সঙ্গে থেকে চিরদিন তাঁর সেবা করতে পারেন, বাদশাহ যেন সে বন্দোবস্ত করেন ; তাছাড়া চিতোরের রানী পদ্মিনীকে শাহেনশার শিবিরে পৌঁছে দেবার জন্যে যে-সব বড়ো-বড়ো ঘরের রাজপুতনী সঙ্গে যাবেন, তাঁদের যাতে কোনো অসম্মান না হয়, সেজন্য বাদশা তাঁর সমস্ত সৈন্য কেল্লার সামনে থেকে কিছু দূরে সরিয়ে রাখবেন। শেষে মহারানার ইচ্ছা যে, এর পর থেকে আল্লাউদ্দীন আর যেন তাঁর সঙ্গে শত্রুতা না করেন।' চিঠিখানা পড়ে বাদশার মন আনন্দে নৃত্য করতে লাগল ; তিনি হাসিমুখে গোরা বাদলের দিকে ফিরে বললেন, 'বেশ কথা! আমি আজ রাত্রের মধ্যেই সমস্ত ফৌজ কেল্লার সামনে থেকে উঠিয়ে নেব, রানীর আসবার কোনোই বাধা হবে না। তোমরা মহারানাকে জানাওগে তাঁর সকল কথাতেই আমি রাজী হলেম।'

গোরা বাদল বিদায় হলেন। বাদশা, কেল্লার সামনে থেকে সৈন্য উঠিয়ে নিতে হুকুম দিলেন। একদিনের মধ্যে এত সৈন্য অন্য জায়গায় উঠিয়ে নেওয়া সহজ নয়। বাদশা বললেন— তাম্বুকানাত, গোলাগুলি, অস্ত্রশস্ত্র, আসবাব-পত্র যেখানকার সেইখানেই থাক, কেবল সেপাইরা নিজের ঘোড়া নিয়ে একদিনের মতো অন্য কোথাও আশ্রয় নিক। তাতেও প্রায় সমস্ত রাত কেটে গেল।

পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে চিতোরের প্রধান ফটক রাম-পালের উপর কড়কড় শব্দে নাকাড়া বাজতে লাগল। বাদশা দেখলেন, চিতোরের সাতটা ফটক একে-একে পার হয়ে চার-চার বেহারার কাঁধে, প্রায় সাতশো ডুলি তাঁর শিবিরের দিকে আসছে—মাঝে রানী পদ্মিনীর চিনা-পাত-মোড়া সোনার চতুর্দোল, তার

এক-পাশে পঞ্চাশ বৎসরের সর্দার গোরা, আর একপাশে বারো বৎসরের বালক বাদল— দুজনেই ঘোড়ায় চড়ে। পদ্মিনী আর তাঁর সহচরীদের থাকবার জন্যে বাদশা প্রায় আধ ক্রোশ জুড়ে কানাত ফেলেছিলেন। একে-একে যখন সেই সাতশো পাল্‌কি কানাতের ভিতর পৌঁছল, তখন গোরা বাদশার হুজুরে খবর জানালেন, 'শাহেনশা, রানীজী উপস্থিত ; এখন তিনি একবার ভীমসিংহের সঙ্গে দেখা করতে চান— বাদশাহের বেগম হলে আর তো দুজনে দেখা হবে না।' বাদশা বললেন, 'পদ্মিনী যখন রানাকে দেখতে চেয়েছেন, তখন আর কথা কী ! আমি আধঘণ্টা সময় দিলেম, তার বেশি রানা যেন পদ্মিনীর কাছে না থাকেন।' গোরা তথাস্তু বলে বিদায় হলেন।

আল্লাউদ্দীন একলা বসে দেখতে লাগলেন— এক, দুই করে প্রায় সাতশো পাল্‌কি, কানাতের ভিতর থেকে বেরিয়ে, চিতোরের মুখে চলে গেল ; সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বারো বৎসরের বাদল। বাদশা একজন ওমরাহকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ সব পাল্‌কিতে কারা যায় ?' শুনলেন, চিতোর থেকে যে-সকল বড়ো-ঘরের রাজপুতনী রানীকে বিদায় দিতে এসেছিলেন, তারা ফিরে গেলেন। বাদশা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভীমসিংহ কোথায় ?' উত্তর হল, 'অন্দরে আছেন।'

আল্লাউদ্দীন শিবিরের এককোণে বালির ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলেন, আধ ঘণ্টা হয়ে গেছে। এইবার পদ্মিনীর সঙ্গে দেখা হবে। বাদশা সাজগোজ করবার জন্য অন্য এক শিবিরে উঠে গেলেন। সেখানে আতর গোলাপ, হীরে-জহরতের ছড়াছড়ি— কোথাও সোনার আতরদানে হাজার-টাকা ভরি গোলাপী আতর, কোথাও মুক্তোর তাজ, পান্নার শিরপ্যাঁচ, কৌটো-ভরা-মানিকের আংটি, আলনায় সাজানো কিংখাবের জামাজোড়া, রেশমী রুমাল, জরির লপেটা।

বাদশা যতক্ষণ কিংখাবের জামাজোড়া, জরির লপেটা পরে

আয়নার সম্মুখে পাকা দাড়িতে গোলাপী আতর লাগাচ্ছিলেন, ততক্ষণ সেই সাতশো পাল্‌কির একখানিতে রানা ভীমসিংহকে লুকিয়ে মেবারের বাছাবাছা রাজপুত-সর্দারেরা পাঠান-শিবিরের মাঝখান দিয়ে চিতোরের মুখে এগিয়ে চলেছেন।

ক্রমে আল্লাউদ্দীনের সাজগোজ সাঙ্গ হল। আধ-ঘন্টা শেষ হয়ে একঘন্টা পূর্ণ হতে চলল, এখনো পদ্মিনীর শিবির থেকে ভীমসিংহ ফিরে এলেন না! বাদশা গোরাকে ডাকতে হুকুম দিলেন; গোরার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না! আল্লাউদ্দীন আর স্থির থাকতে পারলেন না, ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে যেখানে আধক্রোশ জুড়ে কানাত খাটানো হয়েছিল, সেইখানে উপস্থিত হলেন; দেখলেন পদ্মিনীর সোনার চতুর্দোল শূন্য পড়ে আছে। যে লাল মখমলের প্রকাণ্ড শিবিরে তিনি চিতোরের রানী পদ্মিনীকে মানিকের খাঁচায় সোনার পাখিটির মতো পুষে রাখবেন ভেবেছিলেন, সে শিবির অন্ধকার! কোথায় পদ্মিনী কোথায় তাঁর একশো সখী, আর কোথায় বা বন্দী ভীমসিংহ; পাঠান-শিবিরে হুলস্থুল পড়ে গেল! সকলেই শুনলে পাল্‌কি-বেহারা সেজে রাজপুতেরা বন্দী রানাকে ফাঁকি দিয়ে নিয়ে গেল।

বাদশা তখনি সমস্ত সৈন্য জড়ো করতে হুকুম দিয়ে দুহাজার ঘোড়-সওয়ার সঙ্গে চিতোরের মুখে বেরিয়ে গেলেন।

সবেমাত্র রানার পাল্‌কি চিতোরের ফটক পার হয়েছে, এমন সময় পাঠান বাদশার ঘোড়-সওয়ার কালবৈশাখীর ঝড়ের মতন ধূলিধ্বজায় চারিদিক অন্ধকার করে দীন্-দীন্-শব্দে রাজপুত সৈন্যের উপর পড়ল।

তখন বেলা দুই প্রহর। আগুনের সমান তপ্ত রৌদ্রে বারো বৎসরের বালক বাদল আর পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধ গোরা, একদল রাজপুতকে নিয়ে প্রাণপণে চিতোরের সিংহদ্বার রক্ষা করতে লাগলেন। সন্ধ্যা হয়ে এল, তবু যুদ্ধের শেষ হল না। চিতোর থেকে দলের পর দল রাজপুত এসে যুদ্ধে যোগ দিতে লাগল; বাদশা

হাজারের পর হাজার পাঠান এনেও চিতোরের একখানা পাথর পর্যন্ত দখল করতে পারলেন না! শেষে, যে ভীমসিংহকে তিনি কাল রাত্রে লোহার শৃঙ্খলে বন্ধ রেখেছিলেন, সেই ভীমসিংহ যখন হাতির পিঠে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন, তখন পাঠান বাদশার আশা-ভরসা নির্মূল হল। সন্ধ্যার অন্ধকারে অর্ধেক-ভারতবর্ষের সম্রাট আল্লাউদ্দীন চিতোরের সম্মুখ থেকে ঘোড়া ফিরিয়ে শিবিরে গেলেন। জয়! জয়! রবে চিতোর নগর পরিপূর্ণ হল!

সেইদিন গভীর রাত্রে যুদ্ধ-শেষে রানা ভীমসিংহ যখন পদ্মিনীর শয়ন-কক্ষে বিশ্রাম করতে এলেন, তখন রানার দুই চক্ষে জল দেখে পদ্মিনী জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ সুখের দিনে চক্ষে জল কেন?' রানা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'পদ্মিনী, আজ আমার পরম উপকারী চিরবিশ্বাসী গোরা চিরদিনের মতো যুদ্ধের খেলা সাঙ্গ করে, দেবলোকে চলে গেছে।' দুজনে আর একটিও কথা হল না! রানী পদ্মিনী শয়ন-ঘরের প্রদীপ অন্ধকার করে দিলেন; দক্ষিণের হাওয়ায় সারারাত্রি চিতোরের মহাশ্মশানের দিক থেকে যেন একটা হায়-হায়-হায়-হায় শব্দ সেই ঘরের ভিতর ভেসে আসতে লাগল।

আল্লাউদ্দীন যখন পদ্মিনীর আশায় চিতোর ঘিরে বসেছিলেন, সেই সময় কাবুল থেকে মোগলের দল একটু-একটু করে ক্রমেই ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে আসছিল! রাজপুতের কাছে হার মেনে বাদশা নিজের শিবিরে এসে শুনলেন— মোগল বাদশা তৈমুরলং দিল্লী আক্রমণ করতে আসছেন। সেই সঙ্গে দিল্লী থেকে পিয়ারী বেগমের এক পত্র পেলেন; তার এক-জায়গায় বেগম লিখেছিলেন, 'শাহেনশা, আর কেন? পদ্মিনীর আশা পরিত্যাগ করুন। হে মধুকর, তুমি পদ্মের সন্ধানে মরুভূমির মাঝে ফিরতে লাগলে, আর বনের ভাল্লুক এসে তোমার সাধের মৌচাক লুটে গেল? সকলি আল্লার ইচ্ছে! আজ অর্ধেক ভারতবর্ষের রাজা, কাল হয়তো পথের ভিখারী! হায় রে হায়, দিল্লীর পিয়ারী বেগমকে এতদিনে বুঝি মোগল-দস্যুর বাঁদী হতে হল!' বাদশা পিয়ারীর চিঠি পড়ে স্তম্ভিত

হলেন। বিপদ যে এত গুরুতর, তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। আল্লাউদ্দীন তৎক্ষণাৎ শিবির উঠাতে হুকুম দিলেন। সেই রাত্রে পাঠান-ফৌজ রাজস্থান ছেড়ে কাশ্মীরের মুখে চলে গেল।

তেরো বৎসর পরে, চিতোরের সম্মুখে পাঠান-বাদশার রণডঙ্কা, আর একবার বেজে উঠল। তখন চিতোরের বড় দুরবস্থা। সমস্ত দেশ দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে উজাড় হয়ে যাচ্ছে— দেশ প্রায় বীরশূন্য ; নতুন নতুন লোকের হাতে যুদ্ধের ভার। রানা ভীমসিংহ সেই সব নতুন সৈন্য নতুন সেনাপতি নিয়ে গ্রামে-গ্রামে পথে-পথে, পাঠান সৈন্যকে বাধা দিতে লাগলেন ; কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল।

যুদ্ধের পর যুদ্ধে রাজপুতদের হটিয়ে দিয়ে, গ্রামের পর গ্রাম, কেল্লার পর কেল্লা দখল করতে-করতে একদিন আল্লাউদ্দীন চিতোরের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন। বাদশাহী ফৌজ চিতোরের দক্ষিণে পাহাড়ের উপর গড়বন্দী তাঁবু সাজিয়ে, রাজপুতের সঙ্গে, শেষ-যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। এবার প্রতিজ্ঞা, চিতোরের কেল্লা ভূমিসাৎ না করে দিল্লী ফেরা নয়।

মলিন মুখে রানা ভীমসিংহ চিতোর-গড়ে ফিরে এলেন। মহারানা লক্ষ্মণসিংহ রাজসভায় ভীমসিংহকে ডেকে বললেন, 'কাকাজি, এত দিনে বুঝি চিতোরগড় পাঠানের হস্তগত হয়, আর উপায় নেই! প্রজাসকল হাহাকার করছে, সমস্ত দেশ দুর্ভিক্ষে উজাড় হয়ে যাচ্ছে, তার উপর এই বিপদ উপস্থিত। এখন কী নিয়ে, কাকে নিয়েই বা লড়াই করি?' ভীমসিংহ বললেন, 'চিতোর এখনো বীরশূন্য হয়নি, এখনো আমরা একবৎসর পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধ চালাতে পারি, এমন ক্ষমতা রাখি!' লক্ষ্মণসিংহ ঘাড় নাড়লেন, 'কাকাজি, আর যুদ্ধ বৃথা! আমি বেশ বুঝতে পারছি, পাঠানের সঙ্গে সন্ধি না করলে আর রক্ষা নেই ; তবে কেন এই দুর্ভিক্ষের দিনে সমস্ত দেশ-জুড়ে যুদ্ধের আগুন জ্বালাই? সমস্ত প্রজা আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে! আমার ক্ষতিতে রাজ্যে যদি শান্তি আসে, যদি আগুন নিভে যায়, তবে পাঠানের সঙ্গে সন্ধি করায় ক্ষতি কী?

না-হয় কিছুকাল পাঠান বাদশার একজন তালুকদার হয়েই কাটালেম।'

ভীমসিংহের দুই চক্ষে জল পড়তে লাগল; তিনি মহারানার দুটি হাত ধরে বললেন, 'হায় লছমন, মনে বেশ বুঝেছি আর উপায় নেই, তবু আমার একটি অনুরোধ আছে। দুই বৎসর বয়সে যখন তোর মা গেলেন বাপ গেলেন, তখন আমিই তোকে ছেলের মতো বুকে টেনে নিয়েছিলেম; সমস্ত বিপদ-আপদ, রাজ্যের সমস্ত ভাবনা-চিন্তা তোরই হয়ে অকাতরে সহ্য করেছিলেম। আজ আমার একটি অনুরোধ রক্ষা কর বৎস। সাতদিন সময় দে! আমি এই শেষবার চিতোর উদ্ধারের চেষ্টা দেখি! এই সাতদিন যেন পাঠানের সঙ্গে সন্ধি না হয়, এই সাতদিনে যেন আমার হুকুম মহারানার হুকুম জেনে সকলে মান্য করে।'

লক্ষ্মণসিংহ বললেন, 'তথাস্তু।'

সেই দিন থেকে ভীমসিংহের হুকুমমতো এক-একজন রাজপুত সর্দার পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে লাগলেন।

প্রতিদিন খবর আসতে লাগল— আজ অমুক রাজকুমার যুদ্ধে প্রাণ দিলেন, আজ অমুক সামন্ত বন্দী হলেন— চিতোরের ঘরে-ঘরে হাহাকার উঠল! সেই হাহাকার, সেই হাজার-হাজার অনাথ শিশু আর বিধবার ক্রন্দন, পদ্মসরোবরের মাঝখানে, যেখানে রাজরানী পদ্মিনী শ্বেতপাথরের দেবমন্দিরে পূজায় বসেছিলেন, সেইখানে পৌঁছল! পদ্মিনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পূজা সাঙ্গ করলেন। তাঁর কোমল প্রাণ সেই সব দুঃখী পরিবার অনাথ শিশুর জন্যে সারা দিন, সারা সন্ধ্যা কেবলই কাঁদতে লাগল।

ভীমসিংহ যখন মহলে এলেন তখন পদ্মিনী দুই হাত জোড় করে বললেন, 'প্রভু, আর কতদিন যুদ্ধ চলবে?' ভীমসিংহ বললেন, 'তিন দিন মাত্র। কিন্তু যুদ্ধে আর কোনো ফল নেই, রাজপুতের প্রাণে সে উৎসাহ আর নেই। এখন উপায় কী? সূর্যবংশের মহারানাকে এইবার বুঝি পাঠান-বাদশার তালুকদার হতে হল!'

পদ্মিনী জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রভু, চিতোর রক্ষার কি কোনোই উপায় নেই?' ভীমসিংহ বললেন, 'উবরদেবী যদি কৃপা করেন, তবেই রক্ষে। হায় পদ্মিনী, কার পাপে চিতোরের এ দুর্দশা হল।' তারপর দু-একটি কথার পর ভীমসিংহ অন্য কাজে চলে গেলেন।

একা ঘরে পদ্মিনীর কানে কেবলই বাজতে লাগল— হায় পদ্মিনী, কার পাপে আজ চিতোরের এ দুর্দশা! অন্ধকারে পদ্মিনী কপালে করাঘাত করে উঠলেন; 'হায় হতভাগিনী পদ্মিনী, তোরই এ পোড়া-রূপের জন্যে এ সর্বনাশ— তোরই জন্যে এ সর্বনাশ।'

নিঃশব্দ ঘরে প্রতিধ্বনিত হল— 'তোরই জন্যে এ সর্বনাশ!'

ঠিক সেই সময় চৈত্র মাসের পরিষ্কার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে বড়ো-বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। পদ্মিনী একটা মোটা চাদরে সর্বাঙ্গ ঢেকে নিজের মহল থেকে চিতোরেশ্বরী উবরদেবীর মন্দিরে একা চলে গেলেন।

রাত্রি দুই প্রহর, উবরদেবীর মন্দিরে সমস্ত আলো নিভে গেছে, কেবল একটিমাত্র প্রদীপের আলো! সেই আলোয় বসে দেবীর ভৈরবী, রাজরানী পদ্মিনীকে বললেন, 'মহারানী, আমি আবার বলি, তুমি যে কাজ করতে যাচ্ছ, তার শেষ হচ্ছে মৃত্যু! দেবীর রত্ন-অলংকার একবার অঙ্গে পরলে আর নিস্তার নেই! ছয় মাসের মধ্যে জীবন্ত অবস্থায় জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধ হতে হবে!' পদ্মিনী বললেন, 'হে মাতাজী, আশীর্বাদ করুন, যে রূপসীর জন্যে রাজস্থানে আজ এ আগুন জ্বলেছে, তার সেই পোড়া-রূপ জ্বলন্ত আগুনেই ভস্ম হোক।' ভৈরবী বললেন, 'তবে তাই হোক বৎসে, আমি আশীর্বাদ করি, যে চিতোরের জন্যে তুমি নিজের প্রাণ তুচ্ছ করলে, সেই চিতোরে তোমার নাম চিরদিন যেন অমর থাকে; যে মহাসতীর রত্ন-অলংকার আজ তুমি পরতে চললে, সেই মহাসতী মরণান্তে তোমায় যেন চরণে রাখেন।' রানী পদ্মিনী ভৈরবীর হাত থেকে একটি চন্দন কাঠের কৌটায় উবরদেবীর সমস্ত রত্ন-অলংকার নিয়ে বিদায় হলেন।

সেইদিন রাত্রে প্রায় আড়াই প্রহরে চিতোরের রাজপ্রাসাদে একটুখানি সাড়াশব্দ ছিল না— মহারানা নির্জন ঘরে একা ছিলেন। যখন তাঁর সমস্ত প্রজা, পাঠানের সঙ্গে সন্ধি হবে, দেশে শান্তি আসবে মনে করে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে ছিল, সেই সময়ে সমস্ত মেবারের রাজা, ভগবান একলিঙ্গের দেওয়ান মহারানা লক্ষ্মণসিংহের চোখে ঘুম ছিল না। হায় অদৃষ্ট! কাল সন্ধির সঙ্গে-সঙ্গে চিতোর ছেড়ে যেতে হবে, এ জীবনে আর হয়তো ফেরা হবে না! রাজ্য, সম্পদ, মান, মর্যাদা, আত্মীয়স্বজন সব ছেড়ে কোন দূরদেশে সামান্য বেশে নির্বাসনে যেতে হবে। মহারানা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন— ঘরের এককোণে সোনার দীপদানে একটি মাত্র প্রদীপ জ্বলছিল, প্রকাণ্ড ঘরের আর সমস্তটা অন্ধকার। খিলানের পর খিলান, থামের পর থামের সারি অন্ধকার থেকে গাঢ় অন্ধকারে মিশে গেছে— একটিমাত্র প্রদীপের আলোয় নিঃশব্দ সেই প্রকাণ্ড ঘর আরো যেন অন্ধকার বোধ হতে লাগল। মহারানা অন্তঃপুরে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন।

হঠাৎ পায়ের তলায় মেঝের পাথরগুলো একবার যেন কেঁপে উঠল; তারপর মহারানা অনেকখানি ফুলের গন্ধ আর অনেক নূপুরের ঝিন-ঝিন শব্দ পেলেন। কারা যেন অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে! মহারানা বলে উঠলেন, 'কে তোরা? কী চাস?' চারিদিকে— দেওয়ালের ভিতর থেকে, ছাদের উপর থেকে, পায়ের নিচে থেকে শব্দ উঠল— 'ম্যয় ভুখা হুঁ!' লক্ষ্মণসিংহ বললেন, 'আঃ, এতরাত্রে চিতোরের রাজপ্রাসাদে উপবাসে কে জাগে?' আবার শব্দ উঠল — 'ম্যয় ভুখা হুঁ!' তারপর, গাঢ় ঘুমের মাঝখানে স্বপ্ন যেমন ফুটে ওঠে তেমনই সেই শয়নঘরের অন্ধকারে এক অপরূপ দেবীমূর্তি ধীরে ধীরে উঠল! মহারানা বলে উঠলেন, 'কে তুমি, দেবতা না দানব, আমায় ছলনা করছ?' লক্ষ্মণসিংহ দীপদান থেকে সোনার প্রদীপ উঠিয়ে ধরলেন। প্রদীপের আলো দেবীর কিরীটকুণ্ডলে, রত্ন-অলংকারে, অসংখ্য-অসংখ্য মণিমাণিক্যে

হাজার-হাজার আগুনের শিখার মতো দপ-দপ করে জ্বলতে লাগল। লক্ষ্মণসিংহ দেখলেন— চিতোরেশ্বরী উবরদেবী!

ভয়-ভক্তি বিস্ময়ে মহারানার সর্বশরীর অবশ হয়ে এল— পরমানন্দে দুর্বল তাঁর হাত থেকে সোনার প্রদীপ খসে পড়ল। তারপর, সব অন্ধকার! সেই অন্ধকারে মহারানা স্বপ্ন দেখছেন, কি জেগে আছেন, বুঝতে পারলেন না! তিনি যেন শুনতে লাগলেন, দেবী বলছেন— 'ম্যয় ভুখা হুঁ!— বড়ো ক্ষুধা, বড়ো পিপাসা, আমি মহাবলি চাই— রক্ত না হলে এ পিপাসার শান্তি নেই! মহারানা! ওঠো, জাগো, দেশের জন্য বুকের রক্তপাত করো— আমার খর্পর রক্তের শতধারায় পরিপূর্ণ করো! রাজা-প্রজা বালক-বৃদ্ধ যদি চিতোরের জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করে, তবেই কল্যাণ! না হলে, সূর্যবংশের রাজপরিবার আর কখনো চিতোরের সিংহাসন পাঠানের হাত থেকে ফিরে পাবে না!'

পর্বতে গুহায় প্রতিধ্বনি যেমন ঘুরতে থাকে, তেমনই সেই প্রকাণ্ড ঘরে দেবীর শেষ কথা অনেকক্ষণ ধরে গম গম করতে লাগল!

রাত্রি শেষ হয়ে গেল! উষাকালে সোনার আলো আর শীতল বাতাসের মাঝখানে চিতোরেশ্বরী কোথায় অন্তর্ধান করলেন! অনেকদূরে পার্বতীমন্দিরে নহবতের সুরে ভৈরবী-রাগিণীতে মহাদেবীর স্তুতি-গান বাজতে লাগল।

প্রত্যুষে রাজদরবারে মহারানা লক্ষ্মণসিংহ যখন রাত্রের ঘটনা আর দেবীর আদেশ সকলের সম্মুখে প্রকাশ করলেন, তখন সকলে বিস্মিত হল বটে, কিন্তু অনেকেই সে-কথা বিশ্বাস করলে না। যাদের হৃদয়ে বিশ্বাস অটল, ভক্তি অচলা ছিল, যারা চিতোরের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তারা উৎসাহে উন্মত্ত হয়ে উঠল। আর যাদের প্রাণ নিরুৎসাহ, মন দুর্বল, যারা পাঠানের সঙ্গে সন্ধি হলে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাবে ভেবেছিল তারা ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল! কিন্তু সেই রাত্রে মহারানার আদেশে মেবারের ছোটো-বড়ো সামন্তসর্দারেরা

যখন দেবীর নিজের মুখের আদেশ শোনার জন্য অন্তঃপুরে সেই ঘরে একত্র হলেন, যখন দ্বিপ্রহরের স্তব্ধ রাজপুরে হাজার-হাজার রাজপুত বীরের চোখের সম্মুখে আবার সেই দেবীমূর্তি 'ম্যয় ভুখা হুঁ !' বলে প্রকাশ হলেন, তখন আর কারো মনে কোনো সন্দেহ রইল না— সকলের মন থেকে সমস্ত অবিশ্বাস, সকল দুর্বলতা নিমেষের মধ্যে দূর হল— আগুনের তেজে অন্ধকার যেমন দূর হয়ে যায়! সকলেই বীরত্বের নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠল ; কেবল রানা ভীমসিংহ যেন সেই দেবীমূর্তির ভিতরে পদ্মিনীকে দেখে মনে-মনে তোলা-পাড়া করতে লাগলেন— একি দেবী, না পদ্মিনী ? পদ্মিনী, না দেবী ?

তারপর, মহাবলির উদ্‌যোগ হল। মহারানা লক্ষ্মণসিংহ তাঁর বারোটি রাজপুত্রের মধ্যে সর্বপ্রধান, সবচেয়ে বড়ো রাজকুমার, যুবরাজ অরিসিংহের মাথায় চিতোরের রাজমুকুট দিয়ে বললেন, 'হে ভাগ্যবান, দেবীর আদেশ শিরোধার্য করো। পাঠান-যুদ্ধে অগ্রসর হও! আজ তুমি সমস্ত মেবারের মহারানা। এই সমস্ত সামন্ত-সর্দার তোমারই প্রজা বলে জানবে। আজ থেকে তোমারই হাতে যুদ্ধের ভার ; জয় হলে তোমার পুরস্কার— ইহলোকে চিতোরের রাজসিংহাসন ; আর যুদ্ধে প্রাণ গেলে তার ফল— পরলোকে মহাদেবীর অভয় চরণ।' বৃদ্ধ রানা লক্ষ্মণসিংহ অরিসিংহকে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে নিচে দাঁড়ালেন— নতুন রানার মাথায় চিতোরের কিরীট শোভা পেতে লাগল। চারিদিকে রব উঠল— 'জয় মহাদেবীর জয়!' 'জয় অরিসিংহের জয়!' লক্ষ্মণসিংহ বলতে লাগলেন, 'সর্দারগণ, আমার আর একটি শেষ কর্তব্য আছে। সে কর্তব্য দেবীর কাছে নয়, চিতোরের কাছে নয় ; আমার পিতা-পিতামহ স্বর্গীয় মহারানাদের কাছে। এই মহাসমরে মেবারের রাজবংশ একেবারে নির্মূল না হয়, পরলোকে পিতৃ-পুরুষেরা যাতে জল গণ্ডূষ পান, রাজস্থানে বাপ্পার বংশ যুগে-যুগে যাতে অমর থাকে, সেই জন্যে আমার ইচ্ছা, অজয়সিংহ নিজের স্ত্রী-পুত্র নিয়ে কৈলোরের নির্জন দুর্গে চলে যান।'

অজয়সিংহ মহারানার সম্মুখে জোড় হাত করে বললেন, 'পিতা,

আমার এগারো ভাই চিতোরের জন্যে যুদ্ধে প্রাণ দেবে, আর আমি কিনা স্ত্রীলোকের মতো শিশু-সন্তান মানুষ করবার জন্যে বসে থাকব? আমি কি এতই দুর্বল, এমনি অক্ষম?' লক্ষ্মণসিংহ বললেন, 'বৎস হতাশ হয়ো না, যে মহৎ কাজের ভার তোমায় দিলেম, চিতোরের যে-কোনো রাজপুত সে-ভার পেলে নিজেকে ধন্য বোধ করত! হয়তো আমাদের রক্তপাতে চিতোর উদ্ধার হবে না, হয়তো তোমাকেও চিতোরের জন্যে প্রাণ পণ করতে হবে। আমরা হয়তো চিতোরকে পরাধীন রেখে চলে যাব, আর হয়তো তুমি সূর্যবংশের উপযুক্ত কোনো বীরপুরুষের হাতে রাজ্যভার দিয়ে পরম সুখে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারবে! মনে রেখো, চিতোরের জন্যে প্রাণ দেবার যে সুখ চিতোর পুনরুদ্ধারের সুখ তার শতগুণ!' লক্ষ্মণসিংহ নীরব হলেন। জয় জয় শব্দে রাজসভা ভঙ্গ হল।

রাজসভা থেকে বিদায় নেবার সময় অরিসিংহ অজয়সিংহকে বলে গেলেন 'চিতোর ছেড়ে যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে যেয়ো।' যাত্রার সমস্ত আয়োজন শেষ করে অজয়সিংহ যখন বড়ো ভাইয়ের ঘরে গেলেন, তখন অরিসিংহ একখানি চিঠি শেষ করে ছোটো-ভাইয়ের দিকে ফিরে বললেন, 'ভাই, আজ আমাদের শেষ দেখা; কাল তুমি একদিকে, আমি একদিকে! এই শেষ-দিনে তোমায় একটি কাজের ভার দিচ্ছি।' অরিসিংহ চামড়ায়-মোড়া একটি ছোটো থলি আর সেই চিঠিখানি অজয়সিংহের হাতে দিয়ে বললেন, 'অজয়, এ দুটি যত্ন করে রেখো, যদি আমি যুদ্ধ থেকে ফিরে আসি, তবে আবার চেয়ে নেব; নয় তো তুমি খুলে দেখো আমার শেষ ইচ্ছা কী।' তারপর অজয়সিংহকে আলিঙ্গন করে অরিসিংহ বললেন, 'চল ভাই, মায়ের কাছে বিদায় হই!' সেইদিন শেষ-রাত্রে যখন রাজ-অন্তঃপুর থেকে দুই রাজপুত্র দুইদিকে বিদায় হয়ে গেলেন, তখন বারো ছেলের মা-জননী চিতোরের মহারানী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাটির উপর লুটিয়ে পড়লেন— তাঁর সমস্ত শরীর পাষাণের মতো স্থির হয়ে গেল, কেবল সজল দুটি কাতর চোখ সেইদিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল— যেদিক দিয়ে

দুটি রাজকুমার চলে গেলেন। মহারানা বলতে লাগলেন, 'প্রিয়ে, স্থির হও, ধৈর্য ধরো, বুক বাঁধো, মহাকালের কঠোর বিধান নতশিরে শান্ত-মনে বহন করো।' তারপর রণরণ শব্দে রাজপুতের রণডঙ্কা দিগদিগন্ত কাঁপিয়ে বাজতে লাগল— যুবরাজ অরিসিংহ যুদ্ধযাত্রা করলেন!

সেইদিন থেকে একমাস কেটে গেল। পাঠানের বিরুদ্ধে রাজপুতদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল! একের পর এক, এগারোজন রাজকুমার যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। আর আশা নেই, আর উপায় নেই! কিন্তু তবু রাজপুতের বীর-হৃদয় এখনো অটল রইল!

চিতোরের শেষ দুই বীর, লক্ষ্মণসিংহ আর ভীমসিংহ, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। রানার হুকুমে মেবারের লক্ষ-লক্ষ সৈন্যসামন্তের অবশেষ— ভীষণমূর্তি ভগবান একলিঙ্গের দশ-হাজার দেওয়ানী-ফৌজ একত্র হতে লাগল। তাদের একহাতে শূল, একহাতে কুঠার, দুই কানে শাঁখের কুণ্ডল, মাথায় কালো ঝুঁটি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, গায়ে বাঘছালের অঙ্গরাখা, পিঠে একটা করে প্রকাণ্ড ঢাল। তাদের আসবাবের মধ্যে এক ঘোড়া, এক কম্বল, এক লোটা— পৃথিবীতে আপনার বলবার আর কিছুই ছিল না। তারা দেবতার মধ্যে একমাত্র একলিঙ্গজীর উপাসনা করত, মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র মহারানার হুকুম মানত। সমরসিংহ এই ফৌজের সৃষ্টিকর্তা। ছোটো-খাট যুদ্ধে এদের কেউ দেখতে পেত না; কেবল মাঝে-মাঝে ঘোর দুর্দিনে, যখন চারিদিকে শত্রু, চারিদিকে বিপদ ঘনিয়ে আসত, যখন বিধর্মীর হাতে অপমান হবার ভয়ে দেশের যত সুন্দরী— কী কুমারী, কী বিধবা, কী দশ বছরের কচিমেয়ে, কী ষোলো বছরের পূর্ণ যুবতী — চিতার আগুনে রূপযৌবন ছাই করে দিয়ে, চিতোরেশ্বরীর সম্মুখে জীবনের শেষ ব্রত জহর-ব্রত উদ্‌যাপন করত, যখন আর কোনো আশা, কোনো উপায় নেই, সেই সময়, হতাশ রাজপুতের শেষ-উৎসাহের মতো দুর্ধর্ষ, দুর্দান্ত এই দেওয়ানী ফৌজ চিতোরের কেল্লায় দেখা দিত! সত্তর বৎসর পূর্বে সমরসিংহের বিধবা রানী কর্মদেবী

একদিন কুতুবুদ্দীনের হাত থেকে ছেলের রাজ-সিংহাসন রক্ষা করবার জন্যে মেবারের সমস্ত সৈন্য একত্র করেছিলেন ; সেইদিন একবার দেওয়ানী ফৌজের ডাক পড়েছিল, আর আজ কয় পুরুষ পরে মহারানা লক্ষ্মণসিংহের হুকুমে দেওয়ানী-ফৌজ আর একবার চিতোরের কেল্লায় উপস্থিত হল।

কালরাত্রি, তিথি অমাবস্যা যখন জগৎ-সংসার গ্রাস করেছিল, মাথার উপর থেকে চন্দ্রসূর্য যখন লুপ্ত হয়েছিল, সেই সময় চিতোরের মহাশ্মশানের মধ্যস্থলে চিতোরেশ্বরীর মন্দিরে বারো-হাজার রাজপুত সুন্দরীর জহর-ব্রত আরম্ভ হল।

মন্দিরের ঠিক সম্মুখে অন্ধকার একটা সুড়ঙ্গের উপর দাঁড়িয়ে রাজস্থানের প্রথম-সুন্দরী রানী পদ্মিনী অগ্নিদেবের স্তব আরম্ভ করলেন, 'হে অগ্নি, হে পবিত্র উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তি, এসো! পৃথিবীর অন্ধকার তোমার আলোয় দূরে যাক। হে অগ্নি, হে মহাতেজ, এসো! তুমি দুর্বলের বল, সবলের সহায়। হে দেবতা, হে ভয়ংকর, আমাদের ভয় দূর করো, সন্তাপ নাশ করো, আশ্রয় দাও। লজ্জা নিবারণ, দুঃখ বিনাশন, বহ্নিশিখা, তুমি জীবনের শেষ গতি, বন্ধনের মহামুক্তি!' পদ্মিনী নীরব হলেন। বারো-হাজার রাজপুতের মেয়ে সেই অগ্নি-কুণ্ডের চারিদিকে ঘুরে-ঘুরে গাইতে লাগল— 'লাজহরণ! তাপবারণ!' হঠাৎ একসময় মহা কল্লোলে চারিদিক পরিপূর্ণ করে হাজার-হাজার আগুনের শিখা মহা আনন্দে সেই সুড়ঙ্গের মুখে ছুটে এল। প্রচণ্ড আলোয় রাত্রির অন্ধকার টলমল করে উঠল। বারো-হাজার রাজপুতনীর সঙ্গে রানী পদ্মিনী অগ্নি-কুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন— চিতোরের সমস্ত ঘরের সমস্ত সোনামুখ, মিষ্টি কথা আর মধুর হাসি নিয়ে এক-নিমেষে চিতার আগুনে ছাই হয়ে গেল! সমস্ত রাজপুতের বুকের ভিতর হতে চিৎকার উঠল— 'জয় মহাসতীর জয়!' আল্লাউদ্দীন নিজের শিবিরে শুয়ে চিৎকার শুনতে পেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত সৈন্য প্রস্তুত রাখতে হুকুম পাঠালেন।

পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে চিতোরের পাহাড় বেয়ে বর্ষাকালের

স্রোতের মতো রাজপুত-সেনা হর-হর শব্দে দিগদিগন্ত কাঁপিয়ে ভয়ংকর তেজে পাঠান সৈন্যের উপর এসে পড়ল।

আল্লাউদ্দীনের তাতার সৈন্য দেওয়ানী-ফৌজের কুঠারের মুখে নিমেষের মধ্যে ছিন্নভিন্ন, ছারখার হয়ে পলায়ন করলে। আল্লাউদ্দীন নতুন-নতুন সৈন্য এনে বারংবার রাজপুতদের বাধা দিতে লাগলেন— স্রোতের মুখে বালির বাঁধের মতো তাঁর সমস্ত চেষ্টা প্রতিবার বিফল হল।

আল্লাউদ্দীন নিজে একজন সামান্য বীরপুরুষ ছিলেন না; এর চেয়ে ঢের কম সৈন্য নিয়ে তিনি মেবারের চেয়ে অনেক বড়ো বড়ো হিন্দু রাজত্ব অনায়াসে জয় করেছেন, কিন্তু আজ যুদ্ধে রাজপুতের বীরত্ব দেখে তাঁকে ভয় পেতে হল। বারো বার তিনি সৈন্য সাজিয়ে রাজপুতদের বাধা দিলেন, বারো বার তাঁকে হটে আসতে হল; আল্লাউদ্দীন বেশ বুঝলেন আজ যুদ্ধের সহজে শেষ নেই। একদিকে দিল্লীর বাদশাহীর তক্ত, আর একদিকে চিতোরের রাজসিংহাসন— কোনটা থাকে কোনটা যায়! তখন বেলা তৃতীয় প্রহর, আল্লাউদ্দীন নিজের সমস্ত ফৌজ একেবারে একসময়ে সেই বারো হাজার রাজপুতের দিকে চালাতে হুকুম দিলেন। নিমেষের মধ্যে পাঠান বাদশার লক্ষ-লক্ষ হাতি-ঘোড়া সেপাই-শান্ত্রী প্রলয়-ঝড়ের মতো ধূলায়-ধূলায় চারিদিক অন্ধকার করে দীন্-দীন্ শব্দে রাজপুতের দিকে ছুটে আসতে লাগল। তারপর হঠাৎ একসময়, সমুদ্রের তরঙ্গে নদীর জল যেমন, তেমনি সেই অগণিত পাঠান সৈন্যের মাঝে কয়েক হাজার রাজপুত কোনখানে লুপ্ত হল, কিছু আর দেখা গেল না। কেবল সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে সেই যুদ্ধরত অসংখ্য সৈন্যের মাথার উপরে সূর্যমূর্তিলেখা চিতোরের রাজপতাকা একবার মাত্র সন্ধ্যার আলোয় বিদ্যুতের মতো চমকে উঠল, তারপরেই শব্দ উঠল — 'আল্লা হো আকবর, শাহেনশা কি ফতে!' পাঠানের পায়ের তলায় মহারানার রাজচ্ছত্র চূর্ণ হয়ে গেল! সূর্যদেব সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার করে অস্ত গেলেন; রক্তমাংসের লোভে রণস্থলের

উপর দলে-দলে নিশাচর পাখি কালো ডানা মেলো উড়ে বেড়াতে লাগল !

চিতোর হস্তগত হল।

পাঠানের তলোয়ার চিতোরের পথঘাট রক্তের স্রোতে রাঙা করে তুললে ; ধনধান্যে, মণিমুক্তায়, লক্ষ-লক্ষ তাতার ফৌজের বড়ো-বড়ো সিন্দুক পরিপূর্ণ হল! কিন্তু যে-রত্নের লোভে আল্লাউদ্দীন আজ অমরাবতীর সমান চিতোর নগর শ্মশান করে দিলেন, যার জন্যে দিল্লীর সিংহাসন ছেড়ে বিদেশে এলেন, সেই পদ্মিনীর সন্ধান পেলেন কি ?

বাদশা চিতোরে এসে প্রথমেই শুনলেন— পদ্মিনী আর নেই —চিতার আগুনে সুন্দর ফুল ছাই হয়েছে !

সেইদিন রাত্রে বাদশার হুকুমে চিতোরের ঘর-দ্বার, মন্দির-মঠ —ছাইভস্ম চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল— কেবল প্রকাণ্ড সরোবরের মাঝখানে রানী পদ্মিনীর রাজমন্দির তেমনি নতুন, তেমনি অটুট রইল! আল্লাউদ্দীন সেই রাজমন্দিরে পদ্মসরোবরের ধারে শ্বেত-পাথরের বারান্দায়-ঘেরা পদ্মিনীর শয়নমন্দিরে তিনদিন বিশ্রাম করলেন। তারপর মালদেব নামে একজন রাজপুতের হাতে চিতোরের শাসনভার দিয়ে, ধীরে-ধীরে দিল্লীর মুখে চলে গেলেন। পাঠান-বাদশার প্রবল প্রতাপ, হিন্দুস্থানের একদিক থেকে আর-একদিকে বিস্তৃত হল ; আর সেই বারো হাজার সতী-লক্ষ্মীর পবিত্র নাম বারো হাজার রাজপুত বীরের কীর্তি, চিরদিনের জন্যে, জগৎ-সংসারে ধন্য হয়ে রইল। আজও চিতোরের মহাসতীর শ্মশানে পদ্মিনীর সেই চিতাকুণ্ড দেখা যায় ; তার ভিতর মানুষে প্রবেশ করতে পারে না— এক অজগর সাপ দিবারাত্রি সেই গহ্বরের মুখে পাহারা দিচ্ছে।

হাম্বির

চিতোর তখনো পাঠানের হস্তগত হয়নি। মেবারে তখনো ভীমরানার অটুট প্রতাপ। মহারানা লক্ষ্মণসিংহের সুশাসনে দেশ যখন শান্তিতে সুখে ধনে ধান্যে পরিপূর্ণ, সেই সময় একদিন যুবরাজ অরিসিংহ দলবল নিয়ে শিকারে গিয়েছিলেন। আন্ধোয়া বনের ধারে উজলা গ্রামে মেঠো রাস্তায় শিকারী দল রাজকুমারের সঙ্গে-সঙ্গে শিকারের পিছনে ছুটে চলেছিল— শিকার একটা ছুঁচালো-মুখ দাঁতালো বরাহ। বেলা দুপুরে মেঠো রাস্তায় অনেকখানি ধুলো উড়িয়ে অনেকদূর ছুটে গিয়ে রাজকুমারের শিকার রাস্তার একধারে জনার খেতের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ল— সেখানে ঘোড়া চলে না, তীর তো ছোটেই না।

খেতের মাঝে মাচার উপর দাঁড়িয়ে এক রাজপুতের মেয়ে এই তামাশা দেখছিল— পরনে তার পীলা ওড়নি, নীল আঙ্গিয়া। রাজ-কুমারের পায়ে ছিল সবুজ দোপাট্টা! দুজনের চোখ দুজনের উপর পড়েছিল। শিকারের আশায় হতাশ হয়ে অরিসিংহ যখন বুনাস নদীর তীরে আমবাগানে ফিরে চলেছিলেন, খেতের ভিতর থেকে রাজপুতের মেয়ে সেই সময় বরাহটা মেরে শিকারীদের ভেট দিয়ে গেল।

রাজকুমার জিজ্ঞাসা করলেন, 'ক্যায়সে মারা!'

বালিকা বল্লমের মতো সিধে একটা জনারের শিষ দেখিয়ে বললে—'ইসিসে ঘায়েল কিয়া।' তার ধুলোমাখা কালো চুলগুলি সাপের ফনার মতো সুন্দর মুখের চারিদিকে বড় শোভা ধরেছিল। তার সুডোল হাতে পিতলের কাঁকন সূর্যের আলোয় সোনার মতো কেমন ঝকঝক করছিল। বুনাস নদীর তীরে আমবাগানের শীতল ছায়ায় সেই কথাই ভাবতে ভাবতে রাজকুমারের তন্দ্রা আসছিল।

সবুজ খেতের মাঝে মাটির ঢেলা ফেলে পাখি আর ছাগল তাড়াতে-তাড়াতে মেয়েটিও রাজকুমারের কথা ভাবছিল কিনা কে জানে; কিন্তু এক সময় তার হাত থেকে ঠিকরে একটা মাটির ঢেলা সেই আমবাগানের ধারে ঘোড়ার পায়ে এসে লাগল! হঠাৎ ঘোড়ার তড়বড় শব্দে চমকে উঠে রাজকুমার চেয়ে দেখলেন আমবাগানের ফাঁকে একটুখানি সবুজ খেত— তারই মাঝে সেই নীল-আঙ্গিয়া, পীলা-ওড়নি কৃষকনন্দিনী!

পশ্চিম বাতাসে অড়রের খেতে ঢেউ উঠেছে, একদল টিয়া পাখি ঝাঁক বেঁধে উড়ে চলেছে, বেলা-শেষে দিনের আলো নিবু-নিবু, পাথরের মতো পরিষ্কার আকাশ, তার কালো মেঘের সরু রেখা— রাজকুমার শিকার শেষে বাড়ি চলেছেন। নদীর ধারে যেখানে গ্রামের পথ আর মাঠের রাস্তা এক হয়েছে সেইখানে আবার দুজনে দেখা হল— বালিকা মাথায় দুধের কলসী নিয়ে মাঠ ভেঙে গ্রামে চলেছে— সঙ্গে দুটি চিকন কালো ছানা ভেঁষ!

পরদিন উজলা গ্রামের সেই বালিকার ঘরে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে রাজকুমারের দূত এল! বালিকার পিতা চন্দাসো বংশের চৌহান রাজপুত কিছুতেই গেহলোট বংশে কন্যাদানে সম্মত নয়— রাজকুমার হতাশ হয়ে রাজ্যে ফিরলেন। এদিকে সেই বৃদ্ধ রাজপুতের ঘরে গৃহিণীর কাছে পাড়াপড়শীর দুয়ারে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সীমা-পরিসীমা রইল না। এমন কাজও করে? হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে আছে? যেমন বুদ্ধি, তেমনি চিরটা কাল চাষা হয়েই থাক।

বুড়ো কিন্তু সকলের কথায় একই জবাব দিত, 'তোমরা যাই বল, আমি কিন্তু লছমীকে কখনোই রাজবাড়িতে পাঁচ সতীনের দাসী করে দিতে পারিনে; তার চেয়ে আমার মেয়ে গরীবের ঘরে গিন্নী হয়ে থাক সেও ভালো।'

কিন্তু বুড়োর প্রতিজ্ঞা বেশিদিন রইল না। চিতোর থেকে দূত এল, পদ্মিনী রানী লিখছেন: 'আমি নিঃসন্তান, তোমার কন্যাকে

ভিক্ষা চাই ; আমার আশীর্বাদে চিতোরের রাজলক্ষ্মী তোমার বংশকে বরণ করুন।'

সতীর কথা ব্যর্থ হয় না। লছমীর সন্তান যে চিতোরের সিংহাসনে বসবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ রইল না। ধুমে-ধামে আলো জ্বালিয়ে, ঘোড়া সাজিয়ে বর-বেশে যুবরাজ এলেন যেন কোনো স্বপ্নের রাজ্য থেকে। রাজপুত্র এসে উজলাগ্রামে উদয় হলেন— আনন্দে, আলোয়, নাচে-গানে সমস্ত গ্রাম এক রাতের মতো উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সুখের বাসর আনন্দের মধ্যে কখন কাটল বোঝা গেল না।

এক বৎসর পরে যুবরাজ লছমীরানীকে আর এক-মাসের শিশু রাজপুত্র হাম্বিরকে উজলাগ্রামে রেখে পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধে গেলেন। সে-যুদ্ধে যে গেল তাকে আর ফিরতে হল না। রানা গেলেন, রাজপুত্রেরা গেলেন, ভীমসিংহ গেলেন, রানী পদ্মিনী, রাজবধূ, রাজমাতা, সকলে গেলেন। চিতোর-লক্ষ্মী অন্তর্ধান করলেন। রইলেন কেবল উজলাগ্রামে হাম্বিরকে নিয়ে রানী লছমী, আর কৈলোরের কেল্লায় মেবারের রানার বংশধর অজয়সিংহ।

একদিকে শোরোনাল বলে একখানি ছোটো গ্রাম, আর একদিকে আরাবল্লী পর্বত, মাঝে একটি ছোটো পাহাড়ের উপর কৈলোরের পুরাতন কেল্লা। এক সময়ে পাহাড়ী ভীলদের শাসনে রাখার জন্যে ওই কেল্লা প্রস্তুত হয়েছিল। তখন চিতোরের মহারানা বছরের মধ্যে প্রায় চারমাস এখানেই কাটাতেন। তখন কেল্লার শ্রী-ই ছিল এক। তারপর পাহাড়ী জাত যখন ক্রমে অধীন হয়ে শত্রুতা ছেড়ে বশ্যতা মানলে তখন আর বড়ো একটা এখানে আসবার প্রয়োজন হত না। ক্বচিৎ দুই একজন রাজকুমার শিকারে এসে রাত্রিবাস করে যেতেন। কেল্লাও ক্রমে ভেঙে-চুরে বন-জঙ্গল আর কাঁটাগাছে পরিপূর্ণ হয়েছিল।

ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুতের মাঝে চিতোরের রানা লক্ষ্মণসিংহের বংশধর রাজ্যহারা অজয়সিংহ স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে একদিন এই কেল্লায় আশ্রয় নিলেন। সে দুঃখের রাত কী দুঃখে কেটেছিল কে বলবে!

মাথার উপরে ফাটা ছাদ দিয়ে বৃষ্টির ধারা পড়ছে, ঘরের কোণে ইন্দুরের খুটখাট, বাদুড়ের ঝটাপট— রাজার ছেলে রাজার বৌ তারই মাঝে ভিজে ঘরে খড়ের বিছানায় ঘোড়ার কম্বল ঢাকা দিয়ে রাত কাটালেন। সকালে গ্রামবাসীরা রাজা দেখতে এসে দেখলে তাদের রাজার বসবার সিংহাসন, শোবার খাটিয়া নেই; রাজার রানী, রাজার ছেলে ঘোড়ার কম্বলে বসে আছেন। মেবারের রানা অজয়সিংহ আজ কোথায় সোনার সিংহাসনে রাজছত্র মাথায় দিয়ে বসবেন, রানীমা কোথায় দুই রাজকুমার অজিমসিংহ সুজনসিংহকে নিয়ে গজ-দন্তের পালঙ্কে আরাম করবেন, না তাঁদের এ দুর্দশা? গ্রামবাসীরা তখনই যত্ন করে কেল্লা পরিষ্কার করতে লাগল, ঘর সাজাতে লাগল, গ্রামের জোতদার গজদন্তের খাট সিংহাসন, কিংখাবের সুজনী, জরীর চাঁদোয়া, শ্বেত চামর, চন্দনের পাখা, রুপার প্রদীপ, সোনার বাটা, শ্বেত পাথরের বাসন হাজির করলে। খেত থেকে চাষীর মেয়েরা তরি-তরকারি, ঘিয়ের মট্‌কি, দুধ দেবার গাই, ঘোড়ার ঘাস নিয়ে হাজির হল। দেখতে-দেখতে সাজ-সরঞ্জামে কেল্লার শ্রী ফিরে গেল। সন্ধ্যার সময় গ্রামবাসী তাদের রাজার মুখে, রানীর মুখে, দুই রাজ-পুত্রের মুখে হাসি দেখে বিদায় হল।

ভক্ত প্রজার প্রাণপণ সেবায় অজয়সিংহ সব দুঃখ ভুললেন, কেবল চিতোর যে এখনো পাঠানের হস্তগত এ দুঃখ তাঁর মন থেকে কিছুতে গেল না। তিনি প্রায়ই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতেন, 'হায়! সূর্য এখনো রাহুগ্রস্ত, কবে এ গ্রহণ শেষ হবে তা কে জানে! সেই সুদিনের প্রতীক্ষা করে আমায় কতকাল থাকতে হবে কে বলতে পারে!'

দিন যেতে লাগল। কিন্তু যে সুদিনের প্রতীক্ষায় অজয়সিংহ রইলেন, সে সুদিন বুঝিবা আর এল না। পাঠানের হাত থেকে চিতোর উদ্ধার করতে অজয়সিংহ প্রাণ দিতে প্রস্তুত কিন্তু তাঁর লোক-বল অর্থবল কোথায়? বড়ো আশা ছিল দুই রাজকুমার অজিমসিংহ সুজনসিংহ বড়ো হয়ে পিতৃরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করবে— কিন্তু হায়, বিধাতা সে সাধেও বাদ সাধলেন।

সেদিন বর্ষাকাল, মেঘের ঘটা আরাবল্লী পর্বতের শিখরে কাজলের মতো ছায়া ফেলেছে। গ্রামের উপর খেতের উপর দিয়ে আলো-আঁধারের খেলা চলেছে। দুই রাজকুমার শিকারে বেরিয়েছেন, রাজা-রানীতে মহলের ভিতর একলা আছেন।

সন্ধ্যা হল—রাজকুমারেরা ঘরে ফিরছেন না, রানীমা এক-একবার খোলা জানলায় চেয়ে দেখছেন। দেখতে-দেখতে পশ্চিম মেঘের তীরে একটু-খানি সোনার ঢেউ খেলিয়ে সূর্যদেব অস্ত গেলেন। রাত্রির অন্ধকার মেঘের অন্ধকারে গাঢ়তর হয়ে এল। রানীমা রাজার সঙ্গে কথা বলছেন আর বারে-বারে জানালার পানে চেয়ে দেখছেন।

রাজা বললেন, 'তোমায় আজ আনমনা দেখছি যে?'

'কে জানে প্রাণটা কেমন করছে,' বলে রানীমা উঠে গেলেন। দাসী ঘরে এসে প্রদীপ দিয়ে গেল। টুপটাপ করে ক্রমে বড়ো-বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি নামল।

রানীমা মলিন মুখে ফিরে এসে বললেন, 'এরা যে দুভায়ে সকাল থেকে শিকারে গেল, এখনো এল না কেন?'

রানা বলে উঠলেন, 'সে কী? এখনো এরা ফেরেনি? এই ঝড়-বৃষ্টিতে দুজনে কোথায় রইল?' বলতে-বলতে কেল্লার উঠানে লোকের কোলাহল শোনা গেল। তখন মেঘ কেটে গিয়ে চন্দ্রোদয় হচ্ছে; রাজা রানী দেখলেন জন কয়েক গ্রামবাসী কাকে যেন ধরা-ধরি করে নিয়ে আসছে। একজন দাসী তাড়াতাড়ি এসে খবর দিয়ে গেল, 'রানীমা, দেখুন গিয়ে বড়োকুমার অজিম বাহাদুরের কী হয়েছে।' বলতে-বলতে লোকজন ধরাধরি করে রাজকুমারকে নিয়ে উপস্থিত হল। রাজা রানী শুনলেন, পাহাড়ের উপর শিকার করতে গিয়ে মুঞ্জ বলে যে ভীল সর্দার, তার ছেলের সঙ্গে সুজন বাহাদুরের হরিণ নিয়ে ঝগড়া হয়, ক্রমে লড়াই বাধে। বড়োকুমার তাকে রক্ষা করতে গিয়ে মাথায় চোট পেয়েছেন।

রানা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর সুজন সিং কোথায় গেলেন।'

লোকজনেরা মাথা চুলকে বললে, 'আজ্ঞে তিনি ভালো আছেন,

আমাদের তিনি পাঠিয়ে দিলেন। নিজে একটা চটিতে বিশ্রাম করছেন, এলেন বলে!'

পথের ধারে চটিতে বিশ্রাম করার মানে পাঁচ ইয়ারে মিলে সিদ্ধি টেনে আড্ডা দেওয়া। রানা বুঝলেন; বুঝেই বললেন, 'বিপদের সময় বিশ্রাম না করলেই নয়!'

লোকজন সকলে বিদায় হল। রাজা রানী রাজবৈদ্য আর দু-একজন দাসী অচৈতন্য অজিমকে ঘিরে রইলেন। সমস্ত রাত্রে রাজকুমারের চেতনা হল না। রাজবৈদ্য ঘাড় নেড়ে বললেন, 'আঘাত সাংঘাতিক।' ভোরের আলোর সঙ্গে-সঙ্গে রাজকুমার একবার চোখ চাইলেন; একবার 'মা' বলে ডাকলেন; তারপর ভাঙা খাঁচা ছেড়ে পাখি যেমন উড়ে যায় তেমনি রাজকুমারের সেই সোনার দেহ ছেড়ে প্রাণ-পাখি চলে গেল। তারপর দিনের পর দিন কাটতে লাগল। অজয়সিংহ শোকে দুঃখে নিরাশায় দিন-দিন ম্রিয়মাণ হতে লাগলেন। আর সেই দুর্দান্ত মুঞ্জ ডাকাত দিন-দিন প্রবল হয়ে গ্রামবাসীদের উপর প্রজালোকের ঘরে বিষম উৎপাত আরম্ভ করলে। এমনকি দুরন্ত ডাকাত এসে একদিন কৈলোরের কেল্লা পর্যন্ত লুট করে গেল। ডাকাত অজয়সিংহের মুকুট কেড়ে নিয়ে তাঁর মাথায় তলোয়ারের চোট মেরে চলে গেল। বৃদ্ধ অজয়সিংহ, নেশাখোর সুজন বাহাদুর —প্রজালোককে কে রক্ষা করে? একদিকে পাঠানের উৎপাত আর একদিকে মুঞ্জ ডাকাতের নিষ্ঠুর অত্যাচার। ওদিকে আবার চারিদিকে খবর হল— রানা আর বেশিদিন বাঁচেন কিনা সন্দেহ। রাজ্যে হাহাকার পড়ে গেল। সকলেই বলতে লাগল এতদিনে বুঝি সূর্যবংশের গৌরব শেষ হয়। সুজন বাহাদুর যে রাজ্য চালাতে পারেন, এমন তো বোধ হয় না।

রাজ্যের যখন এই দুরবস্থা সেই সময় উজলাগ্রাম থেকে লছমীরানী হাম্বিরকে নিয়ে কৈলোরে উপস্থিত হলেন। রানার আত্মীয়-স্বজন দেশের সর্দার সামন্ত যে যেখানে ছিলেন উপস্থিত। রানা সকালে সভা করে বসেছেন, হাম্বির এসে প্রণাম করলেন। রানা আশীর্বাদ

করে হাম্বিরকে কাছে বসালেন। হাম্বিরকে দেখে আজ তাঁর দাদা অরিসিংহকে মনে হল। সেই নাক সেই চোখ ; দাদার মতো তেমনি সুন্দর বলিষ্ঠ শরীর, গলার স্বর তেমনি মধুর গম্ভীর। আজ অজয়-সিংহের মনে পড়ল তাঁর দাদা অরিসিংহ পাঠানের সঙ্গে শেষ যুদ্ধে যাবার আগে তাঁর হাতে একখানি চামড়ার থলি আর একখানি চিঠি দিয়ে বলেছিলেন, 'এই চিঠিতে আমার শেষ ইচ্ছা রইল। আর এই থলিতে একখানি ছোরা রইল, হাম্বির বড়ো হলে এ দুটি তাকে দিও।'

রানা অজয় আজ তাঁর সমস্ত সামন্ত-সর্দারের সম্মুখে অরিসিংহের নিজের হাতের ছোরা আর মোহর-করা সেই চিঠি হাম্বিরের হাতে দিয়ে বললেন, 'বৎস, পড়ে দেখো, তোমার পিতার শেষ ইচ্ছা কী।' পত্রে লেখা ছিল—

শ্রীরাম জয়তি

শ্রীগণেশ প্রসাদ শ্রীকলিঙ্ক প্রসাদ

মহারাজ অধিরাজ শ্রীঅরিসিংহ আদেশতু

অতঃপর অজয়সিংহজী ও মেবারের দশ সহস্র অধিকারের সামন্ত-সর্দার ও জনপদবর্গকে আমার আদেশ এই যে— ভবানী মাতার ইচ্ছায় পাঠান যুদ্ধ সংকট সময়ে যদি আমার স্বর্গলাভ ঘটে, তবে দেশাচার মতো ভাইজী অজয়সিংহ একলিঙ্গজীর দেওয়ানী গ্রহণ করিয়া যথাবিহিত প্রজাপালন ও রাজ্যচালনা করিতে থাকিবেন ও আমার বিধবা পত্নী রানী লছমীও শিশুপুত্র হাম্বিরকে লইয়া যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে উজলাগ্রামে বাস করিতে পারেন সেজন্য উজলাগ্রাম ও তাঁহার সংলগ্ন সমুদয় জমি-জমা রানীর নিজ নামে বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। আমি নিজ বুদ্ধি ও বিশ্বাস মতো দেওয়ানীর বন্দোবস্ত করিয়া গেলাম, কিন্তু ইতঃপর সিংহাসন লইয়া হাম্বির ও ভাইজীর সন্তানগণের মধ্যে বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা, সে নিমিত্ত শেষ অনুরোধ এই যে, আমাদের সামন্ত-সর্দার-মন্ত্রীবর্গ এবং প্রজালোক যাহাকে উপযুক্ত বিবেচনায় দেওয়ানীতে বহাল করিবেন তিনিই রাজ্যাধিকারী বলিয়া সাব্যস্ত

হইবেন। হাম্বির ও অন্যান্য কুমারের প্রতি আমার এই আদেশ যে তাঁহারা এই উত্তরাধিকার-সূত্র লইয়া বিবাদ না করেন। দেশের সংকট অবস্থা— এ সময়ে গৃহ-বিবাদ বাঞ্ছনীয় নয়। আমাদের মধ্যে যে কুসন্তান এই গৃহবিবাদে লিপ্ত হইবে, ভগবান একলিঙ্গের অভিশাপ যেন তাহাকে স্পর্শ করে। ইতি সংবৎ ১৩৩৩ চিতৈরগড়।

পত্র পাঠ শেষ হলে রানা সকলের দিকে চেয়ে বললেন, 'এখন কী করা কর্তব্য! রাজ্যের সমস্ত সামন্ত-সর্দারই উপস্থিত আছেন; আমার ইচ্ছা, এই সভাতেই সিংহাসন সুজন বাহাদুরের কি হাম্বিরের এ বিষয়ের একটা মীমাংসা হোক। আমি বুঝেছি, আমি আর অধিক দিন নয়; অতএব আমি বেঁচে থাকতেই উপযুক্ত কোনো এক কুমারের হাতে দেওয়ানীর ভার দিতে চাই। এখন দুই কুমারের মধ্যে কে উপযুক্ত তোমরা সকলে স্থির করো।'

রাজসভায় তুমুল তর্ক উঠল। সেই সময় পেটমোটা, নেশায় ঢুলু-ঢুলু রক্তচক্ষু সুজনসিংহ সভায় প্রবেশ করলেন। সভায় দুইদল হল। একদল বললেন সুজন বাহাদুরেরই সিংহাসন পাওয়া উচিত, কেননা রাজ্য চালাতে বাহুবলের প্রয়োজন, এবং বাহুবলটা যে সুজন বাহাদুরের যথেষ্ট আছে সেটা সকলেই জানে। অন্য দল বলে উঠল, শুধু কি বাহুবলের কর্ম। রাজ্য চালাতে হলে ধৈর্য চাই, বুদ্ধি চাই, সুজন বাহাদুরের এ দুটোর একটাও নেই। সৈন্যই রাজার বল, রাজাকে যদি নিজেই লড়াই করতে হল তবে আমরা আছি কী করতে? আমরা তো বলি হাম্বিরকেই রাজা করা উচিত। অন্যদল বলে উঠল, বাপুহে, যে দিনকাল পড়েছে, তাতে মুকুট মাথায় দিয়ে সিংহাসনে বসে থাকলে আর চলছে না; এখন রীতিমতো লড়াই করতে হবে। আমরা এমন রাজা চাই, যে একাই একশো পাঠান ঠেকাতে পারে। দুইদলে প্রচণ্ড তর্ক, শেষে হাতাহাতি হবার যোগাড়।

অজয়সিংহ বললেন, 'তোমরা স্থির হও, আমি যা বলি শোনো। তোমরা তো জানো ভীল-সর্দার মুঞ্জ সেদিন কেল্লা লুট করে গেছে, আমাদের সাধ্য হয়নি যে তাদের বাধা দিই। সেই রাত্রে ডাকাত

এই কেল্লা থেকে চিতোরের রাজমুকুট নিয়ে পলায়ন করেছে ; শুধু তাই নয়, আমি সংবাদ পেয়েছি সে নাকি আবার সেই রাজমুকুট মাথায় দিয়ে নিজেকে রাজস্থানের রাজা বলে প্রচার করেছে। সূর্যবংশের এই ঘোর অপমানের একমাত্র প্রতিকার, সেই রাজমুকুট উদ্ধার করা। হাম্বির আর সুজন দুইজনেই এখন উপযুক্ত। দুইজনের মধ্যে যিনি সেই পাপাত্মার মুণ্ড সমেত মুকুট উদ্ধার করতে পারেন তিনিই রাজ্যের অধিকারী হউন। কৃতঘ্ন ভীল যে মাথায় মেবারের রাজমুকুট ধারণ করতে সাহসী হয়েছে, সে মাথা শীঘ্র আমি চাই, নচেৎ আমার জীবনে মরণেও শান্তি নেই। মেবারের দুই উপযুক্ত রাজকুমার বর্তমান থাকতে যদি সে মুকুট উদ্ধার না হয়, তবে জানলেম মেবারের সূর্যবংশ আজ নির্বংশ হয়েছে ; রাজ্যে বীর নেই, রাজসিংহাসন ভীল আর পাঠানের পাওয়াই শ্রেয়। কেল্লার যত সৈন্য যত অস্ত্র আছে, দুই কুমার ইচ্ছামতো ব্যবহার করুন। আজ সভা ভঙ্গ করো।' কোলাহলে রাজসভা ভঙ্গ হল।

তার পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে নিজের বন্ধু-বান্ধব সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সুজন বাহাদুর ডাকাত ধরতে চললেন। আজ তিনি ভারি ব্যস্ত। অন্যদিন বেলা এগারোটার পূর্বে সুজন.বাহাদুরের ঘুম ছাড়ত না, আজ তিনি ভোর না হতেই প্রস্তুত। এত ব্যস্ত যে হাম্বিরকে সঙ্গে ডেকে নিয়ে যান তারও সময় হল না। কেল্লার জনপ্রাণী না উঠতে-উঠতে বড়োকুমার সুজনসিংহ দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। দু-একজন সামন্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'কই, ছোটো রাজকুমার গেলেন না।'

সুজনসিংহ হেসে বললেন, 'তিনি একটু আরাম করছেন। চলো আমরা আগে যাই, তিনি আহারাদি করে পরে আসবেন এখন।'

অমনি একজন খোশামুদে রাজপারিষদ বলে উঠল, 'চলুন আমরা আগে তো গিয়ে ডাকাতের বাসা ঘেরাও করি, পরে না হয় ছোটো কুমার এসে তার মুণ্ডটা কেটে নিয়ে যাবেন।' অন্যজন বা বললে, 'হুঁঃ, রানার বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে। একি যার তার কর্ম ?

বুকের পাটা চাই। ডাকাত বলে ডাকাত— মুঞ্জ ডাকাত! নামে যার দেশসুদ্ধ থরহরি কম্প, তাকে ধরতে কিনা ছোটো কুমার! হাতি মারতে পতঙ্গ!' ওর মধ্যে কোনো এক মন্ত্রীপুত্র বলে উঠল, 'না হে না, রাজবুদ্ধির মধ্যে প্রবেশ করা কি তোমাদের কর্ম! কণ্টক দিয়ে কণ্টক উদ্ধার, বুঝলে কিনা।'

সুজনসিংহ হেসে বললেন, 'না হে না, তোমরা জানো না, হাম্বিরের গায়ে বেশ শক্তি আছে। তবে কী জানো, ছেলেমানুষ, এখনো হাড় পাকেনি। আমি এবার লড়াই থেকে এসেই তাকে রীতিমতো কুস্তি শেখাবার বন্দোবস্ত করছি, দেখো না!'

এদিকে সকালে উঠে হাম্বির একখানা পুরোনো তলোয়ার আর একখানা ছোরা শান্-পাথরে ঘষে-ঘষে সাফ করছিলেন। ছোরাখানা পিতা অরিসিংহের, আর তলোয়ারখানা উজলাগ্রামের দাদামশায় হাম্বিরকে দিয়ে গিয়েছিলেন। আজ কতকাল পরে শান্ পেয়ে অস্তর দুখানা বর্ষার জল পেয়ে নদীর স্রোতের মতো ক্রমে খরধার হয়ে উঠল। হাম্বির বসে-বসে অস্তরে শান্ দিচ্ছেন, এমন সময় লছমী-রানী সেখানে এসে বললেন, 'এখানে বসে কী করছিস?'

হাম্বির বললেন, 'জানো না মা? ডাকাত ধরতে যেতে হবে, তাই অস্তর দুখানায় শান্ দিচ্ছি।'

লছমীরানী বললেন, 'হা কপাল! তুমি এখনো অস্তর শান্ দিচ্ছ, আর ওদিকে যে সুজন সিং সৈন্যসামন্ত নিয়ে ডাকাত ধরতে গেল। তোর চেয়ে তো সে কাজের লোক দেখি, লোকে কেবল তার মিছে দুর্নাম রটায় বুঝলেম।'

হাম্বির যেন মায়ের কথায় একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'তাই তো মা, দাদা তো আমায় ডেকে নিয়ে গেলেন না? রাজত্বিটা দেখছি আমার কপালে নেই। যাই হোক, আমি ছাড়ছিনে!'

এই কথা বলে হাম্বির দ্বিগুণ উৎসাহে তলোয়ার শান্ দিতে লাগলেন। রানীমা বললেন, 'যা যা, বেলা হল— এখন কিছু খেয়ে আয়, আমি ততক্ষণ এ দুখানায় শান্ দিচ্ছি।' হাম্বির উঠে গেলেন,

লছমীরানী বসে-বসে অস্তরে শান্ দিতে লাগলেন। রাজপুতের মেয়ে বাটনা বাটা কুটনো কোটার চেয়ে অস্তরে শান্ দেওয়া ভালো বোঝেন। তাঁর হাতে পড়ে অস্তর দুখানা কিছুক্ষণের মধ্যেই চকচকে ঝকঝকে হয়ে উঠল। হাম্বির ফিরে এলে রানীমা তাঁর হাতে ছোরাখানা দিয়ে বললেন, 'দেখ দেখি, এটায় যেন ফাট ধরেছে বোধ হয়। আঁকা-বাঁকা যেন কিসের দাগ দেখছি! এখানায় তো কোনো কাজই হবে না।'

হাম্বির বললেন, 'বলো কী মা, বাবার হাতের ছোরা কাজে লাগবে না কী? দাও দেখি একবার ভালো করে দেখি।' হাম্বির ছোরাখানা নিয়ে এদিক-ওদিক ফিরিয়ে দেখলেন, কিছু বোঝা গেল না। মনে হল যেন ছোরার ফলকটার একদিক থেকে আর একদিক জুড়ে একটা আঁকা-বাঁকা ফাট। ফাট কি রক্তের দাগ চেনা যায় না!

হাম্বির বললেন, 'তাই তো, এটা তো কিছু বোঝা গেল না; ভালো করে দেখতে হবে। মা তুমি অস্তর দুখানা আমার ঘরে রেখে দিও। আমি একবার মহারাজার সঙ্গে দেখা করে আসি, একটা ভালো ঘোড়া দেখে নিতে হবে।'

অজয়সিংহ আজ আর সভায় যাননি। শরীর অসুস্থ, নিজের মহলে বিশ্রাম করছিলেন, হাম্বিরকে আসতে দেখে বললেন, 'সে কী, তুমি যাওনি? সুজন তো অনেকক্ষণ রওনা হয়েছেন।'

হাম্বির বললেন, 'আজ্ঞে, একটি ঘোড়া বেছে নিতে কিছু বিলম্ব হবে, আমি আজ সন্ধ্যাকালেই রওনা হব।'

অজয়সিংহ বললেন, 'লোকজন তো সব বড়ো কুমারের সঙ্গে চলে গেছে, তুমি একা পথ চিনবে কেমন করে?'

হাম্বির বললেন, 'আজ্ঞে, একজন শিকারীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছি, সে-ই আমাকে ডাকাতের আড্ডা দেখিয়ে দেবে। আমি মনে করেছিলুম, লোকজন নিয়েই যাব, কিন্তু পরে ভেবে দেখলুম, মুঞ্জ ভীল যে রকম দুর্দান্ত, তার সঙ্গে লোকজন নিয়ে পেরে ওঠা অসম্ভব। কৌশলে কার্য সিদ্ধ করা চাই।'

অজয়সিংহ বললেন, 'যা ভালো বোঝো তাই করো। আশীর্বাদ করি জয়ী হও।' হাম্বির প্রণাম করে বিদায় হলেন।

হাম্বির নিজের ঘরে বিশ্রাম করছিলেন, লছমীরানী এসে বললেন, 'কই তোর যাবার কী হল? তোর তো লড়ায়ে যাবার কোনো চেষ্টাই নেই দেখছি। ভয় পেলি নাকি? এই যে বললি, ঘোড়া ঠিক করতে যাচ্ছি, আর ঘরে এসে ঘুম দিচ্ছিস!'

হাম্বির একটুখানি হেসে বললেন, 'রোসো মা, ডাকাত ধরতে যাওয়া কি সহজ ব্যাপার? একটু ভেবে নিতে দাও, ফন্দি আঁটতে দাও! একি বুনো শুয়োর, যে যাব আর জনারের শিষে গেঁথে আনব।'

লছমীরানী বুঝলেন, হাম্বির মুখে তামাশা করছেন, কিন্তু মনে-মনে যেন কী একটা মতলব স্থির করে বসে আছেন। তিনি হাম্বিরের দিকে চেয়ে বললেন, 'বটে, আমার সঙ্গে তামাশা হচ্ছে? একটা জনারের শিষ দিয়ে বুনো শুয়োর গেঁথে আন, তবে বাহাদুর বুঝি। দেখা যাবে তোমার ঐ পুরোনো তলোয়ার আর দাগী ছোরায় কতদূর কী করো! এখন বল্ দেখি তোর মতলব কী!' তারপর মায়েতে ছেলেতে সেই নির্জন ঘরে সারাদিন কত কী পরামর্শ হল। সন্ধ্যা হয়-হয়, রানী লছমী বললেন, 'তুই তবে প্রস্তুত হ— আর বিলম্ব করলে রাত্রি হয়ে পড়বে।'

হাম্বির বললেন, 'আর প্রস্তুত কী, এই যেমন আছি, তেমনিই যাব। দেখো তো মা আমার ঘোড়াটা এল কিনা।'

রানী উঠে গেলেন। হাম্বিরের ঘোড়া প্রস্তুত হয়ে এল। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'দেখা যাক মা, পুরোনো তলোয়ার, দাগী ছোরা আর এই বেতো ঘোড়াটা নিয়ে কতদূর কী করতে পারি।'

মা আশীর্বাদ করলেন, 'জয়ী হও।'

হাম্বির সেকেলে তলোয়ার কোমরে গুঁজে সামান্য বেশে সেই বেতো ঘোড়ায় চড়ে বসলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে এল।

সূর্য অস্ত গেলেন। হাম্বিরকে নিয়ে সেই বেতো ঘোড়া খটর্-খটর্ করে গ্রাম ছাড়িয়ে বনের পথে প্রবেশ করলে।

আরাবল্লী পর্বতের নিবিড় বনচ্ছায়ায় ঘোর অন্ধকার। দুহাত তফাতে লোক চেনা যায় না। হাম্বির তাঁর বেতো ঘোড়াটাকে একদিকে ছেড়ে দিয়ে কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে সেই বনের অন্ধকারে লুকিয়ে পড়লেন। ছায়ার সঙ্গে যেন একটা ছায়া মিলিয়ে গেল। যেমন শিকারের সন্ধানে বাঘ ফেরে, তেমনি সেই অন্ধকার বনে হাম্বির নিঃশব্দে অতি সন্তর্পণে গিরি-নদীর পারে-পারে, ঘনবনের ধারে-ধারে, পাহাড়ের গহ্বরে-গহ্বরে ডাকাতের সন্ধান করে চললেন। তৃষ্ণার সময় নদীর জল, ক্ষুধার সময় গাছের ফল, ঘুমের সময় পর্বতের গহ্বর, এমনি করে হাম্বিরের দিন কেটে চলল। যে সব মহাবনে মানুষের চলাচল নেই— দিবারাত্রি যেখানে কেবল সবুজ অন্ধকার আর বাঘ-ভালুকের গর্জনে পরিপূর্ণ, দিনের পর দিন হাম্বির সেই সব মহাবনের ভিতর ঘুরে বেড়াতে লাগলেন ; বনের আর অন্ত নেই।

একদিন ঘোর অমাবস্যার রাত্রি— বনের ভিতর দিয়ে পথ দেখে চলা অসম্ভব, হাম্বির একটা প্রকাণ্ড শালগাছে চড়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখছেন আর মনে-মনে ভাবছেন, দূর কর ছাই, ডাকাতের সন্ধান কি পাওয়া যাবে না ? আজ তো এই অন্ধকারে আর পথ চলা অসম্ভব। আজ রাত্রি দেখছি এই গাছেই কাটাতে হল। উঃ, বনের তলায় মশাগুলো ভনভন করে ডাকছে দেখো। আবার ঐ যে বাঘের গর্জন ঘন ঘন শোনা যাচ্ছে। এত মশার ভনভনানি আর বাঘের গর্জন কোনো দিন তো শুনিনি। যাই হোক আজ রাত্রিতে আর মাটিতে পা দেওয়া নয়। এ বনটায় তত গাছপালা নেই কিন্তু জীব-জন্তু দেখছি অনেক আছে। হাম্বির নিজেকে বেশ করে গাছের সঙ্গে বেঁধে নিদ্রা গেলেন।

অনেক রাত্রে হাম্বিরের ঘুম ভাঙল। হাম্বির দেখলেন আকাশের একদিকে রাঙা আলো দেখা দিয়েছে। সকাল হয়েছে ভেবে হাম্বির

উঠে বসলেন ; কিন্তু সকাল হল তো পাখি ডাকে না কেন ? তবে ভ্রম হল নাকি ? হাম্বির বেশ করে চারিদিকে দেখতে লাগলেন। সেই সময় যেন দুজন মানুষে সেই শালগাছের তলায় কথা কইছে শোনা গেল ! লোক দুটোর কথা বোঝা গেল না কিন্তু দু-একবার মুঞ্জ ডাকাতের আর সুজন বাহাদুরের নাম বেশ স্পষ্ট শুনতে পেলেন।

হাম্বির আস্তে-আস্তে গাছের ডাল বেয়ে খানিকটা নেমে এসে কান পেতে শুনতে লাগলেন, দুই পাহাড়ীতে কথা হচ্ছে, 'ওরে ভাই বদরী, তুই এখনো মুঞ্জু-মুঞ্জু বলিস, তাই তো সে চটে যায়।'

'মুঞ্জুকে মুঞ্জু বলব না তো কী ? সে কি জানেনা যে আমি তার চাচা হলেম ?'

'ওরে ভাই, সে কি এখনো চাচা-ফাচা মানে ? যে দিন থেকে সে সেই রাজপুতগুলোকে আর রানার ছেলেকে লড়ায়ে হারিয়ে দিয়েছে, সেইদিন থেকে তার মাথা বিগড়ে গেছে ! সে এখন চায় আমরা তাকে রানা আর তার ছেলেকে কুমার বলি।'

'রেখে দে তোর রানা, রেখে দে তোর কুমার। আমি তাদের চিরকাল বলব মুঞ্জ আর ভুঞ্জ।'

'তবে ভাই রঞ্জু, আজ তুই লাচ দেখতে চলেছিস কেন ? সর্দার আজ মেয়ের বিয়েতে মৌয়া খেয়ে নেশা করেছে— তোকে দেখলেই মাথা কাটতে আসবে।'

'ওরে একি বলিদানের মোষ পেয়েছিস যে টক করে হাড়িকাঠে মাথা দেব ? চল এখন নাতনির বিয়েতে একটু আমোদ করা যাক ; বাজে কথায় কেবল রাত কাটালি।'

লোক দুটো হন-হন করে উত্তর-মুখো চলল। হাম্বির এতক্ষণে বুঝলেন, তিনি ডাকাতের আড্ডায় এসে পড়েছেন। দূর থেকে মাদল আর ঝাঁঝরের দুমদুম ঝুমঝুম আওয়াজ অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। মশালের আলো আকাশের একদিক রাঙা করে তুলেছে। হাম্বির তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে সেই লোক দুটোর সঙ্গ নিলেন।

কতদিন কেটে গেছে, সুজন বাহাদুর ডাকাত ধরতে না পেরে কৈলোরের কেল্লায় ফিরে এসেছেন। হাম্বিরের কিন্তু কোনো খবর নেই। সকলেই বলছে, নিশ্চয় তিনি ডাকাতের হাতে কাটা পড়েছেন। এমন সময় একদিন মহারানার সভায় হাম্বিরের এক পত্র এল। হাম্বির উজলাগ্রাম থেকে লিখেছেন— তিনি উজলাগ্রামে মুঞ্জ বাহাদুরকে মেবারের রানা করে রাজসিংহাসন দিয়েছেন। নতুন রানা হাম্বিরকে কৈলোরের কেল্লা আর একশোখানা গ্রাম জায়গীর দিয়েছেন। অজয়সিংহ যদি সহজে কেল্লা ছেড়ে দেন তো ভালো, নচেৎ লড়াই নিশ্চয়! এবং মুঞ্জ বাহাদুর সশরীরে সগণে এসে কেল্লা দখল করবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি।

শুনে সুজনসিংহ বলে উঠলেন, 'দেখলে, ছোকরার কাণ্ডটা দেখলে একবার। সে কি মনে করেছে, দুমুঠো ডাকাতের দল নিয়ে মেবারের সিংহাসন দখল করবে? এত বড়ো তার স্পর্ধা।'

অজয়সিংহ বললেন, 'হাম্বির কি এতদূর নীচ হবে? এ তো আমার বিশ্বাস হয় না। চিঠিটা কেমন-কেমন শোনাচ্ছে না?'

রাজমন্ত্রী বললেন, 'কথাটা যদিও বিশ্বাসযোগ্য নয়, কিন্তু বলাও যায় না। আমার মনে হয় প্রস্তুত হয়ে থাকাই ভালো। আজকালের ছেলে কখন কী করে বসে বলা যায় না।'

সুজনসিংহ বললেন, 'তবে একবার মেবারের সমস্ত সামন্ত-সর্দারকে খবর পাঠানো হোক।'

অজয়সিংহ বললেন, তাতে কাজ নেই। এ কী পাঠান বাদশা আসছে, যে সামন্ত-সর্দারকে খবর পাঠাতে হবে? লোকে যে হাসবে! সকলকে সাবধানে থাকতে বলো। হঠাৎ কেল্লায় ডাকাতি না হয়। হাম্বিরকে লিখে দাও যেন এমন দুঃসাহসের কাজ না করে। আর একদল সৈন্য নিয়ে তুমি উজলাগ্রাম থেকে ডাকাতের দল তাড়িয়ে দাও গে; আর পারো তো হাম্বিরকে বেঁধে আনো।'

সুজনসিংহ 'যে আজ্ঞে' বলে উঠে গেলেন। কিন্তু তিনি মুঞ্জ ডাকাতের হাতে একবার পড়েছিলেন। সে যে কেমন সহজ ডাকাত,

বেশ চিনেছেন। ঘরে গিয়ে রাজবৈদ্যকে দিয়ে মহারানাকে বলে পাঠালেন, শরীর তাঁর বড়ো অসুস্থ ; কিছুদিন বিশ্রাম করতে পারলে ভালো হয়। ডাকাত ধরতে সেনাপতিকে পাঠালে চলে না ?

অজয়সিংহ বললেন, 'আচ্ছা তাই হবে !'

সেদিন রাত্রে অজয়সিংহ লছমীরানীর সঙ্গে দেখা করে হাম্বিরের পত্র দেখালেন। রানীমার অন্দর-মহলে সেনাপতির তলব হল। তারপর হাম্বিরের নামে চিঠি নিয়ে সেনাপতি বিদায় হলেন। তাঁর উপর হুকুম রইল— হাম্বিরের পরামর্শ মতো খুব সাবধানে কাজ করবে।

এদিকে উজলাগ্রামে শেয়ালরাজার মতো মুঞ্জ বাহাদুর রাজ-সিংহাসন আলো করে বিরাজ করছেন। ডাইনে বামে গম্ভীরমল আর চুয়োমল দুই নতুন মন্ত্রী কানে কলম গুঁজে বসে আছেন। আর রাজসভায় আছেন হাম্বির আর উজলাগ্রামের দু-এক পেট-মোটা জোতদার আর দু-চার কালো মুস্কো পাহাড়ী ভীল।

একজন গরীব প্রজা খাজনা দিতে পারেনি, রাজার লোক তাকে বেঁধে এনেছে। মুঞ্জরাজা হুকুম দিলেন, 'ওর মাথা কাটো।' অমনি হাম্বির কানে কানে বললেন, 'এরকম করলে প্রজালোকে খাপ্পা হবে। ওকে কিছু বকশিশ দিতে হুকুম হোক।' অমনি দুই মোহর ইনাম হয়ে গেল, গরীব প্রজা দুই হাতে সেলাম ঠুকে বিদায় হল। মনে-মনে বললে, 'রাজা তো হাম্বির, এটা তো ডাকাতের সর্দার, ওর কি দয়া-মায়া আছে ?'

এমন সময়ে কৈলোরের কেল্লা থেকে সেনাপতি এসে মুঞ্জ বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করলেন। কথা স্থির হল মহারানা কৈলোরের কেল্লা হাম্বিরকে দিয়ে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে কাশীবাস করুন, তাঁর খরচ-পত্র রাজভাণ্ডার থেকে দেওয়া হোক, আর হাম্বির ভীল রাজার মন্ত্রী হয়ে রাজ্যশাসন করুন, সেজন্য তাঁকে সমস্ত খরচ-খরচা ও মাসিক ছ-হাজার তন্‌খা ও চিতোরের কেল্লা জায়গীর দেওয়াই স্থির।

গম্ভীরমল শর্ত আওড়ালেন, চুয়োমল একরারনামা লিখে হুজুরে

পেশ করলেন, কিন্তু হুজুর তো পড়তে জানেন কত— কলম হাতে হাম্বিরের দিকে চাইলেন।

হাম্বির বললেন, 'এ সব পাকা দলিলে কলমের সই দেওয়া ভালো নয়। আমি বলি মহারাজ এতে পাঞ্জা মোহর করে দিলেই ভালো হয়।'

মুঞ্জবাহাদুর দুই হাতে কালি মেখে দলিলের দুই পিঠে হাতের ছাপ লাগালেন। সেনাপতি দলিল নিয়ে বিদায় হলেন। মুঞ্জবাহাদুর হাম্বিরের দিকে চেয়ে হাসতে-হাসতে বললেন, 'এ তো বড়ো মজা। লড়াই নেই, হাঙ্গামা নেই, এক হাতের ছাপেই কাজ সাফ? দিল্লীর বাদশাকে এমনি একটা পাঞ্জা পাঠিয়ে চিতোরের কেল্লাটা দখল নিলে হয় না?'

হাম্বির বললেন, 'আগে মেবার দখল করে নেওয়া যাক, তারপর দিল্লী পর্যন্ত ঠেলে যাওয়া যাবে। এখন একটু আমোদ-আহ্লাদের হুকুম হোক। রানার সেনাপতি আমাদের জাঁক-জমকটা দেখে যাক।'

মুঞ্জ রাজা বললেন, 'বন্ধু, তুমি যেমন বোঝো কর, কিন্তু দেখো, মাদলের বাজনা আর মহুয়ার কলসীটা ভুলো না। এ দুটো না থাকলে আমোদ হবে না।'

হাম্বির ভারে-ভারে মহুয়ার কলসী দলে-দলে মাদলের ব্যবস্থা করলেন। উজলাগ্রামে ভীল-রাজার রাজপ্রসাদে আমোদের ফোয়ারা খুলে গেল। সেনাপতি এলেন, গম্ভীরমল এলেন, চুয়োমল এলেন, হাম্বির এলেন, গ্রামের প্রজালোক পাড়া-প্রতিবাসী যে যেখানে ছিল সকলে এল। আর সেই সঙ্গে এল শাদা কাপড়ে ভদ্রলোক সেজে একদল রাজপুত সৈন্য!

রাত্রি প্রায় শেষ হয়েছে, গ্রামবাসীরা যে-যার ঘরে ফিরেছে; ভীলের দল মহুয়ার কলসী খালি করে যেখানে-সেখানে গড়াগড়ি যাচ্ছে, সেই সময় হাম্বির তাঁর বেতো ঘোড়ার পিঠে একটা রক্তমাখা চটের থলি চাপিয়ে উজলাগ্রাম থেকে বিদায় হলেন। সেনাপতির উপর ভীল-রাজার রাজপ্রাসাদ জ্বালিয়ে দেবার হুকুম রইল।

হাম্বির যেমন সন্ধ্যাবেলায় বেতো ঘোড়ায় চড়ে কৈলোরের কেল্লা থেকে বেরিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি সন্ধ্যাবেলা সেই বেতো ঘোড়ায় চড়ে কতদিন পরে রাজমুকুট সমেত মুঞ্জ ডাকাতের মুণ্ড নিয়ে ফিরে এলেন। কেল্লায় জয়জয়কার পড়ে গেল!

মহারানা সেই ভীলের কাঁচা রক্তে হাম্বিরের কপালে রাজটীকা লিখে দিয়ে বললেন, 'রাজপুতের নিয়ম সিংহাসনে বসবার আগে টীকাজের ব্রত সাঙ্গ করতে হয়। আজ এই শত্রুর রক্তে তোমার এই ব্রত উদ্‌যাপন হল। আজ থেকে সিংহাসন তোমার, রাজমুকুট তোমার। কিন্তু মনে রেখো, মেবারের মুকুট উদ্ধার হল বটে, রাজ্য এখনো পাঠানের হস্তগত।' তারপর মহারানা সুজনসিংহকে ডেকে পাঁচ হাতিয়ার আর এক ঘোড়া দিয়ে বললেন, 'তুমি মেবার ছেড়ে দক্ষিণ দেশে যাও। সেখানে তোমার ক্ষমতা থাকে তো নতুন রাজত্ব করো গিয়ে। মনে ভেবো না যে তোমাকে আমি স্নেহ করি না, কিন্তু আমি বেশ বুঝছি, তোমার নির্বাসনে মেবারের মঙ্গল, তোমারও মঙ্গল। আর যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়, তবে তোমার সন্তানেরা একদিন দক্ষিণ দেশে অখণ্ড রাজ্য বিস্তার করবে। যাও, মনে রেখো তুমি সূর্যবংশের সন্তান, তোমা হতে যেন সে বংশের কলঙ্ক না হয়। নিজের উপর নির্ভর করো, তবেই বড়ো হতে পারবে!'

হাম্বিরের রাজ্যলাভ

হাম্বির এখন শুধু হাম্বির নয়— ভগবান একলিঙ্গের দেওয়ান মহারানা হাম্বির। নামটা শুনতে যতখানি, হাম্বিরের রাজত্ব কিন্তু ততখানি ছিল না। থাকবার মধ্যে কৈলোরের কেল্লা, আশে-পাশে খানকতক গ্রাম আর দুই হাজার মাত্র রাজপুত সেপাই! মেবারের মহারানা এখন ঠিক যেন একজন তালুকদার। এদিকে দিল্লীর বাদশা মহম্মদ খিলজীর হয়ে মালদেব তখন চিতোরে বসে সমস্ত মেবার শাসন করছিলেন। চিতোর থেকে প্রায় বিশ ক্রোশ দূরে কৈলোরের কেল্লা। কোনো কোনো দিন আকাশ পরিষ্কার থাকলে কৈলোর থেকে পাহাড়ের উপর চিতোরের কেল্লা ঠিক যেন একখানি জাহাজের মতো আকাশ-সমুদ্রে ভেসে রয়েছে দেখা যেত।

হাম্বির লছমী মায়ের সঙ্গে কেল্লার ছাদে উঠে, লোক যেমন ঠাকুর দর্শন করে তেমনি— চিতোর দর্শন করতেন। সেই সময় সূর্যের আলোয় সকালবেলায় সোনার আকাশ-পটে রাজপ্রাসাদের পাথরের দেওয়াল, দেবমন্দিরের সোনার চুড়ো নিয়ে পাহাড়ের উপরে চিতোরের কেল্লা ধীরে ধীরে ফুটে উঠত। হাম্বির বলতেন, 'ওই দেখো মা, আমার জাহাজ দেখা দিয়েছে!'

রানীমা বলতেন, 'জাহাজ তো তৈরি আছে। তুই যদি ঘুম দিতে থাকিস তবে জাহাজ বেদখল হয়।'

হাম্বির বলতেন, 'এ জাহাজ মারে কার সাধ্য।'

হাম্বির যে ঘুম দিচ্ছিলেন না একথা লছমীরানী অতি অল্প দিনেই জানতে পারলেন। সেদিন দেওয়ালির পুজো! সন্ধ্যাবেলা হাম্বির এসে মাকে বললেন, 'মা, দেওয়ালির আলো দেখবে তো ছাদে এসো।'

রানীমা হেসে বললেন, 'আচ্ছা তুই এত বড়ো হলি তবু মায়ের সঙ্গে তামাশা করা রোগটা তোর এখনো গেল না? এই মাঠের

মধ্যে দেওয়ালির আলো কোথায় পেলি ? এ কি তোর চিতোর— যে ঘরে-ঘরে লোকে আলো দেবে ?'

'দেখবে এসো না মা' বলে হাম্বির লছমীরানীকে নিয়ে কেল্লার ছাদে উঠলেন। কার্তিক মাসের অমাবস্যা— কিন্তু আকাশ ছেয়ে তারা ফুটে ছিল ; যেন দেবতারা ফুল ছড়িয়ে গেছেন ! রানীমা অবাক হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছেন। হাম্বির হেসে বললেন, 'মা, কী চমৎকার বাহার দেখেছ ! কিন্তু এ দেওয়ালি তো দেবতাদের —তোমারও নয় আমারও নয়। এখন একবার কৈলোরের দেওয়ালি —আমার দেওয়ালিরই আলোটা কেমন হয়েছে এদিকে দেখো দেখি!'

রানীমা চেয়ে-চেয়ে দেখলেন— কৈলোরের কেল্লার চারিদিকে পাহাড়ে-পাহাড়ে আলো জ্বলছে ! গ্রামের পথে মাঠে-ঘাটে দিকে-দিকে লক্ষ-লক্ষ প্রদীপ, যেন তারার মালা, আলোর জাল ! লছমী-রানী অবাক হয়ে হাম্বিরের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'এই জনমানবহীন কৈলোরে এত আলো, এত লোক কোথা থেকে এল ?'

হাম্বির বললেন, 'ওই যে পাহাড়ের দিকে দেখছ ওই আলো সব ভীলেরা জ্বালিয়েছে। আর যে গ্রামের দিকে দেখছ এসব গ্রাম-বাসীদের দেওয়া।' রানীমা বললেন, 'এত প্রদীপ, এত তেল, তুই এসব বুঝি চিতোর থেকে আমদানি করলি ?'

হাম্বির বললেন, 'শুধু চিতোর থেকে নয়, সমস্ত মেবার থেকে প্রদীপ আর তেল, প্রদীপ গড়বার কুমোর, তেল যোগাবার তেলিও আমদানি করেছি। ওই দেখো, কুমোর-পাড়ায় মশাল জ্বলছে ; যাত্রা শুরু হল। ওই শোনো তামুলি-পাড়ায় ঢোল বাজছে ; এখনি সঙ বার হবে। ওই যে মহাজন পট্টিতে নহবৎ বাজল, তোপখানায় বোমা ফাটল। দেখছ মা, হাম্বিরতালাও ঘিরে ব্রাহ্মণের মেয়েরা কেমন প্রদীপ দিয়েছেন।'

লছমীরানী বলে উঠলেন, 'কী আশ্চর্য ; এ যে নগর বসিয়ে ফেলেছিস দেখি ! আমি বলি বুঝি তুই বসে-বসে কেবল ঘুম দিস। ভিতরে-ভিতরে তোর এত বুদ্ধি !'

হাম্বির বললেন, 'তা যাই হোক মা, এখন আমার এই নগরের একটি ভালো নাম তোমায় বেছে দিতে হবে। লক্ষ্মীপুর কেমন নাম ?'

রানীমা বললেন, 'আরে না না, ও যে বাঙালী রকম শোনাচ্ছে। আমি একটা ভালো নাম সন্ধান করছি। শুধু নাম নয়, তার সঙ্গে একটি লক্ষ্মী বউ। তুই আর দিন কতক সবুর কর।'

দুজনে যখন এই কথা হচ্ছে, সেই সময় চিতোর থেকে মালদেবের দূত আর একজন ব্রাহ্মণ হাম্বিরের বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে কৈলোরে উপস্থিত হল। ব্রাহ্মণ এসে মালদেবের চিঠি আর একটি রুপোর পাতে মোড়া নারকেল এনে লছমীরানীর সম্মুখে ধরে দিলেন। রানী চিঠিখানি খুলে পড়তে লাগলেন, লেখা রয়েছে— 'আমার কন্যা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। তাকে আপনার চরণে দাসী করে আমার কুলকে পবিত্র করুন। আমি পাঠানের আশ্রয়ে আছি বটে, কিন্তু ধর্ম ছাড়িনি!'

রানী হাম্বিরের দিকে চেয়ে বললেন, 'দেখ দেখি, মালদেব চিতোর থেকে কেমন সুন্দর নারকেলটি পাঠিয়েছেন। এটা আজ দেওয়ালির পুজোর কাজে লাগবে।'

হাম্বির বললেন, 'বেশ ফলটি, কিন্তু মা, এটার উপর প্রথম থেকেই আমার লোভ পড়েছে। এটা আর দেবতাদের দিয়ে কাজ নেই, এটা আমাকেই দাও।'

রানী হেসে বললেন, 'তা বেশ তোমাকেই দেওয়া গেল— রাজাও একরকম দেবতা তো। কিন্তু শুধু ফলটি নিলে তো চলবে না, সঙ্গে-সঙ্গে এই চিঠিখানি আর এখানি যে লিখেছে তার মেয়েটিকেও তোমায় নিতে হচ্ছে। যাও, এই ব্রাহ্মণকে নিয়ে এই চিঠির একটা ভালো করে জবাব লিখে নিয়ে এসো; আমি ততক্ষণ পুজো সেরে আসি।' রানী পুজোয় গেলেন। হাম্বির ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপারখানা কী বলো দেখি?' ব্রাহ্মণ বললেন, 'মহারানা, সভায় চলুন, সমস্ত খুলে বলব।'

বিয়ের সমস্ত ঠিকঠাক করে মালদেবের দূত চিতোরে ফিরে গেল।

এদিকে কৈলোরে বরযাত্রার উদ্‌যোগ চলতে লাগল। যত বুড়ো-বুড়ো রাজপুত সর্দার লছমীরানীকে ধরে বসলেন— 'মালদেব হাজার হোক শত্রুপক্ষ তো বটে। মহারানাকে সেখানে বিনা পাহারায় পাঠানো কোনো মতেই উচিত নয়।' রানীর হুকুমে পাঁচশো রাজপুত সেপাই বরযাত্রীর সঙ্গে যাবার জন্যে প্রস্তুত হল। হাম্বির মাকে প্রণাম করে বিদায় হলেন। লছমীরানী আশীর্বাদ করলেন, 'বৎস, মালদেবের কন্যার সঙ্গে মেবারের রাজলক্ষ্মীও তোমায় বরণ করুন।' কৈলোর থেকে চিতোর অনেক দূর, কিন্তু হাম্বিরের ঘোড়া যেন উড়ে চলল!

বরযাত্রীরা যখন চিতোরের সম্মুখে উপস্থিত হলেন তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়েছে। পশ্চিমের আলোয় আকাশ ছেয়ে গেছে। ঠিক যেন দেবদূতেরা মহারানার মাথায় ছাতা ধরেছেন।

কিন্তু মালদেব— যাঁর কন্যা আজ মেবারের অধীশ্বরী রাজ-রাজেশ্বরী হতে চলেছেন, তিনি কোথায়? কেল্লার দরজায় একটিমাত্র প্রহরী মহারানাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে দুয়ার ছেড়ে পাশে দাঁড়াল! মঙ্গল-শাঁখ নেই, কন্যাযাত্রীর আনন্দ নেই, যেন কোনো নির্জন পুরীতে হাম্বির প্রবেশ করলেন।

বুড়ো মন্ত্রী এসে হাম্বিরের কানের কাছে বললেন, 'মহারানা, যেন কেমন কেমন ঠেকছে! মালদেবের লক্ষণ ভালো নয়। আমার মতে কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করা উচিত হয় না।'

হাম্বির বললেন, 'নিজের কেল্লায় নিজে প্রবেশ করব, তার আবার ভয়টা কী? চলে এসো—'

সেই সময় ফটকের এক কোণ থেকে মালদেব এসে বললেন, 'মহারানা, আমারও সেই আশা ছিল, আপনি নিজের ঘরে আসছেন তার জন্যে আবার অভ্যর্থনাই বা কী, বাজনা-বাদ্যিই বা কেন?'

মন্ত্রী বললেন, 'মালদেব, তুমি কি জানো না রাজপুতদের নিয়ম

আছে বিবাহের রাত্রে ফুলের কেল্লা দখল করে তবে কন্যা-কর্তার বাড়িতে বর প্রবেশ করেন ? তোমার কন্যার সখীরা সে আয়োজন করেননি কেন ?'

মালদেব বললেন, 'মন্ত্রী, আমি কন্যার পিতা বটে, কিন্তু বাড়ি আমার কোথা ? এটা যে মহারানার নিজেরই কেল্লা। নিজের ঘরে নিজে মহারানা এসে প্রবেশ করছেন, সেখানে আমার কন্যার সখীরা এসে তাঁকে বাধা দিতে সাহস পাবে কেন ?'

মন্ত্রী একটু হেসে বললেন, 'দেখছি বাদশাহের মজলিসে আনাগোনা করে আপনার কুসংস্কার অনেকটা দূর হয়েছে। এখন চলুন, বিবাহকার্য সুসম্পন্ন করুন ! লছমীরানীর হুকুম, আজ রাত্রেই বরকন্যা নিয়ে আমরা কৈলোরে ফিরে যাব।'

হাম্বিরের পিতা পিতামহ যে রাজসভায় বসে রাজত্ব করতেন, সেই ঘরে হাম্বিরকে নিয়ে মালদেব যখন উপস্থিত হলেন, তখন হাম্বিরের বুকের ভিতরটা কেমন যে করে উঠল তা বলা যায় না। তাঁর মনে হল যেন সেই প্রকাণ্ড ঘরের একধারে চিতোরের শূন্য রাজসিংহাসন ঘিরে ছায়ার মতো সব বীরপুরুষ দাঁড়িয়ে রয়েছেন একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে। তাঁদের গায়ে সোনার সাঁজোয়া, হাতে খোলা তলোয়ার, মুখে কারু কথা নেই ; হাম্বিরের সঙ্গে যত রাজপুত এসেছিল সবাইকার চোখ সেই সিংহাসনের দিকে ! প্রকাণ্ড ঘরের আবছায়া অন্ধকারে চিতোরের শূন্য সিংহাসনের উপরে সোনার রাজচ্ছত্র আলো পেয়ে একবার ঝলমল করছে, আবার যেন অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। হাম্বিরের সঙ্গে পাঁচশো রাজপুত সেই সিংহাসনকে নমস্কার করে যেমন উঠে দাঁড়ালেন, অমনি সেই অন্ধকার ঘর যেন আলো করে কমলকুমারী সখীদের সঙ্গে এসে হাম্বিরের গলায় পদ্মফুলের মালা দিলেন ! চিতোরের রাজলক্ষ্মী এতদিন অনাথা বিধবার মতো শূন্য রাজপুরে যেন একা ছিলেন, আজ যেন কতদিন পরে চিতোরের রাজকুমার এসে তাকে হাতে ধরে বরণ করে নিলেন !

কতদিন পরে চিতোরের কেল্লায় আর একবার মঙ্গলশাঁখ বেজে

উঠল। চিতোরের গড় বড়ো-বড়ো তালা-বন্ধ ঘর নিয়ে এতদিন শূন্য পড়ে ছিল, আজ সেই শাঁখের শব্দে পাঁচশো রাজপুতের তলোয়ারের ঝনঝনায় আর একবার যেন লোকে লোকারণ্য বোধ হতে লাগল; যেন তার আগেকার শ্রী আবার ফিরে এল।

সেইদিন থেকে দুই বৎসর না যেতে সত্যি-সত্যিই হাম্বির এসে চিতোরের কেল্লা দখল করে নিলেন। দিল্লীর নবাব মহম্মদ খিলজীর কাছে এ খবর পৌঁছতে গেল মালদেবের ছেলে বনবীর। তার আশা ছিল মালদেবের পরে সে-ই চিতোরে বসে রাজত্ব করবে। তাই সে মহম্মদ খিলজীর সঙ্গে পাঠান ফৌজ নিয়ে চিতোরের দিকে আসতে লাগল।

শিঙ্গোলীতে পাঠান বাদশা ফৌজ নিয়ে তাম্বু গেড়েছেন। লছমীরানীর সঙ্গে কমলকুমারী আর এক বছরের রাজকুমার ক্ষেত-সিংহকে আর একবার কৈলোরের কেল্লায় পাঠিয়ে দিয়ে হাম্বির যুদ্ধে গেলেন।

বাঘ যেমন হরিণের পালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি রাজপুত-সৈন্য পাঠান ফৌজের উপর গিয়ে পড়ল। সেবারে মহম্মদ খিলজীকে আর দিল্লীর মুখে ফিরে যেতে হল না। হাম্বির তাঁর দুই পায়ে শিকল দিয়ে চিতোরের কেল্লায় এনে তাঁকে বন্ধ করলেন। বনবীরেরও সেই দশা। কমলকুমারীর ভাই বলে সে-যাত্রা হাম্বির তাঁকে প্রাণে না মেরে বন্দী করে কৈলোরে নিয়ে উপস্থিত হলেন।

হাম্বির থাকেন কৈলোরে, আর চিতোরে কড়া পাহারার মধ্যে থাকেন দিল্লীর বাদশা মহম্মদ খিলজী। এক মাস, দু-মাস, তিনমাস যায়, হাম্বির আর চিতোরে যাবার নাম-গন্ধ করেন না। একদিন লছমীরানী তাঁকে ডেকে বললেন, 'তুই কি পাঠান বাদশাকে চিতোর ছেড়ে দিলি নাকি? যেখানে তোর রাজসিংহাসন, সেই চিতোর ছেড়ে কৈলোরে এসে বসে থাকা তো আর সাজে না। তোর রাজা হয়ে রাজসিংহাসনে বসবার ইচ্ছে নেই কি?'

হাম্বির বললেন, 'মা চিতোরের সিংহাসনে বসতে হলে কী চাই তা

জানো ?' শুধু মুঞ্জ ডাকাতের হাত থেকে চিতোরের রাজমুকুট কিংবা পাঠান ফৌজের কাছ থেকে চিতোর গড়টা কেড়ে নিলে বাপ্পারাওর সিংহাসনে বসা যায় না ! ভবানী মায়ের হাতের খাঁড়াখানি যতদিন না সন্ধান করে পাওয়া যায় ততদিন তো রাজা হওয়া যাবে না। আগে সেই খাঁড়াখানির পুজো দিয়ে তবে রাজসিংহাসনে বসা চাই। সে খাঁড়া যে এখন কোথায়, তা কেউ জানে না। কেউ বলে পাঠানেরা লুটে নিয়ে গেছে, কেউ বলে রানী পদ্মিনীর সঙ্গে সে খাঁড়া চিতার আগুনে ছাই হয়ে গেছে।'

লছমীরানী বললেন, 'আমি এ দুটো কথার একটাও বিশ্বাস করিনে। লোকে যাই বলুক, আমার বিশ্বাস ভবানীর খাঁড়া এখনো চিতোরেই আছে ; কেবল চিতোরে এমন কেউ কাজের লোক নেই যে সেই খাঁড়াখানি যত্ন করে সন্ধান করে। লোকেরই বা দোষ দিই কেন ? চিতোরের যে রাজা তাঁরই যখন কোনো চেষ্টা দেখা যাচ্ছে না তখন সামান্য লোকের এত কী গরজ যে খাঁড়াখানা সন্ধান করে তাদের রাজার হাতে তুলে দেয় !' সেই দিন হাম্বির মায়ের পায়ে হাত দিয়ে শপথ করলেন, 'ভবানীর খাঁড়া উদ্ধার করে তবে অন্য কাজ !'

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, আকাশে মেঘ করে একটু-একটু বৃষ্টি পড়ছে ; হাম্বির ও কমলকুমারী দুজনে লুকিয়ে চিতোরের কেল্লায় এসেছেন। গ্রামবাসী চাষা-চাষীর সাজে কমলকুমারী পথ দেখিয়ে যাচ্ছেন আর হাম্বির তাঁর সঙ্গে গায়ে একখানা মোটা কম্বল জড়িয়ে মস্ত পাগড়িতে মুখের আধখানা ঢেকে গুটি-গুটি চলেছেন বরাবর যেদিকে শ্মশান সেই দিকে। আকাশ দিয়ে কালো-কালো মেঘ হু-হু করে পুব থেকে পশ্চিমে ছুটে চলেছে। ঝড়ের তাড়ায় বড়ো-বড়ো গাছের ডালগুলো মচমচ করে শব্দ করছে। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার, কেউ কোথাও নেই, বাতাস এমন ঠাণ্ডা যে গায়ে লাগলে গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। এই অমাবস্যার রাত্রে ঝড়ে জলে ঘোর অন্ধকারে কমলকুমারী হাম্বিরকে নিয়ে মহাশ্মশানের ভিতরে এসে উপস্থিত হলেন। চোখে কিছু দেখা

যায় না, কেবল একদিক থেকে ঝরঝর করে একটা শব্দ আসছে—যেন অন্ধকারের ভিতরে একটা ঝরনা পড়ছে।

যেদিক থেকে জলের শব্দ আসছিল, সেইদিক দেখিয়ে কমলারানী হাম্বিরকে বললেন, 'ও ঝরনার ধারে পাহাড়ের গায়ে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ, তারই পাশ দিয়ে একটা সুড়ঙ্গ পাতালের দিকে নেমে গেছে ; সেই সুড়ঙ্গের ভিতরে পদ্মিনীরানী চিতার আগুনে পুড়ে মরেছিলেন। ওই সুড়ঙ্গের শেষে একটা গুহায় কারুণী দেবীর মন্দির! শুনেছি সেইখানে একটা অজগর সাপ পাহারা দিচ্ছে, আর ঠিক তার মাথার উপরে ভবানীর খাঁড়া ঝুলছে। আমি অনেকবার সেই সুড়ঙ্গ পর্যন্ত গেছি কিন্তু ভিতরে যেতে সাহস হয়নি!'

হাম্বির বললেন, 'তুমি সুড়ঙ্গ পর্যন্ত আমার সঙ্গে চলো ; সেই বটগাছের তলায় তোমাকে রেখে আমি ভেতরে যাব।'

শ্মশানের একধার দিয়ে একটা আঁকা-বাঁকা সুঁড়ি-পথ অন্ধকারের দিকে নেমে গেছে! দুজনে সেই পথে পায়ে-পায়ে চললেন ; কতদূর চলে সামনে একটা জলের নালা— আর রাস্তা নেই! পাথর কেটে ঝরনার জল কুলকুল করে ছুটে চলেছে। নালার জল এক হাঁটু, কিন্তু বরফের মতো ঠাণ্ডা— পা রাখা যায় না।

হাম্বির কমলারানীকে দুই হাতে তুলে ধরে সেই জলের উপর দিয়ে হেঁটে সেই বটগাছের দিকে চলেছেন। শুনতে পাচ্ছেন, দূরে যেন পাহাড়ের ভিতর থেকে ঝনঝন করে একটা শব্দ আসছে! কারা যেন লোহার কপাট ধরে নাড়া দিচ্ছে। বটগাছের একটা শিকড় ধরে হাম্বির ডাঙায় উঠলেন। সেখানটা এমন নিস্তব্ধ, এমন অন্ধকার যে মনে হয়, পৃথিবী ছেড়ে কোথাও এসেছি!

সেই বটতলায় কমলারানীকে বসিয়ে রেখে হাম্বির অন্ধকারে দুহাত বাড়িয়ে সুড়ঙ্গের ভিতর নেমে চললেন। দুদিকে পাহাড়ের দেয়াল বেয়ে জল পড়ছে! একটু আলো নেই, একটু শব্দ নেই, সামনে কিছু দেখা যাচ্ছে না, পিছনে কিছু সাড়া দিচ্ছে না! নীল

অন্ধকারের ভিতর দিয়ে হাম্বির একা চলেছেন। একবার তাঁর পায়ে ঠেকে কী একটা গড়গড় করে গড়িয়ে গেল। হাম্বির সেটা হাতে তুলে দেখলেন একটা মড়ার মাথা! কখনো তাঁর পায়ের চাপনে একখানা শুকনো মড়ার হাড় মড়মড় করে গুঁড়িয়ে গেল। কখনো পাহাড়ের ফাটল বেয়ে একটা গাছের শিকড় নেমেছে, সেটা তাঁর হাতে ঠেকতে মনে হল যেন সাপের গায়ে হাত পড়েছে; কখনো তিনি দূরে থেকে যেন ফোঁস-ফোঁস আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন; কখনো মনে হচ্ছে কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে; এক-এক জায়গায় আলেয়া একবার দপ করে জ্বলেই নিবে যাচ্ছে; কোথাও মনে হচ্ছে পাথরের দেয়াল কত দূরে যেন সরে গেছে; আবার এক-এক জায়গায় দেয়াল যেন চেপে পড়তে চাচ্ছে। এক জায়গায় শুনলেন মাথার উপর থেকে কাদের যেন কান্নার শব্দ আসছে; পা যেন তাঁর ছাইগাদায় বসে যেতে লাগল; মাথার উপর হাম্বির চেয়ে দেখলেন অনেক দূরে নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে— চারিদিকে তার গোল পাথরের দেয়াল, কোনো দিকে আর যাবার পথ নেই! সেই অন্ধকূপের ভিতর হাম্বির চারিদিকে হাতড়ে বেড়াতে লাগলেন। নিচে পথ নেই, উপরে পথ নেই, আশে-পাশে পাথরের দেওয়াল, তারি মাঝে স্তূপাকার ছাই, চলতে গেলে পা বসে যায়।

কতক্ষণ হাম্বির সেইখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, এমন সময় পাথরের দেয়ালের উপর থেকে শুনলেন শাঁখ ঘণ্টার শব্দ আসছে! দেখতে-দেখতে হাম্বিরের চোখের সামনে খানিকটা পাথরের দেয়াল দুফাঁক হয়ে সরে গেল; সেই ফাঁক দিয়ে হাম্বির দেখলেন, গেরুয়া কাপড় রুদ্রাক্ষের মালা পরা পাঁচজন ভৈরবী আগুনের উপরে একখানা প্রকাণ্ড লোহার কড়া ঘিরে বসে রয়েছেন। অনেকদূরে কারুণী দেবীর সোনার মূর্তি আগুনের আলোয় ঝকঝক করছে। হাম্বির নির্ভয়ে কারুণীর মন্দিরে যেখানে ভৈরবীরা বসে রয়েছেন, সেখানে উপস্থিত হলেন। হাম্বিরকে দেখে ভৈরবীরা বিকট চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'কেরে তুই! কী চাস?'

হাম্বির নির্ভয়ে বললেন, 'আমি এসেছি যা আমার তাই চাইতে। মা ভবানী বাপ্পাকে যে খাঁড়া দিয়েছিলেন, সে খাঁড়া এইখানে আছে, আমি তাই চাই! তারই জন্যে আমার মা আমাকে পাঠিয়েছেন—আমি চিতোরের রানা হাম্বির!'

ভৈরবীরা হাম্বিরের কথার উত্তর না দিয়ে আগুনের উপর সেই লোহার কড়াখানার দিকে দেখিয়ে দিলেন। হাম্বির ছুটে গিয়ে যেমন সেই কড়াখানার ভিতর হাত দিয়েছেন অমনি কোথায় সে আগুন, কোথায় সে কড়া, কোথায় বা সে ভৈরবীর দল! হাম্বির দেখলেন ভবানীর খাঁড়া হাতে তিনি কমলারানীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন; আর অজগর সাপের মতো খানিকটা ধোঁয়া সেই সুড়ঙ্গের মুখ থেকে বেরিয়ে চলেছে আস্তে-আস্তে। হাম্বির ভবানীর খাঁড়া হাতে যেদিন চিতোরের রাজসিংহাসনে উঠে বসলেন, সেদিন সমস্ত রাজস্থানে জয়জয়কার পড়ল। দিল্লীর বাদশা মহম্মদ খিলজী সেদিন পঞ্চাশ লাখ মোহর হাম্বিরকে নজর দিয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন এ জীবনে আর চিতোর-মুখো হবেন না; তবে তিনি ছাড়া পেলেন।

কমলকুমারী হাম্বিরকে ভবানীর খাঁড়াখানির সন্ধান দিয়েছিলেন বলে হাম্বির তাঁর কথায় বনবীরকে ছেড়ে দিলেন আর কৈলোরের কেল্লার নাম রাখলেন— কমলমীর।

লছমীরানী হাম্বিরকে সিংহাসনে বসিয়ে উজলাগ্রামে তাঁর বাপের বাড়ি চলে গেলেন তাঁর সেই ছেলেবেলার ঘরে নদীর পারে খেতের ধারে।

চণ্ড

হাম্বিরের নাতি লখারানা— লড়াই করতে-করতে তিনি এখন বুড়ো হয়েছেন। আর তাঁর তলোয়ার, সে শত্রুর মাথা কাটতে-কাটতে এমন ভোঁতা হয়ে গেছে যে কেবল মুঠসার একগাছা আখ কাটবারও ধার তাতে নেই। তলোয়ারের ধার না থাকুক লখারানার কিন্তু কথার ধার খুবই ছিল ; ঠাট্টায় তামাশায় তাঁর মুখের কাছে দাঁড়ায় কার সাধ্য। বয়সের সঙ্গে রানার মসকরা করবার বাতিক ক্রমেই বেড়ে চলেছিল।

সে একদিনের কথা— শাদা জামাজোড়া, শাদা দোপাট্টা, পাকা চুলের উপরে ধবধবে পাগড়ি পরে লখারানা লক্‌কা পায়রাটি সেজে বসে আছেন। পাহাড়ের উপর শ্বেত পাথরের খোলা ছাদ— আধখানায় চাঁদের আলো পড়েছে, আর আধখানায় কেল্লার উঁচু পাঁচিলের কালো ছায়া বিছিয়ে গিয়েছে ; রানার চারিদিকে সভাসদ পারিষদ, সকলের হাতে এক-এক খোরা সিদ্ধি। এখনি জলসা শুরু হবে— চাকরেরা বড়ো-বড়ো থালায় ফুলের মালা, পানের দোনা এনে রেখেছে, গোলাপ আর আতরের গন্ধ, ছাদের এক কোণে একদল নাচনী সোনার ঘুঙুর এ-ওর পায়ে জড়িয়ে দিচ্ছে। এমন সময় রাজকুমার চণ্ডের সঙ্গে মাড়োয়ারের রাজকুমারীর বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে রণমল্লের দূত এসে উপস্থিত— রুপোর পাতে মোড়া একটি নারকেল হাতে। মাড়োয়ারের দূত বেশ একটু মোটা ; তার উপর এগারোগজি থানের প্রকাণ্ড এক পাগড়ি বেঁধেছেন আর তাঁর আগে-আগে পেটটি এগিয়ে চলেছে। দূতকে দেখে লখারানা অনেক কষ্টে হাসি চাপলেন কিন্তু এই মানুষ-লাটিমকে নিয়ে একটু মসকরা করবার লোভ তিনি আর কিছুতেই সামলাতে পারলেন না।

রানা দূতের হাত থেকে রুপোয় মোড়া নারকেলটি নিজেই নিয়ে

বলছেন, 'বা, বেশ তো, এটা বুঝি তোমার রাজা এই বুড়ো বয়সে আমার খেলার জন্যে পাঠিয়েছেন ?'

দূতের বলা উচিত ছিল— আজ্ঞে না, এটি রাজকুমার চণ্ডের জন্যে কেননা তাঁরই সঙ্গে আমাদের রাজকুমারীর বিয়ের কথা নিয়ে এসেছি, আপনার মতো পাকা দাড়ির খেলার জিনিস এটি নয়—কিন্তু রানার ভাবগতিক দেখে দূতের মুখে আর কথা সরছে না। এদিকে সভাসুদ্ধ লোক মুখ টিপে হাসছে, ওদিকে লজ্জায় রাজকুমার চণ্ডের মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে। দূত তখন বিষম সমস্যায় পড়ে বলছেন, 'মহারানা, বড়ো সুখের কথা যে আপনি নিজেই আমাদের রাজকুমারীকে চাইলেন, আমাদের দেশের রাজা গরীব, তাঁর এতদূর সাহস কেমন করে হবে যে বিয়ের সম্বন্ধ করে মহারানাকে নারকেল পাঠাবেন ? তিনি চেয়েছিলেন রাজকুমারকে জামাই করতে, কিন্তু কী আশ্চর্য, তিনি স্বপ্নেও যা আশা করেননি তাই ঘটল ! মহারানার যদি হুকুম হয় তবে আমি আমার রাজাকে গিয়ে এই সুখের খবর এখন পাঠিয়ে দিই'— বলেই দূত উঠতে যান— রানা তখন কী জবাব দেন, তাড়াতাড়ি দূতের হাত ধরে বললেন, 'রোসো, আমি তামাশা করছিলাম, ডাক কুমার বাহাদুরকে'— কুমার তখন সভা ছেড়ে উঠে গেছেন। রানার দূত চণ্ডের কাছে ছুটল কিন্তু চণ্ড বলে পাঠালেন— মহারানা তামাশা করেও যে রাজকুমারীকে বিয়ে করতে চেয়েছেন তিনি আজ থেকে আমার মায়ের তুল্য, আমি কিছুতেই তাঁকে বিয়ে করব না।

বুড়ো রানা বড়ো বিপদেই পড়লেন ! কী আশ্চর্য, ছেলেটা তামাশা বোঝে না ! লোকের পর লোক রাজকুমারকে বোঝাতে ছুটল কিন্তু চণ্ডের প্রতিজ্ঞা অটল। রানা নিজের কথার ফাঁদে নিজেই বাঁধা পড়লেন। এবারের তামাশা যে জাদুকরের আমগাছের মতো দেখতে-দেখতে এমন সত্যি হয়ে উঠবে এটা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি ; বিয়ে করতে দুঃখ নেই কিন্তু তামাশাটা যে দূতকে ছেড়ে উল্‌টে তাঁকে নিয়েই শুরু হল এইটেতেই তাঁর আপত্তি।

অনেক বোঝানোর পরেও যখন চণ্ড বিয়ে করতে রাজী হলেন না, তখন রাগে বুড়ো রানা পাকা দাড়িতে মোচড় দিয়ে বললেন, 'দেখো চণ্ড, তোমার প্রতিজ্ঞা তুমি রাখো ; কিন্তু আমিও প্রতিজ্ঞা করলেম, এবার আমার যে ছেলে হবে তাকেই আমি সিংহাসন দেব, সে-ই হবে রানা আর তোমাকে তার একজন সামন্ত হয়ে থাকতে হবে।' চণ্ড একলিঙ্গ মহাদেবের নামে শপথ করে বললেন, 'তাই হবে!' সভাসুদ্ধ লোক চুপ হয়ে রইল। মাড়োয়ারের দূত রানার বিয়ের হুকুম নিয়ে বিদায় হল।

বুড়ো বয়সে বর সেজে যে তামাশা দেখাতে হল সেটা লখারানার বড়োই বাজল ; তিনি চণ্ডকে কিছুতে ক্ষমা করতে পারলেন না। বিয়ের দুবছর পরে দুমাসের ছেলে মকুলকে মেবারের সিংহাসনে বসিয়ে তিনি এক কম্বল এক লোটা নিয়ে তীর্থ করতে বেরিয়ে গেলেন— কবে কোনখানে জীবনের বিষম তামাশার থেকে তাঁর যে নিষ্কৃতি হল তা জানা গেল না।

মকুল তখন ভারি ছোটো, নেহাত কচি— কাজেই রাজার যা কিছু কাজ সবই চণ্ডকে করতে হয়, রাজা না হয়েও তিনি রাজা। দেশের লোকের মুখে চণ্ডের সুখ্যাতি আর ধরে না। চণ্ডকে তারা যেমন ভয় করে তেমনি ভক্তিও করে, ভালোওবাসে ; এটা কিন্তু মকুলের মায়ের আর যত মাড়োয়ারী মামার দলের প্রাণে সয় না। চণ্ড কাউকে কিছু বলেন না— কিন্তু বোঝেন তাঁর আর বেশি দিন এ রাজ্যে থাকা চলবে না। এই যে রাজবাড়ি যেখানে চণ্ড মায়ের কোলে মানুষ হয়েছেন, বাপের আদরে বেড়ে উঠেছেন, এখানে তাঁর আপনার বলতে আজ কে আছে? পুরোনো চাকর যারা ছিল মহারানী তাদের তাড়িয়ে নিজের দেশ থেকে যত মাড়োয়ারী এনে কাজে রেখেছেন। তাঁর নিজের যে মহল সেখানে রানীর ভাইরা এসে ঢুকেছেন, তাঁর যে সোনা-রুপোর খাট-বিছানা আসবাবপত্র সবই এখন মকুলের, রাজবাড়িতে নিজের বলতে রয়েছে একমাত্র তাঁর তলোয়ার! কিন্তু মকুল—সেই অফুটন্ত ফুলের মতো কচি মকুল,

তাঁর চেয়ে পঁচিশ বছরের ছোটো মকুল, সেই হাসি মুখে ছোটো ভাই মকুল— যে এখনো চলতে শেখেনি, বলতে শেখেনি, সে কি তাঁর আপনার নয়? সকালে সন্ধ্যায় রাজসভাতে নিয়ে যাবার সময় সে যখন তার ছোটো দুটি হাত দিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে, তখন কি আর চণ্ডের কোনো দুঃখ মনে থাকে? চণ্ড কতবার মনে করেছেন চলে যাই, কিন্তু এই ছোটো ভায়ের ছোটো হাতের বাঁধন— তাঁর সব দুঃখের উপরে কচি দুখানি হাতের পরশ— একে ছেড়ে যাওয়া, একে কাটিয়ে বেরিয়ে পড়া চণ্ডের আর হয়ে ওঠে না! তিনি বছরের পর বছর সব দুঃখ সয়ে এই ছোটো ভাই মকুলকে একদিন মেবারের রাজসিংহাসনে বসবার মতো উপযুক্ত করে, মানুষ করে তুলতে লাগলেন। দারুণ গরমের দিনে সকাল-সকাল সভা ভঙ্গ করে মকুলকে নিয়ে চণ্ড খোলা ময়দানে গোলা-খেলা করতে যান, চণ্ড চড়েন এক ঘোড়ায় আর এক টাট্টুতে মকুল— মাথার উপরে রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে, কোথাও একটু ছায়া নেই, এরি মাঝে দুই ভায়ের ঘোড়া বিদ্যুতের মতো গোলার পিছনে পিছনে ছুটে-ছুটে চলেছে— মুখে চোখে আগুনের মতো বাতাস লাগছে, দুই ভায়ের মুখ রক্তের মতো রাঙা হয়ে উঠেছে সূর্যের তাপে। আবার হয়তো কোনো দিন ঘোরতর মেঘ করে ঝুপ-ঝুপ বৃষ্টি নেমেছে— চণ্ড চলেছেন মকুলকে নিয়ে শিকারে— কাদা ভাঙতে-ভাঙতে, জলে ভিজতে-ভিজতে, থৈ-থৈ করছে নদীতে জল, সাঁতার দিয়ে তা পেরিয়ে, বাড়ি থেকে অনেক দূরে গ্রাম ছাড়িয়ে অনেকখানি জঙ্গল আর জলার মাঝে। শীতের দিনে তাদের খেলা পাহাড়ে-পাহাড়ে। সেখানে বরফের মতো বাতাস ধারালো ছুরির মতো বুকে এসে লাগে। এমনি করে মকুল মানুষ হচ্ছেন, দিন-দিন শক্ত হচ্ছেন, তাঁর খাওয়া-পরা খেলাধূলা রাজার ছেলে বলে কিছু যে আরামের ছিল তা নয়— চণ্ড মেবারের একজন সামান্য রাজপুতের ছেলের সঙ্গে যে একদিন মেবারের সর্বময় কর্তা হবে তার কোনো বিষয়ে কিছু তফাত রাখলেন না; এমনি করে লখারানা চণ্ডকে মানুষ করেছিলেন, আর ঠিক

তেমনি করে চণ্ড তাঁর ছোটো ভাইকে সিংহাসনের উপযুক্ত হবার, আপদে-বিপদে দুঃখে-কষ্টে বীরের মতো নির্ভয়ে থাকবার জন্যে ছোটোবেলা থেকেই তৈরি করছেন। এটা কিন্তু মকুলের মায়ের ভালো লাগে না। তিনি চান গরমে মকুল পাখার বাতাসে, বাদলে ছাতার তলায়, শীতে লেপ-তোশকের মধ্যে থেকে মোমের পুতুলটির মতো গোলগাল মোটাসোটা হয়ে উঠুক! এর জন্যে মকুলকে আর কখনো কখনো চণ্ডকেও মহারানীর কাছে গঞ্জনা সইতে হয়। মকুল সে ছেলেমানুষ, মায়ের ধমকে কখনো রাগ করে, কখনো খানিক কাঁদে আবার একটু পরেই সব ভুলে যায়— চণ্ডের প্রাণে কিন্তু রানীর বাক্যবাণ তীরের মতো গিয়ে বাজে।

এক-একদিন তিনি আপনার খুব প্রাণের যাঁরা বন্ধু বুড়ো-বুড়ো সর্দার তাঁদের কাছে বলেন— 'আর না, এখানে আর থাকা চলে না। সবাই বলে আমি আমার ভাইকে বশ করে নিয়ে নিজে রাজাগিরি করছি; সে যখন আমার হুকুমে ওঠে-বসে, তখন আমিই হলেম সত্যি রাজা আর সে একটা সাক্ষিগোপাল— নামমাত্র মেবারের রাজা। আপনারা আমায় ছুটি দিন, আমি অন্য রাজ্যে গিয়ে থাকি!' বুড়ো সর্দারেরা বলেন, 'এখনো সময় হয়নি, যুবরাজ, আরো কিছুদিন থাক, মকুল আর একটু উপযুক্ত হয়ে উঠুক।'

চণ্ড চান কোনো সর্দারের হাতে মকুলকে মানুষ করবার ভার দিয়ে বেরিয়ে পড়েন, কিন্তু কোনো সর্দার সে ভার নিতে চাইলে তবে তো! তাঁরা কেবলই বলেন— আমরা মকুলের জন্য সব করতে প্রস্তুত, কিন্তু যুবরাজ তবু আমরা পর মাত্র আর আপনি তার ভাই। চণ্ড আর কোনো জবাব দিতে পারেন না। বাপ থাকলে কেউ তো চণ্ডকে মকুলের জন্য কষ্ট নিতে বলত না; কিন্তু এখন ভাই যদি তাকে না দেখে তবে মকুলকে রাজা হবার মতো শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে মানুষ করে তোলে কে?

এমনি করে দিন কাটছে, ইতিমধ্যে একদিন— কাল বৈশাখের রাতদুপুরে অন্ধকার দিয়ে বড়ো-বড়ো শাদা মেঘ একখানার পর

একখানা আস্তে আস্তে পুব থেকে পশ্চিমে চলেছে, মনে হচ্ছে যেন বড়ো-বড়ো পাল তুলে আকাশের এপার থেকে ওপারে, অন্ধকারে পাড়ি দিচ্ছে একটির পর একটি নৌকা ! একটি তারা নেই, একটু শব্দ নেই। চণ্ড সারাদিনের কাজ সেরে সেই দিকে চেয়ে আছেন ঘরের আলো নিবিয়ে একলাটি, রাজবাড়ির সবাই ঘুমিয়ে, কেবল চণ্ড জেগে একা। আজ চণ্ডের বুকের ভিতরে একটা বেদনা থেকে-থেকে দুই পাঁজরের হাড়গুলো মোচড় দিয়ে-দিয়ে যেন ভাঙতে চেষ্টা করছে ! ব্যথা যে কিসের, বেদনা যে কতটা, চণ্ড তা বুঝতে পারছেন না ; তাঁর কেবলি মনে হচ্ছে মকুলকে একবার কাছে ডাকি কিন্তু উঠতেও পারছেন না, ডাকতেও পারছেন না। অন্ধকারের মধ্যে একলাটি চুপ করে পড়ে রয়েছেন। চণ্ডের দেহ-মন সমস্ত অসাড় হয়ে মরে গেছে কেবল তাঁর চোখ যেন জীবনের সব আলোটুকু টেনে নিয়ে প্রহরের পর প্রহর বর্ষা রাতের অন্ধকারে কী যেন সন্ধান করে ফিরছে ! একটা ঝড় অনেকখানি ঠাণ্ডা হাওয়ার ধাক্কায় গাছপালা ঘরবাড়ি জলস্থল আকাশ দুলিয়ে চলে গেল, অনেকখানি বৃষ্টির জল ঝরঝর করে চারিদিকে ঝরে পড়ল, বিদ্যুৎ বাজ খানিক চমক দিয়ে ধমক দিয়ে চলে গেল ; তারপরে মেঘ আস্তে-আস্তে পাতলা হয়ে এল, রাত্রি শেষের সঙ্গে রুপোর মতো শাদা আলো ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে এসে অন্ধকারকে ক্রমে ফিকে করে ভোরের একটি ছোটো পাখির গানের সঙ্গে-সঙ্গে ক্রমেই ফুটে উঠতে লাগল ; ঠিক সেই সময় বাদলা দিনের সকাল বেলায় ফুটন্ত কচি আলোর মাঝখানে একখানি জলে ভরা মেঘ ! চণ্ড দেখছেন, সে কিবা চোখ জুড়ানো শান্ত রূপ— যেন তাঁর মা। চণ্ড সেই মেঘের দিক থেকে আর চোখ ফেরাতে পারছেন না, সারারাত্রি অন্ধকারের মধ্যে তাঁর দুই চোখ যে এরই সন্ধানে, তাঁর মরা মায়ের সন্ধানে ফিরছিল, এতক্ষণে দেখা পেলেন ; তাঁর বুকের বেদনা, টানা-তার ছেড়ে দিলে যেমন, তেমনি কাঁপতে-কাঁপতে একেবারে শান্ত হয়ে গেল। সেই সারারাতে বাদল দিয়ে ধোয়া মেঘ, সেই মায়ের চোখের

জলে জলভরা সেই সকালের মেঘ, তারই দিকে চেয়ে চণ্ড ঘুমিয়ে পড়লেন।

এদিকে বেলা হয়েছে। রাজসভায় যাবার ঘণ্টা পড়েছে— মহারানী মকুলকে সাজগোজ করিয়ে বসে রয়েছেন এমন সময় মকুলের দাই এসে বললে, 'রানীমা, আজ আর সভা বসবে না; বড়োকুমার চণ্ডের শরীর খারাপ হয়েছে।' সেখানে মহারানীর বাপ রণমল্ল বসেছিলেন; তিনি বলে উঠলেন, 'কেন, বড়োকুমার নইলে রাজসভা বন্ধ থাকবে, রানা মকুল কি কেউ নয়?' দাই সে অনেক দিনের, চণ্ডকেও সে মানুষ করেছে— রণমল্লের কথায় কী একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, রানী তাকে ধমকে বললেন, 'যা, তোর আর তকরার করতে হবে না; বাবা এখুনি মকুলকে নিয়ে সভায় যাচ্ছেন; তুই সর্দারদের বসতে বলগে যা!'

মেবারের সিংহাসনে সেই দিন সূর্যবংশের কেউ না বসে, বসল কিনা পেটমোটা মাড়োয়ারী রণমল্ল নাতি মকুলকে কোলে নিয়ে! লজ্জায় সর্দারদের মুখ লাল হয়ে উঠল! সেই সময় চণ্ড হঠাৎ ঘুমের থেকে চমকে উঠে চেয়ে দেখলেন আকাশে গ্রহণ লেগেছে, সূর্য একখানা কলঙ্ক-ধরা তামার থালার মতো দেখা যাচ্ছে, আর সেই বুড়ি দাই তাঁর পায়ের তলায় বসে দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে।

সেদিন সভাভঙ্গের পর বর্ষাকালের আকাশের মতো মুখ আঁধার করে রাজপুত সর্দারেরা যখন চণ্ডের কাছে এসে উপস্থিত, তখন চণ্ড তাঁদের হাত ধরে অনুরোধ করে বললেন, 'দেখুন, মহারানীমা'র ইচ্ছা নয় যে, আমি আর মেবারের কোনো রাজকার্য চালাই; কাল রাত্রে একথা মহারানীমা নিজের মুখে স্পষ্ট করে বলেছিলেন, আজ সকালে তাঁরই হুকুমে মাড়োয়ারের রাজা রণমল্ল মকুলের দেখাশোনার ভার নিয়েছেন, এখন থেকে রাজ্যের কাজ তিনিই চালাবেন, আমার এখন ছুটি; মায়ের আদেশ আজ সকালে আমার কাছে পৌঁচেছে, মকুলকে আর এই বাপ্পার সিংহাসন আপনাদের জিম্মায় রেখে আমি এখনি বিদায় হব, আমার ঘোড়া প্রস্তুত।'

বুকের ভিতর কী বেদনা নিয়ে চণ্ড যে সারারাত কাটিয়েছেন তা আর কারো বুঝতে বাকি রইল না, তাঁরা কোনো কথা না কয়ে চণ্ডকে প্রণাম করে বিদায় হলেন।

চণ্ড তখন তাঁর দাই-মাকে কাছে ডেকে চুপি-চুপি বললেন, 'মকুলের যাতে ভালো হয়, তার কোনো বিপদ না ঘটে দেখবে ; আমার ছোটো ভাই রঘুদেও কৈলোরে আছে, আমি তার সঙ্গে দেখা করে মাণ্ডুর রাজার কাছে চললেম। মহারানীকে বলবে যদি কোনোদিন কোনো বিপদ আসে, রাজ্যে যদি কোনো গোলমাল হয় তবে আমি কাছেই রইলেম, আমাকে ডেকে পাঠালেই আবার আসব ; আমার তলোয়ার মকুলের শত্রুর জন্যে আর মেবারের জন্যে আমার প্রাণ। দাই-মা, এরা কি যাবার আগে মকুলকে একবার দেখতে দেবে না ?'

দাই ঘাড় নেড়ে চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদতে লাগল ; চণ্ড বুঝলেন ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার কোনো উপায় নেই ; তিনি একটি কথা না কয়ে যেমন সাজে ছিলেন তেমনি, কেবল তলোয়ারখানা কোমরে বেঁধে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেলেন— তখন মাথার উপরে দুপুরের রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে। মকুল যখন শিকার খেলতে যাবার সময় তার দাদাকে খুঁজতে লাগল, তখন রানী বললেন, 'তোর দাদাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে, সে আর আসবে না।'

সারাদিন মকুলের চোখ ছল-ছল করতে লাগল, সে শূন্য রাজপুরীতে কোথাও তার দাদাকে খুঁজে পেলে না। রাত্রে যখন সবাই শুয়েছে তখন মকুল তার দাই-মা'র গলা জড়িয়ে বললে, 'যে বাঘ দাদাকে মেরেছে তাকে আমি বড়ো হয়ে নিশ্চয়ই মারব ; তলোয়ারের এক চোটে তার মাথাটা কেটে এনে তোমায় দেব, কেমন ?'

দাই বললে, 'রানাসাহেব, আমি সেই বাঘটা ধরবার একটা দড়ির শক্ত ফাঁদ কালই বানিয়ে রাখছি— বাঘটাকে কিছুতেই পালাতে দেওয়া হবে না!'

মকুল খানিক চুপ করে বললে, 'দাই-মা বাঘটা দেখতে কেমন ? আমি তো বাঘ দেখিনি, তাকে চিনতে পারব তো ?'

'ঠিক চিনতে পারবে, নয়তো আমি চিনিয়ে দেব। তোমার ওই মাড়োয়ারী দাদামশায়ের মতো তার পেটটা মোটা আর ঠিক এমনি খোঁচা-খোঁচা দাড়ি-গোঁফও আছে।'

তার পরদিন সকালে যখন দাই মকুলকে সাজ পরিয়ে রাজসভায় তার বুড়ো দাদার কাছে দিতে গেল তখন রণমল্ল পাকা গোঁফে চাড়া দিয়ে চোখ পাকিয়ে তার দিকে চেয়ে বললেন, 'দাই, বাঘ ধরবার ফাঁদ তৈরি করতে সময় লাগবে, সেজন্যে আজ থেকে তোমায় ছুটি দিলেম। আমার দেশের এক ভালো দাই সে-ই রানীর কাজ করবে, তুমি বসে-বসে ফাঁদ বাঁধো গিয়ে জঙ্গলে।' দাই 'যো হুকুম' বলে খুব একটা বড়ো সেলাম রণমল্লকে দিয়ে মকুলকে বললে, 'রানাসাহেব, বাঘটাকে চিনে রেখ — ঠিক তোমার বুড়ো দাদার মতো গোঁফ-দাড়ি ওমনি মোটা পেট আর বড়ো-বড়ো দাঁত।' সভাসুদ্ধ লোক মুখ টিপে হাসতে লাগল। মকুল দুই চোখে একটা ভয় নিয়ে রণমল্লের দিকে চেয়ে এক দৌড়ে দাইয়ের কোলে গিয়ে উঠল।

দাই তার মুখে চুমু খেয়ে বললে, 'বেটা ডরো মাৎ, সেরকো দেখ ভাগনা কভি নেহি, মার তলোয়ার কী চোট, কাট্ লে শির্।' সভাসুদ্ধ লোকের মুখে হাসি চাপা থাকে না দেখে রণমল্ল কথাটা চাপা দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি একটা কাষ্ঠ হাসি হেসে দাইয়ের পিঠ চাপড়ে তার হাতে এক জোড়া সোনার বালা দিয়ে বললেন, 'ভালো-ভালো, আমি খুব খুশি হলেম, এমনি করে মকুলকে সাহস দিয়ে এখন থেকে বাঘ শিকারে মজবুৎ করে তোল; আজ থেকে তোমার তলব আরো দশ-তন্‌খা বাড়িয়ে দেওয়া গেল, মকুলজী বড়ো হওয়া পর্যন্ত তুমিই তার তদারক করবে।'

সভাসুদ্ধ লোক বুঝলে রণমল্লকে যদি কেউ জব্দ করতে পারে তবে সে দাই, আর রাজবাড়িতে তার মতো মকুলের বন্ধুও আর কেউ নেই। মেবারের সমস্ত রাজপুত সর্দার, যাঁরা রানীর খাতিরে

রণমল্লকে ভয় করে একটি কথা কইতেন না, তাঁরা আজ এই দাইকে মনে-মনে তার সাহসের জন্যে তারিফ না করে থাকতে পারলেন না। রণমল্ল সেদিন মাথা হেঁট করে রাজসভা থেকে বিদায় হলেন।

চণ্ডের ছোটো ভাই রঘুবীর, কিন্তু মেবারের সবাই তাঁকে নাম দিয়েছিল রঘুদেব — রূপে গুণে তিনি ছিলেন বাস্তবিকই দেবতার মতো। নগরের বাইরে রাজ্যের গোলমাল থেকে অনেক দূরে একখানি সুন্দর বাগানঘেরা ছোটোখাটো পাথরের বাড়ি, তারই মধ্যে রঘুদেব একলা রাজার ছেলে হয়ে তপস্বীর মতো দীন দুঃখী কাঙাল নিয়ে থাকতেন। তাঁর মুখের কথা — সে যেন ছোটো-বড়ো সবার মন গলিয়ে গানের মতো গিয়ে প্রাণে বাজত। রাজ্যে তাঁর শত্রু ছিল না — এমন-কী যে মহারানী চণ্ডকে বিষ-দৃষ্টিতে দেখতেন তিনিও রঘুদেবকে গুরুর মতো ভক্তি, ভায়ের মতো ভালোবাসা দিয়েছিলেন।

আর মকুল — সে ছোড়দাদার মুখের গল্প, তাঁর সেই বাগানে ফল পেড়ে বনভোজন, গাছের পাখিদের বাসার খুব কাছে গিয়ে তাদের ছোটো ছোটো ছানাগুলিকে খাইয়ে আসা, গাছের ছায়ায় বসে বাঁশের বাঁশিতে রাখাল ছেলেদের কাছ থেকে গান শেখা, এই সব আনন্দের কথা কখনো ভুলবে না।

চণ্ড গিয়ে অবধি সে তার ছোড়দার কাছে যাবার জন্যে রোজ কাঁদছে, রানীর ইচ্ছে তাকে কিছুদিনের জন্যে সেখানে পাঠিয়ে দেন কিন্তু রণমল্ল কেবলি বাধা দিচ্ছেন। রানী একবার রঘুদেবকে রাজবাড়িতেই না হয় আনবার কথা বললেন কিন্তু তাতেও আপত্তি! শেষে একদিন রণমল্ল স্পষ্টই বলে দিলেন যে, তাঁর হুকুম ছাড়া রঘুদেবের সঙ্গে দেখা কিংবা তাঁকে এখানে আনানো হতে পারবে না — রানীর সেইদিন চোখ ফুটল; তিনি বুঝলেন, রাজ্যের কাজে তাঁর আর কোনো হাত নেই, এই পাথরের রাজবাড়ির চারখানা দেওয়ালের মধ্যে তিনি আর মকুল দুজনকে বন্দীর মতো থাকতে হবে।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন খবর এল রঘুদেব মকুলকে দেখতে নগরে আসছিলেন, হঠাৎ মারা পড়েছেন ; দেশের লোক হাহাকার করে বলছে রণমল্ল তাঁকে বিষ দিয়ে খুন করেছে, সমস্ত মেবার তাঁর মূর্তি ঘরে-ঘরে রেখে পুজো করছে আর মাড়োয়ারী শেয়ালরাজা আর তার দলবলকে খুনে, বদমাস, চোর বলে অভিসম্পাত দিচ্ছে। বুড়ি দাই রানীকে এসে বললে, 'এখনও যদি ভালো চাও তো চণ্ডজীকে খবর পাঠাও, না হলে তোমার মকুলের দশা কোন দিন রঘুদেওজীর মতো হবে।'

কিন্তু খবর তাঁকে দেয় কে ? যে চিঠি বইবে সে রণমল্লের লোক, আপনার লোক দিয়ে সে রাজ্যটা ভরিয়ে রেখেছে, তার চর রানীর অন্দরে ঘুরছে, তার অনুচর সর্দারের বাসায়-বাসায়, গ্রামে-গ্রামে, প্রজাদের ঘরে-ঘরে, পাঠশালায়, মন্দিরে, মঠে! কে কোথায় কী করছে, কী বলছে সব খবর পাচ্ছে সেই পেটমোটা মাড়োয়ারী রাজা রণমল্ল ডাকাতদের সর্দার, চোরের শিরোমণি। নগরের ফাটকে-ফাটকে কেল্লার বুরুজে-বুরুজে তার চেলারা সব থানা বসিয়ে পাহারা দিচ্ছে দিন-রাত। রাগে ভয়ে দুঃখে রানী অস্থির হয়ে পড়লেন, চারিদিক অন্ধকার দেখতে লাগলেন, চণ্ডকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তিনি কী ভুলই করেছেন, আজ সেটা হাড়ে-হাড়ে বুঝতে তাঁর বাকি রইল না। রানী বুড়ি দাই-এর দুই পা জড়িয়ে কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, 'হায়, আমার কী হবে ?' যে রানী একদিন তাকে দূর-দূর করে তাড়িয়েছিলেন, আজ তাঁকে পা জড়িয়ে কাঁদতে দেখে বুড়ির চোখে জল এল। সে রানীকে শান্ত করে বললে, 'আমি খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করছি ; কিন্তু রানীমা, তুমি খুব সাবধানে কাজ করবে যেন আমাদের মনের কথা কেউ না জানতে পারে। তোমার বাপ শুনতে পেলে বড়ো বিপদ হবে, তার মুঠোর ভিতরে এখন সমস্ত রাজ্য, সে যদি গলা টিপে তোমার মকুলকে মেরে ফেলে, তবে ভয়ে কেউ একটি কথাও বলবে না।'

রানীর সঙ্গে কথা ঠিক করে দাই যেখানে বুড়ো রণমল্লটা

সন্ধ্যাবেলা একটা ঘরে নিজের মতো মোটা একটা গের্দা ঠেস দিয়ে একরাশ মোহর গুনে-গুনে চটের থলিতে ভরে-ভরে রাখছেন ঠিক বড়োবাজারের মাড়োয়ারী এক-একটা মহাজনের মতো, সেইখানে আস্তে আস্তে এসে উপস্থিত হল। দাইকে হঠাৎ আসতে দেখে বুড়ো মোহরগুলো দুই থাবায় কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'তবে—তবে অসময়ে কী মনে করে?'

'আজ্ঞে একটু সামান্য কাজ ছিল, যদি এখন ব্যস্ত থাকেন তো পরে আসব।'

রণমল্ল দাইকে ভয় করতেন, ঠিক দপ্তরখানার দপ্তরি যেমন তার মনিবকে ভয় করে। রাজ্যের সবাই রণমল্লের ভয়ে সারা কিন্তু রণমল্ল কাঁপেন দাইয়ের ভয়ে; তাই তিনি তাড়াতাড়ি দাইকে বললেন, 'না না, আগে তোমার কাজটাই সেরে নিই।'

দাই তখন বললে, 'আজ্ঞে, মকুলজীর একটু ফরমাস আছে, তার কবুতর পালবার শখ হয়েছে, তাই হুজুরের কাছে দরবার করতে এসেছি!'

'মকুলজী পায়রা ওড়াবেন,' বলেই বুড়ো হোঃ-হোঃ করে খানিক হেসে বললেন — 'তা ভালো, এ সব শখ ভালো — পায়রা ওড়ান, ছাগল পালুন, এতে আমার আপত্তি নেই; ঘোড়া চড়া, তলোয়ার খেলা এগুলো ছাড়লেই বাঁচি, রাজার ছেলে ও-সব কেন? খান দান ঘুড়ি ওড়ান, সুখে থাকুন আর'—দাই বলে উঠল — 'আর রাজার ছেলের দাদামশায় বুড়ো মাড়োয়ারী সিংহাসনে বসে কেবল মোহরের তোড়া বাঁধুন?'

'ঠিক বলেছ দাই, আমি তোমার উপর খুশি আছি; মকুলকে তুমি এরকম পায়রা আর ঘুড়ি দিয়ে ভুলিয়ে রাখ আর দুটো বছর, তারপর দেখা যাবে সিংহাসন আমার কাছ থেকে কেমন করে এরা কেড়ে নেয়! এই নাও' — বলেই একটা মোহর বুড়ো অনেক কষ্টে থলি থেকে বের করে দাইয়ের হাতে দিতে গেলেন।

দাই হাত জোড় করে বলল, 'আপনার মোহর আপনার

কাছেই থাক, মকুলজীর কবুতর কেনবার পয়সার অভাব নেই।'

'হ্যাঁ, তা কি আর আমি জানিনে! তার মায়ের হাতে অনেক টাকা আছে, তা যাও তোমরাই তবে কবুতর জোড়ার দাম দিও। প্রজাদের খাজনা অনেক বাকি পড়েছে এখন আমার হাতে একটি পয়সাও নেই'— বলেই বুড়ো আবার টাকা গুনতে লাগলেন। দাই একটা মস্ত সেলাম করে সেখান থেকে চলে গেল।

কেল্লার ছাদের এক কোণে পাথরের একটা টানা বারাণ্ডায় কার্নিস খানিক ছায়া ফেলেছে, তারই তলায় একটি বাঁশের খাঁচায় দুটি পায়রা সকালবেলার দিকে চেয়ে গলা ফুলিয়ে চুপটি করে বসে আছে, এখনি মকুল এসে খাঁচাটি খুলে আকাশের আলোর মাঝে তাদের ছেড়ে দেবে এই আনন্দে তাদের শাদা রঙের ডানা দুখানি থেকে-থেকে উল্‌সে উঠছে। এমন সময় মহারানীর সঙ্গে দাই এসে পায়রা দুটির ডানার নিচে দুখানি ছোটো চিঠি বেঁধে দিয়ে আস্তে-আস্তে আবার খাঁচার দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

তখনো সূর্যের আলো পৃথিবীতে এসে পড়েনি, রাজকুমার মকুল নরম বালিসের উপরে মাথাটি রেখে একটি হাত পুবের জানালার দিকে ছড়িয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে আছে মুঠোর এক টুকরো কাগজ ধরে। রানী এসে তার ঘুম ভাঙিয়ে কোলে করে দাইয়ের কাছে দিয়ে বললেন, 'তুই এখনো ঘুমচ্ছিস? বেলা হয়েছে, কখন আর তোর দাদার কাছে পায়রার গলায় বেঁধে চিঠি পাঠাবি?' মকুল কোনো কথা না বলে দাইকে টানতে-টানতে এক ছুটে ছাদে এসে উপস্থিত হল। দাই হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে, 'কই, মকুলজী তুমি যে বলেছিলে চিঠ্‌ঠি লিখে রাখবে, তা কই?' মকুল হাতের মুঠো খুলে দেখালে সেই হিজি-বিজি লেখা কাগজখানি। দাই কাগজটি এপিঠ-ওপিঠ উল্‌টে-পাল্‌টে বললে, 'বহুৎ আচ্ছা, চিঠ্‌ঠি পড়ো তো শুনি কুমার-সাহেব কী লিখেছ।' মকুল জানত কেমন করে চিঠি পড়তে হয়, তাই সে গম্ভীর হয়ে আরম্ভ করলে :

দাদা, আমি তোমার ছোটো ভাই, তোমার জন্য কাঁদছি, একবার এসো, খুব খেলা হবে ; কবুতর দুটো চিঠি নিয়ে যাচ্ছে জবাব দিও। এদের ছানা হলে তোমায় একটা দেব। আমি খুব ভালো আছি। ইতি—

মকুল

তোমার ছোটো ভাই

পুঃ—মা আর দাই তোমার জন্য খালি কাঁদে।

'চিঠি যেমন হতে হয়'— বলে দাই কাগজখানা নিয়ে বেশ করে মুড়ে বললে, 'তবে এখন কোন দাদাকে চিঠিখানা পাঠাতে চাও বল।' এইবার মকুল মুশকিলে পড়ল, বড়োদাদা আর ছোটোদাদা দুই দাদার মধ্যে বেছে নেওয়া তার পক্ষে শক্ত হল, দুইজনকেই সে সমান ভালোবসে, দুইজনকেই সে চিঠি লিখে ডেকে পাঠাতে চায়। কিন্তু হায়, চিঠি তার একখানি বৈ নেই! ভাবনায় তার মুখ শুকিয়ে গেল, তখন রানী আস্তে আস্তে তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'এক কাজ কর, আধখানা চিঠি বড়োদাদাকে, তার আধখানা ছোড়দাদাকে পাঠিয়ে দে।' তাই হল। প্রথম টুকরো ছোড়দাদার আর বাকিটুকু বড়দাদার জন্যে ছিঁড়ে মকুল দাইয়ের হাতে দিল।

শাদাডানা দুই পায়রা সেই দু-টুকরো কাগজ গলায় বেঁধে আকাশে উড়ল, ডানার তলায় লুকানো রইল তাদের মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যে চণ্ডের কাছে রানী আর দাইয়ের দুখানি চিঠি। সোনামাখানো মেঘের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে দুটি পাখি ছোটো-বড়ো দুজনের ডাক বয়ে, সূর্যের আভা আকাশ রাঙিয়ে তাদের দুজোড়া ডানার পালকে এসে ঠেকেছে শাদা পালে হাওয়ার মতো। চিতোরের কেল্লায় বন্দী অসহায় মকুল আর তার মায়ের ডাক সকালের সোনায় মাখা, দুপুরের রোদে পোড়া, সন্ধ্যার মেঘ আর আলোর চিত্র-বিচিত্র দিনের মধ্যে দিয়ে রাত্রির নীল-গোলা অন্ধকার আকাশ পার হয়ে যেদিন মাণ্ডুর কেল্লায় চণ্ডের কাছে এসে পৌঁছল,

সেদিন চণ্ড সব দুঃখ সব অপমান ভুলে অনেক দিনের কোণে-রাখা তলোয়ার আর একবার কোমরে বেঁধে উঠে দাঁড়ালেন।

আজ তিনদিন ধরে একটা প্রকাণ্ড ঝড় রাজস্থানের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে — তারই মধ্যে থেকে এক-একবার সকালে সন্ধ্যায় সূর্যদেব দেখা দিচ্ছেন রক্তমূর্তি! চণ্ড যখন চিতোর ছেড়ে চলে আসেন তখন তিনশো ভীল তাঁর সঙ্গে তীর-ধনুক নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। আজ তারা চণ্ডের হুকুম নিয়ে চিতোরে আবার ফিরছে ঝড়-জল-বিদ্যুতের মধ্যে দিয়ে।

চিতোর থেকে খানিকটা দূরে গো-সুন্দ নগর, পাহাড়ের উপর একটা মজবুত কেল্লা আর তাকেই ঘিরে ছোটো-ছোটো বাড়ি, পাহাড়ের নিচে অনেকখানি ঘন বন, তার মধ্যে দিয়ে ছোটো-ছোটো নদী বয়ে চলেছে, এই বনে চণ্ড তাঁর দলবল নিয়ে লুকিয়ে রইলেন! কথা ঠিক হল যে, মহারানী সুন্দেশ্বরীর পুজো দেবার ছল করে মকুলজীকে নিয়ে এইখানে এসে দেওয়ালীর দিন চণ্ডের সঙ্গে মিলবেন।

এদিকে চণ্ডের অনুচর যত ভীল মেবারের গ্রামে-গ্রামে ঘুরে রটিয়ে দিয়েছে — রণমল্ল মকুলজীকে মেরে ফেলেছে। লোকে সব গ্রামে-গ্রামে মাঠে-ঘাটে এই সব গুজব শুনে একেবারে ক্ষেপে উঠে লাঠি-তলোয়ার তীর-ধনুক নিয়ে চিতোরের দিকে দল বেঁধে চলেছে — যদি একথা সত্যি হয় তবে সেই পেটমোটা মাড়োয়ারের রাজা রণমল্লকে আর আস্ত রাখবে না। রণমল্ল এই খবর পেয়ে ভয়ে কাঁপছেন, কী উপায় করবেন ভেবে পাচ্ছেন না! সেই সময় একদিন দাই এসে তাঁকে বললে, 'হুজুরের মেজাজ ভালো বোধ হচ্ছে না, একটা খবর শুনে আমারও ভয়ে গা কাঁপছে ; শুনেছেন দেশের লোক তাদের রানা মকুলকে দেখবার জন্যে লাঠি-সোটা নিয়ে এই দিকে আসছে।' রণমল্ল খবরটা খুব ভালো করেই শুনেছিলেন তবু দাইকে ধমকে বললেন, 'যাও-যাও, মাড়োয়ারের রাজা আর মেবারের এখনকার সর্বেসর্বা দু-দশগাছা লাঠির ভয়ে কাঁপে না, আর কিছু খবর থাকে তো বলো।'

দাই তখন চুপি-চুপি বললে, 'এবারে যে-দল আসছে বড়ো শক্ত দল, মেবারের রাজপুতকে আপনি চেনেন না, এই বেলা যা হয় উপায় করুন।'

রণমল্ল মনে ভয় কিন্তু মুখে সাহস দেখিয়ে বলে উঠলেন, 'কী উপায় করতে হবে শুনি?'

দাই বললে, 'মকুলজীকে একবার গ্রামে-গ্রামে শিকার খেলার জন্যে পাঠিয়ে দিন। লোকে দেখুক তাদের রানা বেশ সুখে বেঁচে আছে আর খেলে বেড়াচ্ছে। তাহলেই তারা ঠাণ্ডা হবে আর আপনাকে বিরক্ত করতে আসবে না।'

রণমল্ল খানিক গম্ভীর হয়ে থেকে বললেন, 'মন্দ পরামর্শ নয়, কিন্তু হাতিয়ার বেঁধে গ্রামে-গ্রামে শিকার খেলে বেড়ানো তো হতে পারে না, শিকার থেকে লড়াই বাধতে কতক্ষণ? অন্য কিছু উপায় থাকে তো বল।' 'তবে রানীমা আর মকুলজীকে পালকি চড়িয়ে গ্রামে-গ্রামে দেবতাদের পুজো দেবার জন্যে পাঠিয়ে দিন, কাজ একই হবে।' এ পরামর্শটা রণমল্লের মনোমতো হল, দাই রানীকে আর মকুলজীকে পালকিতে চড়িয়ে চিতোরের কেল্লা পার করে দিয়ে এল। যাবার সময় মকুল বললে, 'দাই মা, তুমি যাবে না?'

'না জী, বাঘ ধরবার সেই ফাঁদটা শেষ করে তবে আমি তোমার কাছে যাব' — বলেই দাই চিতোরের কেল্লায় ফিরে এল।

গো-সুন্দ নগরে দেওয়ালীর আজ ভারি ধুম, মহারানী রানাজীকে নিয়ে কেল্লায় এসেছেন, খুব ঘটা করে আজ সুন্দেশ্বরীর পুজো দেওয়া হবে। ঘরে ঘরে আজ প্রজারা পিদিম জ্বালিয়েছে, রাস্তায়-রাস্তায় দোকানীরা ঝাড়লণ্ঠন ছবি আয়না দিয়ে দোকান সাজিয়ে বসে লোকের গায়ে কেবল গোলাপজলের পিচকিরি দিচ্ছে। শহরের ছেলেগুলো রাস্তার মাঝে তুবড়ি পুড়িয়ে ছুঁচো-বাজি ছেড়ে মকুলজীর সঙ্গে যে-সব ঘোড়সওয়ার এসেছে তাদের ঘোড়াগুলোকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে তামাশা দেখছে। ছেলে বুড়ো সবাই মিলে হাউই উড়িয়ে চরকি ঘুরিয়ে ফুলঝুরি, রংমশাল, বোমা, দোদমা, ভুঁইপটকা,

চিনে-পটকা পুড়িয়ে খুব খানিকটা ধোঁয়া আর খুব খানিকটা আমোদ করে নিচ্ছে।

মকুলের আজ আনন্দের সীমা নেই! এক সোনার সাজ-পরা কালো ঘোড়ায় চড়ে তিনি শহরময় ঘুরে-ঘুরে দেওয়ালীর আলো দেখে বেড়াচ্ছেন। আর রানীমা, কেল্লার ছাদে একলা তিনি চুপ করে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন, যত রাত বাড়ছে ততই তাঁর মনে হচ্ছে চণ্ড বুঝি এলেন না। আজ যে এই গো-স্নুন্দ নগরে দেওয়ালীর রাতে তাঁর দলবল নিয়ে আসবার কথা, কিন্তু কই? দেখতে-দেখতে শহরের আলো নিবে এল ; মকুল তাঁর ঘোড়া ফিরিয়ে কেল্লায় এলেন, কিন্তু চণ্ডের আসবার কোনো লক্ষণ নেই, এই রাত্রের মধ্যে তাঁদের চিতোরে ফিরতে হবে, আর তো সময় নেই। রানী অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে কাঁদতে লাগলেন, দুই চোখের জল তাঁর বুকের কাপড় ভিজিয়ে দিতে লাগল।

এদিকে স্নুন্দেশ্বরীর মন্দির থেকে ঢং-ঢং করে রাত দশটার ঘণ্টা পড়ছে, লোকজন প্রস্তুত হয়ে চিতোরে যাবার জন্যে পালকি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, মকুল রানীকে ডাকছেন যাবার জন্যে কিন্তু রানীর পা আর উঠছে না, তাঁর বুকের ভিতরে যেন হাতুড়ির ঘা দিয়ে অন্ধকারে ঘণ্টা বাজছে এক, দুই, তিন, চার। রাত দশটার ঘণ্টা বেজে থেমেছে — অন্ধকার আকাশ বাতাস তারই শব্দের রেশায় এখনো রী-রী করে কাঁপছে, ঠিক সেই সময় পাহাড়ের নিচে বনের মাঝ দিয়ে দশটা হাউই আগুনের সাপের মতো ফোঁস করে ফণা ধরে আকাশে উঠে দপ করে আলোর ফুল হয়ে আকাশময় ছিটিয়ে পড়ল — আলোয় চারিদিক দিন হয়ে গেছে, শহরের লোক আশ্চর্য বাজি দেখতে হৈ-হৈ করে রাস্তায় ছাদে যে যেখানে পেরেছে বেরিয়ে এসেছে! রানী মকুলের হাত ধরে বললেন, 'সময় হয়েছে, আর দেরি না চলো।' মকুলের ইচ্ছা আরো খানিকটা ছাদে দাঁড়িয়ে বাজি দেখেন। কিন্তু রানী তাঁকে জোর করে ধরে পালকিতে ওঠালেন, আকাশের হাউই তাঁদের মাথার উপরের লাল আলোর পুষ্পবৃষ্টি করে অন্ধকারে

মিলিয়ে গেল! মকুল পালকি থেকে আবার কখন হাউই ওঠে দেখবার জন্য মুখ বাড়িয়ে বসে রইলেন কিন্তু আকাশ যে অন্ধকার সেই অন্ধকারই রইল।

মকুল রাত্রির মধ্যে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে-থেকে ঘুমিয়ে পড়েছেন, রানীর পালকি নির্জন মাঠের পথে আস্তে-আস্তে চলেছে, মাটির উপরে আটটা পালকি-বেহারার খসখস পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোনো দিক থেকে কোনো শব্দ রানীর কানে আসছে না। রানী অন্ধকারের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে চেয়ে রয়েছেন। একবার মনে হল যেন একদল লোক খুব দূরে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল, একবার দেখলেন যেন রাস্তার ধারে একজন কে বল্লম হাতে চুপ করে দাঁড়িয়ে — পালকি কাছে আসতেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। গো-স্থন্দ নগরে সেই দশটার তারাবাজি দেখে রানী চণ্ড এসে পৌঁচেছেন বুঝেছিলেন, তারপর থেকে কিন্তু চণ্ডকে স্পষ্ট করে দেখা এখনো তাঁর ঘটে ওঠেনি। চণ্ড যে তাঁর কাছাকাছি আছেন, সেটা কেবল এই ছায়া-ছায়া রকম দেখছিলেন!

রাত গভীর — পালকি চিতোরের কাছাকাছি এসে পড়েছে, দূর থেকে কেল্লার দেয়াল আকাশের গায়ে কালো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পাহাড় বেয়ে রানীর পালকি কেল্লার ফটকের দিকে উঠে চলল কিন্তু তখনো চণ্ডের কোনো দেখা নেই। ঘোড়ার পায়ের শব্দ কী তলোয়ারের ঝনঝন কিছুই শোনা যাচ্ছে না; রানীর বুক কাঁপছে, তাঁর চোখের সামনে কেল্লার ফটকের বড়ো দরজা তুখানা আস্তে-আস্তে খুলে গেল যেন একটা রাক্ষস অন্ধকারে মুখটা হাঁ করলে। তারপর আস্তে-আস্তে রানীর পালকি কেল্লার মধ্যে ঢুকল, রানী একবার পালকি থেকে মুখ ঝুঁকিয়ে পিছনের দিকে দেখলেন ফটকের সামনে একদল ঘোড়সওয়ার খোলা তলোয়ার মাথায় ঠেকিয়ে তাঁর সঙ্গে কেল্লায় প্রবেশ করলে, তাদের সর্দার প্রকাণ্ড এক কালো ঘোড়ায় — মাথা থেকে পা পর্যন্ত তার কালোসাজ, নিমেষের মধ্যে এই ছবিটা রানী দেখতে পেলেন; চণ্ডকে চিনতে তাঁর বাকি রইল না। তারপর

'জয় মকুলজী কি জয়! জয় চণ্ডজী কি জয়!' শব্দে আকাশ কাঁপিয়ে উঠল, অমনি চিতোরে ছোটো-বড়ো ছেলে-বুড়ো তলোয়ার খুলে রাজপথে রানীর পালকির চারিদিক ঘিরে নিয়ে রাজবাড়ির দিকে চলল। যত মাড়োয়ারী যারা এত বুক ফুলিয়ে রাজাগিরি ফলাচ্ছিল, সব আজ চণ্ডের নাম শুনেই ইঁদুরের মতো গর্তে গিয়ে লুকোল, কারো এমন সাহস হল না যে রণমল্লকে গিয়ে খবরটা দেয়। আর খবর দিয়েই বা কী হবে? দেওয়ালীর রাতে খুব করে সিদ্ধি খেয়ে রণমল্ল খাটিয়ায় পড়ে নাক ডাকাচ্ছেন। দাই একগাছি মোটা দড়ি দিয়ে খাটিয়ার সঙ্গে তাঁকে আচ্ছা করে বেঁধে ছাদের উপর থেকে তামাশা দেখতে গেল। রণমল্লের ভোজপুরী আর মাড়োয়ারী দারোয়ানগুলো ঢাল তলোয়ার বেঁধে তালপাতার সেপায়ের মতো কেবল হাত-পা ছুঁড়তে লাগল, লড়াই দেবার আর সাধ্য হল না।

চণ্ড জোর করে তালা ভেঙে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন। গোলমালে রণমল্ল জেগে উঠে দেখেন তাঁর চারিদিকে খোলা তলোয়ার, নিজের হাত-পা বাঁধা; তাঁর সাহসও ছিল জোরও ছিল; হাজার হোক তিনি মাড়োয়ারের রাজা, আর তলোয়ার দেখে তাঁর সিদ্ধির ঘোরও কেটে গেছে। তিনি পিঠে বাঁধা খাটিয়াখানাসুদ্ধ দাঁড়িয়ে উঠে চণ্ডকে বললেন, 'আমার বাঁধন খুলে দাও, তারপর দেখা যাবে কে জেতে কে হারে। তুমি বীর, রাজার ছেলে—আমিও একটা দেশের রাজা, আমাকে জানোয়ারের মতো বেঁধে মারা তোমার উচিত হয় না।'

চণ্ড রণমল্লের বাঁধন খোলবার জন্যে ঘরে ঢুকবেন এমন সময় দাই ছুটে এসে বললে, 'সাবধান, ওকে একা পুড়ে মরতে দাও, সরে যাও, না হলে সবাই মরবে।' দুম করে একটা ভয়ংকর আওয়াজ হয়ে ঘরের কোণে একরাশ বারুদ জ্বলে উঠল, তারপর দাউ-দাউ করে ঘরখানায় আগুন লেগে গেল! ছুঁচো-বাজি দিয়ে ঘরখানা দাই যে কখন ভর্তি করে রেখেছিল কে জানে? ছুঁচোর মতো রণমল্ল পুড়ে মোলেন — 'খুলে দে! খুলে দে!' বলে চিৎকার করতে করতে। যাকে

রাজবাড়ির দাসী বলে তিনি ঠাউরে ছিলেন, তারই হাতের বাঁধা দড়ির বাঁধ শেষ পর্যন্ত আগুনের নাগপাশের মতো তাঁকে জড়িয়ে রইল।

কোথায় মেবার মাড়োয়ার দুটো দেশ রণমল্ল দখল করে বসবেন, না এখন তাঁর মাড়োয়ারের সিংহাসনটা পর্যন্ত মেবারের রানার হাতে এল। তাঁর ছেলে যোধরাও বাপের সিংহাসন হারিয়ে এখন সামান্য গুটিকতক সেপাই নিয়ে রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে চলল, অনেক দূরে লুনী নদীর ও-পারে।

মহাবীর হরোয়া শংকল রাজর্ষি — লুনী নদীর ও-পারের সমস্ত পাহাড় নদী বন তাঁর রাজত্ব। তাঁর নামে সবাই মাথা নোয়ায় এমনি তাঁর বীরত্ব, এমনি তাঁর দয়া, তাঁর হুকুম অমান্য করে রাজস্থানে এমন লোক নেই। বিপদে যে পড়েছে তাকে উদ্ধার করা, দুঃখীর দুঃখ মোচন, অনাথকে আশ্রয় দেওয়াই তাঁর কাজ, তাঁর যত অনুচর সবাই সন্ন্যাসী বীর, গাঁজাখোর নয়, কাজের মানুষ। কেউ কারুর উপর অন্যায় অত্যাচার করলে তাদের হাতে নিস্তার নেই, বনের ভিতর পাহাড়ের গুহায় তাদের সব কেল্লা, সেখানে জালা-জালা টাকা পোঁতা আছে, লোকে চাইলে সেই টাকা দিয়ে তারা তাদের দুঃখ ঘোচায়। মাটির নিচে বড়ো-বড়ো ঘর, সেখানে তাদের অস্ত্র-শস্ত্র লুকোনো থাকে, কেউ বিপদে পড়ে তাদের কাছে এলে সেই অস্ত্র দিয়ে তারা তার সাহায্য করে, এমনি দলের রাজা তিনি হরোয়া শংকল। লুনী-নদী সাঁতার দিয়ে পার হয়ে যোধরাও রাতদুপুরে এসে তাঁরই আশ্রয় চাইলেন; যোধরাও জানতেন চণ্ডও ইচ্ছে করলে এখানে এসে গোলমাল করতে পারবেন না।

হরোয়া শংকল আদর করে যোধরাওকে বসালেন; তাঁর ছোটো ঘর, রাজকুমারের সঙ্গে অনেক সেপাই, কাজেই সবাইকে গাছতলায় বসাতে হল, সন্ন্যাসী রাজা একটু ভাবিত হলেন এত রাত্রে এত লোকের খাবার কেমন করে যোগাবেন, লোকেরাও অনেক পথ চলে এসে খিদেয় কাতর হয়ে পড়েছে! রাজর্ষি তাঁর দলবলকে ডেকে সকলের আহারের সুবন্দোবস্ত করে দিতে বললেন, কিন্তু ঘরে তাঁর

একটু খুদও নেই, সেদিনের যা-কিছু চাল ডাল সব তিনি অতিথিদের বিলিয়ে দিয়েছেন। বিপদে পড়ে চেলারা সব মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে দেখে রাজর্ষি বললেন, 'অতিথিকে তো খেতে দিতে হবে, এস দেখি ঘরে কী আছে।' ঘরের এক কোণে সন্ন্যাসীদের কাপড় রাঙাবার জন্য এক রাশ মূঁজলতা বোঝা বাঁধা ছিল, রাজর্ষি সেইগুলো দেখিয়ে বললেন, 'যাও, এইগুলো রেঁধে আনো।'

রাঁধুনী এক সন্ন্যাসী, সে হেসে বললে, 'প্রভু, এইবার অতিথি সেবার ঠিক বন্দোবস্ত করেছেন। যে মুখে ঠাকুরের ভোগ খাবে সেই মুখে কাল সকালে দেশে ফিরে কাউকে এবার আর ঠাকুরের অতিথি সেবার নিন্দে করতে হবে না, এইবার ঠিক হয়েছে!'

রাজর্ষি হেসে বললেন, 'আজ আমি নিজের হাতে রাঁধব, তোমাদের সবাইকে নিয়ে এক সঙ্গে খাওয়া যাবে, নিমন্ত্রণ করছি, সব চেলাদের ডাক দাও।'

গাছের তলায় আগুন জ্বালিয়ে রান্না শুরু হল, রান্নার গন্ধে বন আমোদ করলে কিন্তু তরকারি দেখে অবধি চেলাদের আজ আর মোটেই খিদে নেই, যদিও সকালে এক-এক মুঠো ছোলা ছাড়া এ-পর্যন্ত কারো পেটে কিছু পড়েনি। কিন্তু, প্রভুর নিমন্ত্রণ কারো অগ্রাহ্য করার যো নেই। রান্না শেষ হলে সবাই অতিথিদের জন্যে পাতা পেড়ে অপেক্ষা করতে লাগল। আগে যোধরাও আর তাঁর লোকজনদের মোটা আটার রুটি আর মূঁজলতার সেই তরকারি খাইয়ে রাজর্ষি সব চেলাদের নিয়ে খেতে বসলেন, কেবল সেই রাঁধুনি চেলাকে অনেক ডাকাডাকি করেও কেউ আনতে পারলে না, সে কম্বল মুড়ি দিয়ে জঙ্গলের কোনখানে যে লুকিয়ে রইল তার আর সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। খাওয়া শেষ হলে সবাই রাজর্ষির রাঁধা তরকারির সুখ্যাতি করতে-করতে যে যার জায়গায় শুতে গেল। মূঁজশাকের এমন যে রান্না হয় তারা কেউ জানত না, এবার থেকে রোজ এই তরকারি দিয়ে তারা রুটি খাবে এইসব বলাবলি করছে এমন সময় সেই রাঁধুনী এসে উপস্থিত! সবার মুখে তরকারির

তারিফ শুনে তার আর আপসোসের সীমা রইল না! সে ভেবেছিল ওই রঙ করবার পাতাগুলো খেয়ে সবাই মাথা ঘুরে মরবে কিন্তু দেখলে সবাই দিব্বি পেট ভরিয়ে আরামে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমতে লেগেছে, কেবল শীতের রাতে খিদের জ্বালায় সে-ই মরছে কেঁপে।

শীতের রাত সহজে কাটতে চায় না, রাঁধুনী ঠাকুরটিকে অনেক যন্ত্রণা দিয়ে তবে সে রাত পোহাল। সকালে উঠে সে একখানা কুড়ুল নিয়ে রান্নার কাঠ কাটতে চলেছে এমন সময় একজন বুড়ো মাড়োয়ারী সেপাইয়ের সঙ্গে দেখা; পাহাড়ের ঝরনার ধারে সে হাত-মুখ ধুচ্ছে, তার দাঁড়ি-গোঁফ সব লাল রঙের ছোপ-ধরা। কাল সন্ধ্যায় যার দাড়ি ছিল শাদা, আজ লাল হয়ে গেল। এ ব্যাপার দেখে রাঁধুনী ঠাকুরটি আর হাসি রাখতে পারলে না, হোঃ-হোঃ করে হাসতে-হাসতে সঙ্গীদের কাছে এই মজার খবরটা দিতে এসে দেখে যত পাকা দাড়ি গোঁফওয়ালা ছিল তারা নিজের-নিজের দাড়িতে হাত বোলাচ্ছে আর এ ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখছে সবার দাড়ি-গোঁফে লাল রঙের ছোপ। ইতিমধ্যে রাজর্ষি বেরিয়ে এলেন, তাঁর কিন্তু শাদা দাড়ি ধবধব করছে। মূঁজপাতার যে রঙ লেগেছে এটা কারুর মনে এল না; দাড়িতে রক্ত কোথা থেকে লাগল এই ভেবে সবার যখন ভয়ে মুখ শুকিয়ে এসেছে তখন রাজর্ষি সবাইকে অভয় দিলেন, 'নির্ভয়ে থাকো, তোমাদের সুখের সূর্য উদয় হতে আর দেরি নেই; দেখো না এখনি তার রাঙা আলো তোমাদের মুখে এসে পড়েছে; এখন কিছুদিন এইখানে বিশ্রাম করো, তোমাদের রাজত্ব ফিরে পাবার বন্দোবস্ত করা যাবে।'

সেইদিন কাঠ কেটে রাঁধুনী ঠাকুর রাজর্ষিকে আর এক বোঝা মূঁজপাতা এনে দিয়ে বললে, 'ঠাকুর, আমাকে আজ একটু সেই তরকারি রেঁধে দিতে হবে।' রাজর্ষি হেসে বললেন, 'তোমার কালো দাড়িতে লাল রঙের ছোপ তো খুলবে না, দাড়ি আগে পাকুক তবে একদিন মূঁজশাকের চচ্চড়ির ছোপ ধরিয়ে দেওয়া যাবে, আজ ভালো করে অন্য তরকারি দিয়ে অতিথি খাওয়াবার বন্দোবস্ত করো।'

রাঁধুনী ঠাকুরটি খেতে যেমন মজবুত রাঁধতেও তেমনি, আর রাজ্যের আজগুবি গল্প তার কাছে; যোধরাও আর সঙ্গীদের বেশ আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটতে লাগল, বনে আছেন মনেই হত না।

এদিকে হরোয়া শংকলের হুকুম চণ্ডের কাছে পৌঁছল— যোধরাওকে যেন মাড়োয়ারের সিংহাসন ফিরিয়ে দিয়ে ঝগড়াঝাঁটি সব মিটিয়ে নেওয়া হয়— এর উপর কোনো কথা নেই। চণ্ডের দুই ছেলে মুঞ্জজী আর কণ্ঠজী মাড়োয়ার শাসন করছিলেন; তাঁদের উপর হুকুম হল যে হরোয়া শংকল কিংবা তাঁর কোনো লোক যোধরাওকে সঙ্গে নিয়ে আসামাত্র মাড়োয়ারের সিংহাসন যেন তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। হরোয়া শংকল দূতের মুখে এই খবর পেয়ে নিজেই যোধরাওকে সঙ্গে নিয়ে মেবারে চললেন। সেখান থেকে চণ্ডকে সঙ্গে নিয়ে মাড়োয়ার যাবার কথা। ঠিক সময়ে সবাই মেবারে পৌঁছে চণ্ডকে সঙ্গে নিয়ে যোধরাওর রাজত্বে মুন্দরের কেল্লার দিকে চললেন; যোধরাও তখন ছেলেমানুষ— একরাত্রে সবাই মাঠের মধ্যে তাঁবু গেড়ে আছেন এমন সময় একটা বুড়ো মাড়োয়ারী যোধরাওর কানে-কানে বললে, 'দেশে তো এসে পড়েছি, তবে এখন আর চুপ করে থাকা কেন? চলুন, আজ রাত্রেই গিয়ে কেল্লাটা দখল করে বসি, নিজের সিংহাসন পরের কাছ থেকে চেয়ে না নিয়ে জোরসে কেড়ে নেওয়াই ভালো, কী বলেন?' যোধরাও এ কথায় সায় দিলেন, আস্তে-আস্তে মাড়োয়ারী সৈন্য সব মুন্দরের দিকে বেরিয়ে গেল।

চণ্ড আর হরোয়া শংকল এ খবর কিছুই জানেন না, সকালবেলা শিবির থেকে বেরিয়েছেন এমন সময় দেখলেন দূর থেকে এক ঘোড়সওয়ার ছুটে আসছে— তার মাথার পাগড়ি খোলা, বুকের কাপড়ে রক্তের দাগ। সওয়ার যখন ছুটে এসে চণ্ডের কাছে দাঁড়াল তখন চণ্ড তাঁকে নিজের ছেলে কণ্ঠজী বলে চিনতে পারলেন। হরোয়া শংকল তাঁকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে ঘাসের উপর শুইয়ে দিলেন, অমনি কণ্ঠজীর প্রাণ বেরিয়ে গেল। কে তাঁকে এমন করে

মারল এই দেখবার জন্যে তাঁরা এদিক-ওদিক দেখছেন এমন সময় যোধরাও ঘোড়া ছুটিয়ে এসে বললেন, 'প্রভু, আমার অপরাধ যদি হয়ে থাকে তো ক্ষমা করবেন। বাপের সিংহাসন আমি কারু কাছে ভিক্ষা বলে চেয়ে নিতে পারলুম না, নিজের জোরে ফৌজ পাঠিয়ে দখল করেছি, লড়াই শেষ হয়ে গেছে। চণ্ডজীর হাতে আমার বাপ পশুর মতো মারা পড়েছে, তারই ধার তাঁর দুই ছেলেকে যুদ্ধে বীরের মতো মেরে শোধ দিলেম, এতে যদি আমার দোষ হয়ে থাকে তো শাস্তি দিন।'

চণ্ডের মুখে কোনো কথা সরল না। হরোয়া শংকল খানিক ঘাড় হেঁট করে রইলেন, তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, 'যোধরাও ভুল করেছ, চণ্ডের কোনো দোষ ছিল না, তুমি বালক বলে এবার তোমায় শাস্তি দিলেম না, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করো, আর কখনো মেবারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে না। আর এই মাটিতে যেখানে এই বীর কণ্ঠজী পড়ে রয়েছেন, এই পর্যন্ত মেবারের রাজ্যের সীমা ঠিক হল, এর পর থেকে তোমার রাজত্ব।'

চণ্ড চোখের জলের মধ্যে দিয়ে দেখলেন যেখানে তাঁর কণ্ঠজী প্রাণশূন্য দেহে পড়ে রয়েছে সেখানে সকালের আলোতে সমস্ত মাঠ জুড়ে সোনার ফুলের মতো আঁওলার কচি ফুল ফুটে উঠেছে। তিনি হরোয়া শংকলের দিকে চেয়ে বললেন, 'এই আঁওলার ফুলই যেন শান্তির ফুল হয়, যত দূর এই ফুল ফুটবে ততদূর যেন মেবারের রাজ্য এইটেই সবাই বলে। আমার কাজ শেষ হয়েছে, প্রভু আমাকে এখন আপনার সঙ্গী করে লুনী নদীর পারে তপোবনে আশ্রয় দিন।'

রাজর্ষি বললেন, 'তথাস্তু।'

রানা কুম্ভ

রানা মকুলের দুই খুড়ো ছিলেন— চাচা আর মৈর। যদিও দুজনে রাজার ছেলে, কিন্তু তাঁদের মা ছিলেন কাঠুরের মেয়ে ; সেই-জন্য রানাদের চেয়ে তাঁরা মানে খাটো! মেবারের সিংহাসনেও বসবার তাঁদের কোনো উপায় ছিল না। আর সে চেষ্টাও তাঁরা করেননি— মকুল তাঁদের যথেষ্ট জমিজমা দিয়েছিলেন। মকুলজী যদি তাঁর দুই চাচাকে কেবল রাজসভার শোভামাত্র করে রেখে চুপচাপ থাকতেন, তবে আর কোনো গোলই হত না ; তা না, একদিন দুই খুড়োকে সাতশো করে সেপাইয়ের সর্দার বানিয়ে দিয়ে যুদ্ধে পাঠিয়ে মকুল রানা একটু মজা দেখতে চাইলেন।

খুড়ো দুজনের কাজের মধ্যে ছিল দিবারাত্রি আফিং খেয়ে ঝিমানো। হঠাৎ সর্দার ব'নে গিয়ে লড়াইয়ে যেতে হলে, তাঁরা না-জানি কী বিপদেই পড়বেন— কোথায় থাকবে আফিং, কোথায় বা তামাক? দুধের পুরু সর, রাবড়ি, মালাই সেখানে তো পাওয়াই যাবে না ; উল্‌টে বরং মাঠের হিম খেয়ে মরতে হবে!— মাদেরিয়ার ভীলদের হাঙ্গামা মেটাতে গিয়ে মকুল এই তামাশা দুই খুড়োকে নিয়ে শুরু করলেন। অনেক দিন বেশ আমোদে কাটল। তামাশার সঙ্গে সাতশো সেপাইয়ের সর্দারের মাসোহারা যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ ভাইপোটিকে আমোদ দিতে দুই খুড়োর আপত্তি হল না ; কিন্তু ঠাট্টা-তামাশা ক্রমেই একটু কড়া-রকম হতে লাগল। এমন কি, আফিংচি হলেও তামাশার খোঁচার দিকে চোখ বন্ধ করে ঝিমানো দুই খুড়োর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। কিন্তু ভাইপোর অনুগ্রহ ছাড়া বেচারাদের পেট চালাবার অন্য উপায় ছিল না ; কাজেই মনের রাগ তাদের মনেই জমা হতে লাগল! আর কোনো-কোনো দিন মুখ ফসকে বেরিয়েও আসতে শুরু করলে! এতে মকুলজীর আমোদ আরো

বেড়ে চলল বই কমল না। লোককে নিয়ে তামাশা করার নেশা লখারানার মতো মকুলেরও কম ছিল না! একদিন দুই চাচা তাঁকে স্পষ্ট মুখের উপর শুনিয়ে দিলেন যে বাপের তামাশার ফলে তিনি যে সিংহাসন পেয়েছেন, নিজের তামাশার দোষে সেটা কোনদিন বা তাঁকে হারাতে হয়! চাচার মনের কথা এমন স্পষ্ট শুনেও মকুলের চোখ ফুটল না। খুড়োদের ক্ষেপিয়ে তিনি তামাশা করেই চললেন।

সেদিন বনের মধ্যে একটা গাছে হঠাৎ রাত্রের মধ্যে রাঙা ফুল এত ফুটে উঠেছে যে মনে হচ্ছে বনে কে আগুন ধরিয়ে গেছে! মকুল সেই গাছটা দেখিয়ে পাশের একজনকে গাছের নামটা শুধোলেন। সে ঘাড় নেড়ে বললে, 'গাছের খবর আমরা রাখিনে রানাসাহেব!'

মকুল তাঁর দুই খুড়োর দিকে চেয়ে বললেন, 'গাছটার নাম কী আপনারা জানেন চাচা?'

শাদা কথা কিন্তু দুই খুড়ো বুঝলেন, তাঁদের মা ছিলেন কাঠুরের মেয়ে, কাজেই গাছের খবর তাঁদেরই কাছে পাওয়া সম্ভব— এইটেই রানা ইশারায় জানালেন। মা যেমনই হোক, সে তো মা, তাকে নিয়ে তামাশা কোন ছেলে সইবে! সেইদিনই দুই খুড়ো মকুলের কাজে ইস্তফা দিয়ে সভা ছেড়ে শুকনো মুখে বিদায় হয়ে গেলেন। রানার দেওয়া সাজসজ্জা, অস্ত্র-শস্ত্র, টাকা-কড়ি, লোক-লস্কর, হাতি-ঘোড়া সব পড়ে রইল; কেবল একটি মা-হারা মেয়ে যাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে দুই ভায়ে আপনাদের সব ভালোবাসা দিয়ে পুষেছিলেন, তাকেই কোলে করে সেপাই সর্দার সবার মাঝখান দিয়ে মাথা নিচু করে চলে গেলেন— একেবারে বন ছেড়ে।

দুই খুড়োর উপর কতটা অন্যায় হয়েছে, মকুল তখন বুঝলেন। মাপ চেয়ে দুই খুড়োকে ফিরিয়ে আনতে লোকের পর লোক গেল, কিন্তু দুই খুড়ো আর ফিরলেন না! অনুতাপে মকুল সারাদিন দুঃখ পেতে থাকলেন। নিতান্ত ভালোমানুষ নিরুপায় দুই খুড়োর শুকনো মুখ তাঁকে আজ কেবলি ব্যথা দিতে লাগল। তিনি সন্ধ্যাবেলা শিবির ছেড়ে একা বনের মধ্যে বেড়াতে গেলেন! সর্দারেরা রানার

মনের অবস্থা বুঝে কেউ আজ সঙ্গে যেতে সাহস পেলে না। সবাই তফাতে-তফাতে রইল। বনের তলায় আঁধার ক্রমে ঘনিয়ে এল, আকাশে আর আলো নেই, এ-সময়ে যখন চারিদিকে বিদ্রোহী ভীল, তখন রানাকে আর বনের মধ্যে একা থাকতে দেওয়া উচিত হয় না ভেবে যখন সব সর্দার বনের দিকে এগিয়ে চলেছেন, সে সময়ে মনে হল যেন অনেকগুলো শুকনো পাতা মাড়িয়ে অন্ধকারে কারা ছুটে পালাল। তারপরেই সর্দারেরা দেখলেন, সেই রক্তের মতো রাঙা ফুলগাছের তলায় রানা মকুল পড়ে রয়েছেন; বুকের দুই দিকে দুটো বল্লমের চোট দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। রানা সন্ধ্যার মালা জপ করছিলেন, এখনো তাঁর ডান-হাতের আগায় মালা জড়ানো। রানার মতো রানা ছিলেন মকুল— মেবারে হাহাকার পড়ে গেল। সবাই বলতে লাগল, এ কাজ সেই দুটি খুড়োর না হয়ে যায়না। মাদেরিয়ার বনে বিদ্রোহীদের কেউ এসে যে রানাকে মেরে যেতে পারে এটা সবার অসম্ভব বোধ হল!

পায়ীগ্রাম থেকে একটু দূরে পাহাড়ের উপরে রাতকোটের কেল্লা। সেইখানে এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে চাচা আর মৈর অতি কষ্টে এসে পৌঁছলেন। ওদিকে মকুলের উপযুক্ত ছেলে রানা কুম্ভ, তাঁর সঙ্গে মাড়োয়ারের যোধরাও এসে মিলেছেন; গ্রামে-গ্রামে পরগণায়-পরগণায় তাঁদের লোক চাচা মৈর— দুই ভাইকে ধরবার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পায়ীগ্রাম চিতোর থেকে বহুদূরে। ক'ঘর ছুতোর-কামার, জনকতক, জোতদার কিষান, বেশির ভাগই গরীব-গুর্বো। চাচা আর মৈর দুজন সর্দার তাদের মধ্যে এসে ভাঙা কেল্লাটা দখল করে ধুমধাম লাগিয়ে দেওয়াতে প্রথমটা তারা খুব খুশি হল। প্রথম-প্রথম দু-একবার তাদের সবারই পাল-পার্বণে কেল্লাতে নিমন্ত্রণ, আনাগোনাও হল; কিন্তু যতই টাকার টানাটানি হতে লাগল, ততই দুই সর্দার হাত গোটাতে লাগলেন। শেষে এমন দিন এল যে দুই সর্দারের কথা কেউ আর বড়ো একটা মুখেই আনত না। আবার পাহাড়ের উপর ভাঙা কেল্লার দুই বুড়োর নামে নানা-রকম

গুজব রটতে লাগল! কেউ বললে, তাদের অনেক টাকা; কেল্লার মধ্যে তারা সেই সব ধন-দৌলত এনে পুঁতে রেখেছে; রোজ তিনটে রাতে পাহাড়ের একটা দিকে কে যেন লণ্ঠন নিয়ে উঠছে সে স্বচক্ষে দেখেছে। কেউ বললে, দুই সর্দার কেল্লার মধ্যেকার একটা সুড়ঙ্গ দিয়ে দিল্লী যাওয়া-আসা করে, নবাবও মাঝে-মাঝে কেল্লায় এসে নাচ-তামাশা খাওয়া-দাওয়া করেন, তার ভাই একদিন হাট সেরে ফেরবার সময় সারঙ্গীর আওয়াজ আর মেয়েমানুষের গান স্পষ্ট শুনেছিল। একজন কামার কবে কেল্লায় দু-একটা মর্চে-ধরা দরজার খিল মেরামত করে এসেছিল, সে বললে, স্বচক্ষে দেখে এসেছে দুই বুড়োতে একটা আগুনের উপরে লোহার কড়া চাপিয়ে মুঠো-মুঠো লোহা-চুর ফেলছে, আর সেগুলো সোনা হয়ে উথলে পড়ছে। কড়াখানা কিন্তু মানুষের টাটকা রক্তে ভরা; দুটো কালো বাঘ সেই কড়াখানার চারিদিকে কেবল মাটি শুঁকে-শুঁকে ঘুরছে।

রাতকোটের কেল্লা ক্রমে নানা আজগুবি ভয়ংকর কাণ্ডের, ভয়ের আর তরাসের জায়গা বলে রটে গেল। ভয়ে সেদিক দিয়ে লোক আনাগোনাই আর করত না, দিনে-দুপুরে যেন তারা বাঘের গর্জন শুনতে থাকল, আর সন্ধ্যার সময় দেখতে লাগল— যেন কারা ঘোড়ার পিঠে থলে বোঝাই টাকা নিয়ে চলেছে— ঝম-ঝম।

দুই সর্দার মাসে-দুমাসে একবার হাটে নেমে আসতেন, কাপড়-চোপড় আটা গম একটা খোঁড়া ঘোড়ার পিঠে বোঝাই দিয়ে আবার পাহাড়ের উপর কেল্লায় উঠে যেতেন। কিন্তু এই ঘটনা নিয়ে সারা-গ্রাম হপ্তাখানেক ধরে সরগরম থাকত। সে নানা কথা— আটাওয়ালা দুই বুড়োকে আটা বেচে টাকার বদলে মোহর পেয়েছে। ঘি দশ সের, তার দাম কতই বা? বুড়োদের ঘি বেচার পরদিনই গোয়ালার স্ত্রীর গলায় হঠাৎ রুপোর হাঁসুলিটা দেখা যায় কেন? আর সেই কাপড়ের মহাজন, তার দোকান থেকে দুটো বুড়ো কেন যে এত শাড়ি কেনে, সেটা প্রকাশ হয়েও হচ্ছে না, সে কেবল মহাজনটা রীতিমতো কিছু মেরেছে বলে!

এদিকে গ্রামের ঘরে-ঘরে এই চর্চা, ওদিকে পাহাড়ের উপরে দুই বুড়োতে সেই কুড়োনো মেয়েকে তাদের সব ভালোবাসা দিয়ে আদর-যত্নে মানুষ করেছে। মেয়েটি তাদের প্রাণ, সেই ভাঙা কেল্লা, সেই মেয়ের হাসিতে, তার কচি গলার মিষ্টি কথায়, পাপিয়ার মতো তার গানের সুরে, দিন রাত ভরে রয়েছে। তার হাতে লাগানো ফুলের লতা ভাঙা দেওয়াল বেয়ে উঠে সকাল-সন্ধ্যায় ফুল ফোটাচ্ছে, গন্ধ ছড়াচ্ছে রাজার ভয়ে দেশ-ছাড়া এই দুটো বুড়োর জন্যে। একলা কেল্লায় এই তিনটি প্রাণী। আর আছে— এক পাহাড়ী কুকুর, দেখতে যেন বাঘ। সেই কুকুরই চাকর, দরোয়ান, সান্ত্রী, পাহারা— অজানা লোক যে হঠাৎ কেল্লায় ঢুকবে, তার যো নেই! শঙ্খচিল যেমন পাহাড়ের চূড়ায় বাসা বেঁধে বাচ্চা নিয়ে থাকে, তেমনি শাদা-চুল দুই বুড়োতে সেই অগম্য পুরীতে আদরের মেয়েকে নিয়ে রয়েছেন— অনেকদিন ধরে। এমন সময় একদিন পায়ীগ্রামের দফাদারের সুন্দরী মেয়েটি হারাল। নদীতে ডুবে সে মরল, কি বাঘেই তাকে ধরলে কিছুই ঠিক হল না। কিন্তু সবাই ঠিক করলে যে ঐ বুড়ো সর্দার দুটো সুন্দরী দেখে মেয়েটিকে চুরি করেছে। মেয়ের বাপ পাগলের মতো হয়ে কাজকর্ম ছেড়ে দিনরাত রাতকোটের কেল্লার আশে-পাশে ঘুরতে লাগল। তার নিশ্চয় বিশ্বাস সুন্দরিয়া তার ঐ কেল্লাতেই আছে। কেননা একদিন সকালে সত্যিই সে একটি মেয়েকে এলোচুলে পাহাড়ের পাকদণ্ডি বেয়ে বেড়াতে দেখেছে— খুব দূর থেকে যদিও, কিন্তু সে যে তারই মেয়ে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দফাদারকে সবাই পরামর্শ দিলে, 'যাও, রানা কুম্ভের কাছে নালিশ করো গিয়ে। তোমার মেয়েটি যে ভয়ানক লোকেদের হাতে পড়েছে, কুম্ভ ছাড়া কারো সাধ্যি নেই তাকে ছাড়িয়ে আনে।' বুড়ো দফাদার চলল। মরচে-ধরা তলোয়ার কোমরে বেঁধে, আর নিজের চেয়ে একটু বুড়ো এক ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে একলা চিতোরের দিকে চলল সে।

রাতকোট থেকে চিতোর কত দিন-রাতের পথ তা কে জানে,

দফাদার কিন্তু চলেছে। মেয়ের শোকে পাগলের মতো চলেছে; আর ফিরে-ফিরে রাতকোটের কেল্লাটার দিকে তলোয়ার উঁচিয়ে গালাগালি পাড়ছে; এমন সময় পথের মধ্যে তিন ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে দেখা। কথায়-কথায় দফাদারের মুখে মেয়ে-চুরির খবর শুনে তিনজনেই বললে, 'চলো, দফাদার-সাহেব, এর জন্যে আর রানার কাছে যেতে হবে না। আমরাই তোমার মেয়েকে উদ্ধার করে সেই তুই বুড়োর দফা-রফা করে আসছি, চলো!' শুনে দফাদার ঘাড় নেড়ে বললে, 'চেনো না সেই তুই বুড়োকে, তাই এমন কথা বলছ। মানুষের অগম্য স্থানে থাকে তারা। যদি কেউ সে-কেল্লা মারতে পারে তো রানা কুম্ভ! পাহাড় বেয়ে সেখানে উঠতে হবে— রাস্তা নেই। বনে-জঙ্গলে দিনে বাঘ হাঁকার দিয়ে ফেরে। কেউ সেখানে যেতে পারে না; আর গেলেও ফিরতে পারে না এমনি ভয়ানক পাহাড়ের চূড়োয় রাতকোটের কেল্লা! আর তারি মধ্যে রাক্ষসের চেয়ে ভয়ানক তুই বুড়ো বসে!' বলেই দফাদার হাউমাউ করে মেয়ের জন্যে কাঁদতে লাগল। তিন সেপাইয়ের মধ্যে সব-ছোটো যে সেপাই, সে বললে, 'ভয় নেই, আমরা ঠিক সেখানে যাব, চলে এস।' ছোটো সেপাইয়ের কথা শুনে দফাদার একটু চটে বললে, 'আমার কথায় বিশ্বাস হল না? আমি বলছি, সেখানে যাবার রাস্তা নেই!'

ছোটো সেপাই আর কেউ নয়, রানা কুম্ভ নিজে। চাচা আর মৈরকে সন্ধান করে শাস্তি দিতে চলেছেন। দফাদারের কথায় রানা হেসে বললেন, 'কেউ যদি কেল্লায় উঠতেই পারে না, তবে বুড়ো-তুটো তোমার মেয়েকে নিয়ে সেখানে গেল কোথা দিয়ে? রাস্তা নিশ্চয়ই আছে।' দফাদার আরও রেগে বললে, 'ওহে ছোকরা, রাস্তা থাকলে আমি কি সেখানে না উঠে এদিকে আসি? নিজেই গিয়ে বদমাস তুটোর মাথা কেটে আমার মেয়েকে'— বলেই বুড়ো আবার কাঁদতে লাগল। তিন সেপাই তাকে ঠাণ্ডা করে পায়ীগ্রামে ফিরিয়ে আনলেন।

গাঁয়ের মধ্যে সামান্য সেপাই-বেশে দফাদারের সঙ্গে রানা কুম্ভ

যখন উপস্থিত হলেন, তখন সন্ধ্যা উতরে গেছে— আকাশে কালো মেঘ জমে ঝড়বৃষ্টির উপক্রম হচ্ছে। গাঁয়ে এসে রানা খবর পেলেন, কেল্লার উপরে যে বুড়ো দুটি আছেন তাঁরা হচ্ছেন তাঁর বাপের খুড়ো — চাচা আর মৈর। রাগে কুম্ভ লাল হয়ে উঠলেন, 'চলো, আর দেরি নয়, এখনি সেই দুটো পাপাত্মার উচিত শাস্তি দেব!' রানা কেল্লার মুখে ঘোড়া ছোটালেন দেখে সঙ্গের দুটো সেপাইও চলল— পিছনে। দফাদার অন্ধকারে খানিক ওদের দিকে হাঁ-করে চেয়ে থেকে, 'পাগল! পাগল!' বলে ঘাড় নাড়তে-নাড়তে নিজের বাসায় খিল দিলে। সোঁ-সোঁ ঝড় বইতে লাগল আর তার সঙ্গে বৃষ্টি নামল। এক-একবার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, তারই আলোয় দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের উপর রাতকোটের কেল্লা— কালো অন্ধকারের একটা ঢেউ যেন আকাশ জুড়ে স্থির হয়ে রয়েছে। ভিজে মাটিতে তিনটি ঘোড়ার পায়ের ছপ-ছপ শব্দ হতে থাকল। রানা বললেন, 'ঘোড়া এইখানে ছেড়ে পায়ে হেঁটে চলো।' বনের মাঝে ঘোড়া বেঁধে তিন সেপাই পাহাড়ে চড়তে শুরু করলেন।

এদিক পাহাড়ের উপরে ভাঙা কেল্লায় দুটি বুড়ো আর তাঁদের সেই কুড়োনো মেয়েটি একটি পিদিমের একটুখানি আলোয় মস্ত-একখানা অন্ধকারের মধ্যে বসে গল্প করছেন আর কেল্লার ফটকে সিংহের মতো কটা চুল প্রকাণ্ড শিকারী কুকুর হিঙ্গুলিয়া ভাঙা দরজার চৌকাঠে মস্ত থাবা দুটো পেতে মুখটি বাড়িয়ে দুই কান খাড়া করে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছে— কেউ আসে কি না। ভিজে বাতাসে শিকারী কুকুরের কাছে রাতে-ফোটা একটা বনফুলের গন্ধ ভেসে এল; তার পরেই কাদের পায়ের তলায় বনে কুটো-কাটা ভাঙার একটুখানি শব্দ হল। কুকুর গা ঝাড়া দিয়ে উঠে আস্তে-আস্তে বার হল— জঙ্গলের পথে। বনের মধ্যে ভিজে পাহাড়ের তাত উঠছে। অন্ধকারে দু-চারটে জোনাকিপোকা লণ্ঠন জ্বালিয়ে কী যেন কী খুঁজে বেড়াচ্ছে! কুকুর পাহাড়ের পাকদণ্ডির ধারে চুপটি করে গিয়ে দাঁড়াল। রাতের বেলায় অচেনা কাদের পায়ের

শব্দ শুনে শিকারী কুকুরের চোখ দুটো জ্বলছে। কুকুর সজাগ হয়ে বসে আছে। কিন্তু যারা পাহাড়ে উঠছে, তারাও কম সজাগ নেই— পাকা শিকারী পাকা যোদ্ধা রানা কুম্ভ, তাঁর চারণ, আর মাড়োয়ারের যোধরাও! জানোয়ারের চোখ জ্বলছে কোন ঝোপের আড়ালে, সেটা এরা জোনাকির আলো বলে ভুল করলে না। রানার হাতের ছুরি সাঁ-করে গিয়ে বিঁধল হিঙ্গুলিয়ার বিশ্বাসী প্রাণটি ধুক-ধুক করছে ঠিক যেখানে! শিকারীর ছুরিতে কেল্লার একটি মাত্র রক্ষক, দুটি বুড়ো একটি কচি মেয়ের একমাত্র বন্ধু আর বিপদের সহায়— সেই সিংহের মতো হিঙ্গুলিয়া মরল— একটিবার কাতর স্বরে ডাক দিয়ে। সে যেন বলে গেল— 'সাবধান।' ঝড়ের বাতাসে সেই শেষ-ডাক ছেড়ে দিয়ে কুকুর স্তব্ধ হল! রানার বড়ো স্ফূর্তি হয়েছিল যে তিনি কেল্লা নেবার মুখেই একটা মস্ত সিংহ শিকার করলেন। সঙ্গীরাও বললেন, 'রানা, এ বড়ো সুলক্ষণ।' কিন্তু সেই ডাক যখন অন্ধকার চিরে পাহাড়ের চূড়োয় কেল্লার দিকে একটা কান্নার মতো ছুটে গেল, তখন সবার মুখ চুন হয়ে গেল। দেখলেন একটা কুকুর পড়ে আছে। তিনজন আস্তে-আস্তে আবার চললেন। মনে কারু আর তেমন উৎসাহ রইল না।

ওদিকে সেই আঁধার ঘরের একটি পিদিম বাতাসে নিবু-নিবু করছে; তাকেই ঘিরে তিনটি প্রাণী। বুড়ো চাচা গল্প বলছেন, তাঁর ছোটো ভাই আর এক বুড়ো ছেঁড়া কাঁথায় বসে ঝিমচ্ছেন, আর একটি মেয়ে অবাক হয়ে শুনছে: 'আমরা দুই ভাই তখন খুব ছোটো। আমি চলতে শিখেছি আর ও তখন মায়ের কোলে-কোলেই ফেরে। মা আমার হাত ধরে চললেন— এতটুকু ওকে বুকে করে। গাঁয়ের সবাই বলতে লাগল, তুই কাঠুরের মেয়ে, কবে রানা ক্ষেতসিং তোকে বিয়ে করেছেন, তা কি তাঁর মনে আছে? মিছে চিতোর যাওয়া! মা ঘাড় নাড়লেন; তারপর আমরা ঘর ছেড়ে বার হলেম। আমাদের সেই ছোটো ঘরখানি, সেই সবুজ মাঠের ধারে সেই মস্ত তেঁতুলতলার দিকে চেয়ে আমার মনটা কেমন-কেমন করতে থাকল। আমি

কেবলি ঘরের দিকে ফিরে চলতে চাইলেম ! মা কিন্তু আর সেদিকেও চাইলেন না— সোজা চললেন আকাশ যেখানে মাটিতে এসে মিলেছে, বরাবর সেই দিকেই চেয়ে। সন্ধ্যা হলে পথের ধারে, কোনো দিন গাছ তলায় কোনো দিন খোলা মাঠে মা আমাদের নিয়ে রাত কাটান। সকালে আবার চলতে আরম্ভ করেন। দুপুরে কোনো দিন কোনো গাঁয়ে আসি, সেখানে যা ভিক্ষে পাই, তাই খাই! কোনো দিন কিছু পাইও না, খাইও না। এই ভাবে মা আমাদের চলেছেন— চিতোরের রানার দুঃখিনী কাঠকুড়োনি রানী ! কতকাল পথে-পথে কাটল তার ঠিক নেই ! সারা বর্ষা চলে গেল— ভিজতে-ভিজতে পথ চলতে-চলতে! শীত এল। মাঠের দুরন্ত বাতাস রাতের বেলায় গায়ে যেন বরফ ঢেলে দিতে লাগল। ছেঁড়া কাঁথায় আমাদের জড়িয়ে নিয়ে মা সারারাত কাঁদতেন আর জাগতেন। আমাদের দুঃখিনী মা— রানী মা ! আমি এক-একদিন বলতেম, মা, ঘরে চলো। মা বলতেন, আর একটু গেলেই ঘর পাব। আমি সামনের দিকে চেয়ে দেখতেম, দূরে কেবল একটা ঝাপসা পাহাড়ের ঠাণ্ডা নীল ঢেউ ! মা, সেই নীলের দিকে চেয়ে চলতেন, আর এক-একবার তাঁর চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল পড়ত। এমনি সে কত দিন, কত দূরে চলে একদিন আকাশে আজকেরই মতো বাদল লাগল, বাতাস বইল, বিদ্যুৎ চমকাল ; মেঘের ছায়া পড়ে সামনের পাহাড় সে দিন যেন কালো হয়ে কাছে এগিয়ে এসেছে বোধ হল ; মা আমার পথের ধারে চুপটি করে ঘুমিয়ে ছিলেন, আমি তাঁকে জাগিয়ে দিয়ে বললেম, মা চেয়ে দেখো পাহাড়ের উপর কত বড়ো বাড়ি ! মা একবার চোখ মেলে দেখে বললেন, ওই আমার ঘর ! খানিক পরে আস্তে-আস্তে আমায় বুকের কাছে টেনে নিয়ে একটি সোনার হার আমার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'রানাকে এইটে দেখাস, তিনি তোদের ঘরে ডেকে নেবেন।'

বুড়ো চাচার চোখে জল ভরে উঠল। মেয়েটি বললে, 'তারপর ? কী হল ?' কারো মুখে কথা নেই। অনেকক্ষণ পরে চাচা উত্তর

দিলেন, 'তারপর আর কী? রাজার রাজা যিনি, তিনি আমার দুঃখিনী মাকে ডেকে নিলেন— নিজের ঘরে!'

'আর তোমাদের?' মেয়েটি শুধাল।

চাচা আস্তে বললেন, 'আমরা গেলাম রানার সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে কত কাল কাটালেম সুখে-দুঃখে দুই ভাই একলা! অত বড়ো রাজবাড়ি, সেখানে মাকে কোথায় খুঁজে পাব? দুজনে একলা থাকি আর মায়ের জন্যে কাঁদি—'

মেয়েটি ভারি ব্যস্ত হয়ে শুধোলে, 'রানার ঘরে মাকে পেলে না?'

চাচা ঘাড় নাড়লেন, 'না। কোথায় যে গেলেন মা, তা কেমন করে জানব? সে অনেক দিন পরে, দুই ভাই যখন বুড়ো হয়েছি, তখন এক দিন সকালে উঠে রাজসভায় যাব, এমন সময় দেখলেম, পথের ধারে মা আমাদের এতটুকু একটি কচি মেয়ে হয়ে একলাটি দাঁড়িয়ে ঘরে যাব বলে কাঁদছেন। আমরা সেই অনেক দিনের হারানো মাকে ফিরে পেয়ে কোলে করে একেবারে ঘোড়া হাঁকিয়ে এই পাহাড়ে এসে উপস্থিত হলেম।' মেয়েটি শুধোলে, 'রানা আবার কাঠকুড়োনি রানীকে কেড়ে নিতে এলেন না?' চাচা, মৈর দুজনেই বলে উঠলেন, 'খুঁজে পেলে তো রানা? আমরা এমন জায়গায় মাকে লুকিয়ে রেখেছি, রানার সাধ্যি কী, সেখান থেকে মাকে খুঁজে বার করেন!' গল্প শুনতে-শুনতে মেয়েটির চোখ ঘুমিয়ে পড়ছিল। সে চাচার কোলে মাথা রেখে বললে, 'আমাকে একদিন তোমাদের মাকে দেখাবে?' চাচা আস্তে মেয়েটির চুলে হাত বুলিয়ে বললেন, 'আর একটু বড়ো হও, তারপরে সেই নিরালা ঘরে একটি পিদিম জ্বালিয়ে মা যেখানটিতে একলা বসে আছেন সেখানে আমরা সবাই মিলে চুপি-চুপি চলে যাব।' মেয়েটি ঘুমের ঘোরে দরজার দিকে চেয়ে বললে, 'হিঙ্গুলিয়া?' চাচার ভাই আফিমের ঝোঁকে মাথা দুলিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটাকেও সঙ্গে নিতে হবে।' যারা গল্প বলছিল, আর শুনছিল, সবাই আস্তে-আস্তে

ঘুমিয়ে পড়ল। জেগে রইল কেবল একটি পিদিমের আলো— অন্ধকারের মাঝে যেন কষ্টিপাথর-ঘষা একটুখানি সোনালী রঙ।

কোন সময়ে ঝড় বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে, কেউ জানে না; কখন রানা কুম্ভ তলোয়ার খুলে ঘরে ঢুকেছেন, হঠাৎ একটা মেঘ গর্জনের সঙ্গে কড়্ কড়্ করে বাজ পড়ল। তিনজনেই চমকে উঠে দেখলেন তিনখানা খোলা তলোয়ার মাথার উপরে ঝকঝক করছে। রানা কুম্ভ ডাকলেন, 'ওঠো!' দুই বুড়োতে উঠে দাঁড়ালেন— মেয়েটির হাত ধরে। কুম্ভ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'রানাকে খুন করেছ, রাজপুতের মেয়েকে চুরি করে পালিয়ে এসেছ, এর শাস্তি আজ তোমাদের নিতে হবে!'

চাচা অবাক হয়ে বললেন, 'রানাকে?'

মৈর আস্তে আস্তে বললেন, 'মকুলজীকে?'

কুম্ভ বললেন, 'হ্যাঁ, তাঁরই খুনের শাস্তি এই নাও!' দুখানা তলোয়ার একই সঙ্গে দুই বুড়োর মাথায় পড়ল। মেয়েটি 'মা!' বলে একবার ডেকে অজ্ঞান হল। ঝড়ের বাতাস কোথা থেকে হঠাৎ এসে ঘরের পিদিম নিবিয়ে দিলে! কুম্ভ জানলেন, তাঁর বাপের খুনের শাস্তি দিলেন, রাজস্থানের সবাই জানলে তাই, কেবল ক্ষেতসিংহের কাঠকুড়োনি রানীর দুই ছেলে, যাঁদের মাথা কাটা গেল, তাঁরাই জানলেন না, কেন রানা তাঁদের শাস্তি দিলেন! আর সেই মেয়েটি জানলে না দফাদারের ঘরে রাতারাতি কারাই বা তাকে রেখে গেল, আর কেনই বা সকালে গাঁয়ের লোক তাকে ঘিরে বলাবলি করলে— এ-তো নয়, সে-তো নয়! এমনি নানা কথা কয়ে সবাই মিলে সন্ধ্যাবেলায় গাঁয়ের বাইরে, মাঠের ধারে কেন যে তাকে একা বসিয়ে দিয়ে সবাই যে-যার ঘরে চলে গেল, আর কেনই বা সারা রাত চাচা, চাচা, হিঙ্গুলিয়া, হিঙ্গুলিয়া বলে কেঁদে ডাকলেও কেউ সাড়াশব্দ দিলে না, আর সেই রাতকোটের কেল্লা অন্ধকারে কোথায় যে হারিয়ে গেল খুঁজে খুঁজে চলে-চলে পা ধরে গেল, তবু তো আর সেখানে সে ফিরতে পারলে না!— কেন? কেন?

তারপরে রানা কুম্ভ চিতোরের সিংহাসনে বসেছেন। তাঁর রানী মীরা দেখতে যেমন, গান গাইতেও তেমন। রতিয়া-রানার মেয়ে মীরা! তাঁর গান শুনে রূপ দেখে রানা কুম্ভ তাঁকে বিয়ে করেন। রানী স্বামীর সেবা করেন কিন্তু মন তাঁর পড়ে থাকে— রণ্‌ছোড়জীর মন্দিরে বাঁশি হাতে কালো পাথরের দেবমূর্তির পায়ের কাছে।

রানার কিন্তু এ ভালো লাগে না। তিনি নিজে কবি, গান রচনা করেন, আর সেই গান মীরা গায় রাজমন্দিরে বসে— এই চান রানা। কিন্তু সে তো হল না! মীরা দেবতার দাসী, তিনি রণ্‌ছোড়জীর মন্দিরেই সারা দিনমান ভক্তদের মধ্যে গাইতে লাগলেন, 'মীরা কহে বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা!'

চিতোরেশ্বরী মীরা সবার মাঝে গান গাইবে একতারা বাজিয়ে, এটা ভারী লজ্জার কথা হয়ে উঠল। রানা হুকুম দিলেন, 'মন্দিরে বাইরের লোক আসা বন্ধ করো।'

এক রাতের মধ্যে মন্দিরটা কানাতে ঘেরা হয়ে গেল। মীরাকে আর কেউ দেখতে পায় না কিন্তু গানের সুর শুনতে কানাতের বাইরে দেশ-বিদেশের লোক জড়ো হয়। বাঁশি শুনে হরিণ যেমন, তেমনি সবাই এক-মনে কান-পেতে প্রাণ ভরে মীরার গান শুনতে থাকে— তাড়ালে যায় না, হুকুম শোনে না, কাউকে মানেও না।

জোছনা-রাতে মন্দিরের সামনে শ্বেত-পাথরের বেদীতে বসে সোনা আর হীরে-জড়ানো সাজে সেজে মীরা স্বর্গের অপ্সরীর মতো দেবতার সামনে একলা নাচছেন, গাইছেন, রানা বীণা বাজাচ্ছেন, বাইরে লোকের ভিড়, এমন সময় আকাশ থেকে তারার মালার মতো একগাছি হীরের হার মীরার গলায় এসে পড়ল। রানা চমকে উঠে বীণা বন্ধ করলেন। মীরা সেই অমূল্য হার নিজের গলা থেকে খুলে মন্দিরের মধ্যে বংশীধারী রণ্‌ছোড়জীর গলায় পরিয়ে দিয়ে সে-রাতের মতো গান বন্ধ করলেন। হার যে কে দিয়ে গেল, তার আর খোঁজ হল না, কিন্তু দেশে নানা কথা রটল।

কেউ বললে, দিল্লীর বাদশা দিয়ে গেছেন ; কেউ বললে কে-এক উদাসীন, কেউ বা আরো কত কী ! কিন্তু মীরা অমূল্য হার রানাকে না দিয়ে যে রণছোড়জীকে নিবেদন করে দিয়েছেন তাতে সবাই খুশি হল। ভক্তেরা মীরার জয়জয়কার দিলে ! কিন্তু কুম্ভ রানা একটু চটলেন। তিনি হুকুম দিলেন, 'এবারে ভক্তেরা আসুন আর মীরা থাকুন বন্ধ অন্দরে।' এই হুকুম দিয়ে রানা মহম্মদ খিলজীর সঙ্গে লড়ায়ে চলে গেলেন। মীরার গান বন্ধ হল। সেই সঙ্গে চিতোর নিরানন্দ হয়ে গেল। মন্দিরে কাঁদে ভক্তেরা ; অন্দরে কাঁদেন মীরা। নন্দলালার দেখা না পেয়ে বন থেকে ছিঁড়ে আনা ফুলের মতো মীরা দিন-দিন মলিন হচ্ছেন, এমন সময় একদিন যুদ্ধ জয় করে ধুম-ধামে মহারানা চিতোরে এলেন। মামুদ-শাকে তার মুকুটের সঙ্গে রানা চিতোরে বন্ধ রাখলেন। রাজ্যের কারিগর মিলে পাথর কেটে চিতোরের মাঝখানে প্রকাণ্ড জয়স্তম্ভ তুলতে আরম্ভ করলে। কিন্তু মীরার মন রানা জয় করতে পারলেন না ; মীরা বললেন, 'রানা, আমি নন্দলালার দাসী, আমাকে ঘরে বন্ধ কোরো না। আমি শুনতে পাচ্ছি আমার নন্দলালা বাইরে থেকে আমাকে ডাকছেন— 'মীরা আয় !' আমাকে ছেড়ে দাও রানা, আমি পথের কাঙালিনী হয়ে নন্দলালার সঙ্গে বৃন্দাবনে চলে যাই !' রানা রেগে বললেন, 'রতিয়া সামান্য সর্দার, তার মেয়ে তুমি ! তোমার কপালে সিংহাসন জুটবে কেন ? যাও বেরিয়ে— যেখানে খুশি— আমি নতুন রানী নিয়ে আসছি।' সেইদিন চিতোরেশ্বরীর মীরা, নন্দলালার মীরা, ভিখারিনীর মতো একতারা বাজিয়ে পথে বার হলেন। আর রানা বার হলেন নতুন রানীর খোঁজে।

মন্দুর-রাজকুমারের সঙ্গে ঝালোয়ারের রাঠোর সর্দারের মেয়ের বিয়ে, বর আসছে ধূমধাম করে, এমন সময় রানা কুম্ভ এসে ঝলকুমারীকে সভার মধ্যিখান থেকে কেড়ে নিয়ে চিতোরে আনলেন। একে মহারানা, তাতে কুম্ভ, তাঁর উপর কথা কয় রাজস্থানে এমন তো কেউ নেই ! কেবল বৃন্দাবনে মীরা যখন শুনলেন, মন্দুর-

রাজকুমারের মুখে, রানা দুই প্রাণীর ভালোবাসার উপরে কী বিষম ঘা দিতে প্রস্তুত হয়েছেন, তখন তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। ঝলকুমারীর বরকে নিয়ে চিতোরে চললেন! রানার কাছে খবর পৌঁছল মীরা আসছেন। আর কেন আসছেন সেটাও শুনলেন কুম্ভ। রানা কড়া হুকুম দিলেন, 'ঝলোয়ান-বাগানের মধ্যে ঝলকুমারীকে কড়া পাহারায় যেন বন্ধ রাখা হয়!' তারপর কুম্ভ মীরাকে এক চিঠি পাঠালেন— চিতোরেশ্বরী মীরা, চিতোরেশ্বর তাঁকে পেলে সুখী হবেন। তিনি যা ভিক্ষা চাইতে এসেছেন, সেই স্ত্রী-রত্ন যেখানে বন্ধ আছে, সেই ঝলোয়ানের চাবিও রানা পাঠালেন। ইচ্ছে করলে বাগানের দরজা খুলে রানী মীরা ঝলকুমারীকে দেখে আসতে পারেন। কিন্তু মন্দুরের রাজকুমার যদিও বা কোনো উপায়ে ঝলোয়ানের বাগানে প্রবেশ করেন, কুমারীর দেখা পাবেন না নিশ্চয়। কেননা, রানার অন্দরে রানীর ছাড়া কোনো পুরুষের যাবার হুকুম নেই। যদি যায়, তবে মাথা বাইরে রেখে যায় এটা জানা কথা!

তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আকাশে একটিমাত্র তারা; আর দূরে ঝলোয়ানের বাগানের মধ্যে, পাথরের রাজপ্রাসাদের উপরে একটি ঘরে একটি আলো জ্বলজ্বল করে জানাচ্ছে মন্দুরের রাজ-কুমারের উপরে ঝলকুমারীর জ্বলন্ত ভালোবাসা! ঠিক সেই সময়ে রানার চিঠি মীরা পেলেন! চিঠি পড়ে মীরা বুঝলেন, উপায় নেই। তিনি দুটি কথা রানাকে লিখলেন— 'প্রেম না করলরে, বিনা প্রেমসে প্রেম না মিললরে!' মীরা মন্দুরের রাজকুমারের হাতে ঝলোয়ানের চাবি দিয়ে চিতোর ছেড়ে চলে গেলেন; আর মন্দুর-রাজকুমার ঝলকুমারীকে শেষ-দেখা দেখে নিতে বাগানে ঢুকলেন— আলোর নিশানার দিকে চেয়ে।

সেই রাতকোটের কেল্লায়, অন্ধকার-রাতে দুটি বুড়ো আর একটি কচি মেয়ের ভালোবাসার প্রদীপ যেমন করে হঠাৎ নিবেছিল, আজও আবার তেমনি করে রানা কুম্ভ নিজের অন্দরে ঝলকুমারীর

ভালোবাসার প্রদীপটি তলোয়ারের চোটে নিবিয়ে দিয়ে সকালে রাজসভায় এসে বসলেন। কারিগর এসে জোড়-হাতে বলল, 'মহারানার কীর্তিস্তম্ভ শেষ হয়েছে। স্তম্ভের নাম কী, জানতে চাই। পাথরে খোদাই করতে হবে।'

কুম্ভরানা খানিক ভেবে বললেন, 'লেখগে যাও— কুম্ভশ্যাম।'

সংগ্রামসিংহ

রানা কুম্ভ অনেক লড়াই করেছিলেন, অনেক দেশও জয় করে বীরত্ব দেখিয়েছিলেন, কিন্তু ঝুনঝুনের লড়াই যেমন, তেমন আর কোনো লড়াই হল না। আর লড়াই ফতে হবার পর নাচ-তামাশা, গান-বাজনা, আতসবাজি, আলো যেমন হতে হয়! একমাস ধরে চিতোর শহর রাতে দিন হয়ে গেল। কিন্তু একটি কাণ্ড ঘটল। লড়াই জিতে আসবার পরদিন থেকে কুম্ভ হাতের তলোয়ার তিনবার মাথার উপর ঘুরিয়ে ফারসি না আরবিতে কী জানি কী সাপের মন্তর না ব্যাঙের মন্তর আউড়ে তবে নিজের সিংহাসনে বসতে লাগলেন। শুধু এক-আধ দিন নয়, এই কাণ্ড বরাবর চলল। রানা বুড়িয়ে গেলেন তবু তলোয়ার ঘোরানো আর মন্তর পড়া একটি দিন কামাই গেল না। রানার কাণ্ড দেখে সভাসুদ্ধ অবাক হয়ে যেত, কিন্তু কেন যে রানা এমন করেন সে কথা জানতে কেউ চেষ্টাও করত না। একবার রানার বড়ো ছেলে সভার মাঝে রানাকে শুধিয়েছিলেন — মাথার উপরে তিনবার তলোয়ারখানা ঘোরাবার কারণটা কী, আর ওই সাপের মন্তরগুলোরই বা মানে কী? সেইদিন রানা কুম্ভ জবাব দিলেন, 'বারো ঘণ্টার মধ্যে চিতোর ছেড়ে চলে যাও, বাপ কী করেন, সে খোঁজ ছেলের রাখবার কিংবা জানবার দরকার নেই।' তারপর তিনবার করে ঠিক নিয়মিত রানার তলোয়ার মাথার উপরে ফিরতে লাগল কিন্তু হুকুম আর ফিরল না। রানার বড়ো-ছেলে রায়মল নির্বাসনে গেলেন, রইলেন কেবল ছোটো-ছেলে সুরজমল আর মেজ-ছেলে— তার নাম রাজস্থানে কেউ এখনো করে না— 'ঘাতীরাও' 'হাতিয়ারো' এমনি নানা নামে সে লোকটাকে ডাকে। এই 'ঘাতীরাও' বিষ খাইয়ে বুড়ো রানা কুম্ভকে মেরে চিতোরের সিংহাসনে বসল। রাজপুত প্রজারা এই বিষম ঘটনায় একেবার খাপ্পা হয়ে খুনের

শোধ খুনই ঠিক বলে স্থির করে রায়মলকে আবার সিংহাসন দেবার ফন্দি করলে। দিল্লীতে তখন প্রথম পাঠান স্লুলতান বহলোল লোদী। তার সঙ্গে 'ঘাতীরাও' কুটুম্বিতা করে, নিজের মেয়ের সঙ্গে স্থলতানের বিয়ে দেবার ফন্দি করে, খুব শক্ত হয়ে চিতোরের সিংহাসনে বসে থাকার মতলব করছে, এমন সময় ইদর রাজ্য থেকে রায়মলকে রাজপুত সর্দারেরা খুঁজে বার করলেন। 'ঘাতীরাও' বড়ো-বড়ো সর্দারদের বড়ো-বড়ো জমিদারির লোভ দিয়েও নিজের দলে টানতে পারলে না! যে নিজের বাপকে খুন করতে পারে, রাজপুতের মেয়েকে পাঠানের বেগম করে দিতে চায়, তার দলে কোন রাজপুত থাকতে পারে? 'ঘাতীরাও' কাজেই গতিক খারাপ দেখে একদিন রাতারাতি স্থলতানের দরবারে গিয়ে মেয়ের বিয়ের সব পাকা করে চুপি-চুপি আবার চিতোরে এসে বসবার মতলবে ঘোড়া ছুটিয়ে একা আসছে, এমন সময় পথের মধ্যে বজ্রাঘাতে তার মৃত্যু হল।

এই অবসরে রায়মল চিতোর দখল করে বসলেন।

স্থলতান বহলোল চিতোরের রাজকুমারীকে বিয়ে করতে এসে দেখলেন বাহান্ন হাজার সওয়ার আগে, এগারো হাজার পাইক সঙ্গে, রায়-বাঘের মতো রায়মল তাঁকে ধরবার জন্যে পাহাড়ের উপর বসে আছেন। পাঠান স্থলতান বিয়ে করতে এসেছিলেন বর সেজে, কিংখাবের লুঙি কোমরে জড়িয়ে, জরির লপেটা ফেলে চম্পট দিলেন যেখান থেকে এসেছিলেন সেই দিল্লীতে!

রায়মল, তাঁর তিন ছেলে সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ, জয়মল, আর একটি মাত্র ছোটো ভাই স্থরজমল এই চারজনকে নিয়ে চিতোরে বসে রাজত্ব করতে থাকেন, সেই সময়ে একদিন— তখন রানা হয়েছেন বুড়ো, ছেলেরা হয়েছে বড়ো, দেশে রয়েছে শান্তি, আর স্থখে রয়েছে রাজা-প্রজা সবাই— তখন প্রচণ্ড গরমকালে দুপুর-বেলায় বাইরে আগুন হাওয়া, বুড়ো রানাজী ভীম তালাওয়ের মাঝখানে জলের উপরে শ্বেত-পাথরের তাওখানায় আরাম করছেন। রাজকুমার তিনজন ছোটো-খুড়ো স্থরজমলের বাগান-বাড়িতে আড্ডা করছেন আর তাশ, দাবা,

গোলাপ-জলে ভিজানো খসখসের পাখা এমনি সব নানা কুড়েমি ও আয়েসির সাজ-সরঞ্জামের মাঝে বসে এ-গল্প সে-গল্প চলছে, কিন্তু বাইরে বইছে গরম বাতাস —এমন গরম যে পাহাড়গুলো পর্যন্ত ফেটে তো গেছেই, ঘরের মধ্যেকার দেওয়ালগুলো থেকেও তাপ উঠছে। কাজেই ঘরের মধ্যে রাজকুমারেরা ঠাণ্ডা হতে চাইলেও বেশিক্ষণ ঠাণ্ডা রইলেন না।

এ-কথায় সে-কথায় কজনের মধ্যে কে কেমন বীর, কোন লড়াই কে ফতে করে কোন-কোন পরগণা দখল করেছেন, প্রজারা কার নামে কী বলে, এমনি নানা খুটিনাটি খিটিমিটি থেকে রাজসিংহাসন উচিত মতো কে পেলে প্রজারাও সুখী হয়, দেশেরও ভালো হয় —এই তর্ক উঠল। রানার মেজছেলে পৃথ্বীরাজ যেমন সুপুরুষ তেমনি সাহসী ; বড়োছেলে সঙ্গ দেখতে মোটেই রাজপুত্রের মতো নন —শাদাসিদে ছোটোখাটো মানুষটি ধীর-গম্ভীর বড়ো-বড়ো টানা চোখ ; ছোটোছেলে জয়মল কাটখোট্টা, মোটা-সোটা যেন চোয়াড় গোছের, আর রানার ভাই সুরজমল খুব সুপুরুষ নন খুব কদাকারও নন —অনেকটা বুড়ো রানারই মতো নাক চোখ! তিন ভায়ে বিষম তর্ক বাধল সিংহাসন নিয়ে। পৃথ্বীরাজ বললেন, 'প্রজাদের হাতে যদি রাজা বেছে নেবার ভার পড়ে তো দেখে নিও আমাকেই রাজপুতেরা রাজা করবে!' জয়মল বলে উঠলেন, 'ওসব বুঝিনে। দেখছ এই হাতখানা। জোর যার মুলুক তার!' সঙ্গ, তিনি সবার বড়ো, একটুখানি হেসে বললেন, 'ভবানীমাতা যাকে সিংহাসন দেবার দিয়ে বসে আছেন, বিশ্বাস না হয়, চল চারণীদেবীর মন্দিরে শুনিয়ে দেখি কার অদৃষ্টে সিংহাসন লেখা রয়েছে।' সুরজমল তিনজনকে ধমকে বললেন, 'আঃ, এ সব কী কথা হচ্ছে? দাদা শুনলে রক্ষে থাকবে না। হয়তো তোমাদের সঙ্গে আমাকেও দেশছাড়া করবেন। সিংহাসন নিয়ে নাড়াচাড়া কেন বাপু! একি সতরঞ্চ না দাবা খেলা পেলে, যে এখনি রাজা উজির মারছ? নাও, একটু গোলাপ-জল মাথায় দাও, ঠাণ্ডা হও ; থাক ওসব কথা।' কিন্তু বাইরের গরম তখন

রাজকুমারদের মগজে চড়েছে, ঠাণ্ডা হবে কে ? সবাই উঠে বললেন, 'চলো খুড়ো, থাক এখন ঠাণ্ডা হওয়া ; চারণীর কাছে গুনিয়ে আজ ঠিক করব সিংহাসনটি কার পাওনা।' বুদ্ধিমান সুরজমল দেখেন বিপদ —গেলে রাগেন দাদা, না গেলে রাগেন দাদার তিন পুত্তুর, তার মধ্যে একজন গুণ্ডা আর-একজন বেজায় সাহসী ; কাজেই সুরজমল চললেন বলতে-বলতে, 'শেষে দেখছি রাজত্বটা আমারই হবে, তোমরা তিন ভাই হয় দেশছাড়া হবে কালই দাদার হুকুমে, নয়তো দুদিন পরে নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করে মরবে ; বাকি থাকব আমি রাজ্যের ভোগ ভুগতে।'

পৃথ্বীরাজ বলে উঠলেন, 'সেইজন্যে তোমাকেও সঙ্গে নিচ্ছি ; তোমারও কপালে কী আছে দেখা চাই তো ?'

সুরজমল নিজের আর তিন ভায়ের কপালে এক-একবার টোকা মেরে বললেন, 'গুনে দেখার প্রয়োজন নেই, আওয়াজেই বুঝছি সব ফোঁপরা !'

উদয়পুর থেকে পাঁচ ক্রোশ হবে নাহরামুংরা। সেইখানে এক পাহাড় তাকে বলে ব্যাঘ্রমেরু ; তারই উপরে থাকেন চারণীমন্দিরের সিদ্ধিকরী যোগিনী। পাহাড়ের অন্ধকার গুহার মধ্যে দেবীর দেউল। রাজপুত্রেরা দুরন্ত গরমে ঘোড়া ছুটিয়ে যখন মন্দিরে উপস্থিত হলেন তখন সন্ধ্যাপূজার যোগাড় করতে সিদ্ধিকরী বাইরে গেছেন ; মন্দির খালি ; তারই মধ্যে অন্ধকারে কালো পাথরের চারণীদেবীর ফটিকের তিনটে চোখ মাত্র দেখা যাচ্ছে, আর সামনে মস্ত একটা পাথরের চাতালে সন্ধ্যাবেলার আলো পড়েছে —রক্ত যেন ঢেলে দিয়েছে। সিদ্ধিকরীকে মন্দিরে না দেখে সুরজমল বলে উঠলেন, 'কেমন, বলেছিলাম তো কপাল ফোঁপরা ! মন্দির খালি, এখন দেবীকে একটি করে প্রণাম দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে চলো।' পৃথ্বীরাজ ঘাড় নেড়ে বললেন, 'তা হবে না, এইখানে বসতে হবে, আরতির পর হাত গুনিয়ে তবে ছুটি !' একদিকে একটা বাঘের ছাল পাতা ছিল আর একদিকে সিদ্ধিকরীর খাটিয়া, তার উপরে ছেঁড়া কাঁথা। পৃথ্বীরাজ

তাড়াতাড়ি গিয়ে খাটিয়াতে বসলেন, দেখাদেখি জয়মলও উঁচুতে খাটিয়ায় বসল। বাঁশের খাটিয়া একবার মচাৎ করে শব্দ করেই চুপ করল। সঙ্গ গিয়ে বসলেন বাঘছালের উপর মাটিতে, আর সুরজমল বসলেন একটা হাঁটু বাঘছালে রেখে একেবারে আগুনের মতো তপ্ত পাথরের মেঝেয়।

ভর সন্ধ্যায় গুহার মধ্যে অন্ধকার বেশ একটু ঘনিয়ে এসেছে, সেই সময় প্রদীপ-হাতে সিদ্ধিকরী গুহাতে ঢুকেই দেখেন চার মূর্তি। সঙ্গ উঠে, সিদ্ধিকরীকে নমস্কার করে বসলেন। সুরজমলকে আর উঠতে হল না—তিনি যে মাটিতে বসেছিলেন সেই মাটিতেই সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করলেন। পৃথ্বীরাজ খাটিয়া ছেড়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঘাড়টা নোয়ালেন, হাতদুটো কপালের দিকে উঠেই আবার নেমে গেল; আর জয়মলটা উঠলও না, নমস্কারও দিলে না, বসে-বসেই বললে, 'মাতাজী গণনা করে বলুন তো আমাদের মধ্যে কার কপালে চিতোরের সিংহাসনটা রয়েছে?' সিদ্ধিকরী কোনো উত্তর না দিয়ে কেবল নিজের কপালে হাত বোলাতে লাগলেন আর গেরুয়াকাপড়ের খুঁটে মুখ মুছতে থাকলেন দেখে পৃথ্বীরাজ বলে উঠলেন—'ভাবেন কী? বড়ো জরুরি কথা। বেশ করে ভেবে চিন্তে গণনা করে উত্তর দেবেন।' সঙ্গ বললেন, 'আগে চারণীর পুজোটা ওঁকে সেরে নিতে দাও, পরে ওসব কয়ো।'

'সেই ভালো।' বলে সিদ্ধিকরী পুজোয় বসলেন।

তারপর চারণীর সামনে একবার পিদিম নেড়ে ঘণ্টাটা বাজিয়ে গোটাকতক প্রসাদী গাঁদাফুল চারপুত্রের মাথার পাগড়িতে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'রাজকুমারেরা, একটা ইতিহাস বলি শোনো—পূর্বকালে উজ্জয়িনীনগরে একদিন মহারাজা বিক্রমাদিত্য রাজসভা ছেড়ে অন্দরে গিয়ে জলযোগ করতে বসবেন এমন সময় লক্ষ্মী সরস্বতী বিবাদ করতে করতে সেখানে উপস্থিত! মহারাজা তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে উঠে বললেন, 'দেবী আপনাদের কী প্রয়োজনে আগমন, দাসকে বলুন!' দুইজনেই রাজাকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'বৎস বিক্রমাদিত্য, তুমি

তো রাজা, বিচার করো দেখি আমাদের দুইজনের মধ্যে কে বড়ো!' বীণা হস্তে সরস্বতী ঝংকার দিয়ে বললেন, 'আমি বড়ো, না ও বড়ো?' লক্ষ্মী বীণাপাণির ঝংকারের উপর অলংকার দিয়ে বললেন, 'এই আমি, না ওই ওটা, কে বড়ো?' রাজা দেখেন বড়ো গোলযোগ —এঁকে বড়ো করলে উনি চটেন, ওঁকে খাটো করলে তিনি চটেন। রাজা দুজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোচ্ছেন দেখে বিক্রমাদিত্যের ছোটো রানী বলে উঠলেন —'ঠাকরুনরা রাজাকে কিছু খেয়ে নিতে দিন, সারাদিন বিচার করে ওঁর এখন মাথার ঠিক নেই, সুবিচার করেন কেমন করে? আজকের রাতটা ওঁকে ভেবে ঠিক করতে দিন, কাল রাজসভায় ঠিক বিচার হয়ে যাবে দেখবেন।' রাজা বললেন, 'এ পরামর্শ মন্দ নয়, কঠিন সমস্যা, একটু সময় পেলে ভালো হয়।' দেবীরা 'তথাস্তু' বলে বিদায় হলেন। রাজা জলযোগে বসে ছোটোরানীকে বললেন, 'দেবীদের আজকের মতো তো বিদায় করলে কিন্তু কালকের বিচারটা কী হবে কিছু ঠাউরেছ কি?' রানী ভিরকুটি করে বললেন, 'বিচারের আমি কী জানি! তোমার সভায় নবরত্নের মধ্যে কেউ পণ্ডিত, কেউ কবি, কেউ মন্ত্রী, কেউ যন্ত্রী; তাঁদের শুধোও না।' রাজা মাথা চুলকে সভায় প্রস্থান করলেন। সভার মধ্যে নবরত্ন হাজির --ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির, বররুচি। রাজার প্রশ্ন শুনে ন'জনেই মাথা চুলকোতে আরম্ভ করলেন; রাত্রি দুই প্রহর বাজল কিছুই মীমাংসা হল না, দুই দেবীর বিচার কী হিসাবে করা যায়? সরস্বতীকে বড়ো বললে চটেন লক্ষ্মী, রাজ্যপাট সব যায়, নবরত্নের মাসহারাও বন্ধ হয়! আবার যদি বলা যায় সরস্বতী ছোটো, লক্ষ্মীই বড়ো, তবে বিদ্যে পালায়, বুদ্ধি পালায়, কালিদাসের কবিতা লেখা বন্ধ, ধন্বন্তরির চরকসংহিতা, বরাহমিহিরের পাঁজি পুঁথি, খনার বচন সবই মাটি! রাজাই বা কী বুদ্ধি নিয়ে রাজ্য চালান, হিসেব দেখেন, বিচার করেন? বিক্রমাদিত্য বিষম ভাবিত হয়ে অন্দরে এসে বিছানা নিলেন। রানী দেখেন রাজার নিদ্রা নেই, কেবল এপাশ-ওপাশ করছেন; যেন শয্যাকণ্টকী হয়েছে। তারপর —'

এমন সময় পৃথ্বীরাজ বলে উঠলেন —'ও-গল্প তো আমরা জানি। দুই দেবীর একজন এসে বসেছিলেন স্বর্ণ-সিংহাসনে, অন্যে বসেছিলেন রুপোর খাটে; ছোটো-বড়ো বিচার আপনি হয়েছিল। গল্প থাক, এখন দেখুন দেখি বিচার করে আমাদের মধ্যে রাজা হবে কে?'

সিদ্ধিকরী একবার চারজনের দিকে চেয়ে বললেন, 'রাজকুমার, তোমরা নিজেরাই নিজেদের বিচার শেষ করে বসে আছ! সঙ্গ —যিনি বসে আছেন বাঘছালে বীরাসনে, উনি ঠিক রাজার উপযুক্ত জায়গায় রয়েছেন —রাজ্যেশ্বর! সুরজমল রয়েছেন মাটিতে —সঙ্গের কাছেই মাটিতে, কাজেই দেখা যাচ্ছে জমিতে ওঁর দখল, সিংহাসনের কাছাকাছি উনি থাকবেন —হয় মন্ত্রী, নয় সর্দার, নয় জমিদার! আর পৃথ্বীরাজ, জয়মল, তোমরা বসেছ সন্ন্যাসিনী যে আমি, আমার আসনে ছেঁড়া কাঁথায়, কাজেই ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে রাজ্যের স্বপ্ন দেখা ছাড়া তোমাদের অদৃষ্টে আর কিছুই নেই!' এই কথা বলেই সিদ্ধিকরী গুহার অন্ধকারের মধ্যে চলে গেলেন; চার রাজকুমারের চোখ বাঘের মতো কটমট করে এর ওর দিকে চাইতে থাকল!

সর্ব-প্রথম সুরজমল কথা বললেন, 'তাহলে?'

'তাহলে সিংহাসন কার এখানেই স্থির হয়ে যাক আজই!' বলেই পৃথ্বীরাজ তলোয়ার খুলে সঙ্গকে আক্রমণ করলেন। সঙ্গ ছুটে গুহার বাইরে যাবেন, তলোয়ারের চোট পড়ল তাঁর একটি চোখের উপরে। চারণীদেবীর সামনে ভায়ের হাতে ভায়ের রক্তপাত ঘটল! সঙ্গ প্রাণভয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। একদিকে গেলেন সুরজমল; পৃথ্বীরাজ, জয়মল গেলেন আর একদিকে —এঁর পেছনে উনি তাঁর পিছনে তিনি; অন্ধকার ঢেকে নিলে চারজনকেই।

চারণীমন্দির থেকে প্রায় এক রাতের পথ রাঠোরসর্দার 'বিদা'র কেল্লার বুরুজের ধরনে কাঁচামাটির দেওয়ালঘেরা খামার বাড়ি। ভোর হয়ে আসছে কিন্তু মেঘে-ঢাকা আকাশে তখনো আলোর টান একটিও পড়েনি। উঠোনের মাঝে মস্ত তেঁতুল গাছটার আগায়

পোষা ময়ূরটা ডানায় মুখ গুঁজে চুপ করে আছে। গাছের তলায় হালের গরু ছুটো মাটিতে পড়ে আরামে ঝিমচ্ছে। কোথাও কোনো শব্দ নেই; কেবল সর্দারের ঘোড়া নিয়ে দরজার কাছে একটা ছোকরা-রাজপুত দাঁড়িয়ে আছে; সেই ঘোড়া এক-একবার ঘাড় নাড়ছে আর তারই মুখের লাগামে পরানো লোহার আংটা আর কড়াগুলো এক-একবার আওয়াজ দিচ্ছে —টিংটিং ঝিনঝিন। বিদা দূরগ্রামে পুজো দিতে যাবেন, তাই ভোর না হতেই প্রস্তুত হয়ে ঘর থেকে বার হবেন, এমন সময় দূরে অন্ধকারের মধ্যে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল —কে যেন তেজে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। দেখতে-দেখতে রক্তমাখা রাজকুমার সঙ্গ 'রক্ষা করো' বলে বিদার দরজায় এসে ধাক্কা দিলেন। তাঁর একটা চোখের উপরে তলোয়ারের চোট পড়েছে, শরীরও অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত। বিদা তাড়াতাড়ি দরজা খুলে রাজপুত্রকে দেখেই বলে উঠলেন, 'একি! এমন দশা আপনার কে করলে?' সঙ্গ ছুকথায় তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন— প্রাণ সংশয়, পৃথ্বীরাজ আর সুরজমল ছুজনেই অজ্ঞান হয়ে রাস্তার মাঝে পড়েছেন কিন্তু জয়মল এখনো পিছনে তাড়া করে আসছেন তাঁকে মারতে। বিদা সঙ্গকে তাঁর নিজের ঘোড়া দিয়ে বললেন, 'রাজকুমার, ভিতরে গিয়ে বিশ্রাম করুন, পরে নতুন ঘোড়ায় অন্য গ্রামে রওনা হবেন।' ওদিকে জয়মল আসছেন, একটা ঝড়ের মতো— মাঠের উপর দিয়ে। সঙ্গের ইচ্ছা তখনই তিনি পলায়ন করেন, কিন্তু রাজভক্ত বিদা কিছুতেই তাঁকে ছাড়তে চায় না কিছু না খাইয়ে-দাইয়ে। ওদিকে বিপদ ক্রমে এগিয়ে আসছে! সঙ্গ ইতস্তত করছেন দেখে বিদা বললেন, 'কোনো ভয় নেই, আপনি ভিতরে যান। নিশ্চিন্ত হয়ে একটু বিশ্রাম করে যতক্ষণ না আপনি খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন ততক্ষণ জয়মলকে এই দরজার চৌকাঠ পার হতে হবে না, আমি তাকে ঠেকিয়ে রাখব।' তাই হল। সঙ্গের নতুন ঘোড়া সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে পুবমুখে অনেক দূরে ছোটো একটা কালো ফোঁটার মতো আস্তে-আস্তে দূর মাঠের একেবারে শেষে বনের

আড়ালে মিলিয়ে গেছে, সেই সময় তিনঘণ্টা ধস্তাধস্তির পরে বিদাকে মেরে তবে জয়মল বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে দেখলেন সঙ্গ চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর অকর্মণ্য ক্ষতবিক্ষত ঘোড়াটা উঠোনের মাঝে তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়ে খানিক শুকনো ঘাস চিবুচ্ছে আরামে। জয়মল রাজভক্ত রাজপুতবীরের রক্তে রাঙা হাতখানি দিয়ে নিজের কপাল চাপড়ে হতাশ মনে প্রাণশূন্য বিদার দিকে খানিক চেয়ে রইলেন— তারপর ঘাড় নিচু করে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেলেন।

এদিকে সকাল হয়ে গেল, কোন অজানা গাঁয়ের কিষানরা সকালে খেতে যেতে-যেতে পথের ধারে দেখলে রক্তমাখা দুই রাজকুমার সুরজমল আর পৃথ্বীরাজ। সবাই মিলে ধরাধরি করে রাজপুত্রদের ডুলিতে তুলে গাঁয়ে নিয়ে রাখলে। এদিকে মহারানারও লোকজন— তারাও বেরিয়েছে সন্ধানে ঘোড়া পালকি সব নিয়ে, রাজকুমারদের ফেরাতে, কিন্তু কেবল পৃথ্বীরাজ সুরজমল দুজনকে তারা সন্ধান করে ফিরে পেলে, আর দুজন যে কোথায় তার খবরই হল না!

পৃথ্বীরাজ রানীদের যত্নে আস্তে-আস্তে সেরে উঠলেন, সুরজমলের চোট বেশি, অনেক তদ্‌বিরে তিনি সুস্থ হলেন।

মহারানা চার কুমারের ব্যাপার শুনে একদিন পৃথ্বীরাজকে ডেকে বললেন, 'এই যে ঘটনা ঘটেছে, এর জন্যে তুমিই দায়ী। সঙ্গ একেবারে নির্দোষ। সে কোথায় আছে, কি নেই, কিছুই জানা যাচ্ছে না; বেঁচে থাকে তো তোমারই ভয়ে সে কোথায় লুকিয়ে আছে। মনে কোরো না তোমাকে আমি চিতোরে বেশ আরামে বসিয়ে রাখব, আর আমি চোখ বুজলেই আস্তে-আস্তে সিংহাসনে তুমি উঠে বসবে। আজই তুমি ঘোড়া অস্ত্র যা তোমার ইচ্ছে হয় নিয়ে বিদায় হও! লড়তেই চাও তো বড়ো-ভায়ের সঙ্গে না লড়ে পারো তো রাজ্যের শত্রুদের জব্দ করোগে, তবে বুঝব তুমি বীর— যাও!'

ছেলের উপর এই হুকুম দিয়ে সুরজমলকে রানা ডেকে বললেন, 'তুমি সঙ্গকে বাঁচাতে চেয়েছিলে সেই জন্যে তোমাকে শাস্তি দেব

না, আজ থেকে তুমি আমার আত্মীয় সারংদেবের ওখানে গিয়ে থাকো, চিতোরমুখো হয়ো না।'

সুরজমল তো নির্বাসনে যান।

এখন পৃথ্বীরাজ বার হলেন চিতোর ছেড়ে দিক্‌বিজয়ে। তিনি জানতেন মহারানার কাছে যদি কখনো ক্ষমা পান তো সে বীরত্ব দেখিয়ে, মেবারের শত্রুদের শাসন করে তবে। রানা রাগলেও, প্রজারা পৃথ্বীরাজকে সত্যিই ভালোবাসত, কাজেই তাঁকে একেবারে একলা পড়তে হল না। দু-একজন করে ক্রমে একটি ছোটো-খাটো দল তাঁর সঙ্গে জুটল, যাদের কাজই হল এখানে-ওখানে লড়াই করে বেড়ানো। এমনি এদেশে সেদেশে দল নিয়ে ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে পৃথ্বীরাজের যা-কিছু টাকাকড়ি সম্বল ছিল গেল ফুরিয়ে। শেষে এমন দিন এল যে দিনের খোরাক, তাও জোটানো ভার!

এখন একটা ছোটো-খাটো রাজ্য জয় করে না বসতে পারলে আর উপায় নেই। এই অবস্থায় পৃথ্বীরাজ একদিন নিজের হাতের একটা মানিকের আংটি গদাওয়ারের উঝা নামে এক জহুরীর কাছে বাঁধা দিয়ে কিছু টাকা আনতে পাঠালেন। এই উঝাই একদিন ঐ আংটিটা পৃথ্বীরাজকে অনেক টাকায় বেচেছিল; আংটি দেখেই জহুরী তাড়াতাড়ি টাকাকড়ি নিয়ে যেখানে পৃথ্বীরাজ ছদ্মবেশে সামান্য লোকের মতো একটা সরাইখানায় দিন কাটাচ্ছিলেন সেইখানে উপস্থিত হয়ে বললে, 'এ কী দেখছি রাজকুমার! টাকার দরকার ছিল তা একটু লিখে পাঠালে হত, আংটিটা বাঁধা দিয়ে বাজারে কেন বদনাম কিনছেন?' পৃথ্বীরাজ উঝাকে চুপিচুপি বুঝিয়ে বললেন, 'ওই আংটি ছাড়া আমার এমন কোনো সম্বল নেই যে তোমার টাকা দেব, তাছাড়া আংটি তো একদিন না একদিন পেটের দায়ে বেচতেই হবে। আমার কতগুলি সঙ্গী দেখছ তো! এদের শুকনো মুখে আধপেটা তো রাখতে পারিনে!' পৃথ্বীরাজের দুঃখের কাহিনী শুনে উঝার চোখে জল এল। সে দুইহাত জোড় করে বললে, 'কুমার, এই নিন টাকা! আমি আংটি চাইনে।

আমি আপনার প্রজা, মহারানার নুন চিরকাল খাচ্ছি।' পৃথ্বীরাজ উঝাকে নিজের বুকে টেনে নিয়ে বললেন, 'ভাই, আজ যেন তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে, কিন্তু এর পরে কী হবে?' উঝা পৃথ্বীরাজকে চুপিচুপি বললে, 'দেখুন মীনা-সর্দারের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এই দেশটা আপনি দখল করে বসুন। রাজ্যের একটা শত্রুও নাশ হবে, আপনারও মান বাড়বে।'

পৃথ্বীরাজ ছদ্মবেশে সেই দিনই গিয়ে মীনা-সর্দারের কাজে দলবল নিয়ে ভর্তি হলেন। রাজস্থানের মীনারা জংলী, দুর্দান্ত জাত; লুটপাট করাই তাদের কাজ। এদেরই রাজা মীনারায় নাম নিয়ে সমস্ত গদাওয়ার শাসন করছে। মহারানাকেও সে তুচ্ছ করে; নদালা বলে একটা গ্রামে তার আড্ডা। পৃথ্বীরাজ তাঁর পাঁচটি সঙ্গী — যশ, সিন্ধিয়া, সঙ্গমদেবী, অভয় আর জঙ্গুকে নিয়ে এই দুর্দান্ত মীনাকে জব্দ করার মতলব করলেন। আহেরিয়া পরব রাজস্থানের একটা মস্ত আনন্দের দিন। সেইদিন চাকর-মনিব সব এক হয়ে শিকার, বনভোজন— এমনি নানা আমোদে দিনরাত মত্ত থাকে। সেই আনন্দের দিনে মীনারায় বড়ো-বড়ো মীনাকে নিয়ে বনের মধ্যে যখন তাড়ি খেয়ে আনন্দ করছে, সেই সময় নিজের দলবল সমেত পৃথ্বীরাজ তাকে আক্রমণ করে তাদের ঘর দুয়ার জ্বালিয়ে ছারখার করে দিলেন। রাজা কাটা পড়ল। মীনারা যারা বাকি রইল, বন-জঙ্গলে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করলে। উঝাকে পৃথ্বীরাজ গদাওয়ারের শাসনকর্তা করে নিজের ধার শুধে আবার দিক্‌বিজয়ে বার হলেন— রীতিমতো ফৌজ আর রসদ সঙ্গে।

এদিকে জয়মল, তিনি ঘুরতে-ঘুরতে, বেদনোরে গিয়ে হাজির। সে সময় বেদনোরে টোডার রাজা রায় শূরতান সিং পাঠানদের উৎপাতে রাজ্য-সম্পদ সব হারিয়ে নিজের একমাত্র কন্যা পরমা সুন্দরী তারাবাইকে নিয়ে মহারানার আশ্রয়ে বাস করছিলেন। তারাবাই যেমন সুন্দরী, তেমনি বুদ্ধিমতী, গুণবতী, তেজস্বিনী। কত রাজপুত্র তাঁকে বিয়ে করতে চায় কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞা পাঠানদের হাত

থেকে যে বাপের সিংহাসন উদ্ধার করবে, তাকেই বিয়ে করবেন। জয়মল বেদনোরে এসে এই খবর শুনলেন; একদিন তারাবাইকেও দেখলেন— ঘোড়ায় চড়ে ধনুর্বাণ হাতে শিকারে চলেছেন— যেন দেবী দুর্গা! জয়মল টোডা রাজ্য উদ্ধার করে দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা-পত্র লিখে শূরতানের কাছে ঘটক পাঠালেন! শূরতান সিং জয়মলকে খুব খাতির করে নিজের বাড়িতে স্থান দিলেন। কিন্তু দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস, জয়মল পাঠানদের সঙ্গে লড়তে যাবার নামও করেন না; উল্‌টে বরং হঠাৎ রাতারাতি শূরতানকে মেরে তারাবাইকে বন্দী করে নিয়ে পালাবার মতলবে রইলেন। শেষে অন্ধকার রাতে একদিন জয়মল হাতিয়ার হাতে চুপিচুপি শূরতানের অন্দর-মহলের দিকে অগ্রসর হলেন— ভূতের মতো মুখে কালিঝুলি মেখে। বেশিদূর যেতে হল না, অন্দরের দরজাতেই ধরা পড়ে গেলেন। কিন্তু জয়মল দুর্দান্ত গুণ্ডা; তাঁকে ধরে রাখা প্রহরীদের সাধ্য হল না। তিনি তলোয়ার খুলে তারাবাইকে তাঁর শয়ন-ঘর থেকে একেবারে হাত ধরে টেনে বাইরে আনার চেষ্টা করলেন। তারাবাই সামান্য মেয়ে তো ছিলেন না! এক ঝাপটায় জয়মলকে দশহাত দূরে ফেলে দিয়ে একেবারে বাঘিনীর মতো তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, একটি ছুরির ঘায়ে, তাঁর সব আস্পর্ধা শেষ করে দিলেন। শূরতান সিংহ ছুটে এসে জয়মলের মাথাটা সঙ্গে-সঙ্গে কাঁধ থেকে ভুঁয়ে নামিয়ে মিথ্যাবাদীর শাস্তি দিলেন রীতিমতো। জয়মল মহারানার ছেলে; আর শূরতান রাজা হলেও এখন মহারানার আশ্রিত; কাজেই চিতোরে যখন এই খবর পৌঁছল, তখন সবাই ভাবলে এইবার শূরতান গেলেন! কিন্তু মহারানা সমস্ত ব্যাপার শুনে দূতদের বললেন, ‘জয়মল শুধু যে আশ্রিত রাজার অপমান করেছে তা নয়, সে মিথ্যাবাদী, চোর, নির্বোধ, গোঁয়ার। কোন বাপ তার নিজের কন্যার অপমান সইতে পারে? শূরতান তার উপযুক্ত শাস্তিই দিয়েছেন। এমন অপদার্থ ছেলে গেছে, ভালোই হয়েছে। আমার কোনো আক্ষেপ নেই।

যাও শূরতানকে বলো গিয়ে আজ থেকে বেদনোর রাজ্য তাঁকে দিলেম।'

পৃথ্বীরাজ যখন শুনলেন ছোটোভায়ের কাণ্ড, তখন রাগে লজ্জায় তাঁর মুখচোখ লাল হয়ে উঠল। তিনি সেইদিনই বেদনোরের দিকে রওনা হলেন। রাজপুত্র পৃথ্বীরাজ, রাজকুমারী তারাবাই— দুজনেই সমান সুন্দর। সমানে-সমানে মিলল। ইনি দেখলেন ওঁকে, উনি দেখলেন এঁকে। ভালোবাসলেন দুজনেই দুজনকে; কিন্তু প্রতিজ্ঞা রয়েছে, সেটা না পূর্ণ করতে পারলে বিয়ে হবার উপায় নেই! পৃথ্বীরাজ নিজের তলোয়ার ছুঁয়ে শপথ করলেন টোডারাজ্য তিনি উদ্ধার করবেনই; আর সেইদিন তারাবাইকে সঙ্গে নিয়ে আজমীরের দিকে ছদ্মবেশে রওনা হলেন। সঙ্গে গেল পৃথ্বীরাজের সেই পাঁচ সঙ্গী আর অনেক পিছনে চললেন শূরতান অসংখ্য রাজপুত সেপাই নিয়ে। তখন আশ্বিন মাস, মহরমের দিন! টোডাশহরের মোগল-বাজারের প্রকাণ্ড চক— নিশান আর ঘোড়া আর নানাবর্ণের কাগজের তাজিয়া, দুলদুল, পাঞ্জা, লাঠি-সড়কি, ঢাল-তলোয়ার আর লোকে-লোকে গিসগিস করছে। স্বয়ং সুলতান জুম্মা মসজিদের ছাদে উঠে তামাশা দেখছেন, এমন সময় মস্ত একটা তাজিয়ার সঙ্গে হাসান-হোসেন করতে-করতে একদল লোক ঠিক সুলতান যেখানে রয়েছেন সেখানে গিয়ে থামল। সুলতান ঝরকা থেকে মুখ ঝুকিয়ে দেখলেন ছজন ফকির সেই তাজিয়ার সঙ্গে! আর বেশি কিছু সুলতানকে দেখতে হল না; ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা তীর এসে সুলতানের বুকের মাঝ থেকে প্রাণটি শুষে নিয়ে সোঁ করে বেরিয়ে গেল— আকাশের দিকে! টোডার সুলতান উলটে পড়লেন, সঙ্গে-সঙ্গে রাজপুত ফৌজ এসে শহরে হানা দিলে। রাজপুত যারা, তারা গিয়ে পৃথ্বীরাজ আর তারাবাইকে ঘিরে লড়তে লাগল— মুসলমানদের সঙ্গে। সেই অবসরে সুলতানের যত আমীর-ওমরা লুঙ্গি ছেড়ে, দাড়ি ফেলে, বিবি আর মুরগির খাঁচা লুকিয়ে নিয়ে, রাতারাতি শহর ছেড়ে আজমীরের দিকে চম্পট দিল। সকালবেলা পৃথ্বীরাজ টোডা দখল করে নিলেন।

পৃথ্বীরাজ আর তারাবাইয়ের বীরত্বের কথা মহারানার কাছে পৌঁছল। এইবার বাপের প্রাণ গলল। জয়মল নেই, সঙ্গ কোথায় তা কেউ জানে না, একমাত্র রয়েছেন পৃথ্বীরাজ— ছেলের মতো ছেলে ; মহারানা পৃথ্বীরাজের সঙ্গে তারাবাইয়ের বিয়ে দিয়ে কমলমীর কেল্লায় দুজনকে থাকবার হুকুম দিলেন। মেবারের একেবারে শেষ সীমায় কমলমীর। এ সেই কেল্লা যেখানে লছমীরানী এতটুকু হাম্বিরকে নিয়ে বাস করতেন। কতদিন কেটে গেছে, কেল্লা শূন্য পড়েছিল ; আর আজ আবার কত পুরুষ পরে পৃথ্বীরাজ-তারাবাই— বর আর বৌ—হাসি বাঁশি গান দিয়ে সেই পুরোনো কেল্লার শূন্য ঘরগুলি পূর্ণ করে দেখা দিলেন। এই বাপেতে-ছেলেতে বরেতে-বধূতে মিলন আর আনন্দের দিনে একসময় চিতোরে পৃথ্বীরাজ মহারানার সভায় বসে আছেন, সভা প্রায় ভঙ্গ হয়, মহারানা উঠি-উঠি করছেন— এমন সময় মালোয়া থেকে দূত এসে খবর পাঠালে, এখনি মহারানার সঙ্গে দেখা করতে চাই! একসময় ছিল, যখন চিতোরের মহারানার সঙ্গে দেখা করতে হলে দিল্লীর বাদশার দূতকেও অন্তত পনেরো দিন মহারানার সুবিধার জন্য অপেক্ষা করতে হত, কিন্তু আজ মালোয়ার দূত এসেই বুক-ফুলিয়ে, কোনো হুকুমের অপেক্ষা না রেখে মহারানার দরবারে ঢুকল। শুধু তাই নয়, লোকটা একেবারে মহারানার গা-ঘেঁষে বসে যেন সমানে-সমানে কথাবার্তা শুরু করে দিলে। দূতের এই আস্পর্ধা দেখে পৃথ্বীরাজ একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। খুব খানিক বাজে বকে দূত বিদায় হবার পর পৃথ্বীরাজ ঐ মালোয়ার দূতকে এত ভয় আর খাতির করবার কারণটা মহারানাকে শুধোলেন। বুড়ো রানা পৃথ্বীরাজের পিঠে হাত বুলিয়ে জবাব দিলেন, 'বুঝলে না, আমি বুড়ো হয়েছি, তাই দন্তহীন সিংহের মতো গাধাও আমাকে লাথি মারতে চাচ্ছে। তোমরা নিজেদের মধ্যেই ভায়ে-ভায়ে লড়তে ব্যস্ত রয়েছ, তাই আমাকে সবদিক ঠাণ্ডা রেখে খুশি রেখে কোনো রকমে শান্তিতে নিজের আর প্রজাদের জমিজমা জরু-গরু সামলে চলতে হচ্ছে— আজ ক'বছর ধরে।' পৃথ্বীরাজ বাপের কথার কোনো

জবাব দিলেন না, কিন্তু বাপের কত যে দুঃখ, তা বুঝতে আজ তাঁর দেরি হল না। তিনি লজ্জায় ঘাড় হেঁট করে সভা থেকে বেরিয়ে একেবারে নিজের দলবল নিয়ে সোজা মালোয়া রাজার রাজ্যে গিয়ে হাঁক দিলেন 'যুদ্ধং দেহি!'

দুই দলে লড়াই বাধল। মাঠের মাঝে দুই দলের তাঁবু পড়েছে। যুদ্ধের আগের রাতে মালোয়ারাজ নিজের শিবিরে মখমলের গদিতে তাকিয়া ঠেস দিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে মহা ধুমধামে নাচ দেখছেন, এমন সময় ঝড়ের মতো পৃথ্বীরাজ এসে রাজাকে একেবারে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে নিজের কোটে এনে বন্ধ করলেন। মজলিস ভেঙে গেল— ঝাড়লণ্ঠনগুলোর সঙ্গে চুরমার হয়ে! নাচনী, গাইয়ে হাঁ-করে চেয়ে রইল— পৃথ্বীরাজের অদ্ভুত সাহস দেখে।

রাজার সেনাপতি তাড়াতাড়ি সৈন্য সাজাচ্ছেন এমন সময় পৃথ্বীরাজ মালোয়ারাজেরই লিখন সেনাপতির কাছে দিয়ে পাঠালেন, 'আমি চিতোর চললেম— বন্দী হয়ে। কিন্তু খবরদার আমাকে ছাড়াবার চেষ্টাও কোরো না। তাহলেই আমার প্রাণ যাবে, এখনি এসে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করো, যুদ্ধ বন্ধ করে দাও।'

রাজা-রাজড়ার কথা— সেনাপতি সমস্ত সৈন্য ফিরিয়ে শুকনো-মুখে একা পৃথ্বীরাজের শিবিরে হাজির হলেন। পৃথ্বীরাজ তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'রাজার প্রাণের জন্যে কোনো ভয় নেই; আমি ওঁকে চিতোরে নিয়ে যাচ্ছি, খুব যত্নেই রাখব আর সুস্থ শরীরেই ফিরিয়ে দেব; তোমাদের রাজার সেই হামবড়া দূতটাকেও ফিরে পাবে। মহারানা দূতকেও চান না, বন্দীকেও নয়, কেবল মালোয়ার কাছ থেকে যে নমস্কারটা তাঁর প্রাপ্য তাই তিনি আমাকে আনতে হুকুম দিয়েছেন। তাই তোমাদের রাজার একবার সশরীরে চিতোর যাওয়া দরকার। কিন্তু এখান থেকে কিংবা পথের থেকে যদি রাজাকে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করো, তবে ওঁর ধড়টিই শুধু ফিরে পাবে, মাথাটি গিয়ে পড়ে থাকবে চিতোরের মহারানার সিংহাসনের নিচেই —পা রাখবার পিঁড়িখানির ঠিক সামনেই!'

মহারানা সভায় বসে আছেন, পৃথ্বীরাজ মালোয়াকে বন্দী অবস্থায় নিয়ে উপস্থিত। সবাই দেখে অবাক হয়ে গেল! সেই সময় একজন পৃথ্বীরাজের চর দূতের ঘাড় ধরে এনে বললে, 'শিখে নাও মহারানার সঙ্গে কেমন করে কথা বলতে হয় —তোমার নিজের দেশের রাজার কাছে।' দূত থরহরি কাঁপতে লাগল; তার কপাল বেয়ে কালঘাম ছুটল। মহারানা ব্যাপার বুঝে খুব খাতির করে মালোয়াকে নিজের কাছে বসালেন, তারপর কিছুদিন চিতোরে আরামে থাকার পর মালোয়ার রাজা আর রাজদূত তুজনেই ছুটি পেয়ে দেশে গেলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পর রানার আত্মীয় সারংদেব আর সুরজমল তুজনে মিলে হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। পৃথ্বীরাজ তখন অনেক দূরে —কমলমীরে, সওয়ার খবর নিয়ে সেদিকে ছুটল — মহারানা দলবল নিয়ে চটপট লড়াইয়ে বেরিয়ে গেলেন। সদ্রী, বাটেরা, নায়ি আর নিমচ; এর মধ্যে যত পরগণা সমস্ত দখল করে চিতোরের খুব কাছে গাভিরী-নদীর ওপারে সুরজমল এসে দেখা দিলেন প্রকাণ্ড ফৌজ নিয়ে। সেইখানে ভীষণ যুদ্ধ বাধল। রানার ফৌজ ক্রমেই হঠতে লাগল। সন্ধ্যা প্রায় হয়, বাইশটা অস্তরের ঘা খেয়ে মহারানা তুর্বল হয়ে পড়েছেন, সুরজমলের সৈন্যরা নদীর এপারটাও দখল করেছে, বিদ্রোহীদের আর ঠেকিয়ে রাখা চলে না, এমন সময় এক হাজার রাজপুত নিয়ে পৃথ্বীরাজ এসে পড়লেন; যুদ্ধ সেইদিনের মতো স্থগিত রইল। তুই দলের লড়াই বন্ধ রেখে যে যার তাঁবুতে বিশ্রাম করছে, মাঠের দিকে-দিকে মশাল আর ধুনি জ্বলছে, সারাদিনের পর সুরজমল অনেকগুলো অস্ত্রের চোট খেয়ে নাপিত ডেকে কাটা ঘাগুলো ধুয়ে-পুঁছে পটি-বেঁধে একটু বিশ্রামের চেষ্টায় আছেন, এমন সময় হঠাৎ সামনে পৃথ্বীরাজকে দেখে সুরজমল খাটিয়া ছেড়ে এমন বেগে দাঁড়িয়ে উঠলেন যে, তাঁর বুকে বাঁধা কাপড়ের পটিটা ছিঁড়ে ঘা দিয়ে রক্ত ছুটল। পৃথ্বীরাজ তাড়াতাড়ি খুড়োকে ধরে খাটিয়াতে শুইয়ে দিয়ে বললেন, 'ভয় নেই, কেমন আছ তাই জানতে

এলেম।' সুরজমল একটু হেসে বললেন, 'হঠাৎ তুমি এসে পড়ায় একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেম! যা হোক, অনেকদিন পরে তোমাকে দেখে খুশি হলেম। মহারানার সঙ্গে সাক্ষাৎ করোনি?' পৃথ্বীরাজও হেসে বললেন, 'কমলমীরে তোমার খবর পেয়েই ছুটে এসেছি, বাবার সঙ্গে এখনো দেখা হয়নি।' এই সময় এক দাসী সোনার থালায় খাবার নিয়ে হাজির হল। সুরজমল বললেন, 'আরে দেখচিসনে কে এসেছে। যা দৌড়ে আর এক থালা নিয়ে আয়।' দাসী এদিক-ওদিক চাইছে দেখে সুরজমল বললেন, 'বুঝেছি সারংদেব এই একথালা বই আর কিছু পাঠায়নি; খুড়োভাইপোতে আজ এক থালেই খাব।' শুনেই পৃথ্বীরাজ একটা মিষ্টি তুলে মুখে দিলেন। দিনের বেলার শত্রুতা গল্প-হাসি খাওয়া-দাওয়ার চোটে কোথায় পালিয়ে গেল! বিদায়ের সময় পৃথ্বীরাজ খুড়োকে বললেন, 'আমাদের পুরোনো ঝগড়াটা তাহলে আজ তোলা থাক, কাল সকালেই শেষ করা যাবে, কী বলো?' সুরজমল হেসে বললেন, 'বেশ, আজকের মতো একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক্! কিন্তু কাল খুব সকালেই আমি তৈরি থাকব জেনো।'

তার পরদিনের লড়াইয়ে বিদ্রোহীদের পৃথ্বীরাজ হারিয়ে দিলেন। সুরজমল সারংদেবকে নিয়ে পালিয়ে চললেন। পৃথ্বীরাজও তাঁদের পিছনে তাড়িয়ে চললেন—একটার পরে একটা পরগণা বিদ্রোহীদের হাত থেকে আবার জয় করতে-করতে। শেষে সুরজমলের একটু দাঁড়াবারও স্থান রইল না। সারংদেবের রাজ্যটা পর্যন্ত পৃথ্বীরাজ দখল করে নিলেন! দুই বিদ্রোহী তখন স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে নিমচের জঙ্গলে বড়ো-বড়ো গাছের গুঁড়ি আর ডালপালা দিয়ে খুব মজবুত-রকম বরোজ বানিয়ে তার মধ্যে লুকিয়ে রইলেন। একদিন সুরজমল নিশ্চিন্ত মনে বসে গল্পগুজব করছেন—দুপুরবেলা বাইরে বনের মধ্যেটা শুন্‌শান্, কোনখানে ঘনপাতার আড়ালে বসে দুটো নীল পায়রা কেবলি বকম-বকম করছে—এমন সময় বাঘ যেমন চুপিসাড়ে এসে হঠাৎ শিকারের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি পৃথ্বীরাজ

ঘরের বেড়া ডিঙিয়ে একেবারে সুরজমলকে চেপে ধরলেন। দুজনে ধস্তাধস্তি চলল। পৃথ্বীরাজ খুড়োকে কাবু করেছেন, এমন সময় সারংদেব দুজনের মাঝে পড়ে পৃথ্বীরাজকে ঠাণ্ডা করে বললেন, 'করো কী! দেখছ না তোমার খুড়োর অবস্থা? কী রকম কাহিল, এক চড়ে উল্‌টে পড়েন! দাও, ছেড়ে দাও বেচারাকে!' সারংদেবের মোড়লি সুরজমলের মোটেই ভালো লাগল না, তিনি বুক ফুলিয়ে বললেন, 'দেখো সারংদেব, যে চাপড়টার কথা বললে সে চাপড়টা এখন আমার এই ভাইপোর হাত থেকে এলে আমি কাবু হব বটে কিন্তু তোমাদের কারু হাত থেকে এলে এই কাহিল শরীরও শক্ত হয়ে দাঁড়াবে, আর এক চাপড়ের বদলে তোমার নাকে দশটা ঘুঁসি বসিয়ে দেবে নিশ্চয়ই। সরে দাঁড়াও, লড়তে হয় আমরা খুড়ো-ভাইপোতে লড়ব; মিটমাট করতে হয় তো আমরাই করব — বুঝেচ?' সুরজমলের তেজ দেখে পৃথ্বীরাজ অবাক হলেন, সারংদেব রেগে কটমট করে চাইতে-চাইতে বেরিয়ে গেলেন; ঝনাৎ করে সুরজমল নিজের তলোয়ার খাপে বন্ধ করে বললেন, 'দেখো পৃথ্বীরাজ, তোমাতে আমাতে লড়াই —এতে আমি যদি মরি তোমার হাতে, তাতে কোনো দুঃখও নেই, ক্ষতিও নেই—ছেলে দুটো আমার উপযুক্ত হয়েছে, কিছু না জোটে তো মহারানার ফৌজে গিয়ে ভর্তি হবে, তবু তোমাদের বিরুদ্ধে আমার মতো তারা অস্ত্র ধরবে না। কিন্তু তুমি যদি আমার হাতে মরো তবে শুধু যে আমার লজ্জার উপর লজ্জা, দুঃখের উপর দুঃখ পেতে হবে, তা নয়; দাদার পরে তুমি না থাকলে চিতোরের দশাটা কী হবে ভেবেছ কি? আমি লড়ব না। ইচ্ছা হয় তুমি আমাকে মেরে ফেলো, কিন্তু বন্দী করে যে আমায় নিয়ে যাবে তা হবে না।' সুরজমল যে চিতোরের সঙ্গে প্রাণে-প্রাণে এক, তা বুঝতে পৃথ্বীরাজের দেরি হল না। তলোয়ার বন্ধ করে তিনি খুড়োকে প্রণাম করলেন। সুরজমল ভাইপোকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'এতদিনে আমার অদৃষ্টের লিখন একটু ফলল — তোমার হৃদয়সিংহাসনের খুব কাছে আমি এলেম; এখন বাকি শুধু

যে মাটিতে জন্মেছি সেই মাটির এক টুকরোতে মাথা রেখে মরার ব্যবস্থা করে নেওয়া।' পৃথ্বীরাজ খুড়োর পাশে বসে সেই আগেকার মতো আবার হাসিমুখে শুধোলেন, 'আমি আসবার আগে তুমি কী করছিলে খুড়ো?' 'ছেলেদের রাজস্থানের ইতিহাস আর গল্প শুনিয়ে খানিক বাজে সময় কাটাচ্ছিলেম' —বলে খুড়ো হাসলেন।

পৃথ্বীরাজ অবাক হয়ে বললেন, 'আমি তাড়া করে আসতে পারি জেনেও সেজন্য সতর্ক না থেকে বেশ আরামে শুয়ে গল্প করছিলে?'

সুরজমল হেসে বললেন, 'লড়াই করা কি পালানো —এ-দুটোই করবার পথ তুমি বন্ধ করেছ, কাজেই ছেলেদের নিয়ে খোশগল্প করে সময় কাটানো ছাড়া করবার আর কী আছে বলো?'

পৃথ্বীরাজ শুনে বললেন, 'কেন, আমার সঙ্গে বাবার কাছে গিয়ে মাথা গোঁজবার জায়গাটা করে নেবার চেষ্টা করো না কেন!'

সুরজমল খানিক গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আগে হলে যেতেম কিন্তু এই বিদ্রোহের পরে মাথা-গোঁজবার জায়গা চিতোরের বাইরে করে নেওয়াই ঠিক; আর তা হলেই ধড় এবং মাথা —দুটো নিয়ে কিছুদিন আরাম করা যেতে পারবে।' পৃথ্বীরাজ খানিক ভেবে বললেন, 'তা যেন হল, কিন্তু মহারানাকে একটা মাথা না হাজির করে দিতে পারলে আমার যে মাথা হেঁট হবে, কাটাও যাবে —তার কী বল!'

সুরজমল পৃথ্বীরাজের কানে-কানে বললেন, 'সারংদেবের মাথাটা যদি কাজে লাগে তো নিয়ে যাও; ওর মাথার সঙ্গে ওর রাজ্যটাও হাতে আসবে, আমার মাথার সঙ্গে এই ছেঁড়া পাগড়িটা ছাড়া আর তো কিছুই পাচ্ছ না! বেশি সুখ্যাতি পাবে ওই মাথাটা নিলে।'

পৃথ্বীরাজ প্রস্তুত হয়ে উঠলেন, কিন্তু বরোজের মধ্যে সারংদেবকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। তিনি চোখ-রাঙিয়ে খুড়োকে বললেন, 'আমাকে ফাঁকি দিতে চাচ্ছ?'

সুরজমল খানিক ভেবে বললেন, 'এস আমার সঙ্গে বাইরে, বড়ো মাথা না পাও, ছোটো মাথাই নিও।' বনের মধ্যে খানিক এগিয়ে গিয়ে সুরজমল একটা ভাঙা মন্দির দেখিয়ে বললে, 'দেখেছ মন্দিরটা,

এখানে এক সময় নরবলি হত! বহুদিন হল বন্ধ হয়ে গেছে; দেবীও মানুষের কাঁচা মাথা অনেককাল পুজো পাননি, ওইখানে সারংদেব আমাকে পূজো করতে যেতে আজ ডেকে গেছে, কিন্তু আমার হয়ে ওখানে যেতে তোমার সাহস হবে কি?'

'খুব হবে!' —বলেই পৃথ্বীরাজ সুরজমলকে নিজের পাগড়ি দিয়ে কষে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে মন্দিরে ঢুকলেন। বেশি দেরি হল না, সারংদেবের কাঁচা মাথাটা কেটে নিয়ে খুড়োর বাঁধন খুলে দিয়ে পৃথ্বীরাজ যুদ্ধ বন্ধ করে চিতোরে চলে গেলেন। যে-সব পরগণা জয় করতে-করতে সুরজমল ফৌজের পায়ের তলায় প্রজার সুখ-শান্তি চূর্ণ করে ধুলোর মতো উড়িয়ে দিয়েছিলেন সেদিন সেই নায়ি, বাটেরা, নিমচের রাস্তা ধরেই হেরে ফিরতে হল —তাঁকে ঘাড় হেঁট করে। তিনটে বড়ো-বড়ো রাজত্ব তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেল, রইল কেবল একটুখানি সদ্রিপরগণা! কিন্তু সেটুকুও বেশিদিন থাকবে কি না সুরজমল ভাবছেন —এমন সময়ে একদিন দেখলেন গাঁয়ের ধারে মন্দিরের সামনে একটি ডালকুত্তো ছোটো একটি ছাগলছানা শিকার করবার চেষ্টা করতেই একটা রামছাগল তাকে ঢুঁ মেরে তাড়িয়ে ছানাটাসুদ্ধ মন্দিরে গিয়ে সেঁধাল। কুকুরটা মন্দিরের সামনে ঘেউ-ঘেউ করে চেঁচাতে লাগল —কিন্তু ভিতরে ঢোকবার সাহস করলে না।

সুরজমল ঠিক করলেন এইখানেই নিরাপদে থাকা যাবে—এই মন্দির হবে আমার ঘর, কেল্লা, সমস্তই। সেইদিন সুরজমল সদ্রি থেকে কারিগর ডাকিয়ে সেই মন্দির ঘিরে ছোটো এক কেল্লা তুললেন, তার চারিদিকে বাজার হাট বসালেন; সব শেষ 'দেওলা' গ্রাম মায় সমস্ত সদ্রিপরগণা আর কন্থল পাহাড়ের উপর তাঁর কেল্লাটি পর্যন্ত দেবতার নামে উৎসর্গ করে সমস্তটার নাম রাখলেন দেউলগড়। দেবতার কেল্লা তার উপর চড়াও হতে রানারও সাধ্য নেই, ষাট হাজার বছর নরকের ভয় আছে! সব রাজার রাজ্যের সীমানার বাইরে এই দেউলগড়ে, সুরজমল নির্ভয়ে রইলেন, নিশ্চিন্ত

হয়ে মরবার সময় পেলেন ; তাঁর কপালের লিখন এমনি করে ফলল।

জয়মল, সুরজমল, দুইজনেই চিতোরের সিংহাসন আর পৃথ্বীরাজের মাঝ থেকে সরে পড়লেন ; রইলেন কেবল সঙ্গ। একদিন কমলমীরে পৃথ্বীরাজের চর এসে খবর দিলে — সঙ্গ বেঁচে আছেন ; শ্রীনগরের রাজার মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ের উদ্‌যোগ হচ্ছে। পৃথ্বীরাজ তখনি নিজের দলবল নিয়ে সঙ্গকে জালে বাঁধার পরামর্শ করতে বসলেন ; কিন্তু পৃথ্বীরাজের অদৃষ্টও বসে ছিল না, সে দিনে-রাতে আলোতে-অন্ধকারে সুখে-দুঃখে মিলিয়ে যে বেড়াজাল পৃথ্বীরাজকে ধরবার জন্য বুনে চলেছিল, এতদিনে সেটা শেষ হল। সকালে পৃথ্বীরাজ সেজেগুজে সঙ্গকে ধরবার জন্যে বার হবেন, এমন সময় শিরোহী থেকে পৃথ্বীরাজের ছোটোবোন এক পত্র পাঠালেন। সে অনেক দুঃখের কাহিনী। বিয়ে হয়ে অবধি তাঁর স্বামী তাঁকে অপমান করছে, লাথি মারছে, ঘরের বার করে দিতে চাইছে। সে নেশাখোর, দুষ্ট এবং একেবারে নির্দয়। বাবা বুড়ো হয়েছেন, এখন দাদা এসে এই অপমানের প্রতিশোধ না দিলে তাঁর ছোটোবোন মারা যাবে। ছোটোবোনের কান্না-ভরা সেই চিঠি পড়ে, পৃথ্বীরাজ চলেছিলেন শ্রীনগরে, বাইরের দিকে তলোয়ার উঁচিয়ে —কিন্তু যাওয়া হল না, পৃথ্বীরাজের ঘোড়া ফিরল শিরোহীর মুখে —বোনকে রক্ষা করতে। অদৃষ্ট টেনে নিয়ে চলল পৃথ্বীরাজকে সঙ্গের দিক থেকে ঠিক উল্‌টো মুখে —অনেক দূরে!

রাতের অন্ধকারে শয়নঘরের মেঝেয় পড়ে রানার মেয়ে কেবলই চোখের জল ফেলছেন, রানার দেওয়া সোনার খাটে শিরোহীর রাজা ভরপুর নেশায় নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে, হঠাৎ সেই সময় পৃথ্বীরাজ ঘরে ঢুকে এক লাথিতে শিরোহীর রাজাটাকে ভূঁয়ে ফেলে দাড়ি চেপে ধরলেন। রানার মেয়ে পৃথ্বীরাজের তলোয়ার চেপে ধরলেন, 'দাদা থামো, প্রাণে মেরো না।'

পৃথ্বীরাজ রেগে বললেন, 'এত বড়ো ওর সাহস, তোর গায়ে হাত

তোলে। জানে না তুই মহারানার মেয়ে। ওকে কুকুরের মতো চাবুক মেরে সিধে করতে হয়।'

শিরোহীর তখন নেশা ছুটে গেছে, সে পৃথ্বীরাজের পা জড়িয়ে বললে, 'এমন কাজ আর হবে না, ক্ষমা করো।'

পৃথ্বীরাজ তার ঘাড় ধরে দাঁড় করিয়ে বললেন, 'নে, আমার বোনের জুতোজোড়া মাথায় করে ওর কাছে ক্ষমা চা —তবে রক্ষে পাবি!'

'একথা আগে বললেই হত,' বলে তাড়াতাড়ি জুতোজোড়া তুলে নেয় দেখে রানী বললেন, 'থাক এবার এই পর্যন্ত। যাও এখন দাদাকে জলটল খাইয়ে ঠাণ্ডা করোগে, আমায় একটু ঘুমুতে দাও।'

রানার জামাই খুব খাতির করে পৃথ্বীরাজকে বাইরে নিয়ে বসিয়ে সোনার রেকাবিতে শিরোহীর খাসা নাড়ু গুটিকতক জল খেতে দিলেন। শিরোহীর খাসা-নাড়ু— অমন নাড়ু কোথাও হয় না, পৃথ্বীরাজ তাই গোটা চার-পাঁচ মুখে ফেলে এক ঘটি জল খেয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে কমলমীরে আপনার দলবলের সঙ্গে মিলতে চললেন। কমলমীরে আর তাঁর পৌঁছতে হল না ; শিরোহীর মতিচুর সেঁকো-বিষ আর হীরেচুরে মেখে তাঁর ভগিনীপতি খেতে দিয়েছিল —জুতো-তোলার শোধ নিতে!

তখন রাত কেটে সবে সকাল হচ্ছে, দূর থেকে কমলমীর অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সেই সময় পৃথ্বীরাজ ঘোড়া থেকে ঘুরে পড়লেন —রাস্তার ধুলোয়। কমলমীর —যেখানে তাঁর তারারানী একা রয়েছেন, সেইদিকে চেয়ে তাঁর প্রাণ হঠাৎ বেরিয়ে গেল —দূরে —দূরে — কতদূরে সকালের আগুনবরণ আলোর মাঝে নীল আকাশের শুকতারার অস্তপথ ধরে। আর ঠিক সেই সময় সঙ্গের অদৃষ্ট শ্রীনগরের নহবৎখানায় বসে আশা-রাগিণীর সুর বাজিয়ে দিলে — 'ভোর ভয়ি, ভোর ভয়ি।'

ভূতপত্‌রীর দেশ

'মাসি পিসি বনগাঁ-বাসী বনের ধারে ঘর
কখনো মাসি বলেন না যে খইমোয়াটা ধর।'

কিন্তু এবারে মাসি পিসি দুজনেই ডেকেছেন। আগে মাসির বাড়ি এসেছি পালকি চড়ে। সেখানে মোয়া খেয়ে পেট ধামা করেছি। এখন পালকিতে শুয়ে পিসির বাড়ি চলেছি। মাসি চাদরের খুঁটে খই বেঁধে দিয়েছেন—পথে জল খেতে ; হাতে একগাছা ভূতপত্‌রী লাঠি দিয়েছেন — ভূত তাড়াতে ; এক লণ্ঠন দিয়েছেন — আলোয়-আলোয় যেতে।

হুম্পাহুমা পালকি চলেছে বনগাঁ পেরিয়ে ; ধপড়ধাঁই পালকি চলেছে বনের ধার দিয়ে, মাসির ঘর ছাড়িয়ে, ভূতপত্‌রীর মাঠ ভেঙে, পিসির বাড়িতে।

পিসির দেশে কখনো যাইনি। শুনেছি পিসি থাকেন তেপান্তর মাঠের ওপারে সমুদ্দুরের ধারে, বালির ঘরে। শুনেছি পিসি কাঁকড়া খেতে ভালোবাসেন। কিন্তু লোক তো পিসির বাড়ি যায় কত! যে ভূতপত্‌রীর মাঠ! দেখেই ভয় হয়! এই মাঠ ভেঙে দুপুর রাতে পিসির বাড়ি চলেছি। চলেছি তো চলেইছি ; 'হুঁইয়া মারি খপর-দারি!' 'বড়া ভারি খপরদারি!'

মাঠের মাঝে একটা শেওড়াগাছের ঝোপ, অন্ধকারে কালো বেরালের মতো গুঁড়ি মেরে বসে আছে। তারই কাছে ঘোড়ার গোর, তার পরেই তেপান্তর মাঠ! হাটের বাট ওই শেওড়া-তলা পর্যন্ত ; তার পরে আর হাটও নেই, বাটও নেই ; কেবল মাঠ ধূ-ধূ করছে।

এই শেওড়া-তলায় পালকি এসেছে কি আর যত ঝিঁঝিঁপোকা তারা বলে উঠেছে —'চললে বাঁচি!' 'চললে বাঁচি!' কেন রে বাপু, একটু না হয় বসেছি, তাতে তোমাদের এত গায়ের জ্বালা কেন? 'চললে বাঁচি!' চলতে কি আর পারি রে বাপু? অমনি ঝিঁঝিঁ-

পোকার সর্দার দুই লম্বা-লম্বা ঠ্যাং নেড়ে বলছে, 'ওই আসছে চিঁচি ঘোড়া চিঁচিঁ!' ফিরে দেখি গোরের ভিতর থেকে ঘোড়া-ভূত মুখ বার করে পালকির দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে! ওঠা রে পালকি, পালা রে পালা! আর পালা! ঘোড়া ভূত তাড়া করেছে —ঘাড় বেঁকিয়ে, নাক ফুলিয়ে আগুনের মতো দুই চোখ পাকিয়ে!

ভয়ে তখন ভূতপত্রীর লাঠির কথা ভুলে গেছি। কেবল ডাকছি —জগবন্ধু, রক্ষে করো, মাসিকে বলে তোমায় খইয়ের মোয়া ভোগ দেব। বলতেই আমার খুঁটে বাঁধা খইগুলি রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে। মাসির বাড়ির খই —জুঁইফুলের মতো ফুটন্ত ধবধব করছে খই— রাস্তা যেন আলো করে। ঘোড়া-ভূত কি সে-লোভ সামলাতে পারে? খই খেতে অমনি দাঁড়িয়ে গেছে। বেচারা ঘোড়া-ভূত খই খেতে মুখটি নামিয়েছে কি, অমনি তার ভূতুড়ে নিশ্বাসে খইগুলি উড়ে পালাচ্ছে! যেমন খইয়ের কাছে মুখ নেওয়া অমনি খই উড়ে পালায়। খইও ধরা দেয় না, ঘোড়াও ছাড়তে চায় না। ঘোড়া-ভূত চায় খই খায়, খই কিন্তু উড়ে-উড়ে পালায়।

ঘোড়া চলেছে খইয়ের পিছে, খই উড়েছে বাতাসের আগে, আমি চলেছি পালকিতে বসে ঘোড়া-ভূতের ঘোড়দৌড় দেখতে মুখ বাড়িয়ে। কখন যে মাঠে এসে পড়েছি মনেই নেই। সেখানটায় বড়ো অন্ধকার, বড়ো হাওয়া —যেন ঝড় বইছে। মাসির দেওয়া একটি লণ্ঠনের মিট-মিটে আলো অনেকক্ষণ নিভে গেছে। অন্ধকারে আর ঘোড়াও দেখা যায় না, খইও চেনা যায় না। বেহারাদের বলি —আলো জ্বালো; কিন্তু হাওয়ায় কথা উড়ে যায়; কে শোনে কার কথা! এমন হাওয়া তো দেখিনি! আমার ভূতপত্রীর লাঠিটা পর্যন্ত উড়ে পালাবার যোগাড়। লণ্ঠনটি তো গেছে, শেষে লাঠিটাও যাবে? আচ্ছা করে লাঠি ধরে বসে আছি। বাতাসের জোর ক্রমেই বাড়ছে।

সর্বনাশ! এ যে দেখছি বীর-বাতাস! এ বাতাসের মুখে পড়লে তো রক্ষে থাকবে না —পালকিশুদ্ধু আমি, আমার লাঠি, আমার ছাতা, ধুতি-চাদর, পোঁটলা-পুঁটলি, বিছানা-বালিশ কাগজের টুকরোর

মতন কোথায় উড়ে যাবে তার ঠিকানা নেই! পথে জল খেতে দু-মুঠো খই ছিল, তা তো ঘোড়া-ভূতের সঙ্গে কোথায় উড়ে গেছে। শেষে বীর-বাতাসে আমিও উড়ে যাব নাকি? শীতেও কাঁপছি, ভয়েও কাঁপছি। পালকি ধরে বীর-বাতাস এক-একবার ঝাঁকানি দিচ্ছে, আর হাঁক দিচ্ছি, 'সামাল, সামাল।' ভয়ে জগবন্ধুর নাম ভুলে গেছি। পালকিখানা ছাতার মতো বেহারাদের কাঁধ থেকে উড়ে আমাকে সুদ্ধু নিয়ে গড়াতে-গড়াতে চলেছে। পিছনে 'ধর! ধর!' করে পালকি-বেহারাগুলো ছুটে আসছে।

একটা বুড়ো মনসা গাছ, মাথায় তার হলদে চুল, বড়ো বড়ো কাঁটার বঁড়শি ফেলে বালির উপর মাছ ধরছিল। মনসাবুড়োর ছিপে মাছ তো পড়ছিল কত! কেবল রাজ্যের খড়কুটো আর পাখির পালক হাওয়ায় ভেসে এসে বুড়োর বঁড়শিতে আটকা পড়ছিল। এমন সময় আমার চাদরখানা গেল বঁড়শিতে গেঁথে। আর যাব কোথা? পালকিসুদ্ধু বালির উপর উলটে পড়েছি। বেহারাগুলো একবার আমাকে ছাড়াবার জন্যে পালকির ডাণ্ডা ধরে আমার চাদরটা ধরে টানাটানি করলে, কিন্তু বাতাসের চোটে কোথায় উড়ে গেল আমার সেই উড়ে বেহারা ছ-টা, তাদের আর টিকিও দেখা গেল না!

মনসাবুড়োর হাসি দেখে কে! ভাবলে, মস্ত মাছ পেয়েছি। কিন্তু আমার হাতে ভূতপত্‌রী লাঠি আছে তা তো বুড়ো জানে না! লাঠি দিয়ে যেমন বুড়োর গায়ে খোঁচা দেওয়া অমনি ভয়ে বুড়োর রক্ত দুধ হয়ে গেছে—সে তাড়াতাড়ি আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। পালকিটা ঠেলে তুলে বিছানা-পত্তর পোঁটলা-পুঁটলি যা যেখানে পড়েছিল গুছিয়ে নিয়ে, চুপটি করে বসে আছি—কখন বেহারাগুলো ফিরে আসে। মনসাবুড়োর গা বেয়ে দরদর করে শাদা দুধের মতো রক্ত পড়ছে। সেও কোনো কথা বলছে না, আমিও শাদা রক্ত দেখে অবাক হয়ে চেয়ে আছি।

বুড়ো খুব রেগেছে; তার গায়ের সব রোঁয়াগুলো কাঁটার মতো সোজা হয়ে উঠেছে। অনেকক্ষণ গোঁ হয়ে বসে থেকে মনসাবুড়ো

আমার দিকে চেয়ে বলছে, 'দেখছ কী ? বড়ো আমোদ হচ্ছে, না ? বুড়োমানুষের গায়ে খোঁচা দিয়ে রক্তপাত করে আবার বসে-বসে তামাশা দেখছ, লজ্জা নেই ! যাও না, ছাড়া পেয়েছ তো নিজের কাজে যাও না !'

আমি বললুম, 'যেতে পারলে তো ! পালকি-বেহারা নেই যে ! তারা আসুক তবে যাব ।'

শুনে বুড়ো হো-হো করে হেসে বললে, 'কেন পা নেই নাকি ? হেঁটে যেতে পারো না ? নবাব হয়েছ ?'

আমার ভারি রাগ হল। বুড়োর বঁড়শির আঁচড়ে দুই পা ছিঁড়ে তখনো আমার ঝরঝর রক্ত পড়ছে। আমি রেগে বললাম, 'পা দুটো কি আর রেখেছ ! আঁচড়ের চোটে দফা শেষ করেছ যে !'

'লেগেছে নাকি ?' বলে বুড়ো খানিক চুপ করে বললে, 'একটু দই দাও, সেরে যাবে ।'

আমি বললুম, 'এই মাঠের মধ্যে দই ! তামাশা করছ নাকি ?'

'আচ্ছা তবে খানিক তেঁতুল-বাটা হলেও চলতে পারে ।'

আমার হাসি পেল। নিশ্চয় বুড়োটা ঘুমের ঘোরে স্বপন দেখছে। 'বলি, ও দাদা ! এখানে তুমি ছাড়া তো গাছ দেখছি নে, আরেকবার লাঠির খোঁচা দিয়ে তোমার গা থেকে দুধ বার করে নিয়ে দই পাতব নাকি ?' বলেই ভূতপত্রী লাঠিটা যেমন একটু বাগিয়ে ধরেছি, অমনি বুড়ো বলছে, 'রও রও, করো কী দাদা ! বুড়োমানুষ কখন কী বলি, রাগ কোরো না। আমরা মনসাদেবীর বরে চিরকাল নানারকম স্বপন দেখি। এইখানটিতে কতকাল যে বসে আছি তার ঠিক নেই। ছিপ নিয়ে মাছ ধরছিলুম জলের ধারে —আজ সে কত কালের কথা ; সে নদী শুকিয়ে জল সরে চড়া পড়ে গেছে, কিন্তু এখনো ঝোঁক কাটেনি ; মনে হচ্ছে নদীর ধারেই বসে মাছ ধরছি ! আমার বেশ মনে পড়ছে এইখানেই একঘর গয়লা থাকত আর ঠিক তাদের ঘরের কোণে একটা মস্ত তেঁতুলগাছ ছিল, এখন তবে সেগুলো গেছে ?' বলেই বুড়ো ঝিমিয়ে পড়ে দেখে আমি তাকে

জাগিয়ে দিয়ে বললুম, 'আচ্ছা দাদা, ওই যে ঘোড়া-ভূত আর ঝিঝিঁ-পোকা দেখে এলুম, ওদের কথা তুমি কিছু জানো কি ?'

'জানি বইকি ! ওরা তো সেদিনের ছেলে !' বলেই বুড়ো গল্প শুরু করলে :

'দেখো, এই পৃথিবী তখন সবে তৈরি হয়েছে, আমাদের মতো দু-চারটি গাছ ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ নেই ; —নদী নেই, পাহাড় নেই, এমন কি বাতাসে শব্দটি পর্যন্ত নেই ; —কেবল বালি ধূ-ধূ করছে —ঠিক এই জায়গাটির মতো। আমার তখন সবেমাত্র কচি-কচি দুটি কাঁটা বেরিয়েছে —ছোটো ছেলের কচি-কচি দুটি দাঁতের মতো। সেই সময় তারা গান বড়ো ভালোবাসে, তারা দেখতে অনেকটা মানুষের মতো, কিন্তু ফড়িংগুলোর মতো তাদের ডানা আছে, পাখিগুলোর মতো পা, ঝাঁক বেঁধে তারা আমাদের কাছে উড়ে এসে বসল আর গান গাইতে আরম্ভ করলে। আকাশ-বাতাস তাদের গানের সুরে যেন বেজে উঠল। সে যে কী চমৎকার তা তোমাকে আর কী বলব ! আমরা তার আগে শব্দ শুনিনি, গানও শুনিনি —আনন্দে যেন শিউরে উঠলুম। বালি ঠেলে যত গাছ, যত ঘাস মাথা তুলে কান পেতে সেই গান শুনতে বেরিয়ে এল, পৃথিবীর ভিতর থেকে পাহাড়গুলো গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে এল, পাহাড়ের ভিতর থেকে নদীগুলো ছুটে-ছুটে বেরিয়ে এল। গান শুনতে-শুনতে দেখতে-দেখতে আমরা বড়ো হয়ে উঠলুম। কিন্তু যারা গান গাইতে এল, কী খেয়ে তারা বাঁচে ? পৃথিবীতে তো তখন ফুলও ছিল না, ফলও ছিল না ; ছিল কেবল আমাদের মতো বড়ো-বড়ো গাছ ; কাঁটা আর লতা আর পাতা। নদীতে মাছও ছিল না, আকাশে পাখিও ছিল না যে তারা ধরে খায়। তবু তারা অনেকদিন বেঁচে ছিল কেবল গান গেয়ে। একদিন হঠাৎ শুনি যে গান বন্ধ হয়ে গেছে —তারা সবাই মরে গেছে —শুকনো পাতার মতো তাদের সোনার ডানা বাতাসে উড়ে এসে আমাদের গায়ে বিঁধতে লাগল, কিন্তু তাদের গানের সুর আর শোনা গেল না। তারপর পৃথিবীতে অনেকদিন

আর কোনো সাড়াশব্দ নেই ; কেবল দেখছি, একদল কারা জানি না, দেখতে অনেকটা মানুষ আর ঘোড়ার মতো, এদিকে-ওদিকে চার-দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদেরই খুঁজে-খুঁজে যারা গান গাইতে এসেছিল। ক্রমে দেখি তারাও মরে গেছে। পৃথিবীতে আর তখন কিছু চলে বেড়াচ্ছে না, গান গাইছে না —কেবল গাছের দল আমরা চুপ করে বসে আছি। আমাদের বয়েস ক্রমে বাড়ছে আর আমরা বুড়ো হচ্ছি। তখন জলে মাছ দু-একটি দেখা দিয়েছে ; আমি কাঁটা আর বঁড়শি ফেলে এক রাত্তিরে মাছ ধরছি এমন সময়—'

বলেই মনসাবুড়ো ঝিমিয়ে পড়ল ! আমি যত বলি, 'এমন সময় কী হল দাদা ? আবার বুঝি সেই ফড়িংদের মতো মানুষগুলো ঝিঁঝিঁপোকা হয়ে ফিরে এসে গান গাইছে দেখলে ? দেখলে বুঝি সেই মানুষের মতো ঘোড়াগুলো ভূত হয়ে অন্ধকার থেকে মুখ বাড়িয়ে তাদের গান শুনতে এল ?' বুড়োর আর কথা নেই ; কেবল একবার হুঁ বলেই চুপ করলে।

আমি ভাবছি দিই আর-এক ঘা লাঠি বুড়োর মাথায় বসিয়ে, এমন সময় দেখি দূর থেকে একটা আলো আসছে —যেন কে লণ্ঠন-হাতে আমার দিকে চলে আসছে। একবার ভাবছি বুঝি বেহারা কজন আলো নিয়ে আমাকে নিতে এল। একবার ভাবছি, কী জানি মাঠের মাঝে আলেয়া দেখা দেয়, তাও তো হতে পারে। কিন্তু দেখলুম আলোটা এসে পালকির খানিক দূরে থামল ; আর চারটে জোয়ান উড়ে আমার পালকিটা কাঁধে নিলে। উড়েদের একেই একটু ভুতুড়ে চেহারা, কাজেই ঠিক আন্দাজ করতে পারলুম না যে তারা ভূত না মানুষ ! একবার তাদের পায়ের দিকে চেয়ে দেখলুম, ভূতের মতো তাদের পায়ের গোড়ালি উলটো কিনা। কিন্তু অন্ধকারে কিছু ঠিক করতে পারা গেল না। মনসাবুড়োকে ডেকে বললুম, 'দাদা, তবে যাচ্ছি।'

দাদা আমার তখন ঝিমোচ্ছেন ; চমকে উঠে বললেন, 'যাবে নাকি ? গল্পটা তো শেষ হল না ?'

পালকি তখন চলেছে, মুখ বাড়িয়ে বললুম, ‘দাদা, একরকম গল্পটা শেষই করেছিলে, কেবল তোমার মাথার চুল হলদে আর তোমার রক্ত শাদা কেন, সেইটে বলতে বাকি রয়ে গেল।’

‘মাস্টারমশায়ের কাছে জেনে নিও—’ বলেই দাদা আবার ঝিমিয়ে পড়লেন। হু-হু করে পালকি আবার মাঠের দিকে বেরিয়ে গেল।

একটু ভয়-ভয় করছে; বেহারাগুলো মানুষ না ভূত বুঝতে পাচ্ছিনে। পালকির দরজা বন্ধ করে চুপ করে বসে আছি, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল— মানুষ-উড়ে পালকি-কাঁধে হুম্মাহুম্মা ডাক ছাড়ে, এরা তো হাঁক দিচ্ছে না। পড়েছি ভূতের হাতেই! পড়েছি, আর কোনো ভুল নেই। আচ্ছা দেখা যাক, ভূতপত্‌রী লাঠি তো আছে। তেমন-তেমন দেখি তো দুহাতে লাঠি চালাব।

ভূতপত্‌রী লাঠির কথা মনে করেছি কি অমনি ধপাস করে পালকিটা তারা মাটিতে ফেলেছে, কোমরটা আবার খচ করে উঠেছে। ‘তবে রে ভূত-উড়ে, আমাকে এই মাঠে একলা নামিয়ে দিয়ে পালাবে ভেবেছ! তোল্ পালকি, ওঠা সোয়ারী’ —বলেই লাঠি নিয়ে যেমন তেড়ে যাব, কোমরটা আমার বেঁকে পড়ল। ভূতগুলো দেখেই খিলখিল করে হেসে অন্ধকারে মাঠে কোথায় মিলিয়ে গেল। মহা বিপদ! এই রাত্তিরে মাঠের মাঝে ভূতের ভয়, বাঘের ভয়, সাপের ভয়, তার ওপর কোমর ভেঙে গেল! লাঠি ধরে যে গুড়িগুড়ি পালাব তারও জো নেই। মনসা-কাঁটায় পা ছিঁড়ে গেছে। ‘দূর কর আর ভাবতে পারিনে, যা হয় হবে!’ বলে পালকির ভেতরে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম। খিদেও পেয়েছে, তেষ্টাও পেয়েছে।

একলা থাকতে-থাকতে ক্রমে ঘুম এসেছে। একটু চোখ বুজেছি কি না বুজেছি অমনি খস করে একটা শব্দ হল। চোখ চেয়ে দেখি, বালির ওপরে গোটাকতক তালগাছ উঠেছে, তাদের মাথা যেন আকাশে ঠেকেছে, আর একটা আলো ঘুরে-ঘুরে সেই তালগাছে

ঠেকছে, আবার সড়সড় করে নেমে আসছে! আমি আর না-রাম না-গঙ্গা! কাঠ হয়ে পড়ে আছি কেবল ছুটি চোখ চাদরের একটি কোণ দিয়ে বের করে।

দেখছি আলোটা ক্রমে এ-গাছ সে-গাছ করে ঘুরে বেড়াতে লাগল; তারপর আস্তে-আস্তে মাটিতে নেমে এল। সেই সময় দেখি পূর্ণিমার চাঁদের মতো প্রকাণ্ড একটা কাঁচের গোলা মাঠের ওপর দিয়ে বোঁ-বোঁ করে গড়িয়ে আসছে— যেন একটা মস্ত আলোর ফুটবল! তালগাছের তলায় যে আলোটা টিপ-টিপ করছিল সেটা জোনাকি-পোকার মতো উড়ে গিয়ে সেই গোলাটার ওপর বসল। বসেই গোলাটাকে আমার দিকে গড়িয়ে আনতে লাগল!

গেছি, পালকিসুদ্ধ গোলাটার ভেতরে ঢুকে গেছি। হাঁড়ির ভেতরে মাছের মতো আর পালাবার জো নেই। একেবারে গড়িয়ে চলেছি— বন্‌বন্ করে লাঠিমের মতো ঘুরতে-ঘুরতে। সে কী ঘুরুনি! মনে হল, আকাশ ঘুরছে, তারা ঘুরছে, পৃথিবী ঘুরছে, পেটের ভেতর আমার মাসির মোয়াগুলোও যেন ঘুরতে লেগেছে! কখনো মাঠের ওপর দিয়ে, কখনো গাছের মাথা ডিঙিয়ে, গোলাটা শাদা খরগোশের মতো লাফিয়ে, গড়িয়ে, কখনো জোরে, কখনো আস্তে আমাকে নিয়ে ছুটে চলেছে!

ভয়ে দুই হাতে চোখ ঢেকে চলেছি। কঁ্যা-কোঁ চরকা-কাটার শব্দ শুনে চোখ খুলে দেখি এক বুড়ি সুতো কাটছে আর একটা খরগোশ তার চরকা ঘুরোচ্ছে। বুড়িকে দেখেই চিনেছি, সেই আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি, যে চাঁদের ভেতরে বসে থাকে! আর ওই তার চরকা, ওই খরগোশ! আঃ বাঁচা গেল, এটা তবে গোলাভূত নয়! ইনিই আমাদের চাঁদামামা, আর বুড়ি তো আমাদের মামি! আর এ খরগোশ তো আমাদের সেই খাঁচার খরগোশটি, বিলিতি ইঁদুরের আর গিনিপিগগুলির বড়োমামা!

'বলি মামি, এমন করে কি ভয় দেখাতে হয়!' বলেই আমি খরগোশটাকে খপ করে কোলে তুলে নিয়েছি।

'ওরে ছাড়, ছাড়! আমার চরকা-কাটা বন্ধ করিস নে, দেখচিস নে এই চরকার জোরেই চাঁদামামার সংসার চলছে!'

সত্যিই দেখি চরকা বন্ধ হতেই চাঁদামামা গড়াতে-গড়াতে থেমে গিয়ে লাঠিমের মতো মাটির ওপর কাত হয়ে পড়েছেন! আমি খরগোশটি মামির হাতে দিয়ে বললুম, 'কই মামি, চালাও দেখি মামাকে।'

খরগোশ চরকায় যেমন এক পাক দিয়েছে অমনি চাঁদামামা গা-ঝাড়া দিয়ে ঘুরতে লেগেছেন। বুড়ি ডাকছে, 'দে পাক, দে পাক!' খরগোশ ততই পাক দিচ্ছে আর চাঁদামামাও তত ঘুরপাক দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে রবারের বলের মতো নাচতে-নাচতে চলেছেন। যত বলি, 'মামি আর পাক দিও না, মামাকে আমার অত ঘুরিও না, মামা হাঁপিয়ে দম আটকে কোনদিন মারা পড়বেন যে! একটু রয়ে-বসে চালাও, শেষে বুড়ো বয়েসে মামার কি মাথা ঘুরুনির রোগ ধরিয়ে দেবে?' জানি কি যে মামি আমার কালা! আমার একটি কথাও বুড়ির কানে যায়নি। সে কেবল বলছে, 'দে পাক, দে পাক,!' আমি যত ইশারা করে বলি, 'আস্তে, আস্তে!'— বুড়ি ভাবে জোরে চালাতে বলছি, ততই ডাকে, 'দে পাক, দে পাক!'

মামা রেলের গাড়ির মতো হু-হু করে ছুটে চলেছেন। 'ওরে থামা, থামা! মাথা ঘুরে গেল, আর যে পারিনে'— বলেই লাঠি তুলেছি খরগোশটাকে মারতে। যেমন লাঠি তোলা অমনি খরগোশটা খ্যাঁক করে তেড়ে এসেছে, ক্যাঁচ করে চরকাটা বন্ধ হয়ে গেছে আর পটাং করে মামির হাতের সুতো কেটে গেছে। যেমন সুতো কাটা আর ঝপাং করে চাঁদামামা গিয়ে একটা নদীর জলে পড়েছেন, পড়েই ফেটে চৌচির!

'কী করলে গো মামি!' বলেই চমকে দেখি নদীর ওপারে পালকিসুদ্ধ আমি ঠিকরে পড়েছি! কোথায় বুড়ি, কোথায় চরকা, কোথায় বা সে খরগোশ! নদীর জলে দেখি একরাশ কাঁচের টুকরোর মতো চাঁদামামার ভাঙা আলো, খানিক চকচক করেই নিভে

গেল। আকাশের দিকে চেয়ে দেখি সত্যিই চাঁদামামার আধখানা কোথায় উড়ে গেছে।

ভাগ্যি নদীতে তেমন জল ছিল না, নইলে সবাই আজ ডুবেছিলাম আরকি! বড় তেষ্টা পেয়েছিল। নদী থেকে এক ঘটি জল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে তবে বাঁচি!

নদীর ধারেই একটা গাঁ রয়েছে। দেখে সাহস হল; ভাবলুম —আজ রাত্তিরে ওই গাঁয়ে কারু গোয়াল-ঘরে শুয়ে থাকি; কাল সকালে এখান থেকেই ফিরে পালাব, পিসির বাড়ি যাওয়ায় আর কাজ নেই বাবা! এই মনে করে গাঁয়ের ভেতরে গিয়ে দেখি, সেখানে জনমানব নেই। ডাক-হাঁক করে কারো সাড়াও পাইনে! যাই হোক, গাঁ ছেড়ে আর এক পা-ও নড়া নয়। চাদর মুড়ি দিয়ে একটা ঘরের দাওয়ায় শুয়ে পড়লুম। যেমন শোয়া, আর ঘুম— অকাতরে ঘুম।

খানিক পরে জেগে দেখি, সেই মনসাতলার লণ্ঠন-ভূতটা আর তার চার বন্ধু আলো নিয়ে আমার মুখের কাছে বসে আছে। 'তবে রে!' বলেই যেমন উঠতে যাব অমনি তারা বলে উঠেছে, 'দেখো বাবু, ফের যদি লাঠি দেখাও কি মারতে আস, তবে আবার আমরা তোমাকে ফেলে পালাব। আর যদি চুপ করে ভালোমানুষটি হয়ে পালকিতে বসে থাক, তবে ওই-কি-বলে ও-কি-তলা পর্যন্ত তোমাকে আমরা পৌঁছে দেব।' বুঝলুম, ভূতগুলো ভয়ে রামনাম মুখে আনতে পারছে না, তাই পিসির বাড়ি যেতে যে রামচণ্ডীতলার কথা শুনেছি তাকে বলছে— কি-বলে-ও-কি তলা।

ভূতগুলো ভয় পেয়েছে দেখে সাহস হল; পালকিতে আবার উঠে বসলুম।

এবারে আর ভয় করছে না— ভোর হবার এখনো দেরি আছে কিন্তু এরই মধ্যে ভূতগুলো যেন একটু ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, মাঠে আর ঘন-ঘন আলেয়া দেখা দিচ্ছে না, পথের ধারে তালগাছ তো দেখাই দিচ্ছে না, কোথাও মনসাগাছের ছায়াটি পর্যন্ত আর দেখা

যায় না। পূবদিক থেকে ভোরের বাতাস একটু-একটু আসছে; ভূতগুলো হাওয়া পেয়েই যেন জড়োসড়ো। আমি কিন্তু বেশ আরামে পালকিতে দরজা খুলে ঘুম দিতে-দিতে চলেছি।

ভোর হয় দেখে ভূত-বেহারা চারটে ভয় পেয়েছে, কিন্তু রামচণ্ডীতলায় আমাকে পৌঁছে দিলেই তাদের ছুটি এই ভেবে তাদের একটু আহ্লাদও হয়েছে। চার ভূত চার সুরে চিঁচিঁ, পিঁপিঁ, খিটখিট, টিকটিক করে গান গাইতে-গাইতে চলেছে— ঠিক যেন কত দূর থেকে চিল ডাকছে, আর কোলাব্যাঙ কটকট করছে। ঘুমের ঘোরে শুনছি যেন 'কুহু কেকা'র ঠিক সেই পালকির গানটা! কিন্তু কথাগুলো সব উলটোপালটা আর সুরটাও বেখাপ্পা বেয়াড়া— বেজায় ভুতুড়ে। কেবল হাড় খটখট, দাঁত কিটমিট, গোঙানি আর কাতরানি শুনে যে গায়ে জ্বর এল! ঘুমিয়ে আছি কিন্তু তবু শুনছি:

চলে চলে
হুমকিতালে
পংখী গালে
মাসিপিসি
বাঘবেরালে।

ভূতপেরেতে
চলেছে রেতে
হনহনিয়ে
ভূতপেরেতে।

পালকি দোলে
উঠতি আলে
নালকি দোলে
নামতি খালে

আলো-আঁধারে
শেওড়াগাছ
কালোয় শাদায়
বেরাল নাচ।

মরানদী
বালির ঘাট
মনসাতলায়
মাছের হাট।

ভূতের জমি
ভূতের জমি
ভূতপেরেতের
নাইকো কমি।

উড়ছে কতক
ভনভনিয়ে
চলছে কতক
হনহনিয়ে
হঁনহঁনিয়ে।

চলছে কতক
গাছতলাতে
দুলছে কতক
তালপাতাতে।

দিনদুপুরে
বাদুড় ঘুমোয়
রাতদুপুরে
হুতুম ঘুমোয়।

ভোঁদড় ভাম
ব্যাঙ-ব্যাঙাচি
টিকটিকি আর
কানামাচি।

গঙ্গাফড়িং
জোনাকপোকা
আরসোল্লা
ন্যাংটা খোকা।

ছুঁচো ইঁদুর
খ্যাঁকশেয়াল
শুকনো পাতা
গাছের ডাল।

সব ভুতুড়ে
সব ভুতুড়ে
ঘুর্নি-হাওয়ায়
চলছে ঘুরে

জগৎ জুড়ে
ঘুরছে ধুলো
বাতাস দিয়ে
দুলছে কুলো!

সব ভুতুড়ে
সব ভুতুড়ে
আলো-আলেয়া
জ্বলছে দূরে

সব ভুতুড়ে
ভূতের খেলা
খেজুরতলায়
ইঁটের ঢেলা···

গানটা শুনছি একবার— 'ছুঁচো, ইঁদুর, কানামাছি, ভোঁদড়, প্যাঁচা, টিকটিকি, খ্যাঁকশেয়াল।' গানটা শুনছি দু-বার— 'গঙ্গাফড়িং, জোনাকপোকা, আরসোলা, বাদুড়!' গানটা শুনছি তিনবার— 'আলো-আলেয়া, ঘূর্ণি-হাওয়া, খেজুরগাছ, ইঁটের ঢেলা।' একবার, দু-বার, তিনবার, বারবার তিনবার ইঁটের ঢেলা পড়েছে কি আর পালকিসুদ্ধ আমাকে ভূতগুলো ঝপাং করে মাটিতে ফেলে খেজুর-গাছের তলায় একটা মরা গরু পড়েছিল সেটাকে নিয়ে লুফতে-লুফতে দৌড় মেরেছে! ওদিকে অমনি রামচণ্ডী থেকে রাত তিনটের আরতি বেজেছে— টংটং, টংআ-টং, টংটং-আ-টং।

এই খেজুরতলা পর্যন্ত ভূত আসতে পারে, তার ওদিকে রামচণ্ডী-তলা, সেখানে রামসীতা বসে আছেন, হনুমান, জাম্ববান পাহারা দিচ্ছে, ভূতের আর সেখানে এগোবার জো নেই। ভূতপত্নীর লাঠিরও জোর সেখানে খাটবে না। কাজেই পোঁটলা-পুঁটলি, লাঠি-ছাতা সমস্ত পালকিতে রেখে, কোমর ধরে, খোঁড়াতে-খোঁড়াতে বালি ভেঙে রামচণ্ডীতলায় রামসীতা দেখতে তিনটে রাতে অন্ধকার দিয়ে একলা চলেছি। সঙ্গে একটি আলো নেই, হাতে লাঠিটি পর্যন্ত নেবার জো নেই। কী জানি লাঠি দেখে যদি হনুমান মন্দিরে ঢুকতে না দেয়! তখন যাই কোথা?

'রাম-রাম' বলতে-বলতে বালি ভেঙে চলেছি। বালি তো বালি একেবারে বালির পাহাড়! এক-একবার পিছন ফিরে দেখছি ভূতগুলো আসছে কিনা। যদিও এখানকার বালিতে পা দিলেই তাদের মাথার খুলি ফটাস করে ফেটে যাবে তবুও খেজুরগাছটার ওপর থেকে তারা ভয় দেখাতে ছাড়ে না; টুপ করে হয়তো একটা

ভূতের খেলা

খেজুর-আঁটি এসে গায়ে পড়ল, হয়তো দেখছি খেজুরতলায় যেন একটা কচি ছেলে ওমা-ওমা করে কাঁদছে, শুনে ইচ্ছে হয় দৌড়ে গিয়ে দেখি— বুঝি কাদের ছেলে পথ হারিয়ে কেঁদে বেড়াচ্ছে ; হয়তো আমার নাম ধরেই পেছন থেকে কে একবার ডাকলে, গলাটা যেন চেনা-চেনা, ফিরে দেখি কেউ কোথাও নেই ! অন্ধকারে হয়তো দেখলুম মাঠের মাঝে একটা জায়গায় খানিকটা জ্বলন্ত বালি তুবড়ি-বাজির মতো ফস করে জ্বলে উঠল, ইচ্ছে হয় গিয়ে দেখি কিন্তু গেলেই বিপদ— একেবারে ভূতে ধরে জরিমানা করে তবে ছাড়বে, নয়তো মট করে ঘাড় মটকে দেবে।

আমি আর এদিক-ওদিক কোনোদিক না দেখে 'সীতারাম-সীতারাম' বলতে-বলতে চলেছি। ওই দেখা যাচ্ছে বালির পাহাড়ের ওপরে পঞ্চবটীর বন, বনের মাথায় রামসীতা মন্দিরের চূড়ো। মনে হচ্ছে এই কাছেই, আর একটু গেলেই পৌঁছে যাব, কিন্তু যতই এগিয়ে যাচ্ছি ততই যেন সব দূরে সরে যাচ্ছে— আমার কাছ থেকে দৌড়ে পালাচ্ছে। আমিও দৌড়েছি খোঁড়া পা নিয়ে, দৌড়েছি হাঁপাতে-হাঁপাতে, দৌড়েছি উঠি-তো-পড়ি বালির ওপর দিয়ে।

এইবার শুনতে পাচ্ছি মন্দিরের খোল-করতাল বাজছে ; দেখতে পাচ্ছি জাম্ববানের দল আগুন জ্বালিয়ে গাছতলায় বসে আছে ; হনুমানের ল্যাজ বটের ঝুরির মতো পাতার ফাঁক দিয়ে ঝুলে পড়েছে। আর ভয় কী ! বলে যেমন রামচণ্ডীতলায় ছুটে যাব আর নাকটা গেল ঠুকে। একি, নাক ঠুকল কিসে ? এই তো সামনে সোজা রাস্তা—গাছের তলা দিয়ে মন্দিরে উঠেছে ; তবে নাক ঠোকে কিসে ?

নাকে হাত দিয়ে দেখি নাকটা বিলিতি-বেগুনের মতো ফুলে উঠেছে। সামনে হাতড়ে দেখি প্রকাণ্ড কাঁচ, তার ভেতর থেকে ফ্রেমে-বাঁধা ছবির মতো রামচণ্ডীর মন্দির, পঞ্চবটী বন, হনুমানের ল্যাজ, সবই দেখা যাচ্ছে ; কেবল তার ভেতরে যাওয়া যাচ্ছে না। ফড়িংগুলো যেমন লণ্ঠনের চারদিকে মাথা ঠুকে মরে, আমিও তেমনি

ঘুরে বেড়াচ্ছি চারদিকে কেবল নাক ঠুকে-ঠুকে। নাকটা বেগুনের মতো গোল হয়ে ফুলে উঠেছিল, কাঁচে লেগে-লেগে ক্রমে চ্যাপটা হয়ে গেল, তবু ভেতরে ঢোকবার রাস্তা কিন্তু পেলুম না।

হাঁপিয়ে গেছি, বালির ওপরে বসে পড়েছি, হনুমানের গোটাকতক ছানা আমাকে দেখে দাঁত বের করে হাসছে। ভারি রাগ হল, রাগে বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল। 'জয় রাম!' বলে দিয়েছি এক লাফ সেই কাঁচের ওপরে।

লাফ দিয়েই ভাবলুম— গেছি! হাত-পা কেটে, সকল গায়ে কাঁচ ফুটে রক্তারক্তি হল দেখছি! কিন্তু আশ্চর্য! রামনামের গুণে জলের মতো কাঁচ কেটে একেবারে ভেতরে গিয়ে পড়েছি— হনুমানের জাম্ববানের দলের মাঝখানে! আর অমনি চারদিকে রব উঠেছে— 'জয় রাম! জয়-জয় রাম, সীতারাম!' সমুদ্দুরের ডাক শুনছি— 'জয়-জয় রাম!' বাতাসে শব্দ শুনছি— 'জয় রাম!' চারদিকে 'জয় রাম সীতারাম!'

কেউ আমাকে একটি কথাও বললে না, আমার দিকে ফিরেও চাইলে না! আমি রামসীতা দর্শন করে একটা কাঁটাবন পেরিয়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে পড়েছি। সেখানে দেখি, ছটা বেহারা আমার পালকিটি নিয়ে বসে আছে— দেখতে কালো কিচ্‌কিন্দে।

'কে হে বাপু তোমরা পালকিটি নিয়ে?'

'বাবুজি, আমরা তোমার গিসির চাকর— কিচ্‌কিন্দে, কাসুন্দে, বাসুন্দে, ঝাপুন্দে, মালুন্দে, হারুন্দে।'

'আচ্ছা বাপু, চলো তো পিসির বাড়ি'— বলেই আমি পালকি চেপে বসেছি।

এবার চলেছি আরামে, কোনো ভয় নেই; পা ছড়িয়ে বসে, পালকির দুই দরজা খুলে, মনের আনন্দে চারদিক দেখতে-দেখতে চলেছি। কেমন তালে-তালে এবার পালকি চলেছে— কালকাসুন্দি, ঝালকাসুন্দি! ঝাঁকুনি নেই, পালকি চলেছে— আমকাসুন্দি, জামকাসুন্দি! যেন জলের ওপর দুলতে-দুলতে নেচে চলেছে।

পিসির পালকি চলেছে— ধর কাস্থন্দে, চল বাস্থন্দে, বড়া ঝালুন্দে, খোঁড়া মালুন্দে। পালকির এক দরজা ধরে চলেছে হারুন্দে, আর এক দরজা ধরে চলেছে উড়েদের সর্দার— কালো কিচ্‌কিন্দে।

হারুন্দের মাথায় কালো চুলের উঁচু ঝুঁটি আর কিচ্‌কিন্দের মাথায় পাকা চুলের শণের নুটি। হারুন্দে ফরসা, কিচ্‌কিন্দে কালো মিশ— যেন বাংলা কালি! হারুন্দের চুল যেন বালির ওপরে মনসাগাছ— খাড়া-খাড়া, খোঁচা-খোঁচা, আর কিচ্‌কিন্দের চুল যেন সমুদ্দুরের শাদা ঢেউ— হাওয়ায় লটপট করছে। কিচ্‌কিন্দের মাঠটাও দেখছি খানিক শাদা, খানিক কালো, খানিক আলো, খানিক অন্ধকার— একদিকে ধপধপ করছে শুকনো বালি আর-দিকে টলমল করছে কালো জল— নুনে গোলা। মাঠ দিয়ে চলছি, না, শাদা-কালো মস্ত একখানা সতরঞ্চির ওপর দিয়েই চলেছি!

আমার বাঁদিকে কেবল বালি— শাদা ধপধপ করছে বালি ; আর আমার ডানদিকে রয়েছে কালি-গোলা সমুদ্দুর—কালো— কাজলের মতো কালো, বাঁয়ে চলেছে হারুন্দে—ডাঙার খবর দিতে-দিতে, ডাইনে চলেছে কিচ্‌কিন্দে— জলের আদি-অন্ত কইতে-কইতে। আমি চলেছি পালকিতে শুয়ে মনে-মনে দুজনের দুটো গল্প শাদা একটা শেলেটের ওপর কালো পেনসিল দিয়ে লিখে নিতে-নিতে। কিচ্‌কিন্দের গল্পটা জলের কিনা তাই সেটা লিখে নিতে-নিতেই ধুয়ে-মুছে গেছে, একটুও আর পড়া যাচ্ছে না। কিন্তু হারুন্দের গল্পটা বালির আঁচড়ের মতো একেবারে শেলেটে কেটে বসে গেছে— ধুলেও যায় না, মুছলেও যায় না— বেশ পষ্ট-পষ্ট পড়া যাচ্ছে।

হারুন্দের কথা

'আমার নাম হারুন্দে নয়—হারুন-অল-রসিদ, বোগদাদের নবাব খাঞ্জা খাঁ জাহান্দর শা বাদশা। এখন হয়েছি হারুন্দা।'

বোগদাদের হারুন-অল-রসিদের কথা আরব্য উপন্যাসে পড়েছি, আবু হোসেনের থিয়েটারেও তাকে দেখেছি— কখনো সদাগর সেজে বেড়াচ্ছে, কখনো ফকির, কখনো বা কাফ্রি চাকর। এখন আবার তিনি উড়ে-বেহারা সেজে এলেন দেখছি!

অবাক হয়ে হারুন্দের মুখের দিকে চেয়ে আছি— কখন আবার সে ফকির হয়, কি বাদশা হয়! আমাকে হাঁ করে থাকতে দেখে বলছে, 'আমার কথায় বিশ্বাস হল্ না বুঝি? আচ্ছা দেখো!' বলেই একবার হারুন্দে দাড়িতে গোঁফে মোচড় দিয়েছে। আর অমনি দেখি, সে হারুন্দে আর নেই! ইয়া দাড়ি, ইয়া গোঁফ, মাথায় বকের পালক-গোঁজা পাগড়ি, গায়ে চিনেপোতের জোব্বা-কাব্বা, পায়ে ঢিলে ইজের আর দিল্লির লপেটা পরে হাতে বাঁকা এক তলোয়ার নিয়ে দেখা দিয়েছে— হারুন বাদশা! ফিক করে হেসে আমাকে সে যেমন সেলাম করেছে আর অমনি আমি ফস করে দেশলাই জ্বেলে ফেলেছি। বাদশার হাতে গলায় মাথায় হীরে-মানিকের গহনাগুলো এমন ঝকঝক করে উঠেছে যে চোখে ধাঁধা লেগে গেছে। কিচ্‌কিন্দে ছিল পাশে; সে অমনি ফুঃ করে আলোটা নিভিয়ে দিয়েছে। আর কোথায় বাদশা?— যে হারুন্দে সেই হারুন্দে!

আলো জ্বালতে হারুন্দে ভারি রেগে গেছে, কিছুতে আর গল্প বলতে চায় না। অনেক হাতে-পায়ে ধরে তাকে ঠাণ্ডা করেছি তবে সে আবার গল্প বলছে, 'দেখলে তো আমিই ছিলুম বোগদাদের নবাব খাঞ্জা খাঁ জাহান্দর শা বাদশা হারুন-অল-রসিদ! আর ওই যে কালো কিচ্‌কিন্দে উড়েটা তোমার ওপাশে চলেছে, ও ছিল মস্থর— আমার

কাফ্রি চাকর। তুমি ফস করে যেমন আলো জ্বেলেছিলে ও তেমনি খপ করে তোমার মাথা কেটে ফেলতে পারে যদি আমি হুকুম দিই। দেখবে? মস্থুর—'

'না! না!' বলেই আমি হারুন্দের মুখ চেপে ধরেছি, পাছে হুকুম বেরিয়ে পড়ে। কিচ্‌কিন্দে আমার গা টিপে বলছে, 'শোনো কেন! ওটা একটা পাগল, আমি কোনোপুরুষে ওর চাকর নই।'

একটা ভারি মজা দেখছি— কিচ্‌কিন্দে আমার গা-টি ছুঁয়েছে আর তার মনের কথা পষ্ট-পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, কিচ্‌কিন্দেকে মুখ দিয়ে একটি কথাও বলতে হচ্ছে না।

কিচ্‌কিন্দের কথায় সাহস পেয়ে হারুন্দের মুখ ছেড়ে দিলুম। ছাড়তেই শুনলুম, হারুন্দের মুখের হুকুমটা গোঁ করে তার বুকের ভেতর নেমে গেল; হারুন্দেও আর রাগ-টাগ করলে না।

'দেখলে তো!' বলেই সে আবার গল্প শুরু করল: 'একদিন আমি আমার বসরাই-গোলাপবাগ বলে যে বাগান সেখানে বসে গুড়গুড়িতে তামাক খাচ্ছি, আর গোলাপজলের ফোয়ারার ধারে বসে ওই মস্থুর আমার পোষা বুলবুল বোস্তাঁর সোনার খাঁচাটা ধুয়ে-মেজে সাফ করছে, এমন সময় সিন্ধবাদ নাবিক সাত সুমুদ্দুরের জলে সাতখানা জাহাজ-ডুবি করে এসে হাজির— ভিজে কাপড়ে দু-হাতে আমাকে সেলাম ঠুকতে-ঠুকতে। মস্থুরকে বলেছি আনতে একখানা চৌকি, না, মস্থুরটা এমন গাধা যে এনেছে একটা টুল। আমি রেগে মস্থুরের মাথা কাটতে যাব আর অমনি সিন্ধবাদ আমার দু-পা জড়িয়ে ধরে বলছে, হুজুর মস্থুরকে মাপ করুন— অনেকদিনের পুরোনো চাকর। শুনুন, এবার কী আশ্চর্য কাণ্ড দেখে এসেছি। এবারে আমি জাহাজ নিয়ে হিন্দুস্থানের দিকে বাণিজ্য করতে গিয়েছিলুম, কাঁচের বাসনের বদলে অনেক হীরে-জহরত হিন্দুস্থানের বোকা লোকগুলোর কাছ থেকে ঠকিয়ে নিয়ে দেশে ফিরে আসছি, এমন সময় জাহাজ আমাদের ঝড়ে পড়ল। এমন ঝড়ও কখনো দেখিনি, সমুদ্দুরে এমন ঢেউও কখনো পাইনি! পাল, দড়ি, হাল,

দাঁড় ভেঙেচুরে ছিঁড়ে-খুঁড়ে কোথায় উড়ে গেল তার ঠিক নেই! সাতদিন সাতরাত আমাদের জাহাজ মোচার খোলার মতো জলে ভাসতে-ভাসতে শেষে এসে কালাপানিতে পড়ল ; সেখানে সমুদ্দুরের জল, হুজুর, ওই মসুরের মতো কালো, আর যেন রেগে টগবগ করে ফুটছে! যেমন কালাপানিতে জাহাজ পড়েছে আর মাঝিমাল্লা সবাই আল্লা-আল্লা করে কেঁদে উঠেছে। যত বলি— কাঁদিস কেন? কী হয়েছে বল?— কেউ আর কথার উত্তরই দেয় না, কেবল ডাঙার দিকে একটা কাফেরদের মন্দির দেখায় আর ভেউ-ভেউ করে কাঁদে। এমন সময় জাহাজের কাপ্তেন আমার কাছে এসে বললে— কর্তা আর ভ্যাহেন্ কী? আল্লার নাম ল্যান! ওই যে কাফেরদের মন্দির, ওর মাথায় একটা জাঁতার মতো চুম্বুক-পাথর আছে, তারি টানে জাহাজের যত লোহার পেরেক সব একটি-একটি করে খুলে ওই মন্দিরের গায়ে যেয়ে লাগবে আর জাহাজের কাঠগুলি ভুস করে আলগা হয়ে মাঝিমাল্লা মালমাত্তা সব জলে যাবে! কত্তা সব জলে যাবে! বলতে-বলতে দেখি, জাহাজ থেকে পেরেকগুলো খুলে-খুলে বিষ্টির মতো গিয়ে সেই মন্দিরের চুড়োয় চুম্বক পাথরটায় লাগছে। দেখতে-দেখতে আমাদের মুরগি রাঁধবার লোহার হাঁড়ি আর রুটি সেঁকবার তাওয়াখানা গেল উড়ে। আমার হাতে আমার হীরে-জহরতের লোহার সিন্দুকের চাবিটা ছিল, সেটাও দেখি পালাই-পালাই কচ্ছে। আমি— না আল্লা, না খোদা— চাবিটাকে মুখে পুরে আমার লোহার সিন্দুকটা জাপটে ধরেছি। এদিকে ভুস করে জাহাজটি ডুবে গেছে। আমি কিন্তু ঠিক ভেসে আছি ; চুম্বকের টানে লোহার সিন্দুক আমার ঠিক ভাসতে-ভাসতে গিয়ে ডাঙায় ঠেকেছে। আমি টপাস করে বালিতে লাফিয়ে পড়েছি আর অমনি হুজুর— আমার সেই লোহার সিন্দুক, আমার অনেক টাকার সিন্দুক হুজুর, অনেক-কষ্টে-ঠকিয়ে-নেওয়া হীরে-জহরতে-ভরা সিন্দুক হুজুর, বোঁ করে উড়ে পালিয়েছে— উড়ে-মেড়াদের সেই মন্দিরের চুড়োয়!'— বলেই সিন্ধবাদ মাটিতে লুটোপুটি খেয়ে কাঁদতে লাগল।

আমি সিন্ধবাদের হাত ধরে উঠিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করে টুলে বসিয়ে বললেম, 'সিন্ধবাদ, শোনো। জানো আমি হারুন-অল-রসিদ, আমার সামনে মিথ্যা কথা বললে তোমার মাথা কাটা যাবে জানো!'

সিন্ধবাদ বললে, 'জানি হুজুর, সেইজন্যেই তো আমার দুঃখু! সব সত্যি বলতে হল হুজুর, একটি মিথ্যা কথা দিয়ে এবারকার গল্পটা সাজাতে পারলুম না। ওরে আমার লোহার সিন্দুক!'—বলেই সিন্ধবাদ টুল থেকে ঘুরে পড়েছে। একেবারে অজ্ঞান অচৈতন্য। মস্থুর অমনি তাড়াতাড়ি তার মুখে জল দিতে এসেছে। আমার ভারি রাগ হল, মস্থুরকে এক লাথি মেরে বললুম, 'গাধা! আগে ওর মুখ থেকে সিন্দুকের চাবিটা এইবেলা বার করে নে। জেগে উঠলে কি আর দেবে?'

মস্থুর অমনি সিন্ধবাদের মুখে আঙুল দিয়ে বলছে, 'কই কত্তা চাবি তো পাইনে!'

'পাসনে কি রে, দেখ্ জিবের নিচে!'

'পাইনে তো কত্তা!'

'দেখ্, দেখ্, গলায় আটকেছে!'

'চাবি তো নেই কত্তা।'

'খেয়ে ফেলেছে রে গাধা, খেয়ে ফেলেছে, পেট চিরে দেখ্ পাজি!'

মস্থুর অমনি ঝট করে তার পেট চিরে ফেলেছে আর দেখি পেটের ভেতর বজ্জাত সওদাগর তার লোহার সিন্দুকের চাবিটা লুকিয়ে রেখেছে! নিশ্চয় আমার কাছে মিথ্যা কথা বলত—'যেমন আল্লা বলে কেঁদেছি হুজুর, অমনি চাবিটাও উড়ে পালিয়েছে।'

মস্থুর চাবিটা গোলাপ জলে ধুয়ে আমার হাতে এনে দিলে। আমি মস্থুরকে হুকুম করলুম, আমার সেই উড়ো-সতরঞ্চি আর মুড়ো-দূরবীনটা আনতে— যাতে পাখির মতো উড়ে-উড়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াই আর সগ্‌গ-মত্ত-পাতালের জিনিস ঘরে বসে দেখি।

সতরঞ্চি আসতেই আমি তার ওপরে তাকিয়া ঠেস দিয়ে দূরবীন

হাতে উঠে বসেছি, মস্তুরও আমার পায়ের কাছে বসেছে— পা টেপবার জন্যে। যেমন হুকুম দেওয়া— চলো কালাপানি! অমনি সতরঞ্চি আকাশ দিয়ে উড়ে চলেছে। তামাক খেতে গিয়ে হাতের কাছে নল পাইনে! মস্তুরটা এমনি গাধা যে গুড়গুড়িটা তুলে নিতে ভুলে গেছে। ভাগ্যি পকেটে কটা সিগারেট ছিল, তাই রক্ষে! মস্তুরও বেঁচে গেল, আমিও তামাক খেয়ে আরাম পেলুম।

বোগদাদ থেকে বেরিয়ে ঘণ্টাখানেক এসেছি কি না, এমন সময় মস্তুর বলছে, 'হুজুর, একটা কালো মন্দিরের চুড়ো দেখা যাচ্ছে, ঠিক ওই ডানদিকে।'

তাড়াতাড়ি দূরবীন কষে দেখি সেটা মক্কার মসজিদ। মস্তুর এত বড়ো মসজিদ কখনো চক্ষেও দেখেনি। সে তো অবাক।

আবার খানিক পরে কাফ্রিস্থানের ওপর দিয়ে আমরা উড়ে চলেছি। তখন মস্তুরের হাসি দেখে কে। সে বলছে, 'ওই দেখা যাচ্ছে সাহারা, হুজুর! ওটা একটা সমুদ্দুর শুকিয়ে গিয়ে চড়া পড়ে গেছে। ওরই ওদিকে দেখুন একটুখানি নোনা জল, তারই ওপারে ফিরিঙ্গি মুলুক আর আমাদের রূমের বাদশার কস্তনতুনিয়ার কেল্লা দেখা যাচ্ছে। ওই দেখুন হুজুর, বালির ওপর দিয়ে সার-বেঁধে উটের কাফিলা চলেছে; ওই খেজুরতলায় ফালহানি জল তুলছে, ওই মিসির শহর আর ওই দেখুন সেকেন্দ্রিয়ার কুতুবখানা, হুজুর! ওখানে দুনিয়ার কেতাব জমা আছে। হুজুর ওই যে দেখেন দুটো পব্বতের মতো, ও দুটো হচ্ছে কাফ্রিস্থানের বাদশার কবর। এত বড়ো কবর আর জগতে নেই। কেবল সোনা-রুপো-হীরে-জহরতে ঠাসা আর তারই মাঝে সব মরা মানুষ শুয়ে আছে— হাজার বরষ ধরে, তবু তাদের দেখে মনে হয় যেন এই মরেছে, নয়তো ঘুমিয়ে আছে। কিমিয়াবিদ্যার জোরে এখনো হাজার-হাজার বরষের মরা মানুষগুলো টাটকা রয়েছে হুজুর! যদি দেখতে চান তো নেমে চলুন।'

আমি মস্তুরকে ধমকে বললুম, 'ওসব জীনের কারখানা আমি দেখতে চাইনে। ওদিকে ওটা কী দেখা যাচ্ছে?'

'হুজুর ওটা নীল নদী, ওখানে নীলপদ্ম পাওয়া যায়। হিন্দুদের যমুনা— আর কাফ্রিদের ওই নীল নদী! হুজুর, ওর ওপর একবার নৌকোয় করে হাওয়া খেয়ে দেখুন, দিল্ খুশ হয়ে যাবে। ওই নদীর ধারে আমার বাড়ি দেখা যায়, ওই আকের খেতের ধারে হুজুর, ওই আমাদের বুড়ো গাধাটি আমার দিকে মুখ তুলে চেয়ে আছে হুজুর! আমি হিন্দুস্থানে হীরে-জহরতের খোঁজে যেতে চাইনে, আমাকে আমার দেশের এই আকের খেতে ছেড়ে দিয়ে যান হুজুর।'

আমি দেখলেম বিপদ। মস্থরকে ছাড়লে আমার তো একদণ্ড চলবে না। তামাক দেয় কে? পা টেপে কে? হিন্দুস্থানে একলাই বা যাই কী করে— সিন্ধবাদের জহরত লুঠ করতে?

আমি মস্থরকে কিছু না বলে সতরঞ্চির ওপরে পুব-মুখো হয়ে ঘুরে বসেছি— হিন্দু রাজাদের মতো। এতক্ষণ আমি মোছলমানি কেতা-মতো পশ্চিম-মুখো বসেছিলুম, সতরঞ্চিও তাই পশ্চিম-মুখো চলছিল; পুব-মুখো বসতেই সতরঞ্চি পুবে ঘুরেছে আর হু-হু করে নীল-নদী পেরিয়ে একেবারে সিস্তান ঘুরে ইস্পাহানে হাজির। সেখানে বুলবুল-বোস্তাঁর ঝাঁক, হাফেজের গান গাইতে-গাইতে আমাদের সঙ্গে সব উড়ে চলেছে; মাটি থেকে সিরাজি সরবত আর ইস্তাম্বুল আতরের খোসবো আসছে। আমারও তেষ্টা পেয়েছে— মস্থরেরও খিদে লেগেছে; দুজনে একটা মেওয়ার বাগানের ধারে আকাশ থেকে নেমে এসেছি। মস্থরকে দুটো মোহর ফেলে দিয়েছি —দু-বোতল সিরাজি সরবত আনতে। মস্থরটা এমনি গাধা! দেখি, খানিক পরে দু-মোহর দিয়ে এক ঝাঁকা বেদানা আর আঙুর এনে হাজির!

'সিরাজি কই রে? কতকগুলো শুকনো বেদানা নিয়ে এলি যে!'

'হুজুর, খোদাবন্দ, জাঁহাপনা! সিরাজি আর পাওয়া যাবে না। দোকানে যে কটা ছিল, একা মস্থর— হুজুরের পেয়ারের গোলাম এই মস্থর—তা শেষ করেছে!'

ভারি রাগ হল, ধাঁ করে মস্তুরের নাকে এক ঘুঁষি বসিয়ে দিলুম। মস্তুরটা সিরাজি খেয়ে একেই টলছিল, ঘুঁষি খেতে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল। মেওয়ার ঝাঁকাটা রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে, আর দেখি তার ভেতর একটা সিরাজির বোতল। আমি সেটা কুড়িয়ে মস্তুরকে বললুম, 'মস্তুর, যেমন আমার সঙ্গে চালাকি তেমনি থাকো তুমি এইখানে পড়ে, আমি চললুম!' বলেই যেমন আকাশে উড়তে যাব আর মস্তুর ধরেছে আমার গুড়গুড়িটা চেপে, আর বলছে, 'হুজুর, আমি মস্তুর হুজুর, কসুর মাপ করুন হুজুর, আমি আপনার পুরোনো চাকর হুজুর, গুড়গুড়ি হুজুর, পায়ের জুতো হুজুর, গোলামের গোস্তাখি মাপ হোক হুজুর।'

গুড়িগুড়ি যায় দেখে মস্তুরকে সেবারের মতো সঙ্গে তুলে নিলুম। তখন আকাশের ওপর দিয়ে সতরঞ্চি হু-হু করে উড়ে চলেছে। দেখতে-দেখতে কাবুল ছাড়িয়ে কান্দাহারে পৌঁচেছে। মস্তুর বলছে, 'হুজুর, মেওয়াগুলো ফেলে আসা হল— অমন বেদানা!'

আমি অমনি কান্দাহারের একটা মেওয়ার বাগানে সতরঞ্চি নামিয়েছি; সেখানে মানুষের মাথার মতো এক-একটা বেদানা ফলে আছে। মস্তুর তো দেখেই অবাক।

'কেমন মস্তুর, এমন বেদানা কখনো দেখেচিস?'

'হুজুর, না!' —বলেই মস্তুর একটা বেদানা ভেঙেছে আর অমনি চারদিক থেকে কাবুলিওয়ালা মোটা লাঠি-হাতে তেড়ে এসেছে। আমি অমনি মস্তুরকে টেনে নিয়ে সোঁ করে আকাশে উঠেছি; মস্তুর তো রেগেই লাল। বলে, 'হুজুর, কেন পালিয়ে এলেন? কাবুলিদের আচ্ছা করে ঘা-কতক দিয়ে আসতুম!'

আমি মস্তুরকে সাবধান করে দিয়ে বললুম, 'মস্তুর, খবরদার আর এমন কাজ কোরো না। মস্তুর, ওরা যদি আজ তোমাকে ধরতে পারত তবে মমিয়াই করে ছেড়ে দিত, জানো। মমিয়াই দেখেছ মস্তুর?'

'হ্যাঁ হুজুর, হাকিমসাহেবের কাছে যে কালো মলম তাকেই তো বলে মমিয়াই!'

'হ্যাঁ, ঠিক তোমার মতনই কালো। মমিয়াই হয় কিসে জানো?—কালো মানুষের চর্বিতে।'

'সে কি হুজুর!'

'হ্যাঁ, শোনো তবে— কাফ্রিদের ছেলে কিম্বা যে-কোনো কালো ছেলে কিম্বা দুষ্টু যদি সুন্দর ছেলে হয় তাদের ওই কাবুলিওয়ালারা ভুলিয়ে-ভুলিয়ে ঝুলির ভেতর পুরে এনে একটা মেওয়ার বাগানে ছেড়ে দেয়! সেখানে মনের আনন্দে ছেলেগুলো বেদানা কিসমিস খোবানি আঙুর খেয়ে বেড়ায় আর মোটা হতে থাকে; শেষে মোটা হতে-হতে তাদের গা থেকে চর্বি গড়াতে থাকে, তখন সেই কাবুলিওয়ালাদের হাকিম একটা আগুনের কুণ্ডুর ওপর গরম-জল চাপিয়ে সেই মোটা ছেলেগুলোর পায়ে দড়ি বেঁধে মুরগির মতো নিচে মুখ ওপরে পা করে ঝুলিয়ে রাখে; আগুনের তাতে তাদের সেই চর্বি গলে টপটপ করে সেই কড়ায় পড়তে থাকে। যতক্ষণ একফোঁটা চর্বি থাকবে ততক্ষণ কিছুতে তাদের ছেড়ে দেবে না—তাতে তারা মরুক আর বাঁচুক। এমনি করে মমিয়াই তৈরি হয় মস্তুর। তোমার মতো মিশকালো ওরা কটা পায়? ধরতে পারলে আজ আর তোমার রক্ষা ছিল না; নিশ্চয়ই মমিয়াই করে ছেড়ে দিত।' ভয়ে দেখলুম মস্তুরের ঠোঁট শাদা হয়ে গেছে, ঘুরে পড়ে আর-কি! আমি তাকে একটু সিরাজি খাইয়ে ঠাণ্ডা করলুম।

বলতে-বলতে পেশোয়ারে এসে পড়েছি। সেখানে সন্ধে হয়েছে কিন্তু কাবুলিওয়ালার ভিড় দেখে মস্তুর কিছুতে সেখানে রাত কাটাতে চাইলে না। আমি কত বোঝালুম যে এখানে ইংরেজের রাজ্য—কাবুলিদের কিছু উৎপাত করার জো নেই, কিন্তু মস্তুর কিছুতে বুঝলে না। কাজেই আরো এগিয়ে উড়ে চলতে হল; একেবারে দিল্লির কুতুবমিনারে এসে সতরঞ্চি নামালুম। মস্তুরটা এমনি ভয় পেয়েছে যে দিল্লির চাঁদনিচকে গিয়ে দুটো দিল্লির লাড্ডু কিনে আনতেও তার সাহস হল না। কী করি, আমরা কুতুবমিনারের চুড়োয় সতরঞ্চি বিছিয়ে শুয়ে পড়লুম। চাঁদ না উঠলে অন্ধকারে আর ওড়া যাবে না।

রাত নটার সময় চাঁদ উঠল। অত বড়ো চাঁদ— এমন পরিষ্কার চাঁদ হিন্দুস্থান ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। এই চাঁদনিতে দিল্লির চাঁদনিচক আলো হয়ে গেছে; রাস্তায় সব লোক বেরিয়ে হাওয়া খাচ্ছে, গান-বাজনা করছে। মসুর দেখি দিল্লির জুম্মা-মসজিদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

'দেখছ কি মস্থর?'

'হুজুর, এমন মসজিদ কোথাও দেখিনি।'

'তবু মস্থর, ওর আধখানা রেল-কোম্পানি ভেঙে উড়িয়ে দিয়েছে!'

'ওটা কী হুজুর?'

'ওটা শাজাহান বাদশার কেল্লা। ওখানে একটা দরবার-ঘর আছে, সে দেখলে চোখ ঠিকরে যেত— এত হীরে-মানিক দিয়ে সেটা সাজানো ছিল। সেইখানে ময়ূর-সিংহাসনে বাদশারা বসে দরবার করতেন।'

'ছিল বলছেন কেন হুজুর? এখন কি সে-সব নেই?'

'না মস্থর, শুনেছি ময়ূর-সিংহাসন নাদির শা কেড়ে নিয়ে কাবুলে চলে গেছে, আর দেয়ালে যে-সব হীরে-পান্না ছিল তা মোগল-বাদশারা বাড়ি ছাড়বার পর কাঁচ হয়ে গেছে। আসল কথাটা কী জানো মস্থর, ও দেয়ালে কাঁচই লাগানো ছিল কিন্তু মোগল বাদশার ভয়ে লোকে বলত সেগুলো হীরে-মানিক! নইলে অত টাকা গরিব হিন্দুস্থানের বাদশা শাজাহান কী করে পাবে? এ কি বোগদাদের বাদশা হারুন-অল-রসিদ যে ঘরখানা হীরে দিয়ে মুড়ে ফেললে? আমি বেশ জানি মস্থর, বুড়ো শাজাহান এক তাজমহল আর ময়ূর-সিংহাসন তৈরি করতে সব টাকা, যা-কিছু তার বাপ-দাদা জমিয়ে গিয়েছিল, ফুঁকে দেয়। সেই রাগে তার ছেলে ঔরঙ্গজেব তাকে কয়েদ করে সিংহাসন কেড়ে নেয়— এ আমার উজির জামায়ের নিজের মুখে শোনা, নিজের কানে শোনা, জানো মস্থর—'

মস্থর দেখি ঘুমিয়ে পড়েছে; আমার কিন্তু ঘুম আসছে না,

দিল্লির হাওয়া বড়ো গরম লাগছে। আমি আস্তে-আস্তে কুতুব-মিনারের ওপর থেকে নেমে বাদশাদের একটা তহ্‌খানার ভেতরে গিয়ে ঢুকেছি। মাটির নিচে তহ্‌খানা, তার চারদিকে জলের ফোয়ারা। এখন আর ফোয়ারার জল উঠছে না, কিন্তু তবু ঘরখানি বেশ ঠাণ্ডা।

খানিক বসে থাকতে-থাকতে শুনছি ঢং-ঢং করে রাত বারোটা বাজল। অমনি দেখি সব ফোয়ারাগুলো খুলে গেছে— আর ফরফর করে গোলাপজলের ছিটে আমার গায়ে পড়ছে। তহ্‌খানার মাঝখানে একটা মখমলের বিছানা ছিল, আমি তারি ওপর শুয়ে একটু চোখ বুজেছি আর দেখি বুড়ো ঔরঙ্গজেব একটা লাঠি ধরে ঠকঠক করে এসে হাজির! এসেই আমাকে লাঠির খোঁচা দিয়ে বলছে, 'কৌন্ হ্যায় রে?' আমিও অমনি তার মুখের ওপর শুনিয়ে দিয়েছি, 'তুম্ কৌন্ হ্যায় রে?'

'হাম্ হিন্দুস্তানকি মালিক ঔরঙ্গজেব বাদশা হ্যায়!'

'ম্যায়নে তুর্কিস্তানকে পাশা হারুন-অল-রসিদ নবাব খাঞ্জা খাঁ খাঁজাহান-ই-জাহান্দার শা বাদশা বোগদাদি হুঁ!'

'আও লড়েঙ্গে!'

'আও লাড়ো!'

বলেই আমরা দুজনে তাল ঠুকতে-ঠুকতে পাঞ্জা কষতে-কষতে একেবারে কুতুবমিনারের ওপরে এসে হাজির। সেখানে এসে বুড়ো ঔরঙ্গজেবটা আমাকে এমনি জাপটে ধরেছে যে ফেলে আর-কি ঠেলে ওপর থেকে নিচে! এমন সময় মন্সুর ছুটে এসে মেরেছে তার মাথায় এক কিল। যেমন কিল মারা অমনি তার পাগড়িটা পড়েছে ঠিকরে লাহোরের কেল্লায়। সেখানে রণজিৎ সিং খাটিয়া পেতে ছাতে ঘুমুচ্ছিল; পাগড়িটা পড়বি তো পড় একেবারে তার মুখের ওপরে, আর পাগড়ির কোহিনুর হীরেটা গেছে তার একটা চোখে বিঁধে!

এদিকে ঔরঙ্গজেবটা তার খালি মাথায় হাত বুলুচ্ছে, ওদিকে রণজিৎ সিং একগাল হাসতে-হাসতে কোহিনুর হীরেটার দিকে

একচোখে চেয়ে আছে, আর আমরা সতরঞ্চি চালিয়ে একেবারে আগ্রায় এসে হাজির হয়েছি। দেখি তাজবিবির কবরটার চারদিকে বুড়ো শাজাহানটা কেঁদে-কেঁদে ঘুরে বেড়াচ্ছে! সেখান থেকে সোজা ফতেপুর শিক্রির দিকে সতরঞ্চি চালিয়ে দিলুম। আমার ছেলেবেলার বন্ধু আকবর সেখানে পঞ্চ্‌মহলের ওপরে বসে চতুরং খেলায় মত্ত ছিল। আমাকে দেখে ভারি খুশি। 'এসো ভাই বোগদাদি!' বলে আমায় পাশে বসালে। তার সঙ্গে এক পাঠশালায় পড়া, তাই সে আমাকে বলে বোগদাদি, আমি বলি তাকে আগারওয়ালা। অনেকদিনের পর দুজনের দেখা। দেখি আকবর কেমন বুড়িয়ে গেছে। চুল সব শাদা হয়ে গেছে। গোঁফ-দাড়ি সব ফেলে দিয়ে লোকটা কেমন যেন কাটখোট্টা-রকমের দেখতে হয়ে গেছে। তার আর সে চেহারা নেই।

দুজনে অনেকক্ষণ ছেলেবেলার গল্প করে আমি বললুম, 'তবে এখন আসি ভাই, অনেক দূর যেতে হবে।'

'আঃ বোসো না। মসুর কিছু খেয়ে নিক। ওরে, মসুরকে ভালো করে খাইয়ে-দাইয়ে নিয়ে আয়। আর ভাই, বুড়ো-বয়েসে মনের সুখ নেই। বড়ো ছেলে জাহাঙ্গিরটা হয়েছে বেজায় মাতাল, কাজকর্ম কিছুই দেখে না, সেই এলাহাবাদের কেল্লায় বসে কেবল টাকা ওড়াচ্ছে। ভেবেছিলুম নাতি শাজাহানটা একটা মানুষের মতো মানুষ হয়ে বংশের নাম রাখবে, কিন্তু ভাই আমার কপালের দোষে নাতবৌ ম'রে ইস্তক স্ত্রীর শোকে সেও গেল পাগল হয়ে। ঔরঙ্গজেবটা এদিকে চালাকচতুর, কিন্তু হিঁদুদের ওপর তার বিষদৃষ্টি। হিঁদু প্রজা নিয়েই আমার কারবার, অথচ তাদেরই সে চটাতে চায়। এমন কল্লে কি রাজত্ব থাকে দাদা? আমি সেই ষোলো বছর থেকে আজ পর্যন্ত যা-কিছু জমিজমা টাকাকড়ি করেছি সব আমার কটা নাতি-পুতি মিলে বরবাদ কল্লে দেখছি। কী যে করব ভেবে পাইনে। এখন ভালোয়-ভালোয় মানে-মানে মরতে পারলে বাঁচি ভাই বোগদাদি।'

আমি বললেম, 'দেখ জাহাঙ্গির যতই মাতাল হোক, ও তোমার রাজ্য একরকম চালিয়ে নেবে; শাজাহানও যতই পাগলামি করুক কিন্তু দেখো একদিন তোমার নাম রাখবে; ছেলেটি বেশ ধীর, শান্ত, বুদ্ধিমান। কিন্তু ওই যে তোমার শাজাহানের ছেলে ঔরঙ্গজেবটি, ওটি ভাই, তোমার গোলাপবাগে কাঁটাগাছ। ও তোমার ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে ছাড়বে। আমার সঙ্গে পথে আসতে তার দেখা হয়েছিল, একেবারে গোঁয়ার। আমি বেশ করে তাকে শিক্ষা দিয়ে এসেছি।'

'বেশ করেছ ভাই বোগদাদি! তুমি শিক্ষা না দিলে আর দেবে কে! দেখ, তুমি তো এলাহাবাদ হয়ে যাবে, পার তো জাহাঙ্গিরটাকে একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মদ খাওয়াটা ছেড়ে যাতে সে এখানে এসে একটু কাজকর্ম ছাখে সেইটে করো ভাই।'

'আচ্ছা তাই হবে।' বলে মন্সুরকে নিয়ে আবার সতরঞ্চি উড়িয়ে চললুম, যমুনার কিনারা দিয়ে। যাবার আগে আগারওয়ালা ছেলেদের জন্যে একরাশ পাথরের খেলনা সতরঞ্চিতে তুলে দিলে।

তখন রাত প্রায় তুটো। এলাহাবাদে পেঁাচেছি। ভেবেছিলুম জাহাঙ্গির ওরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু গঙ্গা-যমুনার ওপরে নৌকোর পুলের কাছে এসে দেখি কেল্লাটা একেবারে আলোয় আলোময়; এক ক্রোশ থেকে মদের গন্ধ, গানবাজনার আওয়াজ, আর আতর-গোলাপের খোসবো পাওয়া যাচ্ছে। কেল্লায় একটা জলসা দেখে আমাকেও একটু সেজেগুজে ফিটফাট হয়ে নিতে হল। তারপর একেবারে গিয়ে জাহাঙ্গিরের খাস মজলিসে হাজির।

জাহাঙ্গির আমাকে দেখেই থতমত খেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরে একেবারে নুরজাহানের কাছে নিয়ে বললে, 'অনেক পথ এসেছেন, এইখানে বিশ্রাম করুন; আমার বন্ধুবান্ধবদের বিদায় করে আমি এলেম বলে!'—বলেই জাহাঙ্গির সরে পড়ল।

আমি নুরজাহানকে বললেম, 'দেখ, আমায় এখুনি আবার রওনা হতে হবে, জাহাঙ্গিরের সঙ্গে আজ রাতে আর দেখা হবার সম্ভাবনা

নেই, কালও হয় কিনা সন্দেহ। তোমায় একটি কথা বলে যাই— জাহাঙ্গিরকে একটু সাবধান হয়ে সমঝে চলতে বোলো, নইলে তোমার শ্বশুর তাকে ত্যাজ্যপুত্তুর করবেন বলেছেন। তোমার শ্বশুর আমাকে এই পাথরের খেলনাগুলো দিয়েছেন; এগুলো তুমি নিয়ে খেলা কোরো, আমি এ-সব নিয়ে কী করব? এখন তবে আসি।'— বলে আমি আবার সতরঞ্চি চালিয়ে দিলুম।

মস্থুরটাকে আমি গাধা বলি, কিন্তু সে একেবারে নিবুর্দ্ধি নয়। এরই মধ্যে সে জাহাঙ্গিরের ভিস্তিখানা থেকে পোয়াটাক খাস অম্বুরী তামাক জোগাড় করেছে। মস্থুরটাকে বাহাদুরি দিতে হবে। কিসে আমার কষ্ট না হয় সেদিকে তার খুব নজর আছে।

ভোর নাগাদ একটু চোখ বুজেছি কি না অমনি মস্থুর 'হুজুর, দেখুন! দেখুন!' বলে ঠেলে তুলেছে। দেখছি ডানা উঠলে পিঁপড়েগুলো যেমন মাটি ছেড়ে ঘুরে-ঘুরে আকাশের দিকে ওঠে, তেমনি দলে-দলে ষাঁড় হু-হু করে উত্তর দিকে উড়ে চলেছে, আর দক্ষিণ দিকে কেবল গাধা টঙ্গস-টঙ্গস করে লাফাতে-লাফাতে চলেছে।

এ কী আশ্চর্য ব্যাপার! এত গোরু, এত গাধা আসে কোথা থেকে? দূরবীনটা চোখে লাগিয়ে দেখছি একটা নদী আধখানা চাঁদের মতো বেঁকে চলেছে তারই দুই পারে দুই শহর; একটা শহরে কেবল হিঁদুদের মঠ আর মন্দির, পূজারি পাণ্ডা গুণ্ডা আর সন্ন্যাসীর আড্ডা, আর-একদিকে কেবল যত মোটা-মোটা লক্ষপতি ক্রোড়পতি— তাদের বড়ো বড়ো মোটা-মোটা থাম-দেওয়া বাড়ি আর যত টিকিধারী সভাপণ্ডিতের বাসা! এই দুই শহরের মাঝে দুটো বড়ো-বড়ো চিতা জ্বালানো রয়েছে, আর শহরের যত লোক দিনরাত কাঠের বোঝা, তেলের কুপো এনে সেই চিতায় ঢালছে। যেমন এক-একবার আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠছে আর অমনি লোকগুলো তাতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর অমনি একদল গোরু হয়ে বেরোচ্ছে, আর অন্য দল গাধা হয়ে দৌড় দিচ্ছে!

এমন সময় দেখি দুপার থেকে দুটো হিঁদুদের বুজরুগ আমাদের হাত নেড়ে ডাকাডাকি করছে— 'গোলোকে যাবে গো? গন্ধর্বলোকে যাবে গো?'

জাফরের মুখে শুনেছিলুম এরা নতুন মানুষ পেলেই ভেড়া বানিয়ে দেয়। আমি আর তাদের দিকে না দেখে বোঁ-করে সতরঞ্চি চালিয়ে দিয়েছি! একেবারে গঙ্গা-পার হাবড়ার পুল কলকেত্তা হাজির! মস্থুরটা তো আজব শহর কলকেত্তা দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, কিন্তু আমি মস্থুরকে বললুম, 'এখানে বুজরুগি বড়ো কম চলে না— মানুষ ধরে এরা পাঁঠা করে রাখে, আর সময়মতো সেগুলোকে বলি দিয়ে বাজারে তাদের মাংস বিক্রি করে, নিজেরাও পাঁঠার ঝোল রেঁধে খায়।' বলতে-বলতে দেখি দলে-দলে ছেলে-বুড়ো যত বাঙালি —কেউ কানে কলম গুঁজে, কেউ কেতাব বগলে —'ওই দেখা যায় বরানগর, সামনে কাশীপুর, কলকাতা কদ্দূর।' —বলতে-বলতে ছুটে এসে এক-একটা বড়ো-বড়ো কেতাবখানা দপ্তরখানায় গিয়ে ঢুকছে বেশ মনের ফুর্তিতে, কিন্তু বেরিয়ে আসছে দেখি এক-একটা বোকা ছাগল!

'মস্থুর, জানো একে বলে কামরূপ কামিখ্যের ভেল্কিবাজি। আর এই শহরে বাঙলার যত বড়ো-বড়ো বুজরুগের আসল আড্ডা। ওই দেখো গড়ের মাঠে একটা জাদুঘর, আর ওই আলিপুরে একটা চিড়িয়াখানা, আর ওই পুবদিকে দিঘির ধারে একটা গোলামখানা। আলিপুরে মানুষ-পাঁঠা জিয়োনো থাকে, ওই গোলামখানায় তাদের পোষ মানায়, আর মরবার পরে ওই জাদুঘরে তাদের হাড়গুলো আর ছালগুলো জমা রাখে। এখানে পা দিয়েছ কি বোকা বনেছ!'— বলেই আমি একদণ্ড আর সেখানে না থেকে একেবারে কালাপানির দিকে সতরঞ্চি চালিয়ে দিলুম।

আকাশের ওপর দিয়ে পাখির মতো শোঁ-শোঁ উড়ে চলেছি, দেখি বাঙলাদেশের বুজরুগ তাদের দূরবীনগুলো উঠিয়ে আমাদের দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে।

'কাজটা ভালো হল না, মস্তুর! সবাই আমাদের দেখে ফেললে, এতক্ষণে কালাপানিতে টেলিগ্রাম গেছে যে আমরা ওই মুখেই চলেছি। সেখানে গেলেই পুলিশ লাগবে পিছনে, তখন সিন্ধবাদি হীরেটাই দখল করা শক্ত হবে। মস্তুর এসো, এইখানেই নেমে পড়া যাক। এইখান থেকে বেশ বদলে, রেলে করে উড়েদের সেই মন্দির পর্যন্ত যাওয়াই ভালো।'

বলে আমরা রূপনারায়ণ নদীর ধারে নেমে তল্পিতল্পা বেঁধে হেঁটে গিয়ে রেলে চড়লুম। আমি হলুম হীরানন্দ বাবাজি আর মস্তুর হল কিচ্‌কিন্দা— আমার উড়ে চেলা। গাড়িতে দেখি কেবল মাড়োয়ারি, মাদ্রাজি আর বাঙালি। বাবাজি দেখে তারা আমাকে আদর করে বসালে, কত কথা পুছতে লাগল। জবাব দিতে পারিনে; কাজেই আমি সাজলুম বোবা আর মস্তুর হল কালা। আর কোনো গোল রইল না।

ছ-মাস পুরীতে আছি, রোজ মন্দিরের চারদিকে ঘুরে বেড়াই, কিন্তু চুড়োর ওপর কোথায় যে সিন্ধবাদের সিন্দুকটা গিয়ে আটকে আছে তার সন্ধান পাইনে। শেষে একদিন একটা ফন্দি মাথায় এল। মস্তুরকে বললুম, 'দেখ্ মস্তুর, প্রায়ই দেখি এক-একটা লোক ওই মন্দিরের চুড়োয় নিশেন বাঁধতে ওঠে, তুই ওদের দলে ভিড়ে যদি একদিন মন্দিরের চুড়োয় গিয়ে বেশ করে সিন্দুকটা কোথায় আছে দেখতে পারিস তবে তোকে একখানা হীরে বকশিশ দেব।'

মস্তুর প্রথমে কিছুতেই রাজি হয় না, বলে, 'পড়ে মরব কত্তা!' কিন্তু শেষে দেখি একদিন গেছে! বেশ করে চুড়োটা দেখে মস্তুর এসে বলছে, 'কত্তা! সিন্দুক এখেনে নেই। ওই চুড়োর ওপর থেকে বিশ-ক্রোশ তফাতে আর-একটা মন্দির দেখা যায়, সেইখানে আমি পষ্ট দেখলুম সিন্দুকটা যেন পাথরের গায়ে ঝুলচে। কিন্তু অনেক দূরে কত্তা! এইখান থেকে বালির ওপর দিয়ে ঠিক সোজা একেবারে পুব-মুখো যেতে হবে কত্তা।'

মস্তুরের কথাই ঠিক। আজ ছ-মাস দেখছি এই কালাপানি দিয়ে কত জাহাজ এল, গেল; কিন্তু একটি পেরেকও দেখলুম না যে

এই মন্দিরে এসে লাগল। সেইদিনই রাত্তিরে সতরঞ্চি উড়িয়ে একেবারে মস্তুরের সেই মন্দিরে হাজির। গিয়ে দেখি মন্দিরের সব আছে কেবল চুড়োটি নেই।

'যাঃ! সর্বনাশ হয়েছে মস্তুর! সিন্দুক সরিয়ে ফেলেছে মস্তুর! এত কষ্ট করে আসা সব বৃথা হল মস্তুর!' বলেই আমি অজ্ঞান।

'কত্তাগো, কী হল!' বলেই মস্তুরও অচৈতন্য।

যখন আবার চোখ খুলেছি দেখি একটা ছোটো ঘরে কে আমাদের বন্ধ করে গেছে— একটি পিদিম আর এক ঘড়া জল দিয়ে। দেখি পিদিমের কাছে একটা বাক্স রয়েছে। বাক্সটা লোহার, আর তার ওপরে পেতল দিয়ে লেখা রয়েছে— 'সিন্ধবাদ'। তাড়াতাড়ি বাক্সটা টেনে নিয়ে খুলতে যাব, দেখি পকেটে চাবিটা ছিল সেটা কে চুরি করেছে!

'মস্তুর, চাবি নিলে কে? নিশ্চয় তোর কাজ!'

'না কত্তা, চাবি তো আমি নিইনি।'

'মিথ্যেবাদী, পাজি!'— বলেই সেই লোহার বাক্সটা ছুঁড়ে মেরেছি। যেমন মারা আর অমনি মস্তুর —'বাপরে!' বলে ঘুরে পড়া; আর বাক্সটা খটাং করে খুলে একটা এক-বেগ্‌দা মানুষ বেরিয়ে এসে আমার সুমুখে দাঁড়াল।

এ কী, সিন্ধবাদ যে! হাতে তার সেই চাবিকাঠিটি। সিন্ধবাদ সামনে এসেই বলছে, 'কী হারুন-অল-রসিদ! —হীরানন্দ বাবাজি! সিন্ধবাদের হীরে পেলে কি? চাবিটা তো তার পেট থেকে খুঁজে বার করলে! এখন হীরেগুলোও বার করো।'

'আমার সঙ্গে তামাশা!' —বলেই যেমন সিন্ধবাদকে ধরতে গেছি আর সে একেবারে চম্পট! যেন নিভে গেল!

আমার বড়ো ভয় হল; এত বুজরুগি কাটিয়ে এসে শেষে কি উড়ে বুজরুগের পাল্লায় পড়লুম!

'মস্তুর! কথা কোসনে যে মো-স্তু-উ-র?'

মাথার ওপরে চামচিকে কিচ্‌কিচ্‌ করে বলছে, 'মঁস্তুঁর কি আর আঁছে সেঁ কালো কিঁচকিন্দে মঁরে ভূঁত হয়ে গেঁছে, এই অঁন্ধকারে

তোমাকেও ভূত হয়ে থাকতে হবে। হিঁঃ-হিঁঃ-হিঁঃ।'— বলেই চিকচিক করে আমার চারদিকে অন্ধকারে উড়ে বেড়াতে লাগল!

মসুরটা হঠাৎ মরে গিয়ে আমায় ভারি বিপদে ফেলে গেল! তার মতন এমন নেমকহারাম চাকর আমি দেখিনি!

রাগে দুঃখে আমি গোঁ হয়ে বসে আছি; চামচিকেটা ঘুরতে-ঘুরতে যেমন আমার হাতের কাছে এসেছে আর অমনি আমি খপ করে তাকে ধরে ফেলেছি। ধরেই দেখি সেটা সেই এক-বেগ্‌দা সিন্ধবাদ!

'তবে রে পাজি! এখন তোকে কে রাখে! বল্‌ কোথায় হীরেগুলো রেখেছিস? নইলে তোকে ওই সিন্ধুকে বন্ধ করে কালাপানির জলে ফেলে দেব!' বলেই আমি তার হাত থেকে বাক্সের চাবিটা কেড়ে নিলুম।

তখন সিন্ধবাদ আর কী করেন? চুপি-চুপি আমাকে যেখানে তার হীরে-জহরতগুলো পোঁতা আছে সেই জায়গাটার নাম বলে দিল।

'জায়গাটা কোথায় জানো?'

'চামচিকেটা যদি আমায় আগে সেটা বলত তবে আমাকে এত কষ্ট পেতে হত না। জায়গাটা হচ্ছে ওই— সে কি-বলে-কি— সেই যেখানে জগন্নাথের যত যাত্রী ঘুরপাক দেয়!'

'অক্ষয় বট?'

'আরে না বাবু, গাছটাছ সেখানে কোথা!'

'তবে দোলমঞ্চ হবে।'

'সেখানে তো দুলতে হয়। ঘুরতে হয় কোথায়?'

'তবে "চানবেদী"!'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওরই কাছাকাছি, ঠিক মনে হচ্ছে না এখন, খানিক বাদে মনে হবে।'— বলেই হারুন্দে চুরুট ফুঁকতে লাগল!

খানিক পরে জিজ্ঞাসা করি, 'হারুন্দে, নামটা মনে পড়ল কি? আমার যে ভারি শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে কোথায় হীরেগুলো লুকোনো আছে।'

কথা নেই!

'বলি ও হারুন্দে, মনে পড়ল কি?'

'একটু-একটু পড়ছে।'

'বলে ফেলো।'

'রোসো বলছি—"ল" না-না, "র" আর "ন"; "র" হল না তো! "র" আর "ন"র মাঝে কী হয় বাবু?'

'কী হয় হারুন্দে?'

'মনে পড়ছে না। মস্তুর, "র" আর "ন"র মাঝে কী হয়? ওহো তুই কেমন করে জানবি? তোকে তো আমি সেই লোহার বাক্সতে পুরে জলে ভাসিয়ে দিলুম। "র' আর "ন" তার মাঝে হল—'

'তোমার মাথা আর মুণ্ডু! শোনো কেন বাবু, ও পাগলের কথা। ও চিরকালই হারুন্দে, কোনো কালে হারুন-অল্‌-রসিদ নয়। ওর বাপ ওকে লেখাপড়া শেখাতে কলকাতায় পাঠিয়েছিল। সেখানে পৃথিবীর ইতিহাস, পারস্য উপন্যাস আর ডিটেক্‌টিভ গল্প পড়ে-পড়ে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কখনো এক টুকরো ইতিহাস, কখনো উপন্যাস, দু ছত্তর বা কবিতা, দুটো বা সত্যি কথা, দশটা বা মিছে কথা। কখনো হাততালি দিচ্ছে, কখনো গালাগালি। মাথাটা যেন বাংলা খবরের কাগজ— মূল্য দুই পয়সা মাত্র! আমি কিচ্‌কিন্দে এই কিচ্‌কিন্দায় থেকে বুড়ো হয়ে গেলুম, সিন্ধবাদকে তো কখনো এ তল্লাটে দেখিনি। একটা কথা বললেই হল— সিন্ধবাদ এল, চুম্বকে তার সিন্দুক টেনে নিলে! জাহাজ টেনে নেয় এত বড়ো চুম্বক-পাথর— সে পাথর গেল কোথায়?'

হারুন্দের কথা নেই।

'দেখলে বাবু, গল্পের খেই ধরতে জানে না, গল্প বলতে আসে। ও তো সেদিনের ছেলে। গল্পের ও জানে কী? বোগদাদ-ফোগদাদ তো সেদিনের কথা; সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি— এই চার যুগের গল্প আমি জানি। গল্প শুনতে চাও তো শোনো—'

কিচ্‌কিন্দের গল্প

সত্যযুগের মানুষ যজ্ঞডুমুরের গাছের সমান লম্বা ছিল, ত্রেতাযুগে লঙ্কা গাছ, দ্বাপরে ভাণ্ডীর, আর কলিতে লজ্জাবতী। এরপর মানুষ ক্রমে এত ছোটো হয়ে যাবে যে শেষে আঁকশি দিয়ে তবে তাদের বিলিতি-বেগুনের গাছ থেকে বেগুন পাড়তে হবে।

সেই ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র অবতীর্ণ হলেন— রাক্ষস-বংশ ধ্বংস করতে অর্থাৎ যেখানে বাঁশবন ছিল সেখানে লঙ্কাচারা আর বোম্বাই-আম বসাতে; যাতে মানুষ বোশেখ-জোষ্টি মাসে আমকাসুন্দি, ঝালকাসুন্দি খেয়ে বাঁচতে পারে। বিশ্বাস না হয়, কাসুন্দে আর ঝালুন্দেকে প্রশ্ন করো।

এখন রামচন্দ্র জন্মালেন, কিন্তু লঙ্কার ধোঁয়া দিয়ে রাক্ষস তাড়ানো তো তাঁর কম্ম নয়। এক-লম্ফে সমুদ্রই পার হয় কে? কাজেই হনুমান এই কিষ্কিন্ধ্যায়— ওই যে মনসাতলার ঘাটে কাঁটাবন ওইখানে— জন্ম নিলেন। এদিকে হনুমানও জন্মেচেন আর ওদিকে রথে চড়ে সুয্যিমামা দেখা দিয়েছেন। মামার মুখটি যেন পাকা আমের মতো। দেখেই হনুমানের লোভ হয়েছে, এক লাফে মামার কোলে ঝাঁপিয়ে উঠেছেন। মামা— 'হনু! হনু!'— বলে আদর করে যেমন ভাগ্নেকে চুমু খেতে গেছেন আর হনু দিয়েছেন মামার গালে এক কামড়!— 'ওরে গেলুম, গেলুম! ছাড়, ছাড়!' —আর ছাড়!

এমন সময় ইন্দ্রদ্যুম্ন যাচ্ছিলেন আকাশ দিয়ে। মামা-ভাগ্নের ঝগড়া দেখে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন বজ্জর। যেমন বাজ পড়া আর হনু 'রাম! রাম!' করতে-করতে ঠিকরে গিয়ে পড়েছেন ওই রামচণ্ডীতলায়; আর সুয্যিমামা রথসুদ্ধ পড়েছেন ওই চন্দ্রভাগার কাছে কালিদয়ে বালির পাঁকে। মামার রথের চুড়োটা মচাৎ করে

ভেঙে পড়ল, ঘোড়া কটা কন্দকাটা হয়ে বালির পাঁকে আটকা পড়ে গেল— মায় সহিস কোচম্যান লোকলস্কর দাসী চাকর! যে যেখানে ছিল সবাই আড়ষ্ট যেন পাথর!

সুয্যিমামা কালিদয়ে দইকাদা মেখে গড়াতে-গড়াতে ডাঙায় গিয়ে উঠলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন তাড়াতাড়ি ঐরাবত-হাতি নিয়ে মামাকে তুলতে যেমন এসেছেন অমনি গেল ঐরাবতও দয়ে পড়ে। কী করেন? তখন হনুমানকে ডাকাডাকি। হনুমান এসে দু-বগলে দুজনকে নিয়ে তবে স্বর্গে পৌঁছে দেন। সেইদিন থেকে সুয্যিমামা আর রথে চড়ে বেড়াতে গেলেন না, পায়ে হেঁটেই আনাগোনা করেন। সিন্ধুঘোটকটা ভাগ্যি ছিল, তাই চড়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন হাওয়া খেয়ে বেড়ান।

একদিন ইন্দ্রদ্যুম্ন ঘোড়ায় চড়ে এই সমুদ্দুরের ধারে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় সিন্ধুঘোটকের একটা পা গেছে বালিতে বসে। আর ঘোড়া নড়ে না। ইন্দ্রদ্যুম্ন ঘোড়ার পা ধরে টানানানি করতে ঘোড়ার পা-টা গেল ছিঁড়ে। তিনি আর কী করেন, সেই খোঁড়া ঘোড়ায় ন্যাংচাতে-ন্যাংচাতে ছিষ্টিকত্তা ব্রহ্মার কাছে গিয়ে হাজির। গিয়েই ব্রহ্মাকে বলছেন, 'আমার আর-একটা ঐরাবত-হাতি আর উঁচু ঘোড়া না হলে চলছে না। দেবতাদের রাজা হয়ে শেষে কি পায়ে হেঁটে বেড়াব? আমার মান থাকে কেমন করে?'

ব্রহ্মা বললেন, 'আমি বারে-বারে তোমাদের জন্যে ছিষ্টি করতে পারিনে, যাও নারদের ঢেঁকিটা চেয়ে নিয়ে চড়ে বেড়াও। হাতিঘোড়া পেয়ে যে যত্ন করে রাখতে পারে না তার ঢেঁকি চড়ে বেড়ানোই ঠিক।'

ছিষ্টিকত্তার কাছে তাড়া খেয়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন নারদের কাছে হাজির। নারদ বুদ্ধি দিলেন: 'দেখ ইন্দ্রদ্যুম্ন, তুমি হলে রাজা, ঢেঁকি চড়া তোমার শোভা পাবে না, লোকে হাততালি দেবে, তার চেয়ে যাও তপস্যা করোগে, ছিষ্টিকত্তা খুশি হয়ে তোমাকে দুটো কেন দশটা হাতিঘোড়া ছিষ্টি করে দেবেন।'

ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার ছেলে, তপস্যার নাম শুনেই ভয়ে তাঁর মুখ শুকিয়ে

গেল। তখন নারদ বুদ্ধি দিলেন, 'যাও ইন্দ্রদ্যুম্ন! রামচন্দ্রের কাছে থেকে রাবণের পুষ্পক-রথটা চেয়ে নাও।'

ইন্দ্রদ্যুম্ন এসে রামচন্দ্রকে ধরে বসলেন। রাম বললেন, 'রাবণের রথ কেড়ে নেওয়া তো সহজ নয়, তোমরা যদি আমার সঙ্গে যাও তো হতে পারে। কিন্তু রাবণ যদি চিনতে পারে যে তোমরা দেবতা, তা হলে তোমার বিপদ।'

ইন্দ্রদ্যুম্ন বললেন, 'আজ্ঞে, আমরা বাঁদর সেজে রাবণের সঙ্গে লড়ব।'

রামচন্দ্র বললেন, 'তথাস্তু।'

তারপর রাম-রাবণের যুদ্ধ। হনুমান হলেন যত বাঁদরমুখো দেবতাদের সেনাপতি; আর আমি কিচ্‌কিন্দে হলুম— কিচ্‌কিন্দের দলে যত উড়ে, তাদের সেনাপতি। এই দুই দল নর-বানর— এদেরই কিত্তি কিত্তিবাসি রামায়ণে লেখা আছে। সে তো তুমিও জানো?

তারপর বলি শোনো— রাবণের কাছ থেকে পুষ্পক-রথ তো কেড়ে নিয়ে রামচন্দ্র অযোধ্যায় এসেছেন, ইন্দ্রদ্যুম্ন রথটি নিয়ে যান আর-কি, এমন সময় সুয্যিমামা এসে বলছেন, 'বাপু রাম, ইন্দ্র বজ্জর ফেলে আমার রথটি গুঁড়ো করেচেন, এখন পুষ্পক-রথটি উনি নিলে আমি দু-বেলা আপিস করি কেমন করে! উনি রাজার ছেলে ঘরে বসে থাকলে চলে, কিন্তু সকাল-সন্ধে আমাকে যে এই সারা পৃথিবী ঘুরে আলো দিয়ে বেড়াতে হয়, আপিস-গাড়ি নইলে আমার চলবে কেন?'

হনুমান ছিলেন বসে রামের কাছে, তিনি অমনি বলচেন, 'ইন্দ্র আমাকেও বজ্জর মেরে দফারফা করেছিল আর-কি! কেবল রামনামের জোরে বেঁচে আছি!'

'কী, রামদাসকে মারা! ইন্দ্রদ্যুম্ন, যাও রথ তোমায় দেব না!' বলেই রাম সুয্যিমামাকে রথটা দিয়ে দিলেন।

ইন্দ্র মুখ-চুন-করে ফিরে যান দেখে রামচন্দ্রের দয়া হল, তিনি হনুমানকে ডেকে বললেন, 'হনু, তুমি ইন্দ্রদ্যুম্নকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে

যাও, সেখানে ইন্দ্রের সিন্ধুঘোটকের ছেঁড়া পা-খানি উদ্ধার করে গন্ধমাদন থেকে বিশল্যকরণীর পাতার আঠা দিয়ে ইন্দ্রদ্যুম্নের খোঁড়া ঘোড়া জোড়া দিয়ে দাওগে।'

তখন হনুমানকে নিয়ে সমুদ্দুরের ধারে ইন্দ্রদ্যুম্ন হাজির। সেখানে তখনো সিন্ধুঘোটকের ছেঁড়া পা-খানা বালির ওপরে লটপট করছিল— হনুমান সেই পা ধরে দিয়েছেন এক টান, আর অমনি বালির নিচ থেকে হড়হড় করে একটা মন্দির বেরিয়ে এল।

হনুমান তো ঘোড়ার পা-খানা ইন্দ্রদ্যুম্নের কাছে রেখে বিশল্যকরণীর পাতা আনতে যান, এদিকে ইন্দ্রদ্যুম্ন মাসির বাড়ি থেকে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রাকে এনে সেই মন্দিরে পুজো লাগিয়ে দিয়েচেন। হনুমান এসে দেখেন মন্দির দখল। তখন হনু রেগেই লাল! বলে, 'আমি বিশল্যকরণীর পাতা দেব না। আমার মন্দির, আমি রামচন্দ্রকে এখানে বসাব মনে ছিল। তুমি কেন জগন্নাথকে বসালে?'

বড়ো গোলযোগ দেখে ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মাকে আনতে ছুটলেন। ব্রহ্মা এসে বললেন, 'হনুমান, যিনি জগন্নাথ, তিনি রঘুনাথ। তুমি গোল কোরো না আমি সব ব্যবস্থা করছি।'

সেই দিন থেকে প্রতি বছর রামনবমীর দিন জগন্নাথের রঘুনাথ-বেশ করে পুজোর ব্যবস্থা হল।

ইন্দ্রদ্যুম্ন বললেন, 'ছিষ্টিকত্তা, আমার ঠাকুরের কী বেশ হবে তার ব্যবস্থা করুন।'

ব্রহ্মা ব্যবস্থা করলেন— পাবন্ধি-বেশ।

ইন্দ্রদ্যুম্ন তো ঘোড়ায় চড়ে স্বগ্‌গে যান আর হনুমান রাবণের মধুবন থেকে যে আমের আঁঠিটি সীতাদেবীর হাত থেকে পেয়েছিলেন, সেটিকে একটা বাগানে বসিয়ে দিলেন। দেখতে-দেখতে সেই বাগান এক আমবন হয়ে উঠল আর হনুমান সেই বনের ভেতরে দলবল নিয়ে মধুরেণ সমাপয়েৎ করে আরামে রইলেন।

এই তো গেল ত্রেতাযুগে— মানুষ যখন লঙ্কাগাছের মতো, তখনকার কথা। এখন সত্যিযুগের কথা বলতে বল তো বলি— কিন্তু

সেটা ভয়ানক সত্যি, গল্পের মজা তাতে নেই, যেন বাঙলার ইতিহাস পড়ার মতো সব ঠিক-ঠিক একেবারে ঠিক।

বলেই কিচ্‌কিন্দে সত্যিযুগের কথা আরম্ভ করেছে—

'সত্যে ব্রহ্মাঙ্ক কর যাত-অ-অ,
সত্য স্ব-রূ-প তু অনন্ত।
সত্যে তোহার আত্ম যাত-অ-অ
আত্মে জ-নি-লু তোর সত্য,
তোর সঙ্গিলা সেয়ল-অ-অ-অ
অসুর মারি সাধু পাল-অ-অ-অঃ
জগত তোর দেহুঁ যাত-অ-অ,
থিতি পালন করুঁ অন্ত।
তোহ মায়ারে মূরু-খ জন-অ-অ,
আত্মাকু দেখন্তি সে ভিন্ন।
পণ্ডিতে জানন্তি সে-এক-অ-অ,
মায়ারে দিশই অনেক
তু এ সংসারে দুঃখ সুখে-এ-এ
শরীর বহু নানা রূপে
সাধুকু দিশই নি-র-ম-ল-অ-অ
খল-লোচনে যম কাল-অ-অ-অঃ।'

'ও কিচ্‌কিন্দে, থাক্! তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলুম না। আর-কোনো কথা থাকে তো বলো।'

'সত্যিযুগের সব কথাগুলোই ওই রকম দাড়িওয়ালা মুনি-গোঁসাইগুলোর মতো গোম্‌সা-মুখো। আচ্ছা শোনো। দ্বাপরযুগে রাখাল-ছেলে ভাণ্ডীরগাছের তলায় দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে আর গোরু-বাছুর তার চারদিকে নেচে-নেচে গান গাইছে:

'কি সুন্দর মুরলী পা-নী রে সজনী।
তাঙ্কু কে দিব অন্তা আ-নি-রে-এ সজনী।

দিনে যমুনাকু মু যেবে গলি গাধোই
বাটরে দেখিলি মু প্রাণ মাধো-ই রে সজনী।
বাঙ্ক-বাঙ্ক করি মো তে দেলে অনাই
তরকী-তরকী মু অইলি প-লা-ই রে সজনী।
ধাঁই-ধাঁই সে যে মো ধইল লাঙ্গলে-এ
মু ভেঁই পড়িলি যাই যমুনা জলে-এ রে সজনী।'

বলেই কিচ্‌কিন্দে ফুঁ-ফুঁ করে একটা বাঁশি বাজাতে আরম্ভ করে দিলে।

'বলি ও কিচ্‌কিন্দে, গানের চেয়ে তোমার বাঁশিটি কিন্তু মিষ্টি।'

যেমন এই কথা বলা অমনি কিচ্‌কিন্দে বাঁশি রেখে বলে উঠেছে : "Thank you Baboo, I earnestly hope and trust that the noble example of this most enlightened and public spirited Kumar Krishna Kich Kinda of Orissa will be followed by all Maharajas, Rajas, Jamindars and other wealthy people—not only in India but throughout the length and breadth of Bengal, Behar & Orissa—for the amelioration of self and friends and all the poor gentlemen at large like হারুন্দে, কাসুন্দে, বাসুন্দে, ঝালুন্দে অ্যাণ্ড মালুন্দে।'

'ও কী বলচ কিচ্‌কিন্দে?'

'কলির কথা।— ধন্যবাদ তোমাকে বাবু, আমি ব্যগ্রভাবে ভরসা ও প্রত্যয় করিতেছি যে ওই কুলীন উদাহরণ এই আলোকসম্পন্ন সাধারণ ভূতবান উড়িষ্যার কুমার কৃষ্ণ কিচ্‌কিন্দার হইরে অনুগমিত সকল রাজা মহারাজা জমিদার ও যোত্রসম্পন্ন ব্যক্তিগণের দ্বারাই নিজের বন্ধুর এবং হারুন্দে ইত্যাদির মতো বেচারা গরিব এবং ছাড়া-পাওয়া ভদ্রগণের অপেক্ষাকৃত ভালো করিবার নিমিত্তে।'

'এ কথার তো কিছু মানে-মাথা নেই কিচ্‌কিন্দে।'

'আচ্ছা শোনো দেখি, এটার কিছু মানে পাও কিনা— বঙ্গ-বিদর্ভনগর লৌবর্ষ্ম সমিতি। এটা আরো শক্ত ? আচ্ছা দেখ দেখি এটা সহজ কিনা— পূর্ণপরব্রহ্মজ্যোতিস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মাতে পূর্ণরূপে নিষ্ঠাবিহীন জীব বাহিরে ভিন্ন-ভিন্ন নামরূপ দেখিয়া বহির্মুখী মনোবৃত্তির দ্বারা বাসনায় আবদ্ধ হইয়া সত্য হইতে বিমুখ হয় ও মিথ্যায় আসক্তি করতঃ কলির ব্রাহ্মণ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে—'

'এটা তো একেবারে সমস্কৃত, একটুও বোঝবার জো নেই।'

'তবেই তো বাবু, কলিকালের কথার নমুনা দেখেই ভড়কে গেলে। গল্পটা আগাগোড়া শোনা তোমার কম্ম নয়। ভাণ্ডীরবনে রাখাল-ছেলের বাঁশির গানটুকুই তোমার অদেষ্টে লেখা ছিল।'

বলেই আবার কিচ্‌কিন্দে বাঁশি বাজাতে লাগল :

মু ভেঁই পড়িলি যাই যমুনা জলে-এ রে সজনী।

বাঁশি শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছি। ইতিমধ্যে কখন যে পালকি সুদ্ধ কিচ্‌কিন্দে আমাকে সমুদ্দুরের জলে নামিয়ে নিয়ে গেছে তা জানিনে। ঝপাং করে যেমন এক ঢেউ এসে পালকিতে লেগেছে আর ঘুম ভেঙে গেছে।

'ও কিচ্‌কিন্দে, কোথায় নিয়ে চললে ? পিসির বাড়িতে চলো না— এদিকে কেন ?'

'বাবু, পিসির বাড়ি কি এখানে ? সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে যেতে হবে।'

'জাহাজ কই কিচ্‌কিন্দে ? পার হব কেমন করে ?'

'জাহাজ কী করবে বাবু ? জন্ম-জন্ম ধরে জাহাজ চালিয়ে গেলেও পিসির বাড়িতে যেতে পারবে না। জলের ওপর দিয়ে পিসির বাড়ি যাবার রাস্তা নেই, যেতে হবে জলের নিচে দিয়ে— ডুব-সাঁতার মেরে, সাত ঘাটের জল খেতে-খেতে। পিসির বাড়ি যাওয়া কি সহজ বাবু!'

'তাই তো কিচ্‌কিন্দে, ডুব-সাঁতার তো আমি জানিনে, কেমন করে তবে পিসির বাড়ি যাই!'

'পিসি তো তাই আমাদের পাঠিয়েছেন। ভয় কী? গট্ হয়ে পালকিতে বসে থাকো, এইখান থেকে এক ডুব মারব আর ঠেলে তুলব পালকি এক্কেবারে পিসির বাড়ি। কিন্তু ভ্যখো বাবু, রাস্তার মধ্যে অনেক আশ্চয্যি দেখতে পাবে, দেখো যেন ভয় খেয়ো না। প্রথমে আসবেন কালা-কানা-আংলা-টানা, তারপর আছেন গামলা-চালা ফোঁপরা-জালা, তার পরে ঘণ্টাকর্ণ রক্তশোষা মাথায়-ছাতা, তার পরে শাঁখচূর্ণি মুক্তোকলাই, তারপর আছেন শুঁড়-তুল্-তুল্ কাঁচুমাচু কল-কব্জা দাড়া-বাঁধা, আর রাঘববোয়াল পায়রা-চাঁদা।'

'কিচ্‌কিন্দে, এরা যদি আমায় ধরে?'

'কিছু ভয় নেই। আমরা আছি। ভয় পেলে আমায় ডেকো। বলেই —'হেয়ে রে রে দাদা রে' বলে পালকি-সুদ্ধু আমাকে নিয়ে তারা ডুব মেরেছে জলের ভেতর।

প্রথমটা অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাইনে। খানিক পরে দেখি ফুঁকো শিশির মতো ছোটো-ছোটো আলো জলের ভেতর দুধারে সারি-সারি ঝুলছে। এক-একবার জলের তোড়ে আলোগুলো হুড়হুড় করে গড়িয়ে ডাঙার দিকে যাচ্ছে আবার গড়গড় করে গড়িয়ে যেখানে ছিল সেখানে ফিরে আসছে। এমন সময় দেখি, এক কড়া তেল জলের ওপর যেমন ভাসতে-ভাসতে চলে তেমনি কী-একটা আমাদের দিকে পিছলে-পিছলে আসছে! অমনি কিচ্‌কিন্দে ডেকেছে, 'সামাল! সামাল! বাঁয়ে ধর ভাই!'

সাঁ করে আমরা বাঁ-দিকে একটা ডোবার ভিতর নেমে গেছি। সেখান থেকে দেখি— তেলটা ভাসতে-ভাসতে আমাদের ঠিক মাথার ওপরে এসে চারদিকে চারটে লম্বা-লম্বা আঙুল বার করে জল খুঁটতে লাগল। তারপর আবার আস্তে-আস্তে আঙুল-কটা গুটিয়ে নিয়ে একদিকে ভেসে চলে গেল।

কিচ্‌কিন্দে বললে, 'দেখলে বাবু, উনিই হচ্ছেন কালা-কানা-আংলা-টানা। ওঁর না আছে মাথা মুখ, না আছে কান, না আছে চোখ; থাকবার মধ্যে আছে কেবল এক আঙুল আর একরাশ

তেল-চুকচুকে পেট। আঙুলটি গিয়ে কারো গায়ে ঠেকেছে কি আর অমনি সমস্ত পেটটি তেলের মতো গড়িয়ে গিয়ে তার ওপর পড়েছে —যেমন পড়া আর অমনি হজম করে ফেলা! জানোয়ার যদি ওঁর চেয়ে তিন-চার ডবল বড়ো হয় তবে ওই পেটটিও সঙ্গে-সঙ্গে বেড়ে তেলের মতো ছড়িয়ে গিয়ে জানোয়ারটিকে বেশ করে ঘিরে নেয়!'

'ছুরি দিয়ে পেটটা চিরে দেওয়া যায় না কিচ্‌কিন্দে?'

'হবার জো নেই। ওঁকে দু-টুকরো কর, দশ-টুকরো কর, একশো-হাজার-টুকরো কর, দেখবে সব টুকরোগুলো একটা-একটা নতুন কালা-কানা-আংলা-টানা হয়ে আঙুল বার করে ভেসে বেড়াচ্ছে। সমুদ্দুরের ভেতর এঁর মতো জবরদস্ত আর কেউ নেই বাবু। চলো, এই আংলা-টানার হাতে পড়লে আর রক্ষে নেই।' —বলেই আমরা চুপি-চুপি পালিয়ে চলেছি। এমন সময় দেখি একরাশ চিনেমাটির মার্বেল জলের ভেতর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে। কাছে আসতে দেখি— সেগুলি এক-একটি গোল খাঁচা আর ভেতরে একটি করে খুদে আংলা বসে আছে।

'ও কিচ্‌কিন্দে, আমাকে চাট্টিখানি ওই মার্বেল ধরে দাও না।'

'দেখ-না একবার ধরে!' —বলেই খপ করে দুটো মার্বেল ধরেই কিচ্‌কিন্দে আমার দু-হাতে দিয়েছে। যেমন মুঠো করে ধরা আর শুঁয়োপোকার কাঁটার মতো হাতময় ছুঁচ বিঁধে গেছে!

মার্বেল দুটো ফেলে দিয়ে দু-হাত চুলকোতে-চুলকোতে চলেছি, এমন সময় কিচ্‌কিন্দে বলছে, 'গামলা-চালা ফোঁপরা-জালার দেশে এলুম বাবু!'

চেয়ে দেখি চারদিকে কেবল গামলা আর জালা! কোনোটা বড়ো, কোনোটা ছোটো, কোনোটা লম্বা, কোনোটা বেঁটে, কেউ ধানের মরাইটার মতো, কেউ ঢাকাই জালাটার মতো, কেউ চুমকি ঘটিটির মতো। কোনো গামলা ফুলের টবের মতো দাঁড়িয়ে আছে, কোনোটা বা গোরুর জাব দেবার ফুটো গামলাটার মতো উল্টোনো রয়েছে!

'এ-সব গামলা আর কুপো কেন কিচ্‌কিন্দে ?'

'জানো না ? এখানে তোমার পিসির ঘি-তেল মজুদ থাকে। দেখ না'— বলেই ছোটো একটি ঘিয়ের মট্‌কি কিচ্‌কিন্দে আমার হাতে তুলে দিয়েছে।

'ও কিচ্‌কিন্দে, এ ভাঁড়টার মুখ কোন্ দিকে ? ঘি বার করি কেমন করে ?'

'দাও, দেখিয়ে দিই।' বলে মট্‌কিটা আমার হাত থেকে নিয়ে কিচ্‌কিন্দে দুহাতে নিংড়োতেই দেখি গল্-গল্ করে এক সের ঘি বেরিয়ে পড়ল !

'এ তো বেশ মজা !' বলেই আমি পালকি থেকে নেমে সেই জালা আর গামলাগুলো টিপতে লাগলুম আর অমনি পিচকিরি দিয়ে ফোয়ারার মতো কোনোটা থেকে তেল কোনোটা থেকে ঘি বেরোতে লাগল। দেখতে দেখতে চারদিক তেল আর ঘিয়ে ভেসে গেল ! তখন কিচ্‌কিন্দে বলছে 'বাবু, আর খেলা নয়। এত তেল-ঘি ঢেলে ফেলেছ দেখলে পিসি রাগ করবেন। চলো, চুপি-চুপি পালাই।'

পালকি করে আবার চলেছি। কিন্তু মনে ভয় হচ্ছে— পিসির এত তেল-ঘি ঢেলে নষ্ট করলুম, পিসি যদি টের পান তো রক্ষে রাখবেন না।

'ও কিচ্‌কিন্দে, পিসিকে বোলো না যেন যে অত তেল-ঘি নষ্ট করেছি !'

'একটুও নষ্ট হবে না বাবু, পিসির তোমার তেমন জালা, তেমন গামলা নয় ! কুপোগুলো সব তেল-ঘি আবার শুষে নিয়ে যেমন ছিল তেমনি ফুলে উঠছে ! চলো এখন পিসির বাড়ির তেতলায় আমরা নেমে যাই। সেখানে ঘণ্টাকর্ণ রক্তশোষা মাথায় ছাতা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন !' বলেই কিচ্‌কিন্দে পালকি নিয়ে ধাপে-ধাপে সমুদ্দুরের নিচে নেমে চলল। সেখানটা এমন অন্ধকার যে কিছু দেখা যায় না।

'ও কিচ্‌কিন্দে, তেতলায় তো সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতে হয়, এ যে তুমি আমাকে নিয়ে নেমে চললে।'

'ঠিক যাচ্ছি বাবু! জলের ওপরে যে তেতলা বাড়ি তাতে উঠতে হলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে যেতে হয়, আর জলের নিচে যে বাড়ি তার তেতলায় যেতে হলে নিচেবাগে নেমে যেতে হবে। জলের ভেতরে যে বাড়ি কি বাগানের গাছ দেখ, সেগুলোর মাথা ওপরে থাকে, না নিচেতে থাকে?'

'নিচেবাগে।'

'জলের ওপরে যে বাড়ি থাকে তার মাথা কোন্‌ দিকে থাকে?'

'ওপর দিকে।'

'তবে? জলের ওপরে তোমার মাসির বাড়িতে যা করতে নিচে পিসির বাড়িতে এসে ঠিক তার উল্টোটা না করলে মুশকিলে পড়বে, এইটে মনে রেখো।' বলেই কিচ্‌কিন্দে ক্রমে আরো নিচে নেমে চলল।

'ও কিচ্‌কিন্দে, চোখে যে কিছুই দেখতে পাইনে, বড়ো অন্ধকার!'

'আলো বেশ আছে, কেবল তুমি চোখটি খুলে রেখেছ বলে কিছুই দেখতে পাচ্ছ না। চোখ বন্ধ করো, সব পষ্ট দেখতে পাবে।'

কিচ্‌কিন্দের কথায় চোখ বন্ধ করেছি। সবাই চোখ-চেয়ে দেখে, আমি দেখছি চোখ বুজে— নীল জল! এত নীল যেন নীল কালি! তারই মাঝে গোনা যায় না— এত ঘণ্টা ঢুলছে! ঘণ্টার গায়ে ছোটো-ছোটো গোল-গোল কত যে চোখ জ্বলছে তার ঠিক নেই —কোনোটা লাল, কোনোটা হলদে! গোলাপি সবুজ শাদা বেগুনি —কত রঙেরই চোখ! ঘণ্টাগুলোর দুদিক দিয়ে ছুটো করে লম্বা শুঁড়ের মতো কান ঝুলছে! যেমন এক-একবার সেই কানগুলোতে ঢেউ লাগছে আর অমনি সব ঘণ্টাগুলো হেলে-দুলে টুং-টাং ক্লিং-ক্লাং টুং-টাং করে বাজছে— ঠিক যেন গোঁসাই এসে কানের কাছে মন্তর দিচ্ছে!

পালকির কাছ দিয়ে যখন এক-একবার ঘণ্টাকর্ণ এক-একটা হেলতে-দুলতে চলে যাচ্ছে তখন ইচ্ছে হচ্ছে— দিই একবার দুই কান ধরে টেনে। কিন্তু তখনি আবার মনে পড়ে যাচ্ছে এখন সব উল্টো কাজ করতে হবে; যখন ইচ্ছে হবে চোখ বুজে ঘুমোই তখন থাকতে হবে চোখ চেয়ে; যখন ইচ্ছে হবে শুই তখন হবে দাঁড়াতে; যখন কান মলতে হাত এগিয়ে যাচ্ছে তখন হাতকে জোর করে পিছিয়ে আনতে হবে। কাজেই আমি ভালো-মানুষটি হয়ে চুপ করে হাত-পা-গুটিয়ে চোখ বুজে বসে রয়েছি। এমন সময় দেখি আমাদের মেজ পুঁটির মতো একটি মাঝারি গোছের পুঁটিমাছ ঝাঁ করে গিয়ে ঘণ্টাকর্ণের কানে দিয়েছে ঠোকর। যেমন কান ছোঁয়া আর কান অমনি জড়িয়ে ধরেছেন হাতির শুঁড়ের মতো পুঁটিমাছটিকে! যেমন ধরা আর অমনি ঘণ্টার ভেতর পোরা! কাঁচের হাঁড়িতে পোষা মাছ যেমন ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়, তেমনি দেখছি ঘণ্টার ভেতর পুঁটিমাছটি ঘুরে বেড়াচ্ছে— পালাবার পথ নেই! আমি মাছটার কী হয় দেখবার জন্যে চেয়ে আছি।

'আর দেখছ কি বাবু! হজম হয়ে গেল বলে। যাও-না, ঘণ্টার কানটা ধরে টেনে দেখো-না মজাটা।'

'কিচ্‌কিন্দে, তুমি কেমন করে জানলে যে কান মলবার জন্যে আমার হাত নিশপিশ করছিল, আমি তো তোমাকে কিছু বলিনি।'

'বল নি বলেই জানতে পারলুম। বললে কিছু শুনতেও পেতুম না, জানতেও পারতুম না। এখানে সব উল্টো নিয়ম তা তো তোমাকে বলেই দিয়েছি।'

এই কথা হচ্ছে এমন সময় দেখি পাঁচ দিক থেকে পাঁচটা শুঁড় নাড়তে-নাড়তে আমার দিকে এগিয়ে আসছে— রক্তশোষা। তার সবটাই অগুনতি ঠোঁট আর গাল আর জিভ— লাল টকটকে, শাদা ফ্যাকফ্যাকে। এক ক্রোশ থেকে তার ঠোঁট নাড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে— পট্‌-পট্‌-পট্‌, চক্‌-চক্‌-চক্‌!

কিচ্‌কিন্দে ডাকছে, 'ডাইনে ধর ভাই, ডাইনে!'

বলতে-বলতে দেখি পালকি ডাইনে ঘুরেছে, আর দেখি রক্তশোষা বাঁদিকে সরে গেছে।

'বাঁয়ে ধর ভাই, বাঁয়ে ধর!'

পালকি যেমন বাঁদিকে ঘুরেছে আর দেখি রক্তশোষা ডাইনে চলে গেছে। এমনি ডাইনে বাঁয়ে করতে-করতে আমরা রক্তশোষার ঠোঁট এড়িয়ে ছাতা-মাথার ঘরে এসে পড়েছি। সেখানে দেখি কেবল ছাতা আর তার নিচে এক-একটা মুণ্ডু— গুটিসুতোর মতো সোঁটা-সোঁটা চুল আর মুলোর পাতার মতো গোছা-গোছা দাড়ি। দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন বিটপালং, গাজর, ওলকপি আর বিলিতি-মুলোর ঝাঁক সব উল্টে পড়ে ভেসে যাচ্ছে।

'ও কিচ্‌কিন্দে! এরা কারা?'

'এরা মালী। তোমার পিসির সবজি-বাগানে কাজ করছে।'

'এত তরকারি কি পিসি একাই খান?'

'তিনি ছাড়া আর কে খাবে? এ তরকারি কারো ছোঁবার জো আছে! ছুঁলেই হাত চুলকে অস্থির হবে। যতক্ষণ না পিসি এগুলিকে নিজের হাতে রেঁধে-বেড়ে দেবেন ততক্ষণ কারো মুখে দেবার জো নেই। মুখে দিয়েছে কি আর গাল ফুলে গোবিন্দর মা হয়েছে!'

'গালফুলো গোবিন্দর মা কে কিচ্‌কিন্দে?'

'তিনি আগে গোবিন্দর মা ছিলেন, পিসির এই সবজি খেতে ওলকপি তুলতে এসে একটি বিলিতি মুলো চুরি করে খেয়েছিলেন, সেই থেকে তাঁর গাল ফুলে গেছে। গোবিন্দ আর তাঁর মায়ের মুখ দেখেন না।'

'আচ্ছা কিচ্‌কিন্দে, ওই যে টোকা মাথায় দিয়ে মালীরা সব এই সবজি-খেতে কাজ করছে ওদের গা কই চুলকোয় না কেন?'

'ওদের গা থাকলে তো! চুলকে চুলকে সব ক্ষয়ে গেছে। এদিকে দেখো বাবু, তোমার পিসির ধানের খেত। এখানে কেবল মুক্তোকলাই, দশবছরে একবার ফলে, আর তোমার পিসি সেই কলাইয়ের ডাল দিয়ে পান্তাভাত দশবছর অন্তর একদিন খান।'

'পান্তাভাত কী কিচ্‌কিন্দে?'

'ভিজে ভাত বাবু। তোমায় তো বলেছি এখানে সব উল্টো, ডাঙার ওপর মাসির বাড়িতে খাও তোমরা শুকনো ভাত আর জলের নিচে পিসির বাড়িতে সবাই খায় ভিজে ভাত। তোমাদের কলাইয়ের ডাল পাতলা— যেন জল, আর এখানকার কলাইয়ের ডাল যেন মুক্তোর মতো ঝুরঝুরে।'

এই কথা হচ্ছে এমন সময় শুনি খেতের ভেতর থেকে ভোঁ-ভোঁ করে শাঁখ বেজে উঠল।

'এত শাঁখ বাজে কেন কিচ্‌কিন্দে?'

'শাঁখচুর্ণিরা সব শাঁখ বাজিয়ে কলাই-খেত থেকে পাখি তাড়াচ্ছে বাবু।'

দেখি, শাঁখচুর্ণিরা সব শাঁখ বাজিয়ে খেতময় ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের আর কিছু নেই— কেবল দুপাটি করে দাঁত আর একটা মস্ত কান, তাতে একটি ফুটো। জাঁতিকলের মতো দুপাটি দাঁত তারা খুলছে আর বন্ধ করছে, আর তাদের সেই কানের ফুটোগুলো দিয়ে ভোঁ-ভোঁ করে শাঁখের শব্দ বার হচ্ছে। কতদূর থেকে যে সে শব্দ শোনা যাচ্ছে তার ঠিক নেই!

শুঁড়-তুল-তুল কাঁচুমাচুর দেশ পেরিয়ে চলেছি, তখনো শুনছি সেই শাঁখের আওয়াজ! যেমন এক-একবার শাঁখের শব্দ আসছে আর অমনি দেখছি শুঁড়-তুল-তুলের যত শুঁড় সব ভয়ে কেঁচো হয়ে ল্যাজ গুটিয়ে মুখ কাঁচুমাচু করে গর্তে লুকোচ্ছে।

'ও কিচ্‌কিন্দে, পিসি এত কেঁচো নিয়ে করেন কি?'

'তিনি ওই কেঁচোর টোপ দিয়ে ছিপ ফেলে কাঁকড়া ধরেন।'

'একটা ছিপ পাই তো গোটাকতক কাঁকড়া ধরি।'

অমনি দেখি মস্ত-মস্ত কাঁকড়া দাড়া নেড়ে-নেড়ে বলছে, 'ধরো-না দেখি! আঙুলটি কাটব নাকি?— কট্‌-কট্‌-কট!'

'যাঃ-যাঃ দূর হ!'

যত বলি 'দূর হ' ততই দেখি কাঁকড়াগুলো এগিয়ে আসে।

'ও কিচ্‌কিন্দে এরা এগিয়ে আসে যে!'

'আসতে বলছ তো আসবে না! যাঃ-যাঃ বললে এগিয়ে আসবে না তো কি পিছিয়ে যাবে? এখানে সব উল্টো, মনে নেই? বলো—আয়-আয়।'

যেমন 'আয়-আয়' করে ডাকা আর অমনি সব কাঁকড়া দেখি পালিয়েছে। আমি যত ডাকি 'আয়' তত তারা দূরে পালায়। আবার যেমন একবার বলেছি 'যাঃ-যাঃ' অমনি সব কাঁকড়া কট্‌কট্ করে আমার দিকে ছুটে এসেছে!

'আচ্ছা কিচ্‌কিন্দে, পিসি অত কষ্ট করে কেঁচোর টোপ ফেলে কাঁকড়া ধরেন কেন? জলের ধারে বসে যাঃ-যাঃ বললেই তো তারা আপনি পিসির হাতে উঠে আসত?'

'আহা, পিসির তোমার মায়ার শরীর, কাউকে কি তিনি যাঃ বলতে পারেন! পিসির মুখে যাঃ কথাটি কখনো শুনিনি। যদি বললুম— পিসি বাড়ি যাই, অমনি পিসি বলবেন— আয় বাছা! কোনোদিন বলবেন না— যা বাছা! তোমাদের মুখে যেমন যাঃ-যাঃ দূর-দূর লেগেই আছে, পিসি তো আর তেমন নয়, পিসি সবাইকে বলেন— এসো বাছা, বসো বাছা! সাধে কি আমরা পিসির চাকর হয়ে আছি? ওই দেখ তোমার পিসির ছিপে একটা কলকজ্জা-দাড়া-বাঁধা ধরা পড়েছে। ওই আর একটা! উঃ, তোমার জন্যে পিসি খুব কাঁকড়া আর গলদা চিংড়ি ধরছেন দেখছি, কাল খাওয়া খুব হবে বাবু!'

দেখি পিসির ছিপে দুটো প্রকাণ্ড কাঁকড়া আর গলদা-চিংড়ি ধরা পড়েছে। কাঁকড়ার এক-একটা দাড়া আমার হাতের মতো লম্বা; আর চিংড়ি দুটো যেন এক-একটা তেলেঙ্গি সেপাই— ঢাল খাঁড়া নিয়ে তিড়িং-তিড়িং লাফাচ্ছে। আমাদের চোখ, মুখের সঙ্গে চ্যাপ্টানো, এদের চোখগুলো যেন দূরবীনের চোঙার মতো মুখ থেকে ঠেলে বেরিয়েছে আর কট্‌মট্ করে তাকিয়ে আছে! দেখলে ভয়ে গা শিউরে ওঠে। কাঁকড়া আর গলদা-চিংড়ি দেখে, পিসির রাঁধা কচি

কুমড়ো দিয়ে কাঁকড়ার ঝোল, লাউ-চিংড়ি আর গুড়-অম্বল খেতে নোলা সকসক করে উঠল।

'ও কিচ্‌কিন্দে, পিসির বাড়ি আর কতদূর?'

'এই তো এসেছি:বাবু তোমার পিসির খিড়কি-পুকুরে। ওই দেখ কত রাঘব-বোয়াল আর পায়রা-চাঁদা মাছ পুকুরে ঠাসা রয়েছে।'

বাপরে! এমন সব মাছ তো কখনো দেখিনি! যেন এক-একটা জাহাজ ভেসে বেড়াচ্ছে। কারো ভাঁটার মতো চোখ, কারো গায়ে চাকা-চাকা আঁশ, কারো মাথায় শিং, কারো গালে গোঁফ, কারো খোঁতা মুখ, কারু মুখ বা ছুঁচলো, কেউ লম্বা কাঠি, কেউ গোল একটি বেলুনের মতো! লাল নীল সবুজ কত রঙের কত রকমের যে মাছ পিসির পুকুরে ছাড়া রয়েছে— তা আর কী বলব! গল্প শুনতে শুনতে যেমন ঘুম পায় তেমনি পিসির বাড়ির সাতঘাটের কাণ্ডকারখানা দেখতে-দেখতে আমার ঘুম পেয়ে এল।

'ও কিচ্‌কিন্দে, বড়ো ঘুম আসছে, আর যে চোখ বুজে থাকতে পাচ্ছিনে।'

'বেশ তো বাবু, ঘুমোও চোখ খুলে, আর তো দেখবার কিছু নেই, রাত পোহালেই এই পুকুরের ওপারে তোমার পিসির বাড়ি পৌঁছে দেব।'

আমি অকাতরে ঘুম দিচ্ছি এমন সময় শুনছি পিসি ডাকছেন, 'অবু, ও অবু, ওঠ্‌ রাত হয়েছে, আর কত ঘুমোবি? সুয্যি যে অনেকক্ষণ নেমেছেন।'

কিচ্‌কিন্দে বলছে, 'পিসিমা, দাদাবাবু সারাদিন পালকিতে ঘুমোননি, একটু ঘুমোতে দাও, এই তো সবে সুর্যি নেমেছেন, এখনো তো রাত বেশি হয়নি।'

কিচ্‌কিন্দের গলা পেয়েই আমার ঘুম ভেঙে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসে দেখি — পিসির বাড়ির ছাদে শুয়ে আছি আর আকাশে একটা কালো সুর্যি উঠেছে। আমাকে উঠে বসতে দেখে কিচ্‌কিন্দে

তাড়াতাড়ি বলছে, 'বাবু ঘুমোও, এখনো রাত হবার দেরি আছে, আর একটু রাত হোক তো জেগো।'

'রাত হলে তো ঘুমোব, তখন আবার জাগব কি?'

পিসি বলছেন, 'ও কপাল রাতে বুঝি ঘুমোতে হয় আর দিনে জাগতে হয়? খবরদার রাতে ঘুমোসনে— অম্বল হবে, বাত হবে! যাই, রান্নাবান্না হল কিনা দেখে আসি'— বলে পিসি তো গেলেন। কিচ্‌কিন্দে তখন আমায় বলছে, 'বাবু ভুলে গেলে? তোমাকে তো বলেছি পিসির দেশে রাতে সুর্যি ওঠে, দিনে চাঁদ। যা মাসির বাড়ি করতে এখানে ঠিক তার উল্টোটি করা চাই, মাসির বাড়ি যদি ঘুমোই রাতে তো এখানে ঘুমোব দিনে, সেখানে যদি চান করি জলে, এখানে করতে হবে বালিতে। খাবার সময় সেখানে যদি বলতে মাসি খিদে পেয়েছে ভাত দাও, এখানে বলতে হবে পিসি খিদে নেই, পেট আই-ঢাই করছে, ভাত আজ দিয়ো না, খাব না। সেখানে বই পড়তে চোখ খুলে বইখানা সামনে রেখে, এখানে পড়তে হবে চোখ বন্ধ করে বইখানা পিছনে লুকিয়ে রেখে।'

'কিচ্‌কিন্দে, এ-সব শিখতে তো আমার অনেকদিন লাগবে।'

'তা লাগবে বই কি বাবু! আজ দিনটা একটু পিসির বাড়ি আরাম কর, কাল রাতেই তোমাকে পাঠশালায় ভর্তি করে দেব; সেখানে লেখাপড়া খুব ভুলতে পারবে।'

এমন সময় পিসি এসে ডাকছেন, 'ভাত আজ আর খেয়ো না।'

কিচ্‌কিন্দে তাড়াতাড়ি এক ঘটি বালি এনে দিলে, আমি তাই একটু মুখে দিয়ে পিসির রান্নাতলায় হাজির। এদেশে রান্নাঘর নেই, খোলামাঠে উনুন পাতা আছে, তারই কাছে দেখি খাবার জায়গা। সেখানে একখানা মস্ত কলাপাতা পাতা রয়েছে, আসন-টাসন কিছুই নেই! আমি যেমন কলাপাতার সামনে মাটিতে বসতে গেছি আর পিসি বলছেন, 'ওরে ওখানে না, ওই পাতাখানায় বোস্‌!'

'পিসি, পাতায় আমি বসব তো ভাত দেবে কিসে?'

'এই যে পিঁড়িতে ভাত বেড়ে রেখেছি'— বলে একটা পিঁড়ের ওপরে ডাল ভাত তরকারি সাজিয়ে পিসি আমাকে এনে দিলেন আমি তখন বুঝলুম, এখানে লোকে পাতায় বসে আর পিঁড়েয় ভাত খায়! পিসির হাতের কলাইয়ের ডাল আর কাঁকড়ার ঝোল দিয়ে একপেট ভাত খেয়ে জলের ঘটিতে চুমুক দিয়ে দেখি এক ঘটি বালি —বেশ পরিষ্কার, তাতে আবার গোলাপের গন্ধ ছাড়ছে, আর বেশ মিষ্টি। ঢক্‌ঢক্‌ করে এক ঘটি বালি খেয়ে ধুলোয় হাত-মুখ ধুয়ে উঠলুম। পিসি একটি পান দিলেন— শুকনো যেন তালপাতা। আমরা খাই কাঁচা পানের পাতা, এরা খায় শুকনো তালের পাতা! একপেট খেয়ে ঘুম পাচ্ছিল। কিচ্‌কিন্দেকে বললুম, 'কিচ্‌কিন্দে শোবার ঘরটা কোথায়? একটু দুপুরবেলা ঘুমোতো হবে। বিকেলে তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাব।'

'আচ্ছা বাবু' —বলেই কিচ্‌কিন্দে একটা ছাদে খাটিয়া পাতা রয়েছে সেইখানে আমাকে এনে বললে, 'এই খাটিয়াতে একটু গড়াগড়ি দাও, আমি ঠিক সকাল পাঁচটার সময় তোমায় নিয়ে বেড়াতে যাব।' বলেই কিচ্‌কিন্দে চলে গেল। বিছানায় শুতে গিয়ে দেখি, খানকতক ইট পাতা রয়েছে! তখন বুঝলুম এদের বালিস তোষক নরম নয়; শক্ত ইট; আর ছাদ হচ্ছে এদের ঘর, ঘর হচ্ছে ছাদ! ইটের বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে কিছুতে ঘুম আসে না, তখন মনে হল দেখি উপুড় হয়ে শুয়ে। যেমন উপুড় হওয়া আর অমনি ঘুম —টিকটিকির মতো ইটের দেয়ালে হাত-পা ছড়িয়ে আরামে ঘুম! এমন ঘুম কখনো হয়নি। যখন বেলা পড়ে এসেছে তখন কিচ্‌কিন্দে এসে বললে, 'বাবু চলো একটু রথতলায় বেড়িয়ে আসি।'

'চলো'— বলে কিচ্‌কিন্দের সঙ্গে এপাড়া-ওপাড়া ঘুরে রথতলায় চলেছি, এমন সময় দেখি গোবিন্দর মা একটি ভোঁদড়-ছানা নিয়ে তাকে ঘুম পাড়াচ্ছে আর সুর করে ছড়া কাটছে—

'ধেই-ধেই চাঁদের নাচন।
বেলা গেল চাঁদ নাচবি কখন।'

তখন পিসির দেশের কালাচাঁদ নাচতে-নাচতে পুবদিকে অস্ত যাচ্ছেন আর সোনারচাঁদ নাচতে-নাচতে পশ্চিম দিকে উদয় হচ্ছেন। এই তুই চাঁদের আলোয় সমস্ত পৃথিবীটা গোবিন্দর মায়ের ফুলো গালের মতো খানিক আলো খানিক কালো দেখা যাচ্ছে। আকাশ দেখতে হয়েছে যেন হলদে-আর-কালো ডুরেশাড়িখানি। হাওয়া বইছে আধেক গরম আধেক ঠাণ্ডা। আমাকে দেখে গোবিন্দর মা বলছে, 'ও কিচ্‌কিন্দে, এ কাদের ছেলে গা?'

'আমাদের দাদাবাবু গো। মামার বাড়ির লোক। এনাকে একবার রথতলাটা দেখিয়ে আনি।'

'চলো, আমিও যাই একবার রথতলায়'— বলেই গোবিন্দর মা ভোঁদড়-ছানাটি কোলে আমাদের সঙ্গে চলল।

সমুদ্দুরের ধারেই রথতলা। বেশ জায়গাটি। চারদিকে ঝাউবন, মাঝে অনেকখানি বালি— পরিষ্কার তকতক করছে। তারই মাঝে মুড়ো রথখানা— তার চাল নেই, চুড়ো নেই। সেইখানে দেখি হারুন্দে হয়েছে সদ্দার আর কাসুন্দে বাসুন্দে ঝালুন্দে মালুন্দে হয়েছে চিতাবাড়ি আর ধাঁইকিড়ি। চিতাবাড়ির দল ধরেছে তুই লাঠি, ধাঁইকিড়ির দল ধরেছে তুই লাঠি। হারুন্দে এক-একবার হাঁক দিচ্ছে—

'ইকড়ি-মিকড়ি চামচিকড়ি
চাম্ কৌটো মজুন্দার
ধেয়ে এসো দামুদার—'

আর অমনি তুই দলে ঠকাঠক লাঠি ঠুকছে। দেখতে-দেখতে দেখি আর মানুষ চেনা যায় না! কোথায় কাসুন্দে কোথায় বাসুন্দে কোথা বা ঝালুন্দে কোথা বা মালুন্দে। কেবল একরাশ কাঁকড়া আর মাকড়সা বালির ওপর ইকড়ি-মিকড়ি কচ্ছে। আর তাদের মাথার ওপরে একরাশ কালো-কালো চামচিকে চামচিকড়ি ডানা-গুলো ঝেড়ে-ঝেড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে! লড়াই হতে-হতে যেমন একটা

চামচিকে চিক্ করে মাটিতে পড়েছে আর অমনি সব ইকড়ি-মিকড়ি গিয়ে তাকে ধরে ফেলেছে! অমনি হারুন্দে ডাকছে—

'দামুদার ছুতারের পো
হিঙুল গাছে বেঁধে থো।'

যেমন এই কথা বলা অমনি সবাই মিলে চামচিকের মতো রোগা-পটকা ছুতোরের পো-কে হিংচে গাছে চুলের দড়ি দিয়ে বেঁধেছে! তখন হিংচে গাছ কচ্ছে কড়মড়! তখন ইকড়ি-মিকড়ির দল হিংচে গাছের চারদিকে হাততালি দিয়ে গান গেয়ে-গেয়ে ঘুরতে লেগেছে—

'চাঁদ-চাঁদ-চাঁদ গগনচাঁদ
হিংচে বনে শশী!
ওই এক চাঁদ এই এক চাঁদ—
চাঁদে মেশামেশি।'

'ও কিচ্‌কিন্দে, এ সব হচ্ছে কী?'

'একে বলে চিকড়ি-মিকড়ি খেলা'— বলেই কিচ্‌কিন্দে একটা বাঁশি বাজাতে লেগেছে। আর অমনি দেখি ইকড়ি-মিকড়ি হয়ে গেছে চিতাবাড়ির দল আর চামচিকড়ি হয়ে গেছে ধাঁইকিড়ির দল! যেমন কাস্থন্দে বাস্থন্দে ঝালুন্দে মালুন্দে ছিল সবাই তেমনি হয়ে গেছে! আর নাচতে-নাচতে তারা এসে আমাদের বলছে—

'ধিনতা নাচন মধুর বচন তোমরা কর কি?'

অমনি গোবিন্দর মা গাল ফুলিয়ে বলছেন—

'মনের আনন্দে মোরা খোকন নাচাচ্ছি!'

'ও গোবিন্দর মা, দেখি তোমার খোকা'— বলেই হারুন্দে ভোঁদড়-ছানাকে নিয়ে যেমন তার পেটে ফুঁ দিয়েছে আর অমনি সে একটা লক্ষ্মীপ্যাঁচা হয়ে উড়ে পালিয়েছে— একেবারে মুড়ো রথের চুড়োয়। সেখান থেকে প্যাঁচাটা আমায় ডাকছে, 'ঘু-ঘু-ঘু মেতি—স্থ পেটে— ফুঁ।'

'ও কিচ্‌কিন্দে, প্যাঁচাটা বলে কী?'

'যাও না, তোমায় খেলতে ডাকছে।'

'ও কিচ্‌কিন্দে, আমি তো উড়তে পারিনে, তবে ওর কাছে যাই কেমন করে?'

'উড়বে নাকি?' বলেই হারুন্দে যেমন আমার পেটে এক ফুঁ দিয়েছে আর আমি হয়ে গেছি একটা হুমো পাখি হুতুম থুমো। গোবিন্দর মা যেমন আমাকে ধরতে এসেছে আর আমি উড়ে গিয়ে একেবারে মুড়ো রথের চালে গিয়ে বসেছি। প্যাঁচাটা আমাকে হঠাৎ দেখেই একটু ভয় খেয়ে গেছে, তারপর যখন দেখছে আমি তারই বড়দাদা হুতুম প্যাঁচা তখন সে আস্তে-আস্তে কানের কাছে এসে বলছে—

একটি কথা।—কী কথা?
ব্যাঙের মাথা।—কী ব্যাঙ?
সরু ব্যাঙ।—কী সরু?
বামুন গোরু।—কী বামুন?
ভাট বামুন।—কী ভাট?
গো ভাট।—কী গো?
চিতি গো।—কী চিতি?
সোনা চিতি।—কী সোনা?
গিনি সোনা—কী গিনি?
মানুষের গিনি।—কী মানুষ?
বনমানুষ।—কী বন?
খেজুরবন।—কী খেজুর?
ঠিক মজুর।—কী ঠিক?
বেঠিক।

'ঠিক-ঠিক।' বলে উড়তে উড়তে আমরা গিয়ে খেজুর গাছে বসেছি। সেই খেজুর গাছের তলায় কতকালের পোড়ো একটা

আখবাড়ি রয়েছে, তাতে একখানা মরচে-ধরা আখমাড়ার কল, একটা ভুঁড়োশেয়ালি সেই আখমাড়া কলটা ধরে ঘোরাচ্ছে— ক্যাঁচকোঁচ। প্যাঁচা দেখেই বলছে—

'আখবাড়ির পাশে
ভুঁড়োশেয়ালি নাচে।'

আমি বলছি, 'তারপর ?'

'তারপর শুনবে গল্পটা ? তবে শোনো'— বলেই প্যাঁচা বলছে—

'এক যে ছিল শেয়াল
তার বাপ দিচ্ছে দেয়াল।'

'বুঝেছ ভাই— সে ভারি কাণ্ড! বুঝেছ কিনা— "শেয়াল তার বাপ দিচ্ছে দেয়াল!" শেয়াল দেয়াল দিচ্ছে না, দিচ্ছে তার বাপ— বুঝেছ ? সে ভারি কাণ্ড। শেয়ালের বাপের নাম কী জানো ?—

'তার বাপের নাম রতা।'

'সে রতা শেয়াল, বুঝেছ কিনা— দেয়াল যে দিচ্ছে সে রতা শেয়াল ;— শেয়ালের বাপ শেয়াল, বুঝেছ ?'

'এক যে ছিল শেয়াল
তার বাপ দিচ্ছে দেয়াল॥
তার বাপের নাম রতা।
ফুরোল আমার কথা॥'

'তারপর ?'

'তারপর আর কি ?'

'এই বুঝি তোমার গল্প হল ? দেখ ভাই প্যাঁচা, একটা যদি বড় গল্প না বল, তবে তোমার সঙ্গে এই আড়ি দিলুম বলে!'

'রোসো-রোসো আড়ি দিয়ো না। মনে পড়েছে একটা মস্ত ব্যাঙের গল্প ; বলি শোনো'— বলেই প্যাঁচা আরম্ভ করেছে—'তাঁতিঘরে ব্যাঙের বাসা! তাঁতঘর দেখেছ তো ? সেই যেখানে খট্-খট্

করে তাঁতি-বুড়ো মাকু চালায় আর সর্-সর্ করে কাপড় বার হয়— দশ হাতি, বারো হাতি, চোদ্দ হাতি, খ্যাপা হাতি, পোষা হাতি !'

'না ভাই, তাঁতশালা কখনো দেখিনি, কিন্তু কাপড়ের হাতি আমি অনেক দেখেছি, আসল হাতির মতোই সেগুলো মোটাসোটা !'

'আচ্ছা গোল কোরো না, শোনো ফের বলছি—

'তাঁতি ঘরে ব্যাঙের বাসা, তিনটে পেড়েছে ছানা।
খায় দায় নিদ্রা যায়, তাঁতঘরে তার থানা ॥'

'বুঝেছ ?'

'বুঝেছি, তাঁতির ঘরে তিনটে ব্যাঙের ছানা হল। কিন্তু তারপর কী হল তো বুঝতে পাচ্ছিনে !'

'এঃ, তুমি ভারি বোকা! তাঁতির ঘরে ব্যাঙের তিনটে ছানা হল, বাড়ির সবাই যখন খেয়ে-দেয়ে ঘুমোতে গেল, তখন তাঁতি-বুড়ো গিয়ে থানায় খবর দিচ্ছে— দারোগা সাহেব, তিনটে ব্যাঙের ছানা আমার সব সুতো খেলে— সর্বনাশ করলে।

'কি, আমি থাকতে ডাকাতি? রামসিং, আমায় এক ছিলিম তামাক দাও আর তাঁতির সঙ্গে গিয়ে বেঁধে আনো সেই ব্যাঙ তিনটেকে !— বলেই দারোগা-সাহেব গুড়গুড়ি টানতে-টানতে খাটিয়াতে শুলেন। যেমন শোয়া আর অমনি ঘুম! এখন তো— "খায় দায় ঘুম যায়, তাঁতঘরে তার থানা"— এটার মানে বুঝলে? তারপর শোনো—

'সুবুদ্ধি তাঁতির ব্যাটা কুবুদ্ধি ধরিল।
তার একটি ছানারে পায়ে চেপে মেল ॥

'সুবুদ্ধি তাঁতি ঠিক কাজ করেছিল— রামসিং এসে তিনটি ছানাকেই পুলিশে নিয়ে জরিমানা করে দিত— কিন্তু সুবুদ্ধির ছেলে কুবুদ্ধি করেছে কি, আস্তে আস্তে একটি ব্যাঙকে ধরেছে, ধরেই পা দিয়ে এক টিপ্‌নি! আর অমনি ফটাস করে ভুঁইপটকার মতো ফেটে গেছে ব্যাঙের পেট, যেমন ফটাস করে শব্দ হওয়া অমনি ছুটো

ব্যাঙ পগার পার— একটা গিয়ে মাঠের ধারে গাছে চড়েছে, আর একটা করেছে কী, বলি তবে শোনো—

'আর একটি ব্যাঙ ছিল বড়ই সিয়ানা।
লিখন পাঠায়ে দিল পরগনা-পরগনা॥
আজিপুর গাজিপুর মধুপুর ডাঙা।
লক্ষ ব্যাঙ এল তথা চক্ষু করে রাঙা॥

'এসেই কুবুদ্ধির মুখে লাথি! লক্ষ ব্যাঙের রাঙা চোখ দেখেই তাঁতির পোর প্রাণ উড়ে গিয়েছিল, তার ওপর ব্যাঙের লাথি খেয়ে সে তো আধ-মরা হয়ে থাক। এদিকে সুবুদ্ধি আর রামসিং দোবে আসছেন রাজহাটের মাঠ দিয়ে—এমন সময় হল কি? না—

'সুতোনাতা নিয়ে তাঁতি যাচ্ছে রাজার হাট।
লক্ষ ব্যাঙে তাড়াতাড়ি আগুলিল ঘাট॥

'যেমন ব্যাঙগুলোকে দেখা অমনি রামসিং তালপাতার-সেপাই—বাপরে! বলে মেরেছে এক দৌড়। তাঁতি তখন আর করেন কি, না—

'তরাসে মরাসে তাঁতি গাছেতে উঠিল।

'একটা ছিল মুড়ো খেজুর গাছ, যেমন তাড়াতাড়ি ওঠা আর অমনি—

'কোথা ছিল কোলাব্যাঙ মুখে লাথি মেল॥

'লাথির ওপর লাথি! কোলাব্যাঙের লাথি খেয়ে তাঁতি তো মরো-মরো; ধপাস করে পড়েছে খেজুরতলায় আর অমনি সব ব্যাঙ তাকে এসে ধরেছে! তখন সেই সিয়ানা ব্যাঙ বলছে— ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—

'মেরো না ধর না, ভাই তাঁতিরে গোঁসাই।

'এখনি দারোগা এসে হাতে হাতকড়ি দেবে। পায়ে বেড়ি পড়লে তখন পালানো দায়। সরে পড় এইবেলা!— বলতেই যত ব্যাঙ আজিপুরে গাজিপুরে চম্পট! এদিকে তো—

'মেরো না ধর না, ভাই তাঁতিরে গোঁসাই।

'ওদিকে রামসিং এসে তার হাতে দিয়েছে হাতকড়ি।'

'কেন, তাঁতির হাতে দড়ি পড়ল কেন?'

'তার ছেলে কুবুদ্ধি ব্যাঙ মেরেছে বলে।'

'কুবুদ্ধির কি হল?'

'কুবুদ্ধির পায়ে বেড়ি পড়ল। আর কি হবে?'

'পরে সেই রামসিং দোবের কিছু হল না?'

'হল বৈকি। ব্যাঙের দিষ্টিতে তার মুখ পুড়ে গেল, মুখে আর কিছু রোচে না—

'নিম লাগে মিষ্টি!
সন্দেশ লাগে তেতো!
মুড়কি বলে ঝাল!

'সে কেবল ঘুষ খেয়ে-খেয়ে ছিষ্টি ব্যাঙের গালাগালি খেয়ে-খেয়ে বেড়াতে লাগল।'

'আর সেই দারোগা কি করলে?'

'সে আর করবে কি? ব্যাঙেরা তার গায়ে যত ধুলো দিলে সে তা ফুঁয়ে উড়িয়ে মনের আনন্দে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াতে লাগল।'

বলেই যেমন প্যাঁচা ফুঃ করে ফুঁ দিয়েছে আর অমনি সেই ফুঁ এসে আমার গায়ে লেগেছে। যেমন গায়ে লাগা আর আমি মানুষ হয়ে যাওয়া, যেমন মানুষ হওয়া আর ধুপুস করে ভাদ্দর মাসের তালের মতো মাটিতে পড়া আর ভুঁড়োশেয়ালি খপ্‌ করে আমাকে তুলে দে-ছুট! এক ছুটে শেয়ালটা আমাকে তালতলাতে এনে হাজির করেছে। সেখানে একজোড়া ছেঁড়া তালতলার চটি পড়েছিল, সেইটে মুখে করে এনে শেয়াল আমাকে বলছে, 'খাবে?'

আমি বলছি, 'দূর! আমি কেন জুতো খেতে গেলুম! তুই খা!'

অমনি শেয়ালটা কসমস করে চটি জুতোটা গিলে ফেলেছে, তারপর আমার দিকে চেয়ে বলছে—

'বাপ ভনরি!
কি খাইতে সাধ করেছ?—চালদা মস্থুরি?'

আমি শেয়ালকে বলছি, 'দেখ শেয়াল, আমার নাম ভনরি নয় আর আমি তোমার বাপও নয়। আমাকে ভুল করে এখানে এনেছ। আমি চালদা পেলে খাই কিন্তু মস্থুরি খাটিয়ে তার ভেতর আমরা ঘুমোই, মস্থুরি আমি কিছুতে খাব না!'

শেয়ালটা বোধহয় আমার কথা বুঝলে না, সে আবার বললে—

'বাপ নন্দলাল!
কি খাইতে সাধ করেছ?— পাকা তাল?'

'ওরে বাপু, আমি নন্দলালও নই, ভনরিও নই, তোর বাপও নই! তোর বাপের নাম হল রতা আর আমার নাম হল অবু। ছুটো তাল পেড়ে দাও তো খাই, নয়তো বল ঘরে যাই। তালের বড়া কিম্বা তালফুলুরি, না হয় গাছপাকা তাল, এই তিনটের একটা যদি দিতে পার তো থাকি, নয়তো আমাকে বাপু পিসির বাড়ি রেখে এসো।'

'এই তো তুমি অন্যায় কইলে। তাল তোমাকে দিই কেমন করে? তালগাছে কে থাকে জানো?' বলেই শেয়ালটা বলছে—

'এক যে আছে একা-নোড়ে,
সে থাকে তালগাছে চড়ে।
দাঁত ছুটো তার মুলোর মতো,
পিঠখানা তার কুলোর মতো!
কান ছুটো তার নোটা-নোটা,
চোখ ছুটো আগুনের ভাঁটা!
কোমরে বিছুলি দড়ি
বেড়ায় লোকের বাড়ি-বাড়ি।

তাল খেতে যে কাঁদে—
তারে ঝুলির ভেতর বাঁধে।
গাছের ওপর চড়ে
আর তুলে আছাড় মারে।'

'ওইরে একা-নোড়ে!'— বলে শেয়ালটা যেমন আমায় ভয় দেখিয়েছে অমনি আমি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলেছি, আর অমনি কি একটা তালগাছে উড়ে এসে বসেছে আর মাথা নেড়ে-নেড়ে বলছে—

'কান-কাটাটা বলে আমি
এই গাছেতে আছি।
যে ছেলেটা কাঁদে তার
কানে ধরে নাচি॥'

আমার তখন আরো ভয় হয়েছে, আমি দুই হাতে কান চেপে ধরে ফোঁস-ফোঁস করে ফুঁপিয়ে একেবারে চিৎকার করে কেঁদে উঠেছি। অমনি শেয়াল বলে উঠেছে, 'কেয়া হুয়া কেয়া হুয়া!' আর সেখানে যত শেয়াল ছিল সব ছুটে এসে ডাকতে লেগেছে, 'ক্যাহুয়া-ক্যাহুয়া-ক্যাহুয়ারে-ক্যাহুয়া?'

বুড়ি খ্যাঁকশেয়ালি ছিল গর্তের ভেতর, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বলছে, 'তোরা কী গোল লাগিয়েচিস! ভালো করে দেখ দিকিন কে?'

যত ভুঁড়োশেয়াল আমার মুখের কাছে এসে আলেয়া ধরে-ধরে দেখছে আর খ্যাঁ-খ্যাঁ করে হেসে পালাচ্ছে। এমন সময় অন্ধকার থেকে হাতি আমার পিঠে শুঁড় বুলিয়ে বলছে—

'ওরে-বাপ নয় রে মানুষ
উড়ে পড়ল ফাঁনুশ!'

মানুষের নাম শুনেই শেয়ালদের ভয় হয়েছে। তখন তারা সব ল্যাজ গুটিয়ে হাতজোড় করে বলছে—

'বাপধন রাজার নাতি
চড়ে কে গো মস্ত হাতি!'

যেমন শেয়ালরা এই কথা বলা আর অমনি হাতি শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে আমাকে পিঠে উঠিয়েছে! হাতিতে চড়ে আমার ভারি আহ্লাদ হয়েছে, আমি হাততালি দিয়ে বলছি—

'তাই-তাই-তাই মামার বাড়ি যাই।'

অমনি হাতি বলছে, 'তোমার মামার বাড়ি কোথায় বলো তো?'

'আমার মামাবাড়ি যশোর দক্ষিণডিহি চেঙুঠে পরগনা।'

'আচ্ছা চলো সেখানেই যাচ্ছি'— বলেই হাতি চলতে আরম্ভ করলে—হুস-হাস-থপাস-থপাস! দেখতে-দেখতে মামাদের কলা-বাগানে এসে পড়েছি। সেখানে দেখি হনুমান হুপ-হাপ করে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। যেমন আমি বলেছি—

'ও হনুমান, কলা খাবি?
জয়জগন্নাথ দেখতে যাবি?'

অমনি হনুমান দাঁত-খামাটি দিয়ে মুখ ভেংচে বলছে, 'রাম-রাম! রোস তো আদুরে ছেলে! তোর মামার বাড়ি যাওয়া বার করছি!' বলেই হনুমান একটি কলা নিয়ে যেমন ডেকেছে—

'আদুরের কলাগুলি বাদুড়ে খায়,
ধর-ধর খোকামণি মামার বাড়ি যায়।'

আর অমনি দুটো বাদুড়ে এসে ছোঁ মেরে হাতির পিঠ থেকে আমাকে তুলে নিয়ে দৌড়—একেবারে পিসির তেঁতুলতলায়! সেখানে আমাকে এনে ফেলেই বাদুড় দুটো হয়ে গেছে হারুন্দে আর কিচ্‌কিন্দে! তাদের দেখে আমার ভারি রাগ হয়েছে, কেমন মামার বাড়ি যাচ্ছিলুম, কেবল যেতে দিলে না আমাকে এই দুটো বাদুড়! যেমন এই কথা মনে করেছি আর অমনি কিচ্‌কিন্দে বলছে, 'মামার বাড়ি যাচ্ছিলে তো যাচ্ছিলে, কলাবাগানে হনুমান-জিকে বলতে গিয়েছিলে কেন—

'ও হনুমান, কলা খাবি?
জয়জগন্নাথ দেখতে যাবি?

'জয় সীতারাম দেখতে যাবি— বলতে পার নি? হনু রেগে

তোমার ইস্কুলের ছুটি কেটে দিয়েছে, এখন আর তুমি পিসির বাড়ি থাকতে পারবে না, এখন তোমায় গুরুমহাশয়ের পাঠশালে পড়তে হবে আর জোড়া-বেত খেতে হবে। চলো'— বলেই আমাকে পালকিতে ভরে হারুন্দে আর কিচ্‌কিন্দে পাঠশালায় নিয়ে চলল।

'ওরে আমাকে তোরা ছেড়ে দে, আমি এমন কাজ আর কখনো করব না। ও কিচ্‌কিন্দে, তোর পায়ে পড়ি আমাকে গুরুমশায়ের কাছে দিস্‌নে, আমি পড়ব না, আমি ছবি লিখব, আমি যাব না পাঠশালে যাব না— আ— আ' বলে পালকির ভেতর আমি হাত-পা আছড়ে কাঁদতে লেগেছি। জোড়া-বেতের নাম শুনে ভারি ভয় হয়েছে। হারুন্দে কিচ্‌কিন্দে পালকির দুই দরজা চেপে ধরে আমাকে গুরুর পাঠশালে হাজির করে বলছে—

'গুরু-মশাই গুরু-মশাই
তোমার পোড়ো হাজির।
চড়চড়িয়ে পড়ুক বেত
হোক বিচার কাজির॥'

শুনছি গুরুমশায় ঘরের ভেতর থেকে মন্তর পড়ছেন—

'আয় ধুগ্‌ড়ি যায় ধুগ্‌ড়ি
ধুগ্‌ড়ি মন্তর গায়।
চড়চড়িয়ে পড়ুক বেত
পড়পড়িয়ে যায়॥'

যেমন এই মন্তর পড়া আর দেখি জোড়া-বেত নাচতে-নাচতে গুরুমশায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সঙ্গে-সঙ্গে মাছরাঙা গুরু নাকের ওপরে চশমা লাগিয়ে এসে বলছেন, 'পড়—

'লিখিবে পড়িবে মরিবে দুখে।
মৎস্য ধরিবে খাইবে সুখে॥'

আমার তখন ভয়ে কি পড়া আসে! আমি বলে ফেলেছি—

'লিখিবে পড়িবে থাকিবে সুখে।
মৎস্য ধরিবে মরিবে দুখে॥'

অমনি গুরু এক বেতের খোঁচা দিয়ে বলছেন, 'ভুল হল! লেখাপড়া করলে কি হয়? সুখে থাকে? না দুঃখে থাকে?'

আমার তখন মনে পড়েছে পিসির বাড়িতে সব উল্টো। আমি অমনি ফস করে বলেছি, 'দুঃখে থাকে মশাই, দুঃখে থাকে!'

'ভালো রে ভালো! আচ্ছা তোর নাম তো অবু? লেখ দেখি—

'অবু তবু গিরি সুতা।
মায়ে বলে পড় পুতা॥
পড়লে শুনলে দুধি ভাতি।
না পড়লে ঠ্যাঙার গুঁতি॥'

আমি জানি সব উল্টো লিখতে হবে, না হলে বেত, কাজেই আমি মাটিতে খড়ি দিয়ে একটা চৌকো ঘর কেটে লিখছি—প্যাঁচা-পেঁচি দুই ভূতা। কিন্তু যেমন লিখছি—মায়ে বলে পড় পুতা—অমনি আমার মাকে মনে পড়ে গেছে, আমি খড়ি ফেলে দিয়ে একেবারে পাঠশালা থেকে দৌড়! এক-দৌড়ে ষষ্ঠীতলায় হাজির। সেখান থেকে দেখছি—গঙ্গার ওপারে তুলসীগাছের পাতা ঝুর-ঝুর করছে, তারই তলায় মা-আমার দুগ্‌গো-পিদিম জ্বালছেন! ওদিকে দেখছি গুরুমশায় ঠ্যাঙার গুঁতি হাতে, সঙ্গে হারুন্দে, কিচ্‌কিন্দে আর সেই মনসা-বুড়ো আর আংলা-কাংলা-বাংলা যত ভূত-পেরেত! যেমন গুরুকে দেখা আর 'মা!' বলে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়েছি, অমনি দেখি আমাদের বাড়িতে হাজির। সেখানে দেখি ঝড় হচ্ছে, শিল পড়ছে, আর আমবাগানে আমার ছোটো-ছোটো দাদা-দিদিরা আমকুড়োতে লেগেছে। আমিও মায়ের বাড়িতে আঁচল ভরে শিল আর আম কুড়োতে লেগে গেছি। ভূত-পেরেত কেউ সেখানে আসবার জো নেই। এসেছে কেবল আমার সঙ্গে উড়তে-উড়তে গোবিন্দর মায়ের ভোঁদড়-ছেলে, আর আমার বন্ধু সেই লক্ষ্মীপ্যাঁচাটি। তাকে একটা আমগাছের কোটরে বাসা বেঁধে দিয়েছি, রোজ রাত্তিরে সে আমার গায়ে ফুঁ দেয় আর আমি মাসির

বাড়ি, পিসির বাড়ি উড়ে বেড়াই। আমার ভূতপত্‌রী লাঠিটি কিন্তু গোবিন্দর মা চুরি করে রেখে দিয়েছে। লাঠি নইলে তো চলতে পারি না। তোমরা সবাই চাঁদা করে যদি আমাকে একটা আঁকাবাঁকা লাঠি কেনবার পয়সা দাও তবে সেইটে নিয়ে আমি একবার মামার বাড়ি যাই, আর তোমাদের জন্যে বাঁকানদীর ধার থেকে অনেক আঁকাবাঁকা ছবি জোগাড় করে আনতে পারি।

নালক

বুদ্ধ ও সুজাতা

অবুদাদার

টাক্ মাথায় কুন্তলীন, ছেঁড়া-জামায় দেল্‌খোস
হয়ে থাকো এই আশায় থৈ মোয়ার

উৎকোচ !

ও আমার

নূন্ সাগরের ওযোন্ বাতাস
মনসা কাঁটার সোণার ফুল

অপুদিদি !

দেবলঋষি যোগে বসেছিলেন। নালক—সে একটি ছোটো ছেলে—ঋষির সেবা করছিল। অন্ধকার বর্ধনের বন, অন্ধকার বটগাছ-তলা, অন্ধকার এপার-গঙ্গা ওপার-গঙ্গা। নিশুতিরাতে কালো আকাশে তারা ফুটেছে, বাতাস ঘুমিয়ে আছে, জলে ঢেউ উঠছে না, গাছে পাতা নড়ছে না। এমন সময় অন্ধকারে আলো ফুটল—ফুল যেমন করে ফোটে, চাঁদ যেমন করে ওঠে—একটু, একটু, আরো একটু। সমস্ত পৃথিবী দুলে উঠল—পদ্মপাতার জল যেমন দুলতে থাকে—এদিক-সেদিক, এধার-ওধার সে-ধার! ঋষি চোখ মেলে চাইলেন, দেখলেন আকাশে এক আশ্চর্য আলো! চাঁদের আলো নয়, সূর্যের আলো নয়, সমস্ত আলো মিশিয়ে এক আলোর আলো! এমন আলো কেউ কখনো দেখে নি! আকাশ-জুড়ে কে যেন সাত-রঙের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছে। কোন দেবতা পৃথিবীতে নেমে আসবেন তাই কে যেন শূন্যের উপরে আলোর একটি-একটি ধাপ গেঁথে গিয়েছে!

সন্ন্যাসী আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, নালককে বললেন—'কপিলবাস্তুতে বুদ্ধদেব জন্ম নেবেন, আমি তাঁর দর্শন করতে চললেম, তুমি সাবধানে থেকো।'

বনের মাঝ দিয়ে আঁকাবাঁকা সরু পথ, সন্ন্যাসী সেই পথে উত্তর-মুখে চলে গেলেন। নালক চুপটি করে বটতলায় ধ্যানে বসে দেখতে লাগল—একটির পর একটি ছবি।

কপিলবাস্তুর রাজবাড়ি। রাজরানী মায়াদেবী সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে আছেন। ঘরের সামনে খোলা ছাদ, তার ওধারে বাগান, শহর, মন্দির, মঠ। আরো ওধারে—অনেক দূরে হিমালয়পর্বত—শাদা বরফে ঢাকা। আর সেই পাহাড়ের ওধারে আকাশ-জুড়ে

আশ্চর্য এক শাদা আলো ; তার মাঝে সিঁদুরের টিপের মতো সূর্য উঠছেন ! রাজা শুদ্ধোদন এই আশ্চর্য আলোর দিকে চেয়ে আছেন, এমন সময় মায়াদেবী জেগে উঠে বলছেন, 'মহারাজ, কী চমৎকার স্বপ্নই দেখলেম ! এতটুকু একটি শ্বেতহস্তী, দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো বাঁকা-বাঁকা কচি দুটি দাঁত, সে যেন হিমালয়ের ওপার থেকে মেঘের উপর দিয়ে আমার কোলে নেমে এল, তারপর যে কোথায় গেল আর দেখতে পেলেম না ! আহা, কপালে তার সিঁদুরের টিপের মতো একটি টিপ ছিল ।'

রাজা-রানী স্বপ্নের কথা বলাবলি করছেন, ইতিমধ্যে সকাল হয়েছে, রাজবাড়ির নবৎখানার বাঁশি বাজছে, রাস্তা দিয়ে লোকজন চলাফেরা করছে, মন্দির থেকে শাঁখঘণ্টার শব্দ আসছে, অন্দরমহলে রাজদাসীরা সোনার কলসীতে মায়াদেবীর চানের জল তুলে আনছে, মালিনীরা সোনার থালায় পুজোর ফুল গুছিয়ে রাখছে। রানীর পোষা ময়ূর ছাদে এসে উড়ে বসল, সোনার খাঁচায় শুকশারী খাবারের জন্য দাসীদের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিলে, ভিখিরী এসে 'জয় রানীমা !' বলে দরজায় দাঁড়াল। দেখতে-দেখতে বেলা হল, রাজবাড়িতে রানীর স্বপ্নের কথা নিয়ে সকলে বলাবলি করতে লাগল ।

কপালে রক্ত-চন্দনের তিলক, মাথায় মানিকের মুকুট, পরনে লাল চেলী, সকালে সূর্যের মতো রাজা শুদ্ধোদন রাজসিংহাসন আলো করে বসেছেন। পাশে মন্ত্রীবর, তাঁর পাশে দণ্ডধর— সোনার ছড়ি হাতে, ওপাশে ছত্রধর— শ্বেতছত্তর খুলে, তার ওপাশে নগরপাল—ঢাল-খাঁড়া নিয়ে ।

রাজার দুইদিকে দুই দালান ; একদিকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, আর-একদিকে দেশবিদেশের রাজা আর রাজপুত্তুর। রাজসভা ঘিরে দেশের প্রজা, তাদের ঘিরে যত দুয়ারী— মোটা রায়বাঁশের লাঠি আর কেবল লাল-পাগড়ির ভিড় ।

রাজসভার ঠিক মাঝখানে লাল চাঁদোয়ার ঠিক নিচে আটখানি

রক্তকম্বলের আসন, তারি উপরে রাজার আট গণৎকার খড়ি-হাতে, পুথি খুলে, রানীর স্বপ্নের কথা গণনা করতে বসেছেন। তাঁদের কারো মাথায় পাকা চুল, কারো মাথায় টাক, কারো বা ঝুঁটি বাঁধা, কারো বা ঝাঁটা গোঁফ! সকলের হাতে এক-এক শামুক নস্যি। আট পণ্ডিত কেউ কলমে লিখে, কেউ খড়িতে দেগে রানীর স্বপ্নের ফল গুণে বলছেন :

'সূর্যস্বপ্নে রাজচক্রবর্তী পুত্র মহাতেজস্বী। চন্দ্রে তথা রূপবান গুণবান রাজাধীরাজ দীর্ঘজীবী। শ্বেতহস্তীর স্বপ্নে শান্ত গম্ভীর জগৎ-দুর্লভ এবং জীবের দুঃখহারী মহাধার্মিক ও মহাবুদ্ধ পুত্রলাভ। এবার নিশ্চয় মহারাজ, এক মহাপুরুষ এই শাক্যবংশে অবতীর্ণ হবেন। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা হয় না। আনন্দ করো।'

চারিদিকে অমনি রব উঠল— 'আনন্দ করো, আনন্দ করো! অন্নদান করো, বস্ত্রদান করো, দীপদান, ধূপদান, ভূমিদান করো।' কপিলবাস্তুতে রাজার ঘরে, প্রজার ঘরে, হাটে-মাঠে-ঘাটে আনন্দের বাজনা বেজে উঠল, আকাশ আনন্দে হাসতে লাগল, বাতাস আনন্দে বইতে লাগল। রাজমুকুটের মানিকের দুল, রাজ-ছত্তরের মুক্তোর ঝালর, মন্ত্রীর গলায় রাজার-দেওয়া কণ্ঠমালা, পণ্ডিতদের গায়ে রানীর দেওয়া ভোটকম্বল, দাসদাসী দীনদুঃখী ছেলে-বুড়োর মাথায় রাজবাড়ির লাল চেলী আনন্দে দুলতে থাকল। প্রকাণ্ড বাগান; বাগানের শেষ দেখা যায় না, কেবলি গাছ, গাছের পর গাছ, আর সবুজ ঘাস; জলের হাওয়া, ঠাণ্ডা ছাওয়া, পাখিদের গান আর ফুলের গন্ধ। বাগানের মাঝে এক প্রকাণ্ড পদ্মপুকুর। পদ্মপুকুরের ধারে আকাশ-প্রমাণ এক শাল গাছ, তার ডালে-ডালে পাতায়-পাতায় ফুল ধরেছে; দখিনে বাতাসে সেই ফুল, গাছতলায় একটি শ্বেতপাথরের চৌকির উপরে উড়ে পড়ছে।

সন্ধে হয়ে এল। সুরূপা যত পাড়ার মেয়ে পদ্মপুকুরে গা ধুয়ে উঠে গেল। উবু ঝুঁটি, গলায় কাঁটি, দুই কানে সোনার মাকড়ি একদল মালি-মালিনী শুকনো পাতা ঝাঁট দিতে-দিতে, ফুলের

গাছে জল দিতে-দিতে, বেলা শেষে বাগানের কাজ সেরে চলে গেল। সবুজ ঘাসে, পুকুর পাড়ে, গাছের তলায়— কোনোখানে কোনো-কোণে একটু ধুলো, একটি কুটোও রেখে গেল না।

রাত আসছে— বসন্তকালের পূর্ণিমার রাত! পশ্চিমে সূর্য ডুবছেন, পুবে চাঁদ উঠি-উঠি করছেন। পৃথিবীর এক পারে সোনার শিখা, আর-একপারে রুপোর রেখা দেখা যাচ্ছে। মাথার উপর নীল আকাশ, লক্ষকোটি তারায় আর সন্ধিপুজোর শাঁখ-ঘণ্টায় ভরে উঠছে। এমন সময় মায়াদেবী রুপোর জালে ঘেরা সোনার পালকিতে সহচরী সঙ্গে বাগান-বেড়াতে এলেন; রানীকে ঘিরে রাজদাসী যত ফুলের পাখা, পানের বাটা নিয়ে। প্রিয় সখীর হাতে হাত রেখে, ছায়ায়-ছায়ায় চলে ফিরে, রানী এসে বাগানের মাঝে প্রকাণ্ড সেই শালগাছের তলায় দাঁড়ালেন— বাঁ হাতখানি ফুলে-ফুলে ভরা শালগাছের ডালে, আর ডান হাতখানি কোমরে রেখে।

অমনি দিন শেষ হল, পাখিরা একবার কলরব করে উঠল, বাতাসে অনেক ফুলের গন্ধ, আকাশে অনেক তারার আলো ছড়িয়ে পড়ল। পুবে পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হলেন— শালগাছটির উপরে যেন একটি সোনার ছাতা! ঠিক সেই সময় বুদ্ধদেব জন্ম নিলেন— যেন একটি সোনার পুতুল, চাঁপাফুলে-ঘেরা পৃথিবীতে যেন আর এক চাঁদ। চারি দিক আলোয়-আলো হয়ে গেল— কোনো-খানে আর অন্ধকার রইল না। মায়া মায়ের কোলে বুদ্ধদেব দেখা দিলেন, পৃথিবীর বুক জুড়িয়ে বুদ্ধদেব দেখা দিলেন— যেন পদ্মফুলের উপর এক ফোঁটা শিশির— নির্মল, সুন্দর, এতটুকু। দেখতে-দেখতে লুম্বিনী বাগান লোকে-লোকারণ্য হয়ে উঠল, পাত্র-মিত্র অনুচর সভাসদ সঙ্গে রাজা শুদ্ধোদন রাজপুত্রকে দেখতে এলেন। দাস-দাসীরা মিলে শাঁখ বাজাতে লাগল, উলু দিতে থাকল। স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে, আকাশে মেঘে-মেঘে দেবতার দুন্দুভি বাজছে, মর্তের ঘরে-ঘরে শাঁখঘণ্টা, পাতালের তলে-তলে, জগঝম্প, জয়ডঙ্কা বেজে উঠছে। বুদ্ধদেব তিনলোক-জোড়া তুমুল আনন্দের মাঝখানে জন্ম

নিয়ে পৃথিবীর উপরে প্রথম সাত পা চলে যাচ্ছেন! সুন্দর পা দুখানি যেখানে-যেখানে পড়ল সেখানে-সেখানে অতল, সুতল, রসাতল ভেদ করে একটি-একটি সোনার পদ্ম, আগুনের চরকার মতো, মাটির উপরে ফুটে উঠল; আর স্বর্গ থেকে সাতখানি মেঘ এসে সাত-সমুদ্রের জল এনে সেই-সেই সাতটি পদ্মের উপরে ঝির-ঝির করে ঢালতে লাগল!

নালক আশ্চর্য হয়ে দেখছে, দেব-দানব-মানবে মিলে সেই সাতপদ্মের মাঝখানে বুদ্ধদেবকে অভিষেক করছেন! এমন সময় নালকের মা এসে ডাকলেন— 'দস্যি ছেলে! ঋষি এখানে নেই আর তুমি একা এই বনে বসে রয়েছ! না ঘুম, না খাওয়া, না লেখাপড়া— কেবল চোখ বুজে ধ্যান করা হচ্ছে! এই বয়সে উনি আবার সন্ন্যাসী হয়েছেন! চল্, বাড়ি চল্!'

মা নালকের হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন, নালক মাটিতে লুটোপুটি খেয়ে বলতে লাগল— 'ছেড়ে দাও মা, তারপর কী হল দেখি। একটিবার ছাড়ো। মাগো, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে!'

সমস্ত বন নালকের দুঃখে কেঁদে-কেঁদে বলতে লাগল— ছেড়ে দে, ছেড়ে দে! আর ছেড়ে দে! একেবারে ঘরে এনে তালাবন্ধ! নালককে তারা জোর করে গুরুমশায়ের পাঠশালায় দিয়েছে। সেখানে গুরু বলছেন— 'ওকাস অহং ভন্তে।' নালক পড়ে যাচ্ছে— ভন্তে। গুরু বলছেন— 'লেখ্, অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।' নালক বড়ো-বড়ো করে তালপাতায় লিখে যাচ্ছে— 'সীলং দেথ মে ভন্তে।' কিন্তু তার লেখাতেও মন নেই, পড়াতেও মন নেই! তার প্রাণ বর্ধনের বনে সেই বটতলায় আর সেই কপিলবাস্তুর রাজধানীতে পড়ে আছে।

পাঠশালের খোড়ো-ঘরের জানলা দিয়ে একটি তিন্তিড়ী গাছ, খানিকটা কাশ আর কাঁটাবন, একটা বাঁশঝাড় আর একটি পুকুর দেখা যায়। দুপুরবেলা একটুখানি রোদ সেখানটা এসে পড়ে, একটা লালঝুঁটি কুবোপাখি ঝুপ করে ডালে এসে বসে আর কুব্কুব্

করে ডাকতে থাকে, কাঁটাগাছের ফুলের উপরে একটা কালো ভোমরা ভন্ ভন্ করে উড়ে বেড়ায়— একবার জানলার কাছে আসে আবার উড়ে যায়। নালক সেই দিকে চেয়ে থাকে আর ভাবে— আহা, ওদের মতো যদি ডানা পেতাম তবে কি আর মা আমায় ঘরে বন্ধ করে রাখতে পারতেন? এক দৌড়ে বনে চলে যেতাম। এমন সময়ে গুরু বলে ওঠেন— 'লেখ্‌রে লেখ্‌!' অমনি বনের পাখি উড়ে পালায়, তালপাতার উপরে আবার খস-খস করে ছেলেদের কলম চলতে থাকে। নালক যে কি কষ্টে আছে তা সেই জানে! হাত চলছে না, তবু পাতাড়ি-লেখা বন্ধ করবার জো নেই, কান্না আসুক তবু পড়ে যেতে হবে— য র ল, শ ষ স— বাদলের দিনেও, গরমের দিনেও, সকালেও, দুপুরেও।

নালক পাঠশালা থেকে মায়ের হাত ধরে যখন বাড়ি ফেরে, হয়তো শালগাছের উপরে তালগাছগুলোর মাথা দুলিয়ে পুবে-হাওয়া বইতে থাকে, বাঁশঝাড়ে কাকগুলো ভয়ে কা-কা করে ডেকে ওঠে। নালক মনে-মনে ভাবে আজ যদি এমন একটা ঝড় ওঠে যে আমাদের গ্রামখানা ঐ পাঠশালার খোড়ো চালটাসুদ্ধ একেবারে ভেঙে-চুরে উড়িয়ে নিয়ে যায়, তবে বনে গিয়ে আমাদের থাকতেই হয়, তখন আর আমাকে ঘরে বন্ধ করবার উপায় থাকে না। রাতের বেলায় ঘরে বাইরে বাতাস শন-শন বইতে থাকে, বিদ্যুতের আলো যতই ঝিকমিক চমকাতে থাকে, নালক ততই মনে-মনে ডাকতে থাকে— ঝড় আসুক, আসুক বৃষ্টি! মাটির দেয়াল গলে যাক, কপাটের খিল ভেঙে যাক! ঝড়ও আসে, বৃষ্টিও নামে, চারি দিক জলে-জলময় হয়ে যায়; কিন্তু হায়! কোনোদিন কপাটও খোলে না, দেয়ালও পড়ে না— যে বন্ধ সেই বন্ধ! খোলা মাঠ, খোলা আকাশে ঘেরা বর্ধনের সেই তপোবনে নালক আর কেমন করে ফিরে যাবে? যেখানে পাখিরা আনন্দে উড়ে বেড়ায়, হরিণ আনন্দে খেলে বেড়ায়, গাছের তলায় মাঠের বাতাসে যেখানে ধরে রাখবার কেউ নেই— সবাই ইচ্ছামতো খেলে বেড়াচ্ছে, উড়ে বেড়াচ্ছে।

ঋষির আশাপথ চেয়ে নালক দিন গুণছে, ওদিকে দেবলঋষি কপিলবাস্তু থেকে বুদ্ধদেবের পদধূলি সর্বাঙ্গে মেখে, আনন্দে দুই হাত তুলে নাচতে-নাচতে পথে আসছেন আর গ্রামে-গ্রামে গান গেয়ে চলেছেন— 'নমো নমো বুদ্ধদিবাকরায়। নমো নমো গোতমচন্দ্রিমায়। নমো অনন্তগুণার্ণবায়, নমো শাক্যনন্দনায়।'

শরৎকাল। আকাশে সোনার আলো। পথের দুইধারে মাঠে-মাঠে সোনার ধান। লোকের মন আর ঘরে থাকতে চায় না। রাজারা ঘোড়া সাজিয়ে দিগ্‌বিজয়ে চলেছেন, প্রজারা দলে-দলে ঘর ছেড়ে হাটে-মাঠে-ঘাটে— কেউ পসরা মাথায়, কেউ ধানখেত নিড়োতে, কেউবা সাত-সমুদ্র-তেরো-নদী-পারে বাণিজ্য করতে চলেছে। যাদের কোনো কাজ নেই তারাও দল-বেঁধে ঋষির সঙ্গে সঙ্গে গান গেয়ে চলেছে— 'নমো নমো বুদ্ধদিবাকরায়!'

সন্ধ্যাবেলা। নীল আকাশে কোনোখানে একটু মেঘের লেশ নেই, চাঁদের আলো আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত নেমে এসেছে, মাথার উপর আকাশ-গঙ্গা এক টুকরো আলোর জালের মতো উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত দেখা দিয়েছে। দেবলঋষি গ্রামের পথ দিয়ে গেয়ে চলেছেন— 'নমো নমো গোতমচন্দ্রিমায়।' মায়ের কোলে ছেলে শুনছে— 'নমো নমো গোতমচন্দ্রিমায়।' ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে মা শুনছেন— 'নমো নমো'; বুড়ি দিদিমা ঘরের ভিতর থেকে শুনছেন— 'নমো'; অমনি তিনি সবাইকে ডেকে বলছেন— 'ওরে নোমো কর্, নোমো কর্।' গ্রামের ঠাকুরবাড়ির শাঁখঘণ্টা ঋষির গানের সঙ্গে একতানে বেজে উঠছে— নমো নমো নমো। রাত যখন ভোর হয়ে এসেছে, শিশিরে নুয়ে পদ্ম যখন বলছে— নমো, চাঁদ পশ্চিমে হেলে বলছেন— নমো, সেই সময়ে নালক ঘুম থেকে উঠে বসেছে আর অমনি ঋষি এসে দেখা দিয়েছেন! আগল খুলে গেছে। খোলা দরজায় সোনার রোদ একেবারে ঘরের ভিতর পর্যন্ত এসে নালকের মাথার উপরে পড়েছে। নালক উঠে ঋষিকে প্রণাম করেছে আর ঋষি নালককে আশীর্বাদ করছেন— 'সুখী হও, মুক্ত হও।'

ঋষির হাত ধরে নালক পথে এসে দাঁড়িয়েছে, নালকের মা দুই চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে ঋষিকে বলছেন— 'নালক ছাড়া আমার কেউ নেই, ওকে নিয়ে যাবেন না।'

ঋষি বললেন— 'দুঃখ কোরো না, আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে নালককে ফিরে পাবে। ভয় কোরো না; এসো, তোমার নালককে বুদ্ধদেবের পায়ে সঁপে দাও।' ঋষি মন্ত্র পড়তে থাকলেন আর নালকের মা ছেলের দুই হাত ধরে বলতে লাগলেন—

'কুসুমং ফুল্লিতং এতং পগ্‌গহেত্বান অঞ্জলিং
বুদ্ধ সেষ্ঠং সবিত্বান আকাসেমপিপূজয়ে।'

নির্মল আকাশের নিচে বুদ্ধদেবের পূজা করি; সুন্দর আমার (নালক) ফুল তাঁকে দিয়ে পূজা করি।

ঋষি নালকের হাত ধরে বনের দিকে চলে গেলেন।

আবার সেই বর্ধনের বন, সেই বটগাছের তলা! গাছের নিচে দেবলঋষি আর সন্ন্যাসীর দল আগুনের চারিদিক ঘিরে বসেছেন, আগুনের তেজে সন্ন্যাসীদের হাতে ত্রিশূল ঝকঝক করছে।

নিবিড় বন। চারিদিকে কাজল অন্ধকার, কিছু আর দেখা যায় না, কেবল গোছা-গোছা অশত্থ-পাতায়, মোটা মোটা গাছের শিকড়ে আর সন্ন্যাসীদের জটায়, তপ্ত সোনার মতো রাঙা আলো ঝিক-ঝিক করছে— যেন বাদলের বিদ্যুৎ!

এই অন্ধকারে নালক চুপটি করে আবার ধ্যান করছে। মাথার উপরে নীলাম্বরী আকাশ, বনের তলায় স্থির অন্ধকার। কোনো দিকে কোনো সাড়া নেই, কারো মুখে কোনো কথা নেই কেবল এক-একবার দেবলঋষি বলছেন— 'তার পরে?' আর নালকের চোখের সামনে ছবি আসছে আর সে বলে যাচ্ছে:

'রাজা শুদ্ধোদন বুদ্ধদেবকে কোলে নিয়ে হরিণের ছাল-ঢাকা গজদন্তের সিংহাসনে বসেছেন, রাজার দুই পাশে চার-চার গণৎকার, রাজার ঠিক সামনে হোমের আগুন, ওদিকে গোতমী মা, তাঁর চারিদিকে ধান-দূর্বা, শাঁখ-ঘণ্টা, ফুল-চন্দন, ধূপ-ধুনো।

'পূজা শেষ হয়েছে। রাজা ব্রাহ্মণদের বলছেন— রাজপুত্রের নাম হল কী ?

'ব্রাহ্মণেরা বলছেন— এই রাজকুমার হতে পৃথিবীর লোক যত অর্থ, যত সিদ্ধি লাভ করবে— সেইজন্য এঁর নাম রইল সিদ্ধার্থ ; রাজা হলে এই রাজকুমার জীবনে সকল অর্থ আর রাজা না হলে বুদ্ধত্ব লাভ করে জগৎকে কৃতার্থ করবেন আর মরণের পরে নির্বাণ পেয়ে নিজেও চরিতার্থ হবেন— সেইজন্য এঁর নাম হল সিদ্ধার্থ।

'রাজা বলছেন— কুমার সিদ্ধার্থ রাজা হয়ে রাজত্ব করবেন, কি রাজ্য ছেড়ে বনে গিয়ে বুদ্ধত্ব পাবার জন্যে তপস্যা করবেন ? সেই কথা আপনারা স্থির করে বলুন।

'রাজার আট গণৎকার খড়ি-পেতে গণনা করে বলছেন! প্রথমে শ্রীরাম আচার্য, তিনি রাজাকে দুই আঙুল দেখিয়ে বলছেন— মহারাজ, ইনি রাজাও হতে পারেন, সন্ন্যাসীও হতে পারেন ঠিক বলা কঠিন, দুইদিকেই সমান টান দেখছি। রামের ভাই লক্ষ্মণ অমনি দুই চোখ বুজে বলছেন— দাদা যা বলেছেন তাই ঠিক। জয়ধ্বজ দুই হাত ঘুরিয়ে বলছেন— হ্যাঁও বটে, নাও বটে। শ্রীমন্তিন দুইদিকেই ঘাড় নেড়ে বলছেন— আমারও ওই কথা। ভোজ দুই চোখ পাকল করে বলছেন— এটাও দেখছি, ওটাও দেখছি। সুদত্ত বলছেন, ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় নেড়ে— এদিকও দেখলেম, ওদিকও দেখলেম। সুদত্তের ভাই সুবাম দুই নাকে নস্যি টেনে বলছেন— দাদার দিকটাই ঠিক দেখছি। কেবল সবার ছোটো অথচ বিদ্যায় সকলের বড়ো কৌণ্ডিন্য এক আঙুল রাজার দিকে দেখিয়ে বলছেন— মহারাজ, এদিক কি ওদিক, এটা-কি ওটা নয়— এই রাজকুমার বুদ্ধ হওয়া ছাড়া আর কোনোদিকেই যাবেন না স্থিরনিশ্চয়। ইনি কিছুতেই ঘরে থাকবেন না। যেদিন এঁর চোখে এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধ মানুষ, রোগশীর্ণ দুঃখী মানুষ, একটি মরা মানুষ আর এক সন্ন্যাসী ভিখারী পড়বে, সেদিন আপনার সোনার সংসার অন্ধকার করে কুমার সিদ্ধার্থ চলে যাবেন— সোনার শিকল কেটে পাখি যেমন উড়ে যায়।'

সন্ন্যাসীর দল হুঙ্কার দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। নালক চেয়ে দেখল সকাল হয়েছে।

আর কিছু দেখা যায় না! সেদিন থেকে নালক যখনি ধ্যান করে তখনি দেখে সূর্যের আলোয় আগুনের মতো ঝকঝক করছে— আকাশের নীল ঢেকে, বাতাসের চলা বন্ধ করে— সোনার-ইঁটে-বাঁধানো প্রচণ্ড প্রকাণ্ড এক সোনার দেয়াল। তার শেষ নেই, আরম্ভও দেখা যায় না। নালকের মন-পাখি উড়ে-উড়ে চলে আর সেই দেয়ালে বাধা পেয়ে ফিরে-ফিরে আসে। এমনি করে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কাটছে। সোনার দেয়ালের ওপারে রয়েছেন সিদ্ধার্থ আর এপারে রয়েছে নালক— যেন খাঁচার পাখি আর বনের পাখি।

ছেলে পাছে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যায় সেই ভয়ে রাজা শুদ্ধোদন সোনার স্বপন দিয়ে, হাসি আর বাঁশি, আমোদ আর আহ্লাদের মায়া দিয়ে সিদ্ধার্থকে বন্ধ রেখেছেন— সোনার খাঁচায় পাখিটির মতো। যখন গরমের দিনে রোদের তেজ বাড়ে, জল শুকিয়ে যায়, তপ্ত বাতাসে চারিদিক যেন জ্বলতে থাকে ; বর্ষায় যখন নতুন মেঘ দেখা দেয় জলের ধারায় পৃথিবী ভেসে যায়, নদীতে স্রোত বাড়ে ; শরতের আকাশ যখন নীল হয়ে ওঠে, শাদা মেঘ পাতলা হাওয়ায় উড়ে চলে, নদীর জল সরে গিয়ে বালির চড়া জেগে ওঠে, শীতে যখন বরফে আর কুয়াশায় চারি দিক ঢাকা পড়ে, পাতা খসে যায়, ফুল ঝরে যায় ; আবার বসন্তে যখন ফুলে ফুলে পৃথিবী ছেয়ে যায়, গন্ধে আকাশ ভরে ওঠে দখিনে বাতাসে চাঁদের আলোয়, পাখির গানে আনন্দ ফুটে-ফুটে পড়তে থাকে— তখন খাঁচার পাখির মন যেমন করে, সোনার দোয়ালে-ঘেরা রাজমন্দিরে বুদ্ধদেবেরও মন তেমনি করে— এই সোনার খাঁচা ভেঙে বাইরে আসতে। তিনি যেন শোনেন— সমস্ত জগৎ, সারা পৃথিবী গরমের দিনে, বাদলা রাতে, শরতের সন্ধ্যায়, শীতের সকালে, বসন্তের পহরে-পহরে— কখনো কোকিলের কুহু, কখনো বাতাসের হুহু, কখনো বা বিষ্টির ঝর-ঝর,

শীতের থর-থর, পাতার মর্মর দিয়ে কেঁদে কেঁদে মিনতি করে তাঁকে ডাকছে— বাহিরে এসো, বাহিরে এসো, নিস্তার করো, নিস্তার করে! ত্রিভুবনে দুঃখের আগুন জ্বলছে, মরণের আগুন জ্বলছে, শোকে তাপে জীবন শুকিয়ে যাচ্ছে। দেখো চোখের জলে বুক ভেসে গেল, দুঃখের বান মনের বাঁধ ধসিয়ে গেল। আনন্দ— সে তো আকাশের বিদ্যুতের মতো— এই আছে এই নেই; সুখ— সে তো শরতের মেঘের মতো, ভেসে যায়, থাকে না; জীবন— সে তো শীতের শিশিরে শিউলি ফুলের মতো ঝরে পড়ে; বসন্তকাল সুখের কাল— সে তো চিরদিন থাকে না! হায় রে, সারা পৃথিবীতে দুঃখের আগুন মরণের চিতা দিনরাত্রি জ্বলছে, সে আগুন কে নেবায়? পৃথিবী থেকে ভয়কে দূর করে এমন আর কে আছে— তুমি ছাড়া? মায়ায় আর ভুলে থেকো না, ফুলের ফাঁস ছিঁড়ে ফেলো, বাহিরে এসো— নিস্তার করো! জীবকে অভয় দাও!

নালকের প্রাণ, সারা পৃথিবীর লোকের প্রাণ, আকাশের প্রাণ, বাতাসের প্রাণ বুদ্ধদেবকে দেখবার জন্য আকুলি-বিকুলি করছে। তাদের মনের দুঃখু কখনো বিষ্টির মতো ঝরে পড়ছে, কখনো ঝড়ের মতো এসে সোনার দেয়ালে ধাক্কা দিচ্ছে; আলো হয়ে ডাকছে — এসো! অন্ধকার হয়ে বলছে— নিস্তার করো! রাঙা ফুল হয়ে ফুটে উঠছে, আবার শুকনো পাতা হয়ে ঝরে পড়ছে— সিদ্ধার্থের চারিদিকে চোখের সামনে— জগৎ সংসারে হাসি-কান্না, জীবন-মরণ —রাতে-দিনে মাসে-মাসে বছরে-বছরে নানাভাবে নানাদিকে।

একদিন তিনি দেখছেন নীল আকাশের গায়ে পারিজাত ফুলের মালার মতো একদল হাঁস সারি বেঁধে উড়ে চলেছে— কী তাদের আনন্দ! হাজার-হাজার ডানা একসঙ্গে তালে-তালে উঠছে পড়ছে, এক সুরে হাজার হাঁস ডেকে চলেছে— চল্, চল্, চল্‌রে চল্! আকাশ তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছে; মেঘ চলেছে শাদা পাল তুলে, বাতাস চলেছে মেঘের পর মেঘ ঠেলে, পৃথিবী তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছে। নদী চলেছে সমুদ্রের দিকে, সমুদ্র আসছে নদীর দিকে—

পাহাড় ভেঙে বালি ঠেলে। আনন্দে এত চলা এত বলা এত খেলার মাঝে কার হাতের তীর বিদ্যুতের মতো গিয়ে একটি হাঁসের ডানায় বিঁধল, অমনি যন্ত্রণার চিৎকারে দশদিক শিউরে উঠল। রক্তের ছিটেয় সকল গা ভাসিয়ে দিয়ে ছেঁড়া মালার ফুলের মতো তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল— তীরে-বেঁধা রাজহাঁস। কোথায় গেল তার এত আনন্দ— সেই বাতাস দিয়ে ভেসে চলা, নীল আকাশে ডেকে চলা! এক-নিমেষে ফুরিয়ে গেল পৃথিবীর সব আনন্দ, সব প্রাণ! আকাশ খালি হয়ে গেল, বাতাসের চলা বন্ধ হয়ে গেল; সব বলা, সব চলা, সব খেলা শেষ হয়ে গেল একটি তীরের ঘা পেয়ে! কেবল দূর থেকে— সিদ্ধার্থের কানের কাছে, প্রাণের কাছে বাজতে লাগল— কান্না আর কান্না! বুক ফেটে কান্না! দিনে রাতে, যেতে আসতে, চলতে ফিরতে, সুখের মাঝে, শান্তির মাঝে, কাজে-কর্মে, আমোদে-আহ্লাদে তিনি শুনতে থাকলেন— কান্না আর কান্না! জগৎ-জোড়া কান্না! ছোটোর ছোটো তার কান্না, বড়োর বড়ো তাদেরও কান্না।

দিবারাত্রি ক্রমাগত ঝড়বৃষ্টি, অন্ধকারের পরে সেদিন মেঘ কেটে গিয়ে সকালের আলো পুবদিকে দেখা দিয়েছে, আকাশ আজ আনন্দে হাসছে, বাতাস আনন্দে বইছে, মেঘের গায়ে-গায়ে মধুপিঙ্গল আলো পড়েছে; বনে-বনে পাখিরা, গ্রামে-গ্রামে চাষীরা ঘরে-ঘরে ছেলে-মেয়েরা আজ মধুমঙ্গল গান গাইছে। পুবের দরজায় দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থ দেখছেন— আজ যেন কোথাও দুঃখ নেই, কান্না নেই! যতদূর দেখা যায়, যতখানি শোনা যায়— সকলি আনন্দ। মাঠের মাঝে আনন্দ সবুজ হয়ে দেখা দিয়েছে; বনে-উপবনে আনন্দ ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে; ঘরে-ঘরে আনন্দ ছেলে-মেয়ের হাসিমুখে, রঙিন কাপড়ে, নতুন-খেলনায় ঝিক-ঝিক করছে, ঝুম-ঝুম বাজছে; আনন্দ— পুষ্পবৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ছে— লতা থেকে পাতা থেকে; আনন্দ— সে সোনার ধুলো হয়ে উড়ে চলেছে পথে-পথে— যেন আবির খেলে।

সিদ্ধার্থের মনোরথ— সিদ্ধার্থের সোনার রথ আজ আনন্দের মাঝ দিয়ে পুবের পথ ধরে সকালের আলোর দিকে অন্ধকারের শেষের দিকে এগিয়ে চলেছে— আস্তে-আস্তে। মনে হচ্ছে— পৃথিবীতে আজ দুঃখ নেই, শোক নেই, কান্না নেই, রয়েছে কেবল আনন্দ— ঘুমের পরে জেগে ওঠার আনন্দ, অন্ধকারের পরে আলো পাওয়ার আনন্দ, ফুলের মতো ফুটে ওঠা, মালার মতো দুলে ওঠা, গানে-গানে বাঁশির তানে জেগে ওঠার আনন্দ। পৃথিবীতে কিছু যেন আজ ঝরে পড়ছে না, ঝুরে মরছে না!

এমন সময় সকালের এত আলো, এত আনন্দ, ঝড়ের মুখে যেন প্রদীপের মতো নিবিয়ে দিয়ে সিদ্ধার্থের রথের আগে কে জানে কোথা থেকে এসে দাঁড়াল— অন্তহীন দন্তহীন একটা বুড়ো মানুষ লাঠিতে ভর দিয়ে। তার গায়ে একটু মাংস নেই, কেবল ক'খানা হাড়! বয়সের ভারে সে কুঁজো হয়ে পড়েছে, তার হাত কাঁপছে, পা কাঁপছে, ঘাড় কাঁপছে; কথা বলতে কথাও তার কেঁপে যাচ্ছে। চোখে সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না, কানে সে কিছু শুনতে পাচ্ছে না— কেবল দুখানা পোড়া কাঠের মতো রোগা হাত সামনে বাড়িয়ে সে আলোর দিক থেকে অন্ধকারের দিকে চলে যাচ্ছে— গুটি-গুটি, একা! তার শক্তি নেই, সামর্থ্য নেই, নেই তার একটি আপনার লোক, নেই তার সংসারে ছেলে-মেয়ে বন্ধুবান্ধব; সব মরে গেছে, সব ঝরে গেছে— জীবনের সব রঙ্গরস শুকিয়ে গেছে— সব খেলা শেষ করে! আলো তার চোখে এখন দুঃখ দেয়, সুর তার কানে বেসুরো বাজে, আনন্দ তার কাছে নিরানন্দ ঠেকে। সে নিজের চারি দিকে অনেকখানি অন্ধকার, অনেক দুঃখ শোক, অনেক জ্বালা-যন্ত্রণা শতকুটি কাঁথার মতো জড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে— একা, একদিকে— আনন্দ থেকে দূরে আলো থেকে দূরে। প্রাণ তার কাছ থেকে সরে পালাচ্ছে, গান তার সাড়া পেয়ে চুপ হয়ে যাচ্ছে, সুখ তার ত্রিসীমানায় আসছে না, সুন্দর তাকে দেখে ভয়ে মরছে! সকালের আলোর উপরে কালো ছায়া ফেলে অদন্তের বিকট হাসি

হেসে পিশাচের মতো সেই মূর্তি সিদ্ধার্থের সামনে পথ আগলে বললে— 'আমাকে দেখ, আমি জরা, আমার হাতে কারো নিস্তার নেই— আমি সব শুকিয়ে দিই, ঝরিয়ে দিই, সব শুষে নিই, সব লুটে নিই! আমাকে চিনে রাখো হে রাজকুমার! তোমাকেও আমার হাতে একদিন পড়তে হবে— রাজপুত্র বলে তুমি জরার হাত থেকে নিস্তার পাবে না!' দশদিকে সে একবার বিকট হাসি হেসে চেয়ে দেখলে অমনি আকাশের আলো, পৃথিবীর সবুজ তার দৃষ্টিতে এক নিমেষে মুছে গেল, খেত জ্বলে গেল, নদী শুকিয়ে গেল— নতুন যা কিছু পুরোনো হয়ে গেল, টাটকা যা কিছু বাসি হয়ে গেল। সিদ্ধার্থ দেখলেন— পাহাড় ধসে পড়ছে, গাছ ভেঙে পড়ছে, সব ধুলো হয়ে যাচ্ছে সব গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে— তার মাঝ দিয়ে চলে যাচ্ছে শাদা চুল বাতাসে উড়িয়ে, ছেঁড়া কাঁথা মাটিতে লুটিয়ে পায়ে-পায়ে গুটি-গুটি— অন্তহীন দন্তহীন বিকটমূর্তি জরা— সংসারের সব আলো নিবিয়ে দিয়ে সব আনন্দ ঘুচিয়ে দিয়ে সব শুষে নিয়ে সব লুটে নিয়ে একলা হাড়ে-হাড়ে করতাল বাজিয়ে।

আর একদিন সিদ্ধার্থের সে মনোরথ— সিদ্ধার্থের সোনার রথ মৃদুমন্দ বাতাসে ধ্বজাপতাকা উড়িয়ে দিয়ে কপিলবাস্তুর দক্ষিণ দুয়ার দিয়ে আস্তে-আস্তে বার হয়েছে। মলয় বাতাস কত ফুলের গন্ধ, কত চন্দনবনের শীতল পরশে ঠাণ্ডা হয়ে গায়ে লাগছে— সব তাপ, সব জ্বালা জুড়িয়ে দিয়ে। ফুল-ফোটানো মধুর বাতাস, প্রাণ-জুড়ানো দখিন বাতাস! কত দূরের মাঠে-মাঠে রাখালছেলের বাঁশির সুর, কত দূরের বনের বনে-বনে পাপিয়ার পিউগান সেই বাতাসে ভেসে আসছে— কানের কাছে, প্রাণের কাছে! সবাই বার হয়েছে, সবাই গেয়ে চলেছে— খোলা হাওয়ার মাঝে, তারার আলোর নিচে— দুয়ার খুলে, ঘর ছেড়ে! আকাশের উপরে ঠাণ্ডা নীল আলো, পৃথিবীর উপরে ঠাণ্ডা আলো-ছায়া, তার মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে মৃদুমন্দ মলয় বাতাস— ফুর-ফুরে দখিন বাতাস— জলে-স্থলে বনে-উপবনে ঘরে-বাহিরে— সুখের পরশ দিয়ে, আনন্দের বাঁশি বাজিয়ে।

সে বাতাসে আনন্দে বুক দুলে উঠছে, মনের পাল ভরে উঠছে। মনোরথ আজ ভেসে চলেছে নেচে চলেছে— সারি-গানের তালে-তালে সুখসাগরের থির জলে। স্বপ্নের ফুলের মতো শুকতারাটি আকাশ থেকে চেয়ে রয়েছে— পৃথিবীর দিকে। সুখের আলো ঝরে পড়েছে, সুখের বাতাস ধীরে বইছে— পুবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে। মনে হচ্ছে— আজ অসুখ যেন দূরে পালিয়েছে, অসোয়াস্তি যেন কোথাও নেই, জগৎসংসার সবই যেন, সবাই যেন আরামে রয়েছে সুখে রয়েছে শান্তিতে রয়েছে।

এমন সময় পর্দা সরিয়ে দিয়ে সুখের স্বপন ভেঙে দিয়ে সিদ্ধার্থের চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা পাঙাশ মূর্তি— জ্বরে জর্জর, রোগে কাতর। সে দাঁড়াতে পারছে না— ঘুরে পড়ছে। সে চলতে পারছে না— ধুলোর উপরে, কাদার উপরে শুয়ে রয়েছে। কখনো সে শীতে কাঁপছে, কখনো-বা গায়ের জ্বালায় সে জল-জল করে চিৎকার করছে। তার সমস্ত গায়ের রক্ত তার চোখ-দুটো দিয়ে ঠিকরে পড়ছে। সেই চোখের দৃষ্টিতে আকাশ আগুনের মতো রাঙা হয়ে উঠেছে। সমস্ত গায়ের রক্ত জল হয়ে তার কাগজের মতো পাঙাশ, হিম অঙ্গ বেয়ে ঝরে পড়ছে। তাঁকে ছুঁয়ে বাতাস বরফের মতো হিম হয়ে যাচ্ছে। সে নিশ্বাস টানছে যেন সমস্ত পৃথিবীর প্রাণকে শুষে নিতে চাচ্ছে। সে নিশ্বাস ছাড়ছে যেন নিজের প্রাণ, নিজের জ্বালা-যন্ত্রণা সারা সংসারে ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সিদ্ধার্থ দেখলেন, সংসারের আলো নিবে গেছে, বাতাস মরে গেছে, সব কথা সব গান চুপ হয়ে গেছে। কেবল ধুলো-কাদা-মাখা জ্বরের সেই পাঙাশ মূর্তির বুকের ভিতর থেকে একটা শব্দ আসছে— কে যেন পাথরের দেয়ালে হাতুড়ি পিটছে— ধ্বক, ধ্বক! তারি তালে তালে আকাশের সব তারা একবার নিবছে একবার জ্বলছে, বাতাস একবার আসছে একবার যাচ্ছে।

জ্বরের সেই ভীষণ মূর্তি দেখে সিদ্ধার্থ ঘরে এসেছেন, রাজ-ঐশ্বর্যের মাঝে ফিরে এসেছেন, সুখসাগরের ঘাটে ফিরে এসেছেন,

কিন্তু তখনো তিনি শুনছেন যেন তাঁর বুকের ভিতরে পাঁজরায়-পাঁজরায় ধাক্কা দিয়ে শব্দ উঠছে— ধ্বক, ধ্বক !

এবার পশ্চিমের দুয়ার দিয়ে-- অস্তাচলের পথ দিয়ে পশ্চিম-মুখে মনোরথ চলেছে— সোনার রথ চলেছে— যেদিকে দিন শেষ হচ্ছে, যেদিকে সূর্যের আলো অস্ত যাচ্ছে। সেদিক থেকে সবাই মুখ ফিরিয়ে চলে আসছে নিজের-নিজের ঘরের দিকে। পাখিরা ফিরে আসছে কলরব করে নিজের বাসায়— গাছের ডালে, পাতার আড়ালে। গাই-বাছুর সব ফিরে আসছে মাঠের ধার দিয়ে নদীর পার দিয়ে নিজের গোঠে, গোধূলির সোনার ধুলো মেখে। রাখাল-ছেলেরা ফিরে আসছে গাঁয়ের পথে বেণু বাজিয়ে মাটির ঘরে মায়ের কোলে। সবাই ফিরে আসছে ভিন্ গাঁয়ের হাট সেরে দূর পাটনে বিকিকিনির পরে। সবাই ঘরে আসছে— যারা দূরে ছিল তারা, যারা কাছে ছিল তারাও। ঘরের মাথায় আকাশ পিদিম, যাদের ঘর নেই দুয়োর নেই তাদের আলো ধরেছে। তুলসী-তলায় দুগ্‌গো পিদিম— যারা কাজে ছিল, কর্মে ছিল, যারা পড়া পড়ছিল, খেলা খেলছিল, তাদের জন্যে আলো ধরেছে। সবাই আজ মায়ের দুই চোখের মতো অনিমেষ দুটি আলোর দিকে চেয়ে-চেয়ে ফিরে আসছে মায়ের কোলে, ভাইবোনেদের পাশে, বন্ধু-বান্ধবের মাঝখানে। ভিখারী যে সেও আজ মনের আনন্দে একতারায় আগমনী বাজিয়ে গেয়ে চলেছে 'এল মা ওমা ঘরে এল মা।' মিলনের শাঁখ ঘরে-ঘরে বেজে উঠেছে। আগমনীর সুর, ফিরে আসার সুর, বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুর, কোলে এসে গলা-ধরার সুর, আকাশ দিয়ে ছুটে আসছে, বাতাস দিয়ে ছুটে আসছে, খোলা দুয়ারে উঁকি মারছে, খালি ঘরে সাড়া দিচ্ছে। শূন্য-প্রাণ, খালি-বুক ভরে উঠছে আজ ফিরে-পাওয়া সুরে, বুকে-পাওয়া সুরে, হারানিধি খুঁজে-পাওয়া সুরে !

সিদ্ধার্থ দেখছেন, সুখের আজ কোথাও অভাব নেই, আনন্দের মাঝে এমন-একটু ফাঁক নেই যেখান দিয়ে দুঃখ আজ আসতে

পারে। ভরা নদীর মতো ভরপুর আনন্দ, পূর্ণিমার চাঁদের মতো পরিপূর্ণ আনন্দ জগৎসংসার আলোয় ভাসিয়ে, রসে ভরে দিয়েছে। আনন্দের বান এসেছে। আর কোথাও কিছু শুকনো নেই কোনো ঠাঁই খালি নেই। সিদ্ধার্থ দেখতে-দেখতে চলেছেন মিলনের আনন্দ। ঝাঁকে-ঝাঁকে দলে-দলে আনন্দ আজ জোর করে দোর ঠেলে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, গলা জড়িয়ে ধরছে। কেউ আজ কাউকে ভুলে থাকছে না, ছেড়ে থাকছে না, ছেড়ে যাচ্ছে না, ছেড়ে দিচ্ছে না! আনন্দ কার নেই? আনন্দ নেই কোন্‌খানে? কে আজ দুঃখে আছে, চোখের জল কে ফেলছে, মুখ শুকিয়ে কে বেড়াচ্ছে? যেন তাঁর কথার উত্তর দিয়ে কোন্ এক ভাঙা মন্দিরের কাঁসরে খন্‌খন্ করে তিনবার ঘা পড়ল— আছে, আছে, দুঃখ আছে! অমনি সমস্ত সংসারের ঘুম যেন ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে একটা বুক ফাটা কান্না উঠল— হায় হায় হা হা! আকাশ ফাটিয়ে সে কান্না, বাতাস চিরে সে কান্না! বুকের ভিতরে বত্রিশ নাড়ি ধরে যেন টান দিতে থাকল— সে কান্না! সিদ্ধার্থ সুখের স্বপ্ন থেকে যেন হঠাৎ জেগে উঠলেন। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলেন, সব ক'টি তারার আলো যেন মরা-মানুষের চোখের মতো ঘোলা হয়ে গেছে! পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখলেন, রাত আড়াই-পহরে জলে-স্থলে পাঙাশ কুয়াশার জাল পড়ে আসছে— কে যেন শাদা একখানা চাদর পৃথিবীর মুখ ঢেকে আস্তে-আস্তে টেনে দিচ্ছে। ঘরে-ঘরে যত পিদিম জ্বলছিল সবগুলো জ্বলতে-নিবতে, নিবতে জ্বলতে, হঠাৎ এক সময় দপ করে নিবে গেল, আর জ্বলল না— কোথাও আর আলো রইল না। কিছু আর সাড়া দিচ্ছে না, শব্দ করছে না; আকাশের আধখানা-জুড়ে জলে-ভরা কালো মেঘ, কাঁদো-কাঁদো দুখানি চোখের পাতার মতো নুয়ে পড়েছে চোখের জলের মতো। বৃষ্টির এক-একটি ফোঁটা ঝরে পড়ছে— আকাশ থেকে পৃথিবীর উপর! তারি মাঝ দিয়ে বুদ্ধদেব দেখছেন দলে-দলে লোক চলেছে— শাদা চাদরে ঢাকা

হাজার-হাজার মরা-মানুষ কাঁধে নিয়ে, কোলে করে, বুকে ধরে। তাদের পা মাটিতে পড়ছে কিন্তু কোনো শব্দ করছে না, তাদের বুক ফুলে-ফুলে উঠছে বুকফাটা কান্নায়, কিন্তু কোনো কথা তাদের মুখ দিয়ে বার হচ্ছে না। নদীর পারে— যেদিকে সূর্য ডোবে, যেদিকে আলো নেবে, দিন ফুরিয়ে যায়— সেইদিকে দুই উদাস চোখ রেখে হনহন করে তারা এগিয়ে চলেছে মহা শ্মশানের ঘাটের মুখে-মুখে, দূরে-দূরে, অনেক দূরে— ঘর থেকে অনেক দূরে, বুকের কাছ থেকে কোলের কাছ থেকে অনেক দূরে— ঘরে আসা, ফিরে আসা, বুকে আসা, কোলে আসার পথ থেকে অনেক দূরে— চলে যাবার পথে, ছেড়ে যাবার পথে, ফেলে যাবার কাঁদিয়ে যাবার পথে।

এপারে ওপারে মরণের কান্না আর চিতার আগুন, মাঝ দিয়ে চলে যাবার পথ— কেঁদে চলে যাবার পথ, কাঁদিয়ে চলে যাবার পথ। থেকে-থেকে গরম নিশ্বাসের মতো এক-একটা দমকা বাতাসে রাশি-রাশি ছাই উড়ে এসে সেই মরণ-পথের যত যাত্রীর মুখে লাগছে, চোখে লাগছে! সিদ্ধার্থ দেখছেন ছাই উড়ে এসে মাথার চুল শাদা করে দিচ্ছে, গায়ের বরণ পাঙাশ করে দিচ্ছে! ছাই উড়ছে— সব-জ্বালানো, সব-পোড়নো গরম ছাই! আগুন নিবে ছাই হয়ে উড়ে চলেছে, জীবন ছাই হয়ে উড়ে চলেছে, মরণ— সেও ছাই হয়ে উড়ে চলেছে। সুখ ছাই হয়ে উড়ে যাচ্ছে, দুঃখ ছাই হয়ে উড়ে যাচ্ছে, সংসারের যা-কিছু যত-কিছু সব ছাই ভস্ম হয়ে উড়ে চলেছে দূরে-দূরে, মাথার উপরে খোলা আকাশ দিয়ে পাঙাশ একখানা মেঘের মতো। তারি তলায় বুদ্ধদেব দেখলেন— মরা ছেলেকে দুই হাতে তুলে ধরে এক মা একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন— বাতাস চারিদিকে কেঁদে বেড়াচ্ছে— হায় হায় হায় রে হায়! সেদিন ঘরে এসে সিদ্ধার্থ দেখলেন, তাঁর সোনার পুষ্পপাত্রে ফুটন্ত পদ্ম ফুলটির জায়গায় রয়েছে একমুঠো ছাই, আর মরা-মানুষের আধপোড়া একখানা বুকের হাড়।

আজ সে বরফের হাওয়া ছুরির মতো বুকে লাগছিল। শীতের

কুয়াশায় চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেছে— পৃথিবীর উপরে আর সূর্যের আলোও পড়ছে না, তারার আলোও আসছে না— দিনরাত্রি সমান বোধ হচ্ছে। ঝাপসা আলোতে সব রঙ বোধ হচ্ছে যেন কালো আর শাদা, সব জিনিস বোধ হচ্ছে যেন কতদূর থেকে দেখছি— অস্পষ্ট ধোঁয়া দিয়ে ঢাকা, শিশির দিয়ে মোছা!

উত্তরমুখে খোলা-দরজায় দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থ দেখছিলেন, পৃথিবীর সব সবুজ, সব পাতা, সব ফুল বরফে আর কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে; বরফের চাপনে পথঘাট উঁচু-নিচু ছোটো বড়ো সব সমান হয়ে গেছে! আকাশ দিয়ে আর একটি পাখি উড়ে চলছে না, গেয়ে যাচ্ছে না; বাতাস দিয়ে আজ একটিও ফুলের গন্ধ, একটুখানি সুখের পরশ, কি আনন্দের সুর ভেসে আসছে না; শাদা বরফে, হিম কুয়াশায়, নিঝুম শীতে, সব চুপ হয়ে গেছে, স্থির হয়ে গেছে, পাষাণ হয়ে গেছে— পৃথিবী যেন মূর্ছা গেছে। সিদ্ধার্থ দিনের পর দিন উত্তরের হিম কুয়াশায় শাদা বরফের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন — কুয়াশার জাল সরিয়ে দিয়ে আলো কি আর আসবে না? বরফ গলিয়ে ফুল ফুটিয়ে পৃথিবীকে রঙে-রঙে ভরে দিয়ে সাজিয়ে দিয়ে আনন্দ কি আর দেখা দেবে না? চারিদিক নিরুত্তর ছিল। সিদ্ধার্থ কান পেতে মন দিয়ে শুনছিলেন, কোনো দিক থেকে কোনো শব্দ আসছিল না। সেই না-রাত্রি-না-দিন, না-আলো-না-অন্ধকারের মাঝে কোনো সাড়া মিলছিল না। তিনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। যতদূর দেখা যায় ততদূর তিনি দেখছিলেন বরফের দেয়াল আর কুয়াশার পর্দা; তারি ভিতর দিয়ে জরা উঁকি মারছে— শাদা চুল নিয়ে; জ্বর কাঁপছে— পাঙাশ মুখে শূন্যে চেয়ে; মরণ দেখা যাচ্ছে —বরফের মতো হিম শাদা চাদরে ঢাকা! আয়নায় নিজের ছায়া দেখার মতো, শাদা কাগজের উপরে নানা রকমের ছবি দেখার মতো, সেই ঘন কুয়াশার উপরে সেই জমাট বরফের দেয়ালে সিদ্ধার্থ নিজেকে আর জগৎসংসারের সবাইকে দেখতে পাচ্ছেন— জন্মাতে, বুড়ো হতে, মরে-যেতে; মহাভয় তাদের সবাইকে তাড়িয়ে নিয়ে

চলেছে রক্ত-মাখা ত্রিশূল হাতে! জ্বর, জরা আর মরা— তিনটে শিকারী কুকুরের মতো ছুটে চলেছে মহাভয়ের সঙ্গে-সঙ্গে, দাঁতে নখে যা-কিছু সব চিরে ফেলে, ছিঁড়ে ফেলে, টুকরো-টুকরো করে। কিছু তাদের আগে দাঁড়াতে পারছে না, কেউ তাদের কাছে নিস্তার পাচ্ছে না! নদীতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ছে, ভয়ে নদী শুকিয়ে যাচ্ছে, পর্বতে এসে তারা ধাক্কা দিচ্ছে, পাথর চূর্ণ হয়ে মাটিতে মিশে যাচ্ছে। তারা মায়ের কোল থেকে ছেলেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে— আগড় ভেঙে, শিকড় ছিঁড়ে। মহাভয়ের আগে রাজা-প্রজা ছোটো-বড়ো সব উড়ে চলছে, ধুলোর উপর দিয়ে শুকনো পাতার মতো। সবাই কাঁপছে ভয়ে, সব নুয়ে পড়ছে ভয়ে। সব মরে যাচ্ছে, সব নিবে যাচ্ছে— ঝড়ের আগে বাতাসের মুখে আলোর মতো। এক দণ্ড কিছু স্থির থাকতে পারছে না! আকাশ দিয়ে হাহাকার করে ছুটে আসছে ভয়, বাতাস দিয়ে মার্-মার করে ছুটে আসছে ভয়! জলে স্থলে ঘরে-বাইরে, হানা দিচ্ছে ভয়— জ্বরের ভয়, জরার ভয়, মরণের ভয়! কোথায় সুখ? কোথায় শান্তি? কোথায় আরাম? সিদ্ধার্থ মনের ভিতর দেখছেন ভয়, চোখের উপর দেখছেন ভয়, মাথার উপর বজ্রাঘাতের মতো ডেকে চলেছে ভয়, পায়ের তলায় ভূমিকম্পের মতো পৃথিবী ধরে নাড়া দিচ্ছে ভয়, প্রকাণ্ড জালের মতো চারি দিক ঘিরে নিয়েছে ভয়। সারা সংসার তার ভিতরে আকুলি-বিকুলি করছে। হাজার হাজার হাত ভয়ে আকাশ আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করছে, বাতাসে কেবলি শব্দ উঠছে রক্ষা করো! নিস্তার কর! কিন্তু কে রক্ষা করবে? কে নিস্তার করবে? ভয়ের জাল যে সারা সংসারকে ঘিরে নিয়েছে। এমন কে আছে যার ভয় নেই, কে এমন আছে যার দুঃখ নেই, শোক নেই, এত শক্তি কার যে মহাভয়ের হাত থেকে জগৎ-সংসারকে উদ্ধার করে— এই অটুট মায়াজাল ছিঁড়ে? সিদ্ধার্থের কথায় যেন উত্তর দিয়ে আকাশে-বাতাশে, জলে-স্থলে, পুবে-পশ্চিমে, উত্তরে দক্ষিণে শব্দ উঠল— বিদ্ধা মহিদ্ধিকা— মহাশক্তি বুদ্ধগণ! সদেবকসস্ লোকসস্ সব্বে এতে পরায়ণা

দীপা, নাথা, পতিষ্ঠা, চ তাণা লেণা চ পাণীনং।
গতি, বন্ধু, মহাস্‌সাসা, সরণা চ হিতেসিনো॥
মহাপ্পভা, মহাতেজা, মহাপঞ্ঞা, মহাব্বলা।
মহা কারুণিকা ধীরা সব্বেসানং সুখাবহা॥

বুদ্ধগণই ত্রিলোকের লোককে পরম পথে নিয়ে চলেন। মহাপ্রভ, মহাতেজ, মহাজ্ঞানী, মহাবল, ধীর করুণাময় বুদ্ধগণ সকলকেই সুখ দেন। জগতের হিতৈষী তাঁরা অকূলের কূল, অনাথের নাথ, সকলের নির্ভর, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অগতির গতি, যার কেউ নেই তার বন্ধু, যে হতাশ তার আশা, অশরণ যে তার শরণ।

দেখতে-দেখতে সিদ্ধার্থের চোখের সামনে থেকে— মনের উপর থেকে জগৎজোড়া মহাভয়ের ছবি আলোর আগে অন্ধকারের মতো মিলিয়ে গেল। তিনি দেখলেন, আকাশের কুয়াশা আলো হয়ে পৃথিবীর উপর এসে পড়েছে। সেই আলোয় বরফ গলে চলেছে— পৃথিবীকে সবুজে-সবুজে পাতায়-পাতায় ফুলে-ফুলে ভরে দিয়ে। সেই আলোতে আনন্দ আবার জেগে উঠেছে। পাখিদের গানে-গানে বনে-উপবনে সেই আলো। বাহিরে বাঁশি হয়ে বেজে উঠছে, অন্তরে সুখ হয়ে উথলে পড়েছে, শান্তি হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে— সেই আলো। ত্রিভুবনে— স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে— সেই আলো আনন্দের পথ খুলে দিয়েছে, শান্তির সাতরঙের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছে। সেই আলোর পথ দিয়ে সিদ্ধার্থ দেখলেন, চলেছেন— সে তিনি নিজেই! তাঁর খালি পা, খোলা মাথা। তাঁর ভয় নেই, দুঃখ নেই, শোক নেই। সদানন্দ তিনি বরফের উপর দিয়ে কুয়াশার ভিতর দিয়ে আনন্দে চলেছেন, নির্ভয়ে চলেছেন— সবাইকে অভয় দিয়ে, আনন্দ বিলিয়ে। মহাভয় তাঁর পায়ের কাছে কাঁপছে একটুখানি ছায়ার মতো! মায়াজাল ছিঁড়ে পড়েছে তাঁর পায়ের তলায়— যেন খণ্ড-খণ্ড মেঘ!

যেমন আর-দিন, সেদিনও তেমনি— রথ ফিরিয়ে সিদ্ধার্থ ঘরে এলেন বটে, কিন্তু সেইদিন থেকে মন তাঁর সে রাজমন্দিরে, সেই

মায়া-জালে-ঘেরা সোনার-স্বপনে-মোড়া ঘরখানিতে আর বাঁধা রইল না। সে উদাসী হয়ে চলে গেল— ঘর ছেড়ে চলে গেল— কত অনামা নদীর ধারে-ধারে কত অজানা দেশের পথে-পথে— একা নির্ভয়।

সন্ধ্যাতারার সঙ্গে-সঙ্গে ফুটন্ত ফুলের মতো নতুন ছেলের কচি মুখ, নতুন মা হয়েছেন সিদ্ধার্থের রানী যশোধরা— তাঁর সুন্দর মুখের মধুর হাসি, সহচরীদের আনন্দ গান, কপিলবাস্তুর ঘরে-ঘরে সাত রঙের আলোর মালা— কিছুতেই আর সিদ্ধার্থের মনকে সংসারের দিকে ফিরিয়ে আনতে পারলে না— সে রইল না, সে রইল না।

ছেলে হয়েছে ; এবার সিদ্ধার্থ সংসার পেতে ঘরে রইলেন— এই ভেবে শুদ্ধোদন নতুন ছেলের নাম রাখলেন রাহুল। কিন্তু সিদ্ধার্থের মন সংসারে রইল কই ? রাহুল রইল, রইল রাহুলের মা যশোধরা, পড়ে রইল ঘরবাড়ি, বন্ধুবান্ধব। আর সব আঁকড়ে পড়ে রইলেন রাজা শুদ্ধোদন, কেবল চলে গেলেন সিদ্ধার্থ— তাঁর মন যে-দিকে গেছে।

সেদিন আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা। রাত তখন গভীর। রাজপুরে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আলো নিবিয়ে গান থামিয়ে সিদ্ধার্থ ডাকলেন— 'ছন্দক, আমার ঘোড়া নিয়ে এসো।' সিদ্ধার্থের চরণের দাস ছন্দক, কণ্ঠক ঘোড়াকে সোনার সাজ পরিয়ে অর্ধেক রাতে রাজপুরে নিয়ে এল। সিদ্ধার্থ সেই ঘোড়ায় চড়ে চলে গেলেন— অনামা নদীর পারে। পিছনে অন্ধকারে ক্রমে মিলিয়ে গেল— কপিলবাস্তুর রাজপুরী, সামনে দেখা গেল— পূর্ণিমার আলোয়-আলোময় পথ!

ছন্দক চলেছে, কপিলবাস্তুর দিকে, সিদ্ধার্থের মাথার মুকুট, হাতের বালা, গলার মালা, কানের কুণ্ডল আর সেই কণ্ঠক ঘোড়া নিয়ে ; আর সিদ্ধার্থ চলেছেন পায়ে হেঁটে, নদী পার হয়ে, বনের দিকে তপস্যা করতে— দুঃখের কোথা শেষ তাই জানতে।

ছোটো নদী— দেখতে এতটুকু, নামটিও তার নমা ; কেউ বলে

অনামা, কেউ বলে অনোমা, কেউ বা ডাকে অনমা। সিদ্ধার্থ নদীর যে পার থেকে নামলেন সে পারে ভাঙন জমি— সেখানে ঘাট নেই, কেবল পাথর আর কাঁটা। আর যে পারে সিদ্ধার্থ উঠলেন সে পারে ঘাটের পথ ঢালু হয়ে একেবারে জলের ধারে নেমে এসেছে; গাছে-গাছে ছায়া-করা পথ। সবুজ ঘাস, বনের ফুল দিয়ে সাজানো বনপথ। এই দুই পারের মাঝে নমা নদীর জল— বালি ধুয়ে ঝির-ঝির করে বহে চলেছে। একটা জেলে ছোটো একখানি জাল নিয়ে মাছ ধরছে। সিদ্ধার্থ নিজের গায়ের সোনার চাদর সেই জেলেকে দিয়ে তার ছেঁড়া কাঁথাখানি নিজে পরে চলেছেন।

নদী— সে ঘুরে-ঘুরে চলেছে আম-কাঁঠালের বনের ধার দিয়ে, ছোটো ছোটো পাহাড়ের গা ঘেঁষে— কখনো পুব মুখে, কখনো দক্ষিণ মুখে। সিদ্ধার্থ চলেছেন সেই নদীর ধারে-ধারে ছাওয়ায় ছাওয়ায়, মনের আনন্দে। এমন সে সবুজ ছাওয়া, এমন সে জলের বাতাস যে মনে হয় এইখানেই থাকি। ফলে ভরা, পাতায় ঢাকা জামগাছ, একেবারে নদীর উপর ঝুঁকে পড়েছে; তারি তলায় ঋষিদের আশ্রম। সেখানে সাত দিন, সাত রাত্রি কাটিয়ে সিদ্ধার্থ বৈশালী নগরে এলেন। সেখানে জটাধারী মহাপণ্ডিত আরাড় কালাম, নগরের বাইরে তিনশো চেলা নিয়ে, আস্তানা পেতে বসেছেন। সিদ্ধার্থ তাঁর কাছে শাস্ত্র পড়লেন, ধ্যান, আসন, যোগ-যাগ, মন্তর-তন্তর শিখলেন কিন্তু দুঃখকে কিসে জয় করা যায় তার সন্ধান পেলেন না।

তিনি আবার চললেন। চারি দিকে বিন্ধ্যাচল পাহাড়; তার মাঝে রাজগেহ নগর। মগধের রাজা বিম্বিসার সেখানে রাজত্ব করেন। সিদ্ধার্থ সেই নগরের ধারে রত্নগিরি পাহাড়ের একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন। তখন ভোর হয়ে আসছে, সিদ্ধার্থ পাহাড় থেকে নেমে নগরের পথে 'ভিক্ষা দাও' বলে এসে দাঁড়ালেন; ঘুমন্ত নগর তখন সবে জেগেছে, চোখ মেলেই দেখছে— নবীন সন্ন্যাসী! এত রূপ, এমন করুণামাখা হাসিমুখ, এমন আনন্দ দিয়ে গড়া সোনার

শরীর, এমন শান্ত দুটি চোখ নিয়ে, এমন করে এক হস্তে অভয় দিয়ে, অন্য হাতে ভিক্ষে চেয়ে, চরণের ধুলোয় রাজপথ পবিত্র করে কেউ তো কোনোদিন সে নগরে আসে নি! যারা চলেছিল তাঁকে দেখে তারা ফিরে আসছে; ছেলে খেলা ফেলে তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে আছে; মেয়েরা ঘোমটা খুলে তাঁর দিকে চেয়ে আছে! তাঁকে দেখে কারো ভয় হচ্ছে না, লজ্জা করছে না। রাজা বিম্বিসার রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছেন— তাঁকে দেখতে। কত সন্ন্যাসী ভিক্ষা করতে আসে কিন্তু এমনটি তো কেউ আসে না। রাজপথের এপার-থেকে-ওপার লোক দাঁড়িয়েছে— তাঁকে দেখতে, তাঁর হাতে ভিক্ষে দিতে, দোকানী চাচ্ছে দোকান লুটিয়ে দিয়ে তাঁকে ভিক্ষে দিতে, পসারী চাচ্ছে পসরা খালি করে দিয়ে তাঁকে ভিক্ষে দিতে! যে নিজে ভিখারী সেও তার ভিক্ষার ঝুলি শূন্য করে তাঁকে বলছে— ভিক্ষে নাও গো, ভিক্ষে নাও! ভিক্ষেয় সিদ্ধার্থের দুই হাত ভরে গেছে কিন্তু ভিক্ষে দিয়ে তখনো লোকের মন ভরেনি! তারা মণিমুক্তো সোনারুপো ফুলফল চালডাল স্তূপাকারে এনে সিদ্ধার্থের পায়ের কাছে রাখছে, তারা নিষেধ মানবে না, মানা শুনবে না।

রাজা-প্রজা ছোটো-বড়ো— সকলের মনের সাধ পুরিয়ে সিদ্ধার্থ সেদিন রাজগেহের দ্বারে-দ্বারে পথে-পথে এমন করে ভিক্ষে নিলেন যে তেমন ভিক্ষে কেউ কোনোদিন দেবেও না পাবেও না। এত মণিমুক্তো সোনারুপো বসন-ভূষণ সিদ্ধার্থের দুই হাত ছাপিয়ে রাজগেহের রাস্তায়-রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছিল যে তত ঐশ্বর্য কোনো রাজা কোনোদিন চোখেও দেখেনি। সিদ্ধার্থ নিজের জন্য কেবল এক-মুঠো শুকনো ভাত রেখে সেই অতুল ঐশ্বর্য মগধের যত দীন-দুঃখীকে বিতরণ করে গেলেন।

উদরক পণ্ডিত সাতশো চেলা নিয়ে গয়ালীপাড়ায় চৌপাটি খুলে বসেছেন। সিদ্ধার্থ সেখানে এসে পণ্ডিতদের কাছে শাস্তর শিখতে লাগলেন। উদরকের মতো পণ্ডিত তখন ভূভারতে কেউ ছিল না। লোকে বলত ব্যাসদেবের মাথা আর গণেশের পেট— এই দুইটি

এক হয়ে অবতার হয়েছেন উদরক শাস্ত্রী। সিদ্ধার্থ কিছুদিনেই সকল শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হয়ে উঠলেন, কোনো ধর্ম কোনো শাস্ত্র জানতে আর বাকি রইল না। শেষে একদিন, তিনি গুরুকে প্রশ্ন করলেন— 'দুঃখ যায় কিসে?'

উদরক সিদ্ধার্থকে বললেন— 'এসো, তুমি আমি দুজনে একটা বড়োগোছের চৌপাটি খুলে চারি দিকে সংবাদ পাঠাই, দেশবিদেশ থেকে ছাত্র এসে জুটুক, বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটবে। এই পেটই হচ্ছে দুঃখের মূল, একে শান্ত রাখো, দেখবে দুঃখ তোমার ত্রিসীমানায় আসবে না।'

উদরক শাস্ত্রীকে দূর থেকে নমস্কার করে সিদ্ধার্থ চৌপাটি থেকে বিদায় হলেন। দেখলেন, গ্রামের পথ দিয়ে উদরকের সাতশো চেলা ভারে-ভারে মোণ্ডা নিয়ে আসছে— গুরুর পেটটি শান্ত রাখতে।

সিদ্ধার্থ গ্রামের পথ ছেড়ে, বনের ভিতর দিয়ে চললেন। এই বনের ভিতর কৌণ্ডিন্যের সঙ্গে সিদ্ধার্থের দেখা। ইনিই একদিন শুদ্ধোদন রাজার সভায় গুণে বলেছিলেন, সিদ্ধার্থ নিশ্চয়ই সংসার ছেড়ে বুদ্ধ হবেন। কৌণ্ডিন্যের সঙ্গে আর চারজন ব্রাহ্মণের ছেলে ছিল। তাঁরা সবাই সিদ্ধার্থের শিষ্য হয়ে তাঁর সেবা করবার জন্য সন্ন্যাসী হয়ে কপিলবাস্তু থেকে চলে এসেছেন।

অঞ্জনা নদীর তীরে উরাইল বন। সেইখানেই সিদ্ধার্থ তপস্যায় বসলেন— দুঃখের শেষ কোথায় তাই জানতে। শাস্ত্রে যেমন লিখেছে, গুরুরা যেমন বলেছেন তেমনি করে বছরের পর বছর ধরে সিদ্ধার্থ তপস্যা করছেন।

কঠোর তপস্যা— ঘোরতর তপস্যা— শীতে গ্রীষ্মে বর্ষায় বাদলে অনশনে একাসনে এমন তপস্যা কেউ কখনো করেনি! কঠোর তপস্যায় তাঁর শরীর শুকিয়ে কাঠের মতো হয়ে গেল, গায়ে আর এক বিন্দু রক্ত রইল না— দেখে আর বোঝা যায় না তিনি বেঁচে আছেন কিনা!

সিদ্ধার্থের কত শক্তি ছিল, কত রূপ ছিল, কত আনন্দ কত তেজ

ছিল, ঘোরতর তপস্যায় সব একে-একে নষ্ট হয়ে গেল। তাঁকে দেখলে মানুষ বলে আর চেনা যায় না— যেন একটা শুকনো গাছের মতো দাঁড়িয়ে আছেন।

এমনি করে অনেকদিন কেটে গেছে। সেদিন নতুন বছর, বৈশাখ মাস, গাছে-গাছে নতুন পাতা, নতুন ফল, নতুন ফুল, উরাইল বনে যত পাখি, যত প্রজাপতি, যত হরিণ, যত ময়ূর সব যেন আজ কিসের আনন্দে জেগে উঠেছে, ছুটে বেড়াচ্ছে, উড়ে-উড়ে গেয়ে-গেয়ে খেলে বেড়াচ্ছে। সিদ্ধার্থের পাঁচ শিষ্য শুনতে পাচ্ছেন খুব গভীর বনের ভিতরে যেন কে-একজন একতারা বাজিয়ে গান গাইছে। সারাবেলা ধরে আজ অনেকদিন পরে শিষ্যেরা দেখছেন সিদ্ধার্থের স্থির দুটি চোখের পাতা একটু-একটু কাঁপছে— বাতাসে যেন শুকনো ফুলের পাপড়ি। বেলা পড়ে এসেছে ; গাছের ফাঁক দিয়ে শেষ বেলার সিঁদুর-আলো নদীর ঘাট থেকে বনের পথ পর্যন্ত বিছিয়ে গেছে — গেরুয়া-বসনের মতো।

একদল হরিণ বালির চড়ায় জল খেতে নেমেছে, গাছের তলায় একটা ময়ূর ঠাণ্ডা বাতাসে আপনার সব পালক ছড়িয়ে দিয়ে সন্ধ্যার আগে প্রাণ-ভরে একবার নেচে নিচ্ছে। সেই সময় সিদ্ধার্থ চোখ মেলে চাইলেন— এতদিন পরে আজ প্রথম তিনি যোগাসন ছেড়ে নদীর দিকে চললেন। শিষ্যেরা দেখলেন, তাঁর শরীর এমন দুর্বল যে তিনি চলতে পারছেন না। নদীর পারে একটা আমলকী গাছ জলের উপর ঝুঁকে পড়েছিল, সিদ্ধার্থ তারি একটা ডাল ধরে আস্তে-আস্তে জলে নামলেন। তারপর অতি কষ্টে জল থেকে উঠে গোটা কয়েক আমলকী ভেঙে নিয়ে বনের দিকে চললেন আর অচেতন হয়ে নদীর ধারে পড়ে গেলেন। শিষ্যেরা ছুটে এসে তাঁকে ধরাধরি করে আশ্রমে নিয়ে এল। অনেক যত্নে সিদ্ধার্থ সুস্থ হয়ে উঠলেন। কৌণ্ডিন্য প্রশ্ন করলেন— 'প্রভু, দুঃখের শেষ হয় কিসে জানতে পারলেন কি ?' সিদ্ধার্থ ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না— এখনো না।' অন্য চার শিষ্য, তাঁরা বললেন— 'প্রভু, তবে আর

একবার যোগাসনে বসুন, জানতে চেষ্টা করুন— দুঃখের শেষ আছে কিনা।'

সিদ্ধার্থ চুপ করে রইলেন। কিন্তু শিষ্যদের কথার উত্তর দিয়েই যেন একটা পাগলা বনের ভিতর থেকে একতারা বাজিয়ে গেয়ে উঠল— 'নারে! নারে! নাইরে নাই!'

কৌণ্ডিন্য বললেন— 'জানবার কি কোনো পথ নেই প্রভু?' সিদ্ধার্থ বললেন— 'পথের সন্ধান এখনো পাইনি, কিন্তু দেখ তার আগেই এই শরীর দুর্বল হয়ে পড়ল, বৃথা যোগেযাগে নষ্ট হবার মতো হল। এখন এই শরীরে আবার বল ফিরিয়ে আনতে হবে, তবে যদি পথের সন্ধান করে ওঠা যায়। নিস্তেজ মন, দুর্বল শরীর নিয়ে কোনো কাজ অসম্ভব। শরীরকে সবল রাখো, মনকে সতেজ রাখো। বিলাসীও হবে না, উদাসীও হবে না। শরীর মনকে বেশি আরামও দেবে না, বেশি কষ্টও সহাবে না, তবেই সে সবল থাকবে, কাজে লাগবে, পথের সন্ধানে চলতে পারবে। একতারার তার যেমন জোরে টানলে ছিঁড়ে যায়, তেমনি বেশি কষ্ট দিলে শরীর মন ভেঙে পড়ে। যেমন তারকে একবার ঢিলে দিলে তাতে কোনো সুরই বাজে না, তেমনি শরীর মনকে আরামে আলস্যে ঢিলে করে রাখলে সে নিষ্কর্মা হয়ে থাকে। বৃথা যোগেযাগে শরীর মনকে নিস্তেজ করেও লাভ নেই, বৃথা আলস্য বিলাসে তাকে নিষ্কর্মা বসিয়ে রেখেও লাভ নেই— মাঝের পথ ধরে চলাই ঠিক।'

সেদিন থেকে শিষ্যরা দেখলেন, সিদ্ধার্থ সন্ন্যাসীদের মতো ছাই মাখা, আসন বেঁধে বসা, ন্যাস কুম্ভক তপজপ ধূনী ধুনচি সব ছেড়ে দিয়ে আগেকার মতো গ্রামে-গ্রামে ভিক্ষা করে দিন কাটাতে লাগলেন। কেউ নূতন কাপড় দিলে তিনি তাই পরেন, কেউ ভালো খাবার দিলে তিনি তাও খান। শিষ্যদের সেটা মনোমতো হল না।

তাদের বিশ্বাস যোগী হতে হলেই গরমের দিনে চারি দিকে আগুন জ্বালিয়ে, শীতের দিনে সারারাত জলে পড়ে— কখনো ঊর্ধ্ব বাহু হয়ে দুই হাত আকাশে তুলে, কখনো হেঁটমুণ্ড হয়ে দুই পা

গাছের ডালে বেঁধে থাকতে হয়। প্রথমে দিনের মধ্যে একটি কুল, তারপর সারাদিনে একটি বেলপাতা, ক্রমে একফোঁটা জল, তারপর তাও নয়— এমনি করে যোগসাধন না করলে কোনো ফল পাওয়া যায় না। কাজেই সিদ্ধার্থকে একলা রেখে একদিন রাত্রে তারা কাশীর ঋষিপত্তনের দিকে চলে গেল— সিদ্ধার্থের চেয়ে বড়ো ঋষির সন্ধানে।

শিষ্যরা যেখানে সিদ্ধার্থকে একা ফেলে চলে গেছে— উরাইল বনের সেদিকটা ভারি নির্জন। ঘন-ঘন শালবন সেখানটা দিন-রাত্রি ছায়া করে রেখেছে। মানুষ সেদিকে বড়ো একটা আসে না; দু-একটা হরিণ আর দু-দশটা কাঠবিড়ালি শুকনো শাল-পাতা মাড়িয়ে খুসখাস চলে বেড়ায় মাত্র।

এই নিঃসাড়া নিরালা বনটির গা দিয়েই গাঁয়ে যাবার ছোটো রাস্তাটি অঞ্জনার ধারে এসে পড়েছে। নদীর ধারেই একটি প্রকাণ্ড বটগাছ— সে যে কতকালের তার ঠিক নেই। তার মোটা-মোটা শিকড়গুলো উঁচু পাড় বেয়ে অজগর সাপের মতো সটান জলের উপর ঝুলে পড়েছে। গাছের গোড়াটি কালো পাথর দিয়ে চমৎকার করে বাঁধানো। লোকে দেবতার স্থান বলে সেই গাছকে পূজা দেয়। ফুল-ফলের নৈবেদ্য সাজিয়ে নদীর ওপারে গ্রাম থেকে মেয়েরা যখন খুব ভোরে নদী পার হয়ে এদিকে আসে, তখন কোনো-কোনো দিন তারা যেন দেখতে পায় গেরুয়া-কাপড়-পরা কে একজন গাছতলায় বসেছিলেন, তাদের দেখেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন! কাঠুরেরা কোনো-কোনো দিন কাঠ কেটে বন থেকে ফিরে আসতে দেখে, গাছের তলা আলো করে সোনার কাপড়-পরা দেবতার মতো এক পুরুষ! সবাই বলত, নিশ্চয় ওখানে দেবতা থাকেন! কিন্তু দেবতাকে স্পষ্ট করে কেউ কোনো-দিন দেখেনি— পুন্না ছাড়া! মোড়লের মেয়ে সুজাতা বিয়ের পরে একদিন ওই বটগাছের তলায় পূজা দিতে গিয়ে পুন্নাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। সেই থেকে সে মোড়লের ঘরে আর একটি মেয়ের

সমান মানুষ হয়েছে। এখন তার বয়স দশ বছর। সুজাতার ছেলে হয়নি, তাই তিনি পুন্নাকে মেয়ের মতো যত্ন করে মানুষ করেছেন। আর মানত করেছেন যদি ছেলে হয় তবে এক-বছর বটতলায় রোজ একটি ঘিয়ের পিদিম দিয়ে নতুন বছরের পূর্ণিমায় ভালো করে বটেশ্বরকে পুজো দেবেন।

সুজাতার ঠাকুর সুজাতাকে একটি সোনার চাঁদ ছেলে দিয়েছিলেন, তাই পুন্না রোজ সন্ধ্যাবেলা একটি ঘিয়ের পিদিম দিতে এই বটতলায় আসে। আজ এক বছর সে আসছে, কোনো দেবতাকে কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পায়নি। কখনো সে আসবার আগেই ছায়ার মতো দেবতার মূর্তি মিলিয়ে যেত, কখনো-বা সে গাছের তলায় পিদিমটি রেখে যখন একলা, পায়ে হেঁটে নদী পার হয়ে ফিরে চলেছে, তখন দেখত যেন দেবতা এসে সেই পাথরের বেদীর উপরে বসেছেন!

আজ শীতের ক'মাস ধরে পুন্না ছায়ার মতো যেন পাতলা কুয়াশার ভিতর দিয়ে দেবতাকে দেখেছে। এ কথা সে সুজাতাকে বলেছিল— আর কাউকে না। সুজাতা সেই দিন থেকে পুন্নাকে দেবতার জন্যে আঁচলে বেঁধে দুটি করে ফল নিয়ে যেতে বলে দিয়েছিলেন। আর বলে দিয়েছিলেন, যদি দেবতা কোনোদিন স্পষ্ট করে দেখা দেন, কি কথা কন তবে যেন পুন্না বলে— দেবতা! আমার সুজাতা-মাকে আমার বাবাকে আমার ছোটো ভাইটিকে আর আমার মোড়লদাদাকে ভালো রেখো। বড়ো হলে আমি যেন একটি সুন্দর বর পাই।

এমনি করে পুন্নার হাত দিয়ে সুজাতা দুটি করে ফল সেই বটতলায় পাঠিয়ে দিতেন। তিনিও জানতেন না, পুন্নাও জানত না যে সিদ্ধার্থ রোজ সন্ধ্যাবেলা সেই বটতলায় ঠাণ্ডা পাথরের বেদীর উপরে এসে বসেন।

আজ বছরের শেষ; কাল নতুন বছরের পূর্ণিমা। পুন্না আজ সকাল করে পাঁচটি পিদিম, পাঁচটি ফল থালায় সাজিয়ে একটি

নিজের নামে, একটি ভায়ের নামে, একটি মায়ের নামে, একটি বাপের নামে, একটি মোড়লদাদার নামে সেই বটগাছের তলায় সাজিয়ে রাখছে। বিকেলবেলার সোনার আলো বটগাছটির তলাটিতে এসে লেগেছে। রোদে-পোড়া বালির চড়ায় জলের দাগ টেনে বয়ে চলেছে অঞ্জনা নদীটি। ওপারে দেখা যাচ্ছে অনেক দূর পর্যন্ত ধানের খেত, আর মাঝে-মাঝে আম-কাঁঠালের বাগান-ঘেরা ছোটো-ছোটো গ্রামগুলি! মাটির ঘর, খড়ের চাল, একটা পাহাড়— সে কত দূরে দেখা যাচ্ছে মেঘের মতো। নদীর ওপারেই মেঠো রাস্তা— সবুজ শাড়ির শাদা পাড়ের মতো সরু, সোজা। সেই রাস্তায় চাষার মেয়েরা চলেছে ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে। তাদের পরনে রাঙা শাড়ি, হাতে রুপোর চুড়ি, পিঠের উপর ঝুলি-বাঁধা কচি ছেলেটি ঘুমিয়ে আছে হাত-দুটি মুঠো করে। একটুখানি ঠাণ্ডা বাতাস নদীর দিক থেকে মুখে এসে লাগল। একটা চিল অনেক উঁচু থেকে ঘুরতে-ঘুরতে আস্তে-আস্তে একটা গাছের ঝোপে নেমে গেল।

পুন্না দেখছে, বেলা পড়ে এসেছে। বালির উপর দিয়ে চলে আসছে অনেকগুলো কালো মোষ— একটার পিঠে মস্ত-এক-গাছ লাঠি-হাতে বসে রয়েছে গোয়ালাদের ছেলেটা। সে রোজ সন্ধ্যাবেলা মোষের পিঠে চড়িয়ে পুন্নাকে মোড়লদের বাড়ি পৌঁছে দেয়। আজও তাই আসছে। অনেক দূর থেকে সে ডাক দিচ্ছে 'আরে রে পুন্না রে!' ছেলেটার নাম সোয়াস্তি। পুন্না তার গলা পেয়েই তাড়াতাড়ি পিদিম-পাঁচটা জ্বালিয়ে দিয়েই যেদিক দিয়ে সোয়াস্তি আসছিল সেইদিকে চলে গেল।

তখন একখানি সোনার থালার মতো পুবদিকে চতুর্দশীর চাঁদ উঠেছে। পুন্না আর সোয়াস্তি মোষের পিঠে চড়ে বালির চড়া দিয়ে চলেছে। উঁচু পাড়ের পর বটতলাতে ঝিকঝিক করছে পুন্নার-দেওয়া পিদিমের আলো। সেই আলোয় সোয়াস্তি, পুন্না দুজনেই আজ স্পষ্ট দেখলে গেরুয়া-বসন-পরা দেবতা এসে গাছের তলায় বসেছেন —পাথরের বেদীটিতে!

পুন্নাকে তাদের বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিয়ে সোয়াস্তি চলে গেল। সুজাতা তখন গোরু-বাছুর গোয়ালে বেঁধে ছেলেটিকে ঘুম পাড়িয়ে সকালের জন্যে পুজোর বাসন গুছিয়ে রাখছেন। পুন্না এসে বললে— 'মা, আজ সত্যি দেবতাকে দেখেছি। কাল খুব ভোরে উঠে যদি তুমি সেখানে যেতে পার তো তুমিও দেখতে পাবে। সোয়াস্তি আমি দুজনেই দেখেছি। কিন্তু ঠাকুরের কাছে কিছু চেয়ে নিতে ভুলে গেলুম মা।'

সুজাতা বললেন— 'যদি মনে পড়ত তবে কী চাইতিস পুন্না? সোয়াস্তির সঙ্গে তোর বিয়ে হোক— এই বুঝি?'

পুন্না তখন পালিয়েছে। সুজাতা পুজোর সমস্ত গুছিয়ে রেখে যখন ঘরে গেলেন, পুন্না তখন ছোটো ভাইটির পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুজাতার চোখে আজ ঘুম নেই। রাত থাকতে তিনি পুন্নাকে ডেকে তুলেছেন। পুন্না গোয়ালের দরজা খুলে এককোণে একটি পিদিম জ্বালিয়ে গোরুগুলিকে দুইতে বসেছে। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় গোরুগুলির শীত লেগেছে, তারা একটু ভয় খেয়েছে, চঞ্চল হয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখছে— এত রাত্রে কে দুধ নিতে এল? কিন্তু পুন্না যেমন তাদের পিঠে বাঁ হাতটি বুলিয়ে নাম ধরে ডাকছে অমনি তারা স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সুজাতা উঠোনের এককোণে একটি উনুন জ্বালিয়ে দিয়ে কুয়োর জলে স্নান করতে গেলেন। পুন্না দুধটুকু দুয়ে একটি ধোয়া কড়ায় সেই উনুনের উপর চাপিয়ে দিলে— দুধ টগবগ করে ফুটতে লাগল। সুজাতা ধোয়া কাপড় পরে পুন্নাকে এসে বললেন— 'তুই গোটা কতক ফুল তুলে আন, আমি দুধ জ্বাল দিচ্ছি।'

মোড়লদের বাড়ির ধারেই বাগান; সেখানে গাঁদা ফুল অনেক! পুন্না সেই ফুলে একটা মালা গেঁথে বটের পাতায় একটু তেল-সিঁদুর পুজোর থালায় সাজিয়ে রেখে সুজাতাকে ডাকছে— 'মা, চলো, আর দেরি করলে সকাল হয়ে যাবে; দেবতাকে দেখতে পাবে না।'

সুজাতা জ্বাল-দেওয়া টাটকা দুধটুকু একটি নতুন ভাঁড়ে ঢেলে পুন্নার হাতে দিয়ে বললেন— 'তুই এইটে নিয়ে চল, আমি পুজোর থালা আর মনুয়াকে সঙ্গে নিয়ে যাই।' সুজাতার ছেলের নাম মনুয়া।

ভোরের অন্ধকারে গাঁয়ের পথ একটু-একটু দেখা যাচ্ছে। পুন্না চলেছে আগে-আগে দুধের ভাঁড় নিয়ে ঝুমুর-ঝুমুর মল বাজিয়ে, সুজাতা চলেছেন পিছনে-পিছনে ছেলে-কোলে পুজোর থালাটি ডান হাতে নিয়ে। পুন্নার সঙ্গে একলা যেতে সুজাতার একটু-একটু ভয় করছিল। সোয়াস্তিদের বাড়ির কাছে এসে সুজাতা বললেন— 'ওরে সোয়াস্তিকে ডেকে নে না!' সোয়াস্তিকে আর ডাকতে হল না, সে পুন্নার পায়ের শব্দ পেয়েই একটা লাঠি আর একটা আলো নিয়ে বেরিয়ে এল।

তিনজনে মাঠ ভেঙে চলেছেন। তখনো আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে— রাত পোহাতে অনেক দেরি কিন্তু এর মধ্যে সকালের বাতাস পেয়ে গাঁয়ের উপর থেকে সারা রাতের জমা ঘুঁটের ধোঁয়া শাদা একখানি চাঁদোয়ার মতো ক্রমে-ক্রমে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। উলু-বনের ভিতর দু-একটা তিতির, বকুলগাছে দু-একটা শালিক এরি মধ্যে একটু-একটু ডাকতে লেগেছে। একটা ফটিং-পাখি শিস দিতে-দিতে মাঠের ওপারে চলে গেল। ছাতারেগুলো কিচমিচ ঝুপ-ঝুপ করে কাঁঠালগাছের তলায় নেমে পড়ল। আলো নিবিয়ে সুজাতা আর পুন্নাকে নিয়ে সোয়াস্তি নদীর ধারে এসে দাঁড়াল। তখন দূরের গাছপালা একটু-একটু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; নদীর পারে দাঁড়িয়ে সুজাতা দেখছেন— বটগাছের নিচে যিনি বসে রয়েছেন— তাঁর গেরুয়া কাপড়ের আভা বনের মাথার আধখানা আকাশ আলো করে দিয়েছে সকালের রঙে।

সুজাতা, পুন্না মনের মতো করে পুজো দিয়ে সিদ্ধার্থের আশীর্বাদ নিয়ে চলে গেছে। সোয়াস্তি তাঁকে কিছু দিতে পারেনি; তাই সে সারাদিন নদীর ধারে একলা বসে অনেক যত্নে কুশিঘাসের একটি

আসন বুনে নদীর জলে সেখানি ঠাণ্ডা করে সিদ্ধার্থকে দেবার জন্য এসেছে। সিদ্ধার্থ তখনো বটতলাতে আসেননি। সোয়াস্তি কুশাসনখানি বেদীর উপর বিছিয়ে দিয়ে মনে-মনে সিদ্ধার্থকে প্রণাম করে নদীপারে চলে গেল।

তখন সন্ধ্যা হয়-হয়; সিদ্ধার্থ অঞ্জনায় স্নান করে সোয়াস্তির দেওয়া কুশাসনে এসে বসলেন। জলে-ধোয়া কুশঘাসের মিষ্টি গন্ধে তাঁর মন যেন আজ আরাম পেয়েছে। পূর্ণিমার আলোয় পৃথিবীর শেষ-পর্যন্ত আজ যেন তিনি দেখতে পাচ্ছেন— স্পষ্ট, পরিষ্কার।

পাথরের বেদীতে কুশাসনে বসে সিদ্ধার্থ আজ প্রতিজ্ঞা করলেন, এ শরীর থাক আর যাক, দুঃখের শেষ দেখবই-দেখব— সিদ্ধ না হয়ে, বুদ্ধ না হয়ে এ আসন ছেড়ে উঠছি না। বজ্রাসনে অটল হয়ে সিদ্ধার্থ আজ যখন ধ্যানে বসে বললেন—

'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।'

তখন 'মার'— যার ভয়ে সংসার কম্পমান, যে লোককে কুবুদ্ধি দেয়, কুকথা বলায়, কুকর্ম করায়— সেই 'মার'-এর সিংহাসন টলমল করে উঠল। রাগে মুখ অন্ধকার করে 'মার' আজ নিজে আসছে মার-মার শব্দে বুদ্ধের দিকে।

চারি দিকে আজ 'মার'-এর দলবল জেগে উঠেছে! তারা ছুটে আসছে, যত পাপ, যত দুঃখ, যত কালি, যত কলঙ্ক, যত জ্বালা-যন্ত্রণা, মলা আর ধুলা— জল-স্থল-আকাশের দিকে-বিদিকে ছড়িয়ে-ছড়িয়ে। পূর্ণিমার আলোর উপরে কালোর পর্দা টেনে দিয়েছে— 'মার'! সেই কালোর ভিতর থেকে পূর্ণিমার চাঁদ চেয়ে রয়েছে— যেন একটা লাল চোখ! তা থেকে ঝরে পড়ছে পৃথিবীর উপর আলোর বদলে রক্ত-বৃষ্টি! সেই রক্তের ছিটে লেগে তারাগুলো নিবে-নিবে যাচ্ছে।

আকাশকে এক-হাতে মুঠিয়ে ধরে, পাতালকে এক পায়ে চেপে রেখে, 'মার' আজ নিজমূর্তিতে সিদ্ধার্থের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার গায়ে উড়ছে রাঙা চাদর— যেন মানুষের রক্তে ছোপানো! তার কোমরে ঝুলছে বিদ্যুতের তলোয়ার, মাথার মুকুটে দুলছে 'মার'-এর প্রকাণ্ড একটা রক্ত-মণির দুল, তার কানে দুলছে মোহন কুণ্ডল, তার বুকের উপরে জ্বলছে অনলমালা— আগুনের সুতোয় গাঁথা।

বুক ফুলিয়ে 'মার' সিদ্ধার্থকে বলছে— "বৃথাই তোমার বুদ্ধ হতে তপস্যা! উত্তিষ্ঠ— ওঠো! কামেশ্বরোঽস্মি— আমি 'মার'। ত্রিভুবনে আমাকে জয় করে এমন কেউ নেই! উত্তিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ মদ্যবিষয়স্থং বচং কুরুষ্ব— ওঠো চলে যাও, আমাকে জয় করতে চেষ্টা কোরো না। আমার আজ্ঞাবাহী হয়ে থাকো, ইন্দ্রের ঐশ্বর্য তোমায় দিচ্ছি, পৃথিবীর রাজা হয়ে সুখভোগ করো; তপস্যায় শরীর ক্ষয় করে কী লাভ? আমাকে জয় করে বুদ্ধ হওয়া কারো সাধ্যে নেই।"

সিদ্ধার্থ 'মার'কে বললেন— "হে 'মার'! আমি জন্ম-জন্ম ধরে বুদ্ধ হতে চেষ্টা করছি— তপস্যা করছি, এবার বুদ্ধ হব তবে এ আসন ছেড়ে উঠব, এ শরীর থাক বা যাক এ প্রতিজ্ঞা—

'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।"

তিনবার 'মার' বললে— "উত্তিষ্ঠ— ওঠো, চলে যাও, তপস্যা রাখো!" তিনবারই সিদ্ধার্থ বললেন, "না! না! না! নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।"

রাগে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করে বিকট হুঙ্কার দিয়ে তখন আকাশ ধরে টান দিলে 'মার'! তার নখের আঁচড়ে অমন-যে চাঁদ-তারায়-সাজানো নীল আকাশ সেও ছিঁড়ে পড়ল শত-টুকরো হয়ে এক-খানি নীলাম্বরী শাড়ির মতো। মাথার উপরে আর চাঁদ নেই,

তারা নেই ; রয়েছে কেবল মহাশূন্য, মহা অন্ধকার ! মুখ মেলে কে যেন পৃথিবীকে গিলতে আসছে। বোধ হয় তার কালো জিভ বেয়ে পৃথিবীর উপর পড়ছে জমাট রক্তের মতো কালো নাল ! 'মার' সেই অন্ধকার মুখটার দিকে ফিরে দেখেছে-কি আর বিদ্যুতের মতো দুপাটি শাদা দাঁত শূন্যে ঝিলিক দিয়ে কড়মড় করে উঠেছে ; আর হুঙ্কার দিয়ে বেরিয়ে এসেছে সেই সর্বগ্রাসী মুখের ভিতর থেকে 'মার'-এর দল ; চন্দ্র সূর্য ঘুরছে তাদের হাতে দুটো যেন আগুনের চরকা ! দশদিক অন্ধকার করে ঘুরতে-ঘুরতে আসছে— 'মার'-এর দল ঘূর্ণি বাতাসে ভর দিয়ে, পৃথিবী জুড়ে ধুলার ধ্বজা উড়িয়ে। তারা শূন্য থেকে ধূমকেতুগুলোকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ফেলছে আগুনের ঝাঁটার মতো ! পৃথিবী থেকে গাছগুলোকে উপড়ে, পাহাড়গুলোকে মুচড়ে নিয়ে বন-বন শব্দে ঘুরিয়ে ফেলছে তারা চারি দিক থেকে অনবরত শিলাবৃষ্টির মতো ; লক্ষ-লক্ষ ক্ষ্যাপা ঘোড়া যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে 'মার'-সৈন্য বুদ্ধদেবের চারি দিকে ! তাদের খুর থেকে বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়ছে, তাদের মুখ থেকে রক্তের জ্বলন্ত ফেনা আঁজলা-আঁজলা ছড়িয়ে পড়ছে— সেই বোধিবটের চারি দিকে, সেই পাথরের বেদীর আশেপাশে। উরাইল-বনের প্রত্যেক গাছটি পাতাটি ফুলটি এমন-কি, ঘাসগুলিও আজ জ্বলে উঠেছে ; জ্বলন্ত রক্তে অঞ্জনার জল ঘুরে ঘুরে চলেছে আগুন মাখা। বিদ্যুতের শিখায় তলোয়ার শাণিয়ে মশাল জ্বালিয়ে দলের পর দল যত রক্তবীজ, তারা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়ে পড়ছে বুদ্ধদেবের উপরে। তাদের আগুন-নিশ্বাসে আকাশ গলে যাচ্ছে, বাতাস জ্বলে যাচ্ছে, পৃথিবী দেখা যাচ্ছে যেন একখানা জ্বলন্ত কয়লা, ঘূর্ণিবাতাসে ঘুরে-ঘুরে চলেছে আগুনের ফুলকি ছড়াতে-ছড়াতে ; তার মাঝে জ্বলন্ত একটা তালগাছ ঘুরিয়ে 'মার' ডাকছে— 'হান ! হান।'

পায়ের নখে রসাতল চিরে জেগে উঠেছে মহামারী। আজ 'মার'-এর ডাকে রসাতলের কাজল অন্ধকার কাঁথার মতো সর্বাঙ্গে উড়িয়ে নিয়ে আর্তনাদ করে ছুটে আসছে— সে 'মারী'। তার

ধুলোমাখা কটা চুল বাতাসে উড়ছে— আকাশ-জোড়া ধূমকেতুর মতো! দিকে-দিকে শোকের কান্না উঠেছে, ত্রিভুবন থর-থর কাঁপছে। মহামারীর গায়ের বাতাস যেদিকে লাগল সেদিকে পাহাড় চূর্ণ হয়ে গেল, পাথর ধুলো হয়ে গেল, বন-উপবন জ্বলে গেল, নদী-সমুদ্র শুকিয়ে উঠল। আর কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না! সব মরুভূমি হয়ে গেছে, সব শুয়ে পড়েছে, নুয়ে পড়েছে, জ্বলে গেছে, পুড়ে গেছে, ধুলো হয়ে ছাই হয়ে উড়ে গেছে! জগৎ জুড়ে উঠেছে 'মারী'র আর্তনাদ, 'মার'-এর সিংহনাদ, আর শ্মশানের মাংস-পোড়া বিকট গন্ধ!

তখন রাত এক-প্রহর। 'মার'-এর দল, 'মারী'-র দল উল্কামুখী শিয়ালের মতো, রক্ত আঁখি বাদুড়ের মতো মুখ থেকে আগুনের হলকা ছড়িয়ে চারি দিকে হাহা হুহু করে ডেকে বেড়াচ্ছে, কেঁদে বেড়াচ্ছে! আকাশ ঘুরছে মাথার উপর, পৃথিবী ঘুরছে পায়ের তলায় ঘর্ঘর শব্দে— যেন দুখানা প্রকাণ্ড জাঁতার পাথর বুদ্ধদেবকে পিষে ফেলতে চেষ্টা করছে! 'মার' দু-হাতে দুটো বিদ্যুতের মশাল নিয়ে বুদ্ধদেবকে ডেকে বলছে— 'পালাও', পালাও, এখনো বলছি তপস্যা রাখো!' বুদ্ধদেব 'মার'-এর দিকে চেয়েও দেখছেন না, তার কথায় কর্ণপাতও করছেন না! 'মার'-এর মেয়ে 'কামনা' তার ছোটো দুই বোন 'ছলাকলা'কে নিয়ে বুদ্ধদেবের যোগভঙ্গ করতে কত চেষ্টা করছে— কখনো গৌতমী মায়ের রূপ ধরে, কখনো যশোধরার মতো হয়ে বুদ্ধদেবের কাছে হাত-জোড় করে কেঁদে-কেঁদে লুটিয়ে পড়ে! তাঁর মন গলাবার ধ্যান ভাঙাবার চেষ্টায় কখনো তারা স্বর্গের বিদ্যাধরী সেজে গান গায়, নাচে, কিন্তু কিছুতেই বুদ্ধদেবকে ভোলাতে আর পারে না। বজ্রাসনে আজ তিনি অটল হয়ে বসেছেন, তাঁর ধ্যান ভাঙে কার সাধ্য! যে 'মার'-এর তেজে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল কম্পমান, যার পায়ের তলায় ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ, জল-স্থল-আকাশ— সেই 'মার'-এর দর্পচূর্ণ হয়ে গেল আজ বুদ্ধের শক্তিতে! 'মার' আজ বুদ্ধের একগাছি মাথার চুলও কাঁপাতে পারলে না, সেই অক্ষয়বটের একটি

পাতা, সেই পাথরের বেদীর একটি কোণও খসাতে পারলে না! বুদ্ধের আগে 'মার' একদণ্ডও কি দাঁড়াতে পারে! বুদ্ধের দিকে ফিরে দেখবারও আর তার সাহস নেই! দুই হাতের মশাল নিবিয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে 'মার' আস্তে-আস্তে পালিয়ে গেছে— নরকের নিচে, ঘোর অন্ধকারে চারি দিক কালো করে দিয়ে! বুদ্ধদেব সেই কাজল অন্ধকারের মাঝে নির্ভয়ে একা বসে রয়েছেন ধ্যান ধরে প্রহরের পর প্রহর।

রাত শেষ হয়ে আসছে। কিন্তু 'মার'-এর ভয়ে তখনো পৃথিবী এক-একবার কেঁপে উঠছে— চাঁদও উঠতে পারছে না, সকালও আসতে পারছে না। সেই সময় ধ্যান ভেঙে 'মার'কে জয় করে সংসার থেকে ভয় ঘুচিয়ে বুদ্ধদেব দাঁড়ালেন। তিনি আজ সিদ্ধ হয়েছেন, বুদ্ধ হয়েছেন, দুঃখের শেষ পেয়েছেন। ডান-হাতে তিনি পৃথিবীকে অভয় দিচ্ছেন, বাঁ-হাতে তিনি আকাশের দেবতাদের আশ্বাস দিচ্ছেন। তাঁর সোনার অঙ্গ ঘিরে সাতরঙের আলো। সেই আলোতে জগৎ-সংসার আনন্দে জয়-জয় দিয়ে জেগে উঠেছে, নতুন প্রাণ পেয়ে, নতুন সাজে সেজে। তাঁর পায়ের তলায় গড়িয়ে চলেছে নৈরঞ্জন নদীটি দুই কূলে শান্তিজল ছিটিয়ে।

যেখানে কাশী, সেখানে গঙ্গা একখানি ধারাল খাঁড়ার মতো বেঁকে চলেছেন। আর ঋষিপত্তনের নিচেই বরুণা নদীর পাড় পাহাড়ের মতো শক্ত। তার গায়ে বড়ো-বড়ো সব গুহা-গর্তে যত জটাধারী বক-বেড়ালি-ব্রহ্মচারি ধুনি জ্বালিয়ে ছাইভস্ম মেখে বসে রয়েছে। পাহাড়ের উপরে সারনাথের মন্দির। মন্দিরের পরেই গাছে-গাছে-ছায়া-করা তপোবন। সেইখানে সত্যি যাঁরা ঋষি তপস্বী তাঁরা রয়েছেন। হরিণ তাঁদের দেখে ভয় খায় না, পাখি তাঁদের দেখে উড়ে পালায় না। তাঁরা কাউকে কষ্ট দেন না। কারু ঘুম ভাঙবার আগেই তাঁরা একটিবার বন থেকে বেরিয়ে নদীতে স্নান করে যান; দিনরাতের মধ্যে তপোবন ছেড়ে তাঁরা আর বার হন না। দেবলঋষি নালককে নিয়ে এই তপোবনের একটি বটগাছের তলায় আজ ক'মাস ধরে রয়েছেন!

তখন আষাঢ় মাস। বেলা শেষ হয়েও যেন হয় না, রোদ পড়েও যেন পড়তে চায় না! সারনাথের মন্দিরে সন্ধ্যার শাঁখ-ঘণ্টা বাজছে, কিন্তু তখনো আষঢ়ন্ত বেলার সোনার রোদ গাছের মাথায় চিকচিক করছে, হরিণগুলো তখনো আস্তে-আস্তে চরে বেড়াচ্ছে, ছোটো-ছোটো সবুজ পাখিগুলি এখনো যেখানটিতে একটুখানি রোদ সেইখানটিতে কিচমিচ করে খেলে বেড়াচ্ছে। একলাটি বসে নালক বর্ষাকালের ভরা নদীর দিকে চুপ করে চেয়ে রয়েছে। একটা শাদা বক তার চোখের সামনে দিয়ে কেবলি নদীর এপার-ওপার আনাগোনা করছে— সে যেন ঠিক করতে পারছে না কোন্ পারে বাসা বাঁধবে।

বর্ষাকালের একটানা নদী আজ সারাদিন ধরে নালকের মনটিকে টানছে— সেই বর্ধনের বনের ধারে, তাদের সেই গাঁয়ের দিকে! সেই তেঁতুলগাছে ছায়া-করা মাটির ঘরে তার মায়ের কাছে নালকের মন একবার ছুটে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। মন তার যেতে চাচ্ছে মায়ের কাছে, কিন্তু ঋষিকে একলা রেখে আবার যেতেও মন সরছে না। সে ওই বকটার মতো কেবলি যাচ্ছে আর আসছে, আসছে যার যাচ্ছে!

দেবলঋষি নালককে ছুটি দিয়েছেন তার মায়ের কাছে যেতে। এদিকে আবার ঋষির মুখে নালক শুনেছে বুদ্ধদেব আসছেন এই ঋষিপত্তনের দিকে! আজ সে-কত-বছর নালক ঘর ছেড়ে এসেছে; মাকে সে কতদিন দেখেনি! অথচ বুদ্ধদেবকে দেখবার সাধটুকু সে ছাড়তে পারছে না। সে একলাটি নদীর ধারে বসে ভাবছে— যায় কি না-যায়। সকাল থেকে একটির পর একটি কত নৌকো কত লোককে যার-যার দেশে নামিয়ে দিতে-দিতে চলে গেল। কত মাঝি নালককে 'যাবে গো! যাবে গো!' বলে ডেকে গেল! সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আর একখানি মাত্র ছোটো নৌকো নালকের দিকে পাল তুলে আসছে— অনেকদূর থেকে। তার আলোটি দেখা যাচ্ছে— জলে একটি ছোটো পিদিম ঝিক-ঝিক করে ভেসে চলেছে। এইখানি চলে গেলে এদিকে আর নৌকো আসবে না। নালক মনে-

মনে দেবল ঋষিকে প্রণাম করে বলছে—'ঠাকুর, যেন বুদ্ধদেবের দর্শন পাই।'

দেখতে-দেখতে নৌকো এসে তপোবনের ঘাটে লাগল। সেই ছোটো নৌকোয় নালক তার মাকে দেখতে দেশের দিকে চলে গেল। আজ কত বছর সে তার মাকে দেখেনি। ঠিক সে সময় বরুণার খেয়াঘাট পার হয়ে বুদ্ধদেব সারনাথের তপোবনে এসে নামলেন। আর একটি দিন যদি নালক সেখানে থেকে যেত!

কত দেশবিদেশ ঘুরে, কত নদীর চরে খালের ধারে নিত্য সন্ধ্যাবেলায় ভিড়তে-ভিড়তে নালকদের নৌকোখানি চলেছে—যে গাঁয়ে যে লোক তাকে সেই গাঁয়ে রেখে। পুরোনো যাত্রী যেমন নিজের গাঁয়ে নেমে যাচ্ছে অমনি তার জায়গার ঘাট থেকে নূতন যাত্রী এসে নৌকোয় উঠছে। এমনি করে নালকদের নৌকো কখনো চলেছে সকালের বাতাসে পাল তুলে দিয়ে তীরের মতো জল কেটে, কখনো বা চলেছে রাতের অন্ধকারের ভিতর দিয়ে কালো জলে পিদিমের একটু আলোর দাগ টেনে—এমন আস্তে যে মনেই হয় না যাচ্ছি। দিনে-দিনে বর্ষাকালে নদী জলে ভরে উঠছে। আগে কেবল নদীর উঁচু পাড়ই দেখা যাচ্ছিল, এখন উপরের খেতগুলো, তার ওধারে গাঁয়ের গাছগুলো ঘরগুলো, এমন-কি অনেক দূরের মন্দিরটি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। জল উঁচু হয়ে উঠে বালির চর সব ডুবিয়ে দিয়েছে!

নৌকো যখন নালককে দেশের ঘাটে নামিয়ে দিয়েছে তখন ভরা শ্রাবণ মাস; ঝুপ-ঝুপ বৃষ্টি পড়ছে, নদীর ধারে-ধারে বাঁশ-ঝাড়ের গোড়া পর্যন্ত জল উঠেছে। থৈ-থৈ করছে জল। খালবিল খানা-খন্দ ভরে গেছে, ঘাটের ধাপ সব ডুবে গেছে—স্রোতের জলে বর্ষাকালের নূতন জলে। নালক ঘাটে দাঁড়িয়ে দেখছে কতদূর থেকে কার হাতের একটি ফুল ভাসতে-ভাসতে এসে ঘাটের এক কোণে লেগেছে; নদীর ঢেউ সেটিকে একবার ডাঙার দিকে, একবার জলের দিকে ফেলে দিচ্ছে আর টেনে নিচ্ছে। নালক জল থেকে

ফুলটিকে তুলে নিয়ে, মনে-মনে বুদ্ধদেবকে পুজো করে মাঝ-নদীতে আবার ভাসিয়ে দিলে। তারপর আস্তে-আস্তে সে ঘরের দিকে চলে গেল— বৃষ্টির জলে ভিজতে-ভিজতে। এই ফুলটির মতো নালক— সে মনে পড়ে না কতদিন আগে— ঋষির সঙ্গে-সঙ্গে ঘর ছেড়ে, মাকে ফেলে সংসারের বাইরে ভেসে গিয়েছিল। আজ এতকাল পরে সে আবার ওই ফুলটির মতোই ভাসতে-ভাসতে তার দেশের ঘাটে, মায়ের কোলের কাছে ফিরে এসে আটকা পড়ল। আবার সেদিন কবে আসবে, যেদিন বুদ্ধদেব এই দেশে এসে ঘাটের ধারে আটকা পড়া ফুলটির মতো তাকে তুলে নিয়ে আনন্দের মাঝ-গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে যাবেন!

নালক তাদের ঘরখানি দেখতে পাচ্ছে, আর দেখতে পাচ্ছে ঘরের দাওয়ায় তার মা বসে রয়েছেন, আর উঠানের মাঝে একটি ভিখারী দাঁড়িয়ে গাইছে—

'এরে ভিখারী সাজায়ে তুমি কী রঙ্গ করিলে!'

সংযোজন

আলেখ্য

হিন্দুস্থানের বাদশা জাহান্‌গীর একদিন ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম জেমসের রাজদূত রো সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সাহেব, ফিরিঙ্গির মুল্লুক আমার হিন্দুস্থানের কাছে কোন্ বিষয়ে বড়ো" ?

সাহেব তখন অনেক দিন এদেশে কাটাইয়াছেন; হিন্দুস্থান সম্বন্ধে যে ভুল বিশ্বাসটুকু লইয়া তিনি প্রথমে এখানে আসিয়াছিলেন, দিল্লীর চাঁদনী চৌকে এবং বাদশাহের খাস্‌মজ্‌লিসে দুই-একবার যাতায়াত করিয়াই তাঁহার সে ভুল ভাঙিয়াছিল। এদেশের সোনার তঞ্জাম, হাতির হল্‌কা, শিকারী চিতাবাঘ প্রভৃতি দেখিয়া বাদশাহকে ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট হইতে একটা ফিটন্ গাড়ি এবং এক জোড়া ভালো কুত্তা উপহার দিতে তাঁহাকে যে সবিশেষ লজ্জা পাইতে হইয়াছিল, এ কথাও তিনি মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু তবু এদেশের কাছে বেলাত কিছুতেই হার মানিতে চাহিল না! সাহেব কোটের পকেট হইতে একখানি মেমের ছবি বাদশার সম্মুখে ধরিয়া দিয়া বলিলেন, "এমন তস্‌বীর হিন্দুস্থানে যতদিন না পাওয়া যায়, ততদিন বিলাতেরই জিৎ রহিল।"

খাস্ দরবারের এই ঘটনায় সমস্ত দিল্লী শহর যে-প্রকার বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল, কাবুল থেকে হঠাৎ একটা বিদ্রোহের সংবাদ আসিলেও সেরূপটা হইত কিনা সন্দেহ। আজ শহরে লোকের মুখে আর অন্য কথা নাই! ঘরে বাহিরে, চৌরাস্তার মোড়ে, গলি ঘুঁজিতে সর্বত্র সেই একই কথা। পাশের দোকানের সামনে শৌখিন লোকেরা সেই বিলাতি ছবিরই কথা পেড়েছে, আমির ওমরাহের মজলিসে সেই কথারই তর্ক উঠেছে, রাস্তার চুড়িওয়ালী, একার গাড়ওয়ান, এমন-কি, জলের ভিস্তিরা পর্যন্ত ফিরিঙ্গীর এই স্পর্ধার কথা নিয়ে বলাবলি করিতেছে। যে দিল্লীর তস্‌বীর

জগদ্‌বিখ্যাত, তার সঙ্গে ফিরিঙ্গী সাহেব টক্কর দিতে চায়? মহাল থেকে মহল্লায় মহল্লায় জাহান্‌গীর বাদশার পেয়াদা ছুটিল, দিল্লীর ছোটো বড়ো নকশাওয়ালা, ওস্তাদ, কারিগর, নামজাদা তস্‌বীরওয়ালা মিনা বাজারে একত্র হলে বাদশা তাদের মাঝে সেই বিলাতি ছবিখানা ফেলে দিয়ে নকল করিবার হুকুম দিলেন— আসলের সঙ্গে যেন তিল তফাৎ না হয়— হিন্দুস্থানের পঁচিশ জন প্রসিদ্ধ কারিগর একমাস ধরে সেই তসবীরের নকল ওঠাইতে লাগিল। দিনের পর দিন, অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমে বিলাতের সেই দুধে আল্‌তায় সুন্দর রঙ সোনার তারের মতন চিকন কেশ ফরাসী ছিটের লতাপাতা ওস্তাদের কলমের মুখে গজদন্তের পটের উপরে অবিকল ফুটে উঠিল, কেবল সমুদ্রের মতো নীল চোখের তারা দুটির কাছে সমস্ত কারিগরের সব কৌশল ব্যর্থ হল! তসবীরের চোখ কোনোটার হল তামড়া আভা, কোনোটার কালো, কোনোটার বা ফিরোজার মতো নীল। বাদশা মহা ক্ষাপ্পা হয়ে উঠিলেন, কারিগরদের উপর ধমক, সোরসরাবত চলিতে লাগিল। যে বিলাতি ছবির জন্যে এতটা কাণ্ড, জগতের জ্যোতি নূরজাহান বেগম সে বিলাতি ছবিটা একবার অন্দর মহলে আনিয়ে দেখিলেন, তার পরে বাদশাকে বলিলেন— "লাহোরে সরিফ ওস্তাদ বলে এক তসবীরওয়ালা আছে, সে একদিন ইচ্ছা করলে এ ছবির অবিকল নকল ওঠাতে পারে।" বাদশার কাজে সরিফ ওস্তাদ দিল্লীর দরবারে হাজির হল; বাদশা তাকে ডেকে বললেন— এ তসবীর তুমি কতদিনের মধ্যে নকল করে দিতে পার;— ওস্তাদ বললে— জাহাঁপানা তিন রোজ, কিন্তু খোদাবন্দ বুড়ো হয়েছি চোখের আর তেজ নাই কি জানি চুক্ হতে পারে! উজীর সাহেবের ঘরে এক ছোকরী আমার কাছে তসবীরের কাম্ অনেক দিন ধরে শিখেছিল, এখন তার জোয়ান বয়েস, সেই অবিকল এই তসবীরের নকল ওঠাতে পারে। তার হাতও যেমন দোরস্ত, আঁখেরও তেমনি তেজ আছে।— বাদশা আবার নূরজাহানের শরণাপন্ন হইলেন। বেগম বলিলেন— আমার বাপের বাড়ির এক ছোকরী এই কাম

জানে বটে ; কিন্তু এখন সে বড়োলোকের ঘরে বাঁদি হয়েছে। সে যে তসবীর ওঠাতে রাজি হয়, এমন তো বোধ হয় না, দেখি চেষ্টা করে।

বেগমের কাছে আশ্বাস পেয়ে জাহান্‌গীর অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। তিন দিন পরে বাদশার হুকুম তামিল হল। ছবির নকল প্রস্তুত, এবার নকলে আসলে একটুও প্রভেদ নাই। সেই চোখ, সেই রঙ। এবার সাহেবের হার হল, বাদশা যখন দরবারের মাঝে হাজার হাজার আমির ওমরাহ নকশাওয়ালা কারিগর লোকলস্করের সামনে সাহেবের ছুই হাতে ছুইখানি ছবি দিয়ে বলিলেন "তোমার কোন্‌টা চিনে লও" সাহেব উত্তর দিলেন, জগজ্জয়ী জাহান্‌গীর যখন আমার বিপক্ষে তখন জয়ের আশা তো ছিলই না, এখন জগজ্জ্যোতি নূরজাহানের কৃপা ভিন্ন আসলে নকলে ভেদ বুঝিবার সাধ্যই-বা কাহার ?" সাহেব এক ঢিলে ছুই পাখি মারিলেন— বাদশা বেগম ছুজনকেই খুসি করিয়া দিলেন— তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, মোগল বাদশাহের দরবারে কথার দাম কাঁচা মাথাটার চেয়ে অনেক বেশি— সাহেবকে রীতিমত খেলাত দিয়া জাহান্‌গীর দরবার ভঙ্গ করিলেন।

দিল্লীর ছোটো বড়ো সকলেই যখন হিন্দুস্থানের জয়ে এবং সাহেবের চাটুবাদে উৎফুল্ল হইয়া ঘরে চলিয়াছে, কেল্লার ফটকে নাকরাখান নহবতের বাঁশিটা আজ যেন অন্য দিনের চেয়ে একটু যখন জোরে জোরে বাজিয়া উঠিয়াছে, তখন অন্দরমহলে বাদশার হুজুরে নূরজাহান বেগম দরবার জানাইলেন "খোদাবন্দ বাঁদীর জন্য কিছু বখ্‌শিসের হুকুম হয়"! বাদশা সেই দিনের ছাপা একটি নতুন মোহর বেগমের হাতে দিয়া বলিলেন, "বিবি, তোম্‌ার ইনাম্‌ এবার এই !" মোহরের একপিঠে অপূর্ব সুন্দরী নূরজাহানের মূর্তি লেখা আছে, আর-এক পিঠে লেখা আছে— জগতের জ্যোতি নূরজাহানের সম্পর্কলাভে স্বর্ণের গুণ আজ শতগুণ বৃদ্ধি পাইল।

আইনে চীন্-ই

যোধপুরের রাওল সুরসিং বিবাহের জন্য ঔরঙ্গজেবের দরবার হইতে ছুটি লইয়া দেশে ফিরিলেন ; এই ঘটনার সঙ্গে সোনার খাঁচার পাখিটির মতো মোগল অন্তঃপুরে কারুকার্য-বিচিত্র পাষাণকক্ষে সুখলালিতা সম্রাটকুমারী জেবুন্নেসার মেজাজের হঠাৎ পরিবর্তনের কী সম্বন্ধ তা কে জানে? তবে জেবুন্নেসা যে সে জেবুন্নেসা নাই,— কিছু দিন হইতে সাহাজাদীর মেজাজ যে বেশ একটুখানি গরম হইয়াছে সেটা দাসী ও বাঁদী মহলে সকলে বেশ অনুভব করিতেছিল।

বিদুষী এবং স্বভাবত কোমলপ্রাণা জেবুন্নেসার এই আকস্মিক পরিবর্তনে বাদশাও একটু চিন্তিত হইলেন ও নানা উপায়ে কন্যার মনোবিকার অপনোদনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে নওরোজ আসিয়া পড়িল। বাদশাহ এবারকার নওরোজ অভাবনীয় ধূমধামের সহিত সম্পন্ন করিতে হুকুম দিয়া, জেবুন্নেসাকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন— "এবার নওরোজে রাজ্যের সমস্ত রানী নবাব পত্নী, কি ছোটো কি বড়ো, নিমন্ত্রণ করো। আমি হুকুম দিয়াছি সকলকেই এবার মীনাবাজারে আসিতে হইবে, সকলের আদর-অভ্যর্থনার ভার তোমার উপরে দিলাম।" বাদশা বুঝিয়াছিলেন জেবুন্নেসার চিত্তবিনোদনের জন্য সকালে সন্ধ্যায় তিনি যে-সকল আমোদ-আহ্লাদ নাচ-তামাসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সেগুলা তার পক্ষে উৎপীড়ন স্বরূপ হইয়াছিল সেইজন্য মীনাবাজারের ভার লইবার প্রস্তাবটা বাদশা একটু ভয়ে ভয়ে পাড়িয়াছিলেন কিন্তু এ কার্যটায় জেবুন্নেসার বরং যেন একটু উৎসাহই দেখা গেল ; সুতরাং বাদশাহ অনেকটা প্রফুল্লমনে কন্যার মহল হইতে বিদায় হইলেন।

রৌশনবাঁদী সাহাজাদীর প্রিয় পরিচারিকা এবং বাদশাহের গুপ্তচরও বটে ;— নানা সমস্যা কুটিল অন্তঃপুররাজ্যের গোপন

সংবাদ হুজুরে পৌঁছিয়া দেওয়া তাহার একটা বিশেষ লাভজনক কাজ ছিল। সেজন্য মীনাবাজারে উপস্থিত হইবার জন্য মোগল অন্তঃপুর হইতে রানী ও বেগমদিগের নামে পত্র বিলি করিবার সময় যোধপুরের নূতন বৌরানীর পত্রখানি নিজ হস্তে লিখিয়া জেবুন্নেসা যখন রৌশনকে রওয়ানা করিবার জন্য দিলেন তখন সে পত্রখানি বাদশার হাতে আসিয়া পড়িল। বাদশাহ সেখানি যত্নে খুলিয়া পাঠ করিলেন এবং নিজের লোক দিয়া সেখানি অবিলম্বে যোধপুরে প্রেরণ করিলেন।

পত্র যথাসময়ে ঠিকানায় পৌঁছিল এবং সুরসিংহ নবপত্নীকে লইয়া দিল্লীমুখে রওনা হইলেন। সে বারের নওরোজ যেমন হইতে হয়! দিল্লী শহরে নাচ গান আমোদ আহ্লাদের যেন ফোয়ারা ছুটিয়া গেল। অবিশ্রান্ত আমোদের নেশায় নওরোজের প্রথম আট দিন যেন নিমেষের মধ্যে কাটিয়া গেল। নয়দিনের দিন বৈকালে মীনাবাজার। সে দিন প্রাতঃকাল হইতে রৌশন বাঁদির বিশ্রামের আর অবসর ছিল না, সে দিন সাহাজাদীর সাজিবার শখ এমনি বাড়িয়া উঠিল যে রৌশনবাঁদি নিজে যে একটু সাজিয়া গুজিয়া ফিট্‌ফাট্ হইয়া লইবে এ অবকাশটুকুও মেলা ভার। সাহাজাদীর এক ছাঁদের পর অন্য ছাঁদে চুল বাঁধিতে, একটার পর আর একটা পেশোয়াজ ওড়নী ও অলংকার প্রভৃতি নানা খুঁটিনাটি বাহির করিতে রৌশন অস্থির হইয়া পড়িল। মহলের দাসী বাঁদিরা আজ সাহাজাদীর সাজ ও ভাবভঙ্গি দেখিয়া অবাক হইয়া গেল ও তাহাদের মধ্যে একটা কানা-ঘুষা পড়িয়া গেল। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল বড়ো লোকের মেজাজ খুশি হতেও যতক্ষণ আবার খারাপি হতেও ততক্ষণ। দেখ আজ কার কপালে কী আছে? রৌশন জেবুন্নেসার কাছে ছুটি পাইয়া সেই সময়ে সেই দিক দিয়া যাইতেছিল, সে বলিয়া উঠিল— কার কপাল ভেঙেছে আমি জানি। এই বলিয়া রৌশন দেল্‌জানের কানে কানে কি ফিস্‌ফিস্ করিয়া মীনাবাজারের দিকে চলিয়া গেল।

মোগল ভাণ্ডারের অমূল্য মণিমাণিক্য ও জরীজরাবতে মণ্ডিতা সাহাজাদী জেবুন্নেসা যখন মীনাবাজারে দর্শন দিলেন তখন মনে হইল আকাশ হইতে হুর কি পরী নামিয়া আসিয়াছে! সে রূপ যে দেখিল সেই বলিল হাঁ বাদশার মেয়ে বটে!

আজ মীনাবাজারে রূপসীর মেলা বসিয়াছে এবং দেশের সুন্দরী একত্র হইলে যাহা হয় অন্য কথা নাই— কেবল রূপেরই চর্চা চলিয়াছে। ও রানী দেখিতে কেমন, ও বেগমের রংটা কি প্রকার, কার গহনার কত মূল্য ইহা লইয়াই তর্ক বিতর্ক চলিয়াছে। সেই সময়ে সাহাজাদী বলিয়া উঠিলেন— "ভালো কথা আমরা তো সব রূপসী একসঙ্গে মিলিয়াছি এখন বিচার হউক না আমাদের মধ্যে সেরা রূপবতী কে? আমি বাদশাহকে বলিয়া তাঁহাকে আজ পুরস্কার দেওয়াইব।" তখন সাহাজাদীর পেয়ারের দাসী রৌশন বাদশার হুজুরে পুরস্কারের প্রার্থনা জানাইতে ছুটিল। বাদশা শুনিয়া বলিলেন— "খেলাটা জমিতেছে বটে! ভালো, আমি পুরস্কার দিতে রাজি আছি কিন্তু জেবুন্নেসা যেন সাবধানে থাকেন, রূপের আগুন লইয়া খেলা কাহারো গায়ে যেন আঁচ না লাগে।" রৌশন বাঁদী মীনবাজারে আসিয়া বাদশাহের মন্‌জুর জানাইবামাত্র সুন্দরী মহলে রূপের পরীক্ষা দিবার জন্য একটা ধুম পড়িয়া গেল। সকলেই পরীক্ষা দিতে অগ্রসর! পরীক্ষা লয় কে? সকলে মিলিয়া জেবুন্নেসাকে রূপের বিচার করিবার জন্য ধরিয়া পড়িল। তখন সাহাজাদী বলিলেন— "বা! সবাই পরীক্ষা দিবে আমি বুঝি ফাঁকে পড়িব, সে হইবে না! এই আমেরের বুড়োরানী আছেন ইনিই আজ বিচারপতি হউন।"

সর্বনাশ! বাদশাজাদীর সঙ্গে রূপের লড়াই? সাপ লইয়া খেলা! সুন্দরীর দল একে একে গা ঢাকা হইতে লাগিলেন এবং খেলা ভাঙিয়া যায় দেখিয়া জেবুন্নেসাও বিশেষ উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিলেন। আম্বেরের বুড়ারানী জেবুন্নেসার মুখে অসন্তোষের লক্ষণ দেখিয়া বুঝিলেন বাদশাজাদী আজ হয় কোনো নবাবপত্নী কি ওমরাহ কন্যা অথবা হিন্দু রানীকে সকলের সম্মুখে কুরূপা প্রমাণ করিয়া

অপদস্থ করিতে চাহেন। অজ্ঞাতনাম্নী মহিলা কেন যে সাহাজাদীর কোপে পড়িলেন এবং কেনই বা জেবুন্নেসা তাহার উপর ঝাল ঝাড়িতে চাহেন তাহা জানিবার উপায় ছিল না। বুড়ারানী মহা বিপদে পড়িলেন এবং সকল দিক বজায় থাকে এরূপভাবে সাহাজাদীকে বলিলেন— "লড়ায়ের পূর্বেই সকলে যখন রণে ভঙ্গ দিল তখন এ ক্ষেত্রে বিনাযুদ্ধে বাদশাজাদীরই জয় বলিতে হইবে, তবে নেহাৎ যদি লড়ায়ের সাধ হইয়া থাকে তো আমি আছি, স্বয়ং বাদশা আসিয়া বিচার করুন আমি সুন্দরী কি সাজাদী সুন্দরী।"

রানীজীর কথায় সুন্দরীমহলে একটা হাসির রোল উঠিল। সকল সুন্দরী একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন— আমরা স্বইচ্ছায় সাজাদীর কাছে পরাজয় স্বীকার করিতেছি, বাদশাহের পুরস্কার ইঁহারই পাওয়া উচিত। বুড়ারানী এই সুযোগে জেবুন্নেসাকে আরো একটু খুশি করিয়া দিবার জন্য বলিলেন— "দেখ সুন্দরীগণ, তোমরা সকলেই আসামী, আর আমাদের সাহাজাদী ফরিয়াদী, আমি হলেম কাজী সাহেব; তোমরা সকলে যখন তোমাদের রূপের দোষ কবুল যাইতেছ তখন সাহাজাদীর পক্ষে একতরফা ডিক্রী দেওয়া গেল ও তোমাদের এই হুকুম দেওয়া যায় যে সকলে একে একে আসিয়া নিজের নাম ধাম ও পরিচয় দিয়া সাহেনসা ঔরঙ্গজেব বাদশার রূপবতী গুণবতী দয়াবতী দুহিতা কুমারী জেবুন্নেসাকে কুর্নিশ করিয়া বিদায় হও।"

সুন্দরীর দল বাদশাজাদীকে যথারীতি সেলাম বাজাইয়া দূরে গিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। সকলের কুর্নিশ শেষ হইলে বাদশাজাদী বলিয়া উঠিলেন— "কই যোধপুরের বৌরানীকে দেখিলাম না যে? দেখ্ তো রৌশন তিনি এসেছেন না?" রৌশন চারিদিক দেখিয়া আসিয়া বলিল— "কই তাঁহাকে তো দেখিলাম না।" সাহাজাদী বলিলেন— "তুই ভালো করিয়া দেখিয়া আয়, বোধ হয় অন্য ঘরে আছেন।" রৌশন আবার ছুটিল। আমেরের বুড়ারানী

ব্যাপারটা কতক বুঝিলেন এবং বেচারা যোধপুরনীর জন্য একটু বেশ ভয় পাইলেন; কি জানি কি ঘটে! এদিকে রৌশন এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে দেখিল যোধপুরের বুড়ারানী এক ঘরে বসিয়া আছেন। সে রানীকে চিনিত, তাড়াতাড়ি গিয়া বলিল— "রানীমা সাহাজাদী বৌরানীকে দেখিতে চাহেন, কোথায় তিনি?" বলিতে বলিতে বৌরানী সেখানে উপস্থিত। অপূর্ব সুন্দরী! রৌশন সে রূপ দেখিয়া অবাক হইয়া গেল, মনে মনে বলিল এইবার, এইবার সাহাজাদীর দর্পচূর্ণ দেখছি, বড়ো রূপের দেমাক হয়েছে, এইবার দেখা যাবে! বলা বাহুল্য, জেবুন্নেসা রৌশনের খাঁদা নাকের প্রশংসা তাহার সম্মুখে প্রায়ই করিতেন এবং সেজন্য রৌশনও সাহাজাদীর নিকটে বিশেষ বাধিত ছিল।

মীনাবাজারে সকলে যখন উৎকণ্ঠিতা হইয়া ঘন ঘন দ্বারের দিকে চাহিতেছিলেন, সেই সময়ে বৌরানীকে লইয়া রৌশন সাহাজাদীর সম্মুখে হাজির করিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। বৌরানী সসংকোচে ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া বাদশাজাদীকে কুর্নিশ করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। জেবুন্নেসা বুড়ারানীর দিকে চাহিয়া বলিলেন— "রানীজি, আসামী হাজির, এখন বিচার করিতে আদেশ হউক"— জেবুন্নেসা রৌশনকে ইসারা করিলেন, রৌশন আসিয়া বৌরানীর অবগুণ্ঠন উঠাইয়া ধরিল। রৌশনের মুখ অতিশয় গম্ভীর কিন্তু তাহার খাঁদা নাকের নথ কেন যে অমন করিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল তাহা কে বলিবে!

আমেরের বুড়ারানী সে দিনের মীনাবাজারের বিষম সমস্যার কিরূপ মীমাংসা করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না, তবে রৌশন সে রাত্রে সাহাজাদীর শয়নকক্ষের দ্বারে অনেকক্ষণ কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া ছিল এবং সে যে অনেক দীর্ঘনিশ্বাস শুনিয়াছিল সে কথা গোপন রাখে নাই। রৌশন সে রাত্রে সাহাজাদীর কক্ষে দু-একবার প্রবেশলাভের চেষ্টাও করিয়াছিল কিন্তু কয়বারই বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। জেবুন্নেসা অতি প্রত্যুষে রৌশনকে

ডাকিয়া পাঠাইলেন। রৌশন মীনাবাজার হইতে ফিরিবার সময় সাহাজাদীর মুখের ভাব বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছিল এবং বৌরানীর অবগুণ্ঠন খুলিবার কালে তাহার নথের অকারণ চাঞ্চল্যটার প্রতি সাহাজাদীর যে বিলক্ষণ নজর পড়িয়াছিল সেটাও রৌশন জানিত, কাজেই বেচারা একটু বিশেষ চিন্তিত মনে সাহাজাদীর মহলে উপস্থিত হইল।

রৌশন গিয়া সাহাজাদীর মুখে হাসি দেখিবে এটা স্বপ্নেও ভাবে নাই। সেজন্য যখন রৌশন আসিবামাত্র জেবুন্নেসা তাহার খাঁদা নাকে বড়ো একটা মুক্তার নথ পরাইয়া তাহার হাতে বহুমূল্য একটি চীনদেশীয় আয়না দিয়া বলিলেন— "দেখ দেখি নথটা তোর নাকে মানাইয়াছে কেমন!" তখন রৌশন হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সাহাজাদী বলিলেন— "জানিস এই আয়না চীনের রাজা বাদশাকে দিয়াছে। তুই এখানা যোধপুরের বৌরানীকে দিয়া আসিতে পারিস? সে যেমন সুন্দরী এ আয়না তারই উপযুক্ত। বলিস এখানি বাদশার পুরস্কার।" রৌশনের যতটুকু বুদ্ধি ছিল এইবার লোপ পাইল এবং সাহাজাদীকে সেলাম করিয়া খোদার নাম স্মরণ করিতে করিতে কম্পিত চরণে অগ্রসর হইল। রৌশনকে অধিক দূর যাইতে হইল না, মধ্যপথে হঠাৎ বহুমূল্য সেই মুকুর তাহার হস্তচ্যুত হইয়া পাষাণের উপর চুরমার হইয়া গেল। কাচের ঝনঝনায় সাহাজাদী ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন সেই বহুমূল্য আয়না ভাঙিয়া চুর হইয়াছে। রৌশন সাহাজাদীকে দেখিয়া কপালে করাঘাত করিয়া বলিল—

"অজকজা আইনে চীন্‌ই শিকস্ত!"

সাহাজাদী প্রথমে কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ করতালি দিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"খুব শুদ্ আস্বাব খুদ্‌বিনি শিকস্ত।"

রৌশন এতক্ষণ মনে মনে পীরের সিরনী মানিতেছিল, সাহাজাদীর কথায় অভয় পাইয়া একেবারে দরজার অভিমুখে ছুটিল। আর

সাহাজাদীর হুকুমে সিস্‌মহলের কারিগর সেই আয়না চূর্ণ দিয়া দুই ছত্র কবিতা জেবুন্নেসার গৃহদ্বারে লিখিতে বসিল।

"অজ কজা আইনে চীন্‌ই শিকস্ত
খুব শুদ্‌ আস্বাব খুদ্‌বিনি শিকস্ত॥"

"দর্পণ ভাঙিয়া দেখি চূর্ণ হল আজ।
ভালো হল, না রহিল দর্পের সে সাজ॥"

রাজা নয়, দ্বিতীয় যমরাজ। যমের দ্বার দেখাইতে লোকে তখন দক্ষিণ দেখাইত না, দেখাইত উত্তর— যেদিকে রাজমিহিরের রাজপাট কাশ্মীর।

সে বৎসর ফাল্গুনের দোল-পূর্ণিমায় এই নরপাল নয়— নরক-পাল বিলাসভবনে পিচকারির পরিবর্তে ছুরির ব্যবস্থা করিয়া হতাহত শত শত অন্তঃপুরচারিকার ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দেহ লইয়া বেতালের মতো বিকট তাণ্ডব লীলায় মগ্ন আছেন। নর-শোণিতের রক্তিমা কুঙ্কুমের রক্তবর্ণকে ধিক্কার দিয়া রাজার উষ্ণীষে উত্তরীয়ে, রাজ-প্রাসাদের গৃহে গৃহে ধবলমণি ভিত্তিতে, শ্যামল পুষ্পকাননে, নির্মল কেলি সরোবরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। খণ্ডবিখণ্ড অভ্রমালায় রক্ত আভা! দূরে দিগন্তে রক্ত ধূলিজাল!

যখন এই মরণোৎসবের মাঝখানে বুদ্ধোপাসিকা রাজরানী জয়শ্রীর ডাক পড়িল তখন বীণাবাদিনীর জীবনশোণিতসিঞ্চিত বীণার ঝঙ্কার মন্দ হইয়া আসিয়াছে, মরণোন্মুখ নর্তকীর নূপুর নিক্কণ স্খলিত হইতেছে আর কুঞ্জবাটিকায় থাকিয়া থাকিয়া রক্তচঞ্চু পিকবধূর উহু উহু আজিকার মরণ রাগিণীতে মূর্ছনা দিতেছে।

সিংহলবাসিনী জয়শ্রী তন্তুবায় কন্যা। রূপসী যে ছিলেন তাহা নয়; খেলাচ্ছলে রাজা তাঁহাকে কোনো সময়ে রাজ-অন্তঃপুরে বরণ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং খেলা শেষে রাজপুরের একপ্রান্তে তাঁহাকে বিসর্জন দিয়াছিলেন।

প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদের জনপূর্ণ নিঃসঙ্গতার মাঝে বিরাট মন্দিরের এককোণে সামান্য চৈত্যটির মতো জয়শ্রী নয়নান্তরালে গোপনে নিজের পবিত্র জীবনের সফলতাটুকু লইয়া বিনা আড়ম্বরে দিন কাটাইতেছিলেন; হঠাৎ আজ ডাক পড়িয়াছে শুনিয়া প্রথমে তিনি

কেমন একটু সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িলেন, পরে কঞ্চুকীর মুখে যখন শুনিলেন রাজা আজ মৃত্যুরূপে রাজমহলে ক্রীড়া করিতেছেন তখন জয়শ্রী হাসিমুখে কঞ্চুকীকে বিদায় দিয়া বেশ-গৃহে প্রবেশ করিলেন।

রাত্রির অন্ধকার সন্ধ্যার সমস্ত রক্তরাগ মুছিয়া দিক্‌দিগন্তে একটা কালিমার প্রলেপ দিয়াছে। শত সহস্র প্রদীপের রশ্মিতে বোধ হইতেছে যেন সমস্ত রাজপ্রাসাদটায় কে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। রাজা রাজমিহির নববস্ত্রে, নবরত্ন অলংকারে দীপ্যমান দ্বিতীয় সূর্যের মতো প্রমোদভবনে বিরাজ করিতেছেন। কোথাও আর সারা দিবসের বীভৎস লীলার চিহ্নমাত্র নাই— সুমার্জিত গৃহভিত্তিতে বারিসিঞ্চিত পুষ্পকাননে কোথাও কোনোখানে নয়। দোর্দণ্ড প্রতাপ রাজার আজ্ঞায় অঙ্গন-প্রাঙ্গণ শোণিতকর্দমে পিচ্ছিল হইয়া গেল, আবার তাঁহারই আজ্ঞায় এক নিমেষে প্রাসাদ হইতে যৎসামান্য রক্তের রেখাটুকু পর্যন্ত দূরীভূত হইল।

এই সদ্য প্রক্ষালিত রাজ-গৃহাঙ্গনে পদার্পণ করিতেই জয়শ্রী মৃত্যুর একটা সুতীব্র শীতলতা নিজের সমস্ত দেহে অনুভব করিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন ; পরে লূতাতন্তুর উপরে নিহিত শিশির-কণার মতো নিজের অতি সূক্ষ্ম বক্ষোবাসে চিত্রিত শুভ্র দুইখানি বুদ্ধচরণে দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে রাজসদনে প্রবেশ করিলেন।

এই বুদ্ধচরণাঙ্কিত শুভ্র বক্ষোবাস জয়শ্রীর বিবাহের যৌতুকস্বরূপ পিতৃগৃহ সিংহল হইতে আসিয়াছিল। হিন্দুরাজকুলসূর্য মিহিরের মহিষী বক্ষে বুদ্ধের চরণাঙ্ক ধারণ করিবেন এটা রাজার অসহ্য ছিল ; সুতরাং ওই বস্ত্রখণ্ড পরিধান সম্বন্ধে জয়শ্রীর উপর তিনি কঠোর নিষেধ প্রচার করিয়াছিলেন। আজ সহসা উৎপলবর্ণা পাণ্ডুবসনা জয়শ্রী যখন রাজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন রানীর নিরাভরণ বক্ষে একমাত্র আভরণ সেই পদাঙ্ক দুইখানির উপরেই রাজার প্রথম দৃষ্টি পড়িল।

ক্রূরকর্মা রাজা মিহির আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া

পরিহাসের স্বরে জয়শ্রীকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন— মহারানী উপযুক্ত উৎসবের বেশই ধারণ করিয়াছ! শ্বেতবসনে কুঙ্কুমরাগ মানাইবে ভালো।

পূর্ব দিগন্তসীমায় নবোদয়ের কনকলেখা দেখা দিয়াছে; ভারত-খণ্ড জুড়িয়া অস্তোন্মুখ জ্যোৎস্নার ম্লান পাণ্ডুতা একখানি শোণিতহীন মুখচ্ছবির মতো বিবর্ণ, বিষণ্ণ!

শ্মশান হইতে দুই রাজপরিচারিকা মৃৎপাত্রে মহারানী জয়শ্রীর শেষ অস্থি এবং রক্তাক্ত পদাঙ্কবাস বহন করিয়া সিংহলের অভিমুখে প্রস্থান করিল।

বোধিধর্মের সঙ্গে জয়শ্রীর রক্ত-পতাকা পূর্বসমুদ্র পারে নির্বাসিত হইয়া গেল। তাহার স্থানে রহিল নামাবলী, তিলকমালা ইত্যাদি এবং রাজসিংহাসনে সর্বসম্মতিক্রমে হিন্দু মিহির!!

সূত্রপাত

সামান্য চামার যে মানুষের মধ্যেই গণ্য হয় না; তাহার মনে মানুষের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে স্বাধীন ধারণা এবং সেই অধিকার বজায় রাখিবার জন্য এতটুকু দৃঢ়প্রতিজ্ঞা যে থাকিতে পারে এটা স্বপ্নের আগোচর। সুতরাং কাশ্মীররাজ কুলচূড়ামণি চন্দ্রাপীড়ের আদেশে রাজমন্ত্রী, ত্রিভুবনেশ্বরের মন্দির নির্মাণের জন্য, রাজধানীর উত্তর-পশ্চিমাংশে ঐ চামারের ভিটা ও তৎসন্নিহিত ক্রোশেক পরিমাণ জমি মনোনীত করিয়া দিতে কিছুমাত্র ইতস্তত করিলেন না। রাজমন্ত্রীর আজ্ঞায় স্থপতিগণ সিংহদ্বার হইতে সূত্রপাত করিয়া পূর্বপশ্চিম মুখে ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে; সূত্রের মুখে যাহাদের বাড়ি ঘর পড়িতেছে তাহারা যথা বা অযথা মূল্যে নিজের নিজের ভিটা রাজসরকারে ছাড়িয়া দিয়া অন্যত্র উঠিয়া যাইতেছে; এবং সেই সকল বহু সুখদুঃখ স্নেহমমতার আশ্রয় বহুকালের প্রাচীন ভিটা পাষাণভারে চূর্ণীকৃত করিয়া দিনে দিনে প্রকাণ্ড দেবায়তন— বিচিত্র বিমান কুম্ভ, কলস, চূড়া ইত্যাদি লইয়া সতেজে গজাইয়া উঠিতেছে। চত্তরের চারি দ্বার এবং চারিদিকে পার্শ্ব-দেবতাগণের মন্দিরাদি শেষ করিয়া স্থপতিগণ, চত্তরের উত্তরাংশে ত্রিভুবনেশ্বরের বড়ো দেউলের স্থান নির্দেশ করিয়া, চর্মকারের জমির উপরে সূত্রপাত করিয়া গেল।

যখন রাজমন্ত্রীর চিহ্নিত ভূমির ত্রিসীমানার তাবৎ লোকই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যাচিত বা অযাচিত নিজের নিজের ভিটা ও কারকারবার উঠাইয়া লইয়া দেবায়তন হইতে যতটা সম্ভব নিজেদের দূরে লইতে বাধ্য হইতেছিল, তখন কাহারো কথায় কর্ণপাত না করিয়া এই চর্মকার নিয়মিতভাবে নিজের দাওয়ায় বসিয়া পাদুকা, ঘোড়ার সাজ ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া চলিয়াছিল। এমন-কি, অধিকারী যেদিন তাহার কুটির ঘেরাও করিয়া সূত্রপাত

করিতেছিল সেদিনও সে নিমেষমাত্র নিজের কাজ বন্ধ করিল না ;— হাত তাহার যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিল। দিন শেষে কারুশিল্পীরা যখন কাজ বন্ধ করিয়া গেল তখন সে অতি শান্ত এবং গম্ভীরভাবে বড়ো দেউলের সূত্রপাতের খোঁটা মায় সূত্র, সজোরে উপড়াইয়া, একদিকে টানিয়া ফেলিল এবং পরম নিশ্চিন্ত মনে কুটিরের ঝাঁপ বন্ধ করিয়া নিদ্রা গেল।

কাণ্ডটা রাজমন্ত্রীর অগোচর রহিল না। এবং এটাও তিনি বেশ বুঝিলেন যে ভয় প্রদর্শনে, অর্থদানে, এমন-কি, বল-প্রয়োগে এই নগণ্য চর্মকার বশীভূত হইবার নহে। রাজমন্ত্রী স্বয়ং গিয়া সাধ্য-সাধনা করিলেন, কিন্তু চর্মকার অটল! সে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছে যে এমন অবিচার সে কিছুতেই ঘটিতে দিবে না। সে স্পষ্টই বলিয়া দিল— "তোমরা রাজাকে বলো গিয়া আমি ঘর ছাড়িতেছি না।"

রাজমন্ত্রী রাজার ভাবগতিক বেশ বুঝিতেন ; সুতরাং ব্যাপারটা রাজগোচরে নিবেদন করিতে তিনি বড় ব্যস্ত ছিলেন না। কিন্তু কুটিল রাজনীতির সমস্ত মারপ্যাঁচ প্রয়োগ করিয়াও যখন দেখিলেন সেই চর্মকারের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তাহারই হাতের জুতা-পাটির সূচ্যগ্র-ভাগের মতো উদ্ধতভাবে খাড়াই রহিল, তখন রাজমন্ত্রী নালিশটা রাজগোচরে আনিতে বাধ্য হইলেন। এবং এটাও তিনি রাজাকে জানাইয়া দিলেন যে রাজনীতির সমস্ত প্রয়োগগুলা এই অপবিত্র জুতার পাটিটাকে দমন করিতে সমর্থ হয় নাই ; সুতরাং এবার দণ্ডনীতির সাহায্য লওয়া প্রয়োজন।

ঠিক চর্মকারের বাস্তুভিটার উপরেই ত্রিভুবনেশ্বরের রত্নপীঠের স্থাপনা হইবে এবং সেই পুণ্য-বলে তাহার সাতপুরুষের স্বর্গলাভের সুনিশ্চিত সম্ভাবনা সত্ত্বেও চর্মকার কেন যে নিজের ও নিজ বংশ-পরম্পরার ভাবী মঙ্গল সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ হইয়া আছে এটা রাজা ছাড়া রাজসভার আর কেহ বুঝিল কিনা সন্দেহ। সুতরাং অপরের ভূমি অপহরণ করিয়া সুকর্মের অনুষ্ঠান করিতে ইতস্তত

করিয়া রাজা যখন মন্দির নির্মাণ স্থগিত রাখিতে আদেশ দিলেন, তখন রাজমন্ত্রীগণের— বিশেষত পণ্ডিতমহলে বিস্ময়ের সীমা রহিল না। দীনের কুটির ত্রিভুবনেশ্বরের দেউল হটাইয়া দিয়াছে এ কথা দেখিতে দেখিতে যখন রাজ্যমধ্যে প্রচার হইয়া গেল, তখন চর্মকারও সেটা শুনিল নিশ্চয়। সে "এমনি রাজাই তো চাই" বলিয়া সজোরে চামড়ার উপরে গুণ ছুচের মুখটা বসাইয়া দিল। পরে গম্ভীরভাবে নিজের কাজকর্ম গুছাইয়া সারিয়া সরাসর রাজদ্বারে উপস্থিত হইল।

মন্ত্রীবর চর্মকারের নাম শুনিয়া বড়োই জ্বলিয়া গেলেন। তাঁর নিজের সম্বন্ধে 'অপটু' 'অপরিণামদর্শী' প্রভৃতি যে বিশেষণগুলা রাজা এইমাত্র প্রয়োগ করিয়াছেন সেগুলা তখনো তিনি পরিপাক করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সুতরাং 'চর্মকার রাজসম্ভাষণপ্রার্থী! তাহার প্রবেশ আজ্ঞা হউক!' এ কথাটা তিনি একটু বিদ্রূপের স্বরেই রাজগোচরে নিবেদন করিলেন। রাজাও যে সেটুকু বুঝিলেন না তাহা নয়, তিনি সভাপণ্ডিতগণের প্রতি একটু উপহাস কটাক্ষ করিয়া বলিলেন— "মন্ত্রীবর! ভুল করিতেছেন। শাস্ত্রমতে চর্মকারকে রাজপ্রাসাদে আসিতে নাই। সুতরাং রাজা এবং রাজপুরুষগণকেই তাহার নিকট যাইতেই হইবে।"

রাজা সিংহাসন ছাড়িয়া উঠিলেন। অনন্যোপায় রাজপুরুষ-গণকেও সঙ্গে সঙ্গে রাজদ্বার পর্যন্ত উজান বাহিয়া চর্মকারের হুজুরে হাজির হইতে হইল!

চর্মকারকে ঘিরিয়া রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে শত সহস্র লোকের জনতা! রাজাকে আসিতে দেখিয়া তাহারা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া দুই হাতে রাজদ্বারের ধুলা গায়ে মাখিয়া আনন্দ গদ্গদ কণ্ঠে বলিতে লাগিল— "আহা একেই তো বলে রাজা! তুমি বিনি মূলে আমাদের সকলকে কিনে নিলে!" চর্মকার নিজের জমির পাটাখানা রাজার চরণে ধরিয়া দিয়া বলিল— "রাজা! এরা জোরই করে। এরা বোঝে না যে আমরা দীন দুঃখী পথের কুকুরের চেয়ে ছোটো নয় আর

তুমিও কাকুস্থ রাজার চেয়ে বড়ো নও! এরা তো বোঝে না রাজার কাছে রাজবাড়ি যেমন আদরের, দুঃখীর কাছে তার কুটিরখানিও তেমনি আদরের; রাজ্য গেলে রাজার যেমন লাগে, কুটির গেলে আমারও তেমনি লাগে। তুই মনের কথা বুঝিস রাজা, আয় আমার কুটিরে পায়ের ধুলো দিয়ে যা।"

চর্মকারের অনুসরণ করিয়া রাজা "ত্রিভুবনেশ্বরের মন্দিরে"র দিকে অগ্রসর হইলেন। অখণ্ড মান-সূত্র নির্বিচারে দেবতা চর্মকার এবং রাজার পথ সরলভাবে নির্দেশ করিয়া গেল।

বাপুষ্টা

রাজ সরকারের খাজনা আদায়-কার্যে ঘুরিতে ঘুরিতে বর্ষারম্ভে উত্তর কাশ্মীরে উপনীত হইয়াছি।

ঘন দেবদারু বনের তলায় শৈবাল শ্যামল খণ্ড শিলাসকলের ভিতর দিয়া ক্ষুদ্র গিরিনদীটি বহিয়া চলিয়াছে; তাহারই তীরে কপোতেশ্বর মন্দির ও মন্দির-সংলগ্ন অতিথশালা। চারি দিকে বহুদূর পর্যন্ত জনমানবের বাস নাই; কেবল মাঝে মাঝে প্রাচীন রাজাদের দুই-চারিটা মঠ এবং রাজনগরীর ভগ্নাবশেষ।

আশ্বিনের পরেই ধান কাটা পর্যন্ত বাপুষ্টা বনে এই পুরাতন অতিথশালায় প্রাচীন মঠ-ধারীর সহিত নির্জনতায় এবং আলস্যে দিন কাটাইতে হইবে। ভাদ্রের শেষে, কাছাকাছি গ্রামগুলার খাজনা আদায় বন্দোবস্ত করিতেছি। বহুদিনের অজন্মায় দেশ জ্বলিয়া গিয়াছিল; এবার চারি দিকে— তরুলতায়, মাঠে মাঠে, প্রকৃতির শ্যামলতা মঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে; দিকে দিকে ধানের ক্ষেত, সবজীবাগান ভরিয়া, চাষীদের সোনার স্বপনের মতো, শরতের ধান এবং হলুদবরণ কেশর ফুল দেখা গিয়াছে। মেঠো গানের মিঠে সুর এই আনন্দের কথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কত করিয়া বলিয়া যেন আর শেষ করিতে পারিতেছে না। এই দেশ-জোড়া আনন্দের মাঝে আদায়ের তাগাদা লইয়া বাহির হইতে কেমন আমার বাধো-বাধো ঠেকিতে লাগিল। আমি আরো কয় দিন দুঃখী প্রজাদের আনন্দে বাধা দিব না স্থির করিয়া নির্জন দেবদারু বনে বনে কপোতের কুহু কুহু এবং গ্রামের পথে পথে চাষীদের গান শুনিয়া কাটাইতেছি। অকস্মাৎ এই সময়ে এত আশা ভরসা সমস্ত নির্মূল করিয়া দিবার উপক্রম করিয়া অকালে মহা হিম এবং প্রচণ্ড তুষারপাতের লক্ষণ দেখা গেল।

সমস্ত আকাশের নীলিমা এক নিমেষে মুছিয়া দিয়া একটা ধূসর বিষণ্ণ ছায়া দিনের পর দিন জলস্থল-আকাশ আক্রমণ করিয়া সুদীর্ঘ দুঃস্বপ্নের মতো জাগিয়া আছে। চাষীর মুখে গান বন্ধ, দেশ জুড়িয়া একটা স্তব্ধ প্রতীক্ষা! এই সংকট ও সংশয়ের মাঝখানে বাপুষ্টা বনে হঠাৎ এক রাত্রিশেষে লোকের কোলাহল এবং ঢোলের বাদ্য শুনিয়া আমি একটু অবাক হইয়া গেলাম। একবার মনে হইল লোকগুলা আমাকেই পাকড়াও করিতে আসিয়াছে। খাজনা কিছুতেই মাপ দিব না মনে-মনে এই স্থির করিয়া মঠধারীকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। তাহার মুখে শুনিলাম, লোকেরা কপোতেশ্বরের পূজা দিতে আসিয়াছে। লোকগুলা দুর্ভিক্ষের হাত এড়াইবার জন্য পূজা দিতে আসিয়াছে আমার হাত এড়াইবার জন্য নয়। মঠধারীর কাছে এই আশ্বাসটা পাইয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম; এবং স্বচক্ষে একবার ফসলের অবস্থা ও আকাশের ভাবগতিক দেখিবার জন্য বন ছাড়িয়া মেঠো রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম।

সন্ধ্যার সময় অতিথশালায় ফিরিয়া আসিয়াছি; লোকেরা পূজা দিয়া ফিরিয়া গিয়াছে; বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির সঙ্গে একটা কনকনে হাওয়া দেবদারু বন কাঁপাইয়া বহিতেছে। বরফ পড়িবার উপক্রম দেখিয়া আমি আগুন জ্বালাইলাম এবং কম্বলখানা পাতিয়া তোরঙ্গ হইতে বহুকষ্টে পাওয়া কবি কহ্লনের রাজতরঙ্গিণীখানা বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম। প্রতাপাদিত্যের পুত্র জলৌকা বত্রিশ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া স্বর্গে গমন করিলে তৎপুত্র তুঞ্জীন দিব্যপ্রভাবসম্পন্না রাজ্ঞী বাক্‌দেবীর সহিত, মেঘ ও বিদ্যুতের মতো স্নেহবারিতে দীন প্রজার মন উৎফুল্ল করিয়া, ফলে ফুলে সুশোভিত ইন্দ্রধনুর ন্যায় নানা বর্ণ বিচিত্র রাজ্যখণ্ড, বহুদিন ধারণ করিয়া রহিলেন। এই সময়ে সহসা ঘোররূপা দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসী যখন রাজা-রানীর যশ-চন্দ্রিমা গ্রাস করিবার জন্যই যেন রাজ্যমধ্যে উপস্থিত হইল, তখন রাজভাণ্ডার শূন্য করিয়া বহু চেষ্টাতেও প্রজাগণ মারীভয় হইতে রক্ষা পাইল না। দেখিয়া মনোদুঃখে রাজা প্রাণত্যাগ করিলেন

এবং রাজ্ঞী রাজার অনুগমনের জন্য প্রস্তুত হইয়া চিতাসজ্জার আদেশ দিলেন।

চারি দিক বরফে ঢাকা। কে যেন পৃথিবীর উপরে একখানা শবাচ্ছাদন সাদা চাদর টানিয়া দিয়াছে, তাহার উপর দিয়া তুঙ্জীনের মৃতদেহ বাহকেরা লইয়া চলিয়াছে, সঙ্গে রানী বাক্‌দেবী, আর দলে দলে বভুক্ষু কাতর প্রজা "রানীমা দান করো, দান করো" বলিয়া চলিয়াছে। হায় রানীর হাত আজ শূন্য। দারুণ দুর্ভিক্ষে রানীর হাতের অলংকার পর্যন্ত বিকাইয়া গেছে।

অনুচরেরা রাজ-দেহ চিতার উপরে তুলিয়া দিল। নির্বাক রানী ধীরে ধীরে চিতায় উঠিবেন এমন সময় ক্ষুধিতের দল আবার চীৎকার করিল; "দান দিয়া যাও, দান দিয়া যাও।"

আমার বুকের ভিতরে কে যেন একটা ধাক্কা দিয়া বলিল, দেখেছ লোকগুলার অন্যায়! ঠিক সেই সময় একটা প্রচণ্ড আলোয় আমার চক্ষু ঝলসিয়া গেল এবং কে যেন আমাকে ঠেলিয়া বলিল— "বাবুজী!" চক্ষু মেলিয়া দেখি— মঠধারী! আমার চোখের সম্মুখে লণ্ঠন ধরিয়া সে বলিতেছে— "বরফ পড়িতেছে, শীঘ্র আহার করিয়া শয়ন করুন"। স্বপ্নের সঙ্গে মিশিয়া গল্পটা বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল; হঠাৎ বাধা পাইয়া মনটা ক্ষুব্ধ হইল। আহারান্তে তুঙ্জীনের গল্পটা শেষ করিলাম।

রাজ্ঞী বাক্‌দেবীর বাক্য ছাড়া আর এমন-কিছু ছিল না যে তিনি দুঃখীকে দান করেন; তিনি ঊর্ধ্বমুখে কাতর কণ্ঠে শুধু বললেন— "হে দেবতা, দীনের আহার প্রেরণ করো।" বলিয়া তিনি পতির সহিত চিতারোহণ করিলেন। সতীর বাক্য সার্থক করিয়া সেই সময়ে দেবতার বরের মতো প্রজাদের ঘরে ঘরে অসংখ্য কপোত দলে দলে আসিয়া দেখা দিল। দিনের পর দিন এই কপোত-মাংস প্রজাদের অন্নস্বরূপ হইয়া রহিল। বাক্‌দেবীকে সেই হইতে লোকে বলিত বাকপুষ্টা। এবং যে বনে তিনি চিতারোহণ

করিয়াছিলেন সেখানে কালে প্রজাদের অর্থে কপোতেশ্বর মন্দির ও তৎসংলগ্ন অতিথশালা প্রতিষ্ঠিত হইল।

পরদিন সকালে সত্যই দেখিলাম বরফ পড়িয়া মাঠ ঘাট ঢাকিয়া গিয়াছে। আমি খাজনা আদায় বন্ধ রাখিয়া সরাসর রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলাম এবং রাজার সাহেব ম্যেনেজরের নিকটে খাজনা অনাদায়ের কারণ দেখাইয়া একতক্তা রিপোর্ট পাঠাইলাম। প্রত্যুত্তরে নিজের 'হোম' বাঙ্গালা মূলুকে গিয়া 'চ্যারিটি' করিতে আদেশ পাইলাম এবং সার্টিফিকেটের মধ্যে উক্ত পত্র ও রাজতরঙ্গিণীর ছেঁড়া পুঁথি লইয়া কাশ্মীর রাজ্য হইতে বিদায় লইলাম।

উদয়াস্ত

বৃদ্ধ কাশ্মীরপতি তাঁহার প্রিয়তম পুত্র সুকণ্ঠ এবং সুকবি হর্ষকে কবিত্বের পুরস্কারস্বরূপ রাজসিংহাসন দান করিতে অভিলাষী হইলেন। কিন্তু পিতাপুত্রের মাঝখানে কঠোর ব্যবধানের মতো বর্তমান ছিলেন হর্ষের বিমাতা, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং চক্রান্তপটু মন্ত্রিদল। পিতৃস্নেহের এমন শক্তি ছিল না যে সে বাঁধ ঠেলিয়া ফেলে সুতরাং স্নেহাতুর পিতা এবং গুণবান কুমারের মধ্যে কারা-প্রাচীর কঠোরতর এবং দৃঢ়তর হইয়া উঠিতে বিলম্ব হইল না।

মহৈশ্বর্যের সুতীক্ষ্ণ জ্যোতিঃপিঞ্জরাবদ্ধ অক্ষম রাজা পলে পলে বিলুপ্তির চিরান্ধকার কামনা করিয়া বাঁচিয়া রহিলেন আর নিরাশায় নিমগ্ন পদ্মকোরকের ন্যায় রাজকুমার হর্ষের তরুণ জীবন কারাগারের সূচীভেদ্য অন্ধকারে কোন্ সৌভাগ্যের অরুণালোকের প্রতীক্ষায় রহিল।

শেষে একদিন দেখা দিল বৃদ্ধ পিতার মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া, স্নেহবঞ্চিতের চিরবাঞ্ছিত ক্লান্তির প্রশান্তি জীবনমরুর প্রখর আলোর উপরে অপরূপ কালো অসীম রাত্রি; আর আসিল সমস্ত উৎসাহ উদ্যম জাগরিত করিয়া তরুণ রাজপুত্রের নিকটে অন্ধকারাগারের বন্ধ দুয়ার মুক্ত করিয়া কালোর পারে অপরূপ আলো!—উদয়াস্তের সন্ধিস্থলে পুত্রের দিকে পিতা, পিতার দিকে পুত্র চাহিয়া রহিলেন। হর্ষের বীণা দুইটিমাত্র জীবনতন্ত্রীতে ঝঙ্কার দিয়া বাজিতে থাকিল—

জয় জয় জয় জয়!

তাহার পরে কতকাল চলিয়া গেছে;— যে অপূর্ব ঘনঘটা একদিন কালোর ওপারে বিদ্যুতের আলো এবং আলোর উপরে

কাল্লোর মাধুরী লইয়া তুই শুষ্ক জীবন-সরোবরের উপর করুণা বর্ষণ করিতে আসিয়াছিল তাহা রাজার চিতাভিষেক আর রাজকুমারের রাজ্যাভিষেক এই তুই অভিষেক সম্পূর্ণ করিয়া দিয়া চলিয়া গেছে। উত্তর ভারতের একমাত্র অধীশ্বর রাজগণরাজ শ্রীহর্ষ এখন অচল অটলভাবে কাশ্মীরের রাজসিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। দিগ্-দিগন্তপ্লাবী রাজ-ঐশ্বর্যের বিলাসবন্যা জলে সম্পূর্ণ স্ফীতিলাভ করিয়া সরোবরের পূর্ব শুষ্কতা মনে রাখিবার এখন আর অবকাশ নাই; চারি পার উল্লঙ্ঘন করিয়া সে এখন প্রবল টানের মহানন্দে নৃত্য করিতে করিতে কালসাগরে মিলিতে চলিয়াছে;— আর সেই মহা কল্লোলের উপর রাজ-কবি হর্ষের সোনার বীণা চারিটা সোনার তারে নিষ্ক দীনারের ঝনৎকার তুলিয়া বাজিতেছে—

"গুপ্তধনের অধিকারী পৃথিবীর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সবলে ধনরাশি আহরণ করিতেছি। ধরিত্রীর শোণিতলিপ্ত অপর্যাপ্ত নিষ্ক দীনার ধৌত করিতে নিষ্কলুষ বিতস্তাবারি বহুদূর পর্যন্ত কলুষিত হইয়া গিয়াছে। দান-রহিত ভোগ-রহিত সর্পের ন্যায় বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া আমার জন্য কতকাল ধরিয়া কত কৃপণ কত নিধিই রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।"

হর্ষের দারিদ্র্য দূরীভূত হইয়াছে। সুমহৎ ঐশ্বর্যের চমৎকার দীপালী হার দিকে দিকে লম্বমান, অতি অপরূপ সুবর্ণদীপ্তি বেষ্টন করিয়া নানা ভোগ, নানা বিলাস, পতঙ্গের মতো অবিশ্রান্ত ঘূর্ণমান হর্ষ-পূর্ণিমার এই দীপালী উৎসব জগতে অনুপম। দশদিক্-পাল ও ইন্দ্র অপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্যসম্পন্ন মহীপাল হর্ষের এই নৈশ সভার বর্ণনা কোন্ কবি বৃহস্পতি করিতে সক্ষম। চন্দ্রাতপ মেঘবৎ, দীপাবলী বিদ্যুৎপ্রাকারবৎ, স্বর্ণদণ্ড শ্বেতছত্রপুষ্পিত মন্দারবৎ, গায়ক-বর্গ গন্ধর্ববৎ, নর্তকীরা অপ্সরোপমা, পণ্ডিতগণ ঋষিতুল্য, রাজন্যবর্গ নক্ষত্রের ন্যায়— ইহা যক্ষরাজ ও যমরাজের সুচির সংগম, দান ও ভয়ের রুচির বিহার স্থল। এই ভূস্বর্গে কালচক্রের কঠোর ঘর্ঘর

কামিনীকুলের কবরীস্থিত শেফালিকা কুসুমের ভঙ্গজনিত মর্মর ধ্বনির ন্যায় শ্রুতিগোচর হইতেছে কি না।

দীপালী নিভিল। রাজরাজহর্ষের দগ্ধ ললাটে দ্রোহ এবং দহনের দীপালী নিভিল। বীণার সব কটা সোনার তার সোনার স্বপ্নের সঙ্গে সঙ্গেই কাটিয়া গেল; এখন কেবল অতি পুরাতন একটি মাত্র জীবনতন্ত্রী বক্ষপঞ্জরের পর্দায় পর্দায় ঘা দিয়া বাজিতে লাগিল—

"আমি কে! কে আমাকে পরাজিত করিয়াছে! আমি কোথায়! আমার অনুচর কে। আমি রাজ্যভ্রষ্ট; আমার পত্নিগণ দগ্ধ হইয়াছে; পুত্র নিরুদ্দেশ; একাকী বন্ধুবিরহিত পাথেয়বিহীন রাজা আজ ভিক্ষুকের অঙ্গনে লুটিতেছি।"

নিরুদ্দেশ পুত্রের নিধন সংবাদের সঙ্গে সঙ্গেই পলাতক রাজার উদ্দেশে গুপ্ত ঘাতকের দল ভিক্ষুকের অঙ্গনে আসিয়া যখন পৌঁছিল তখন আর রাজা নাই— একটি মাত্র আজন্ম সেবকের সম্মুখে বসিয়া এক উন্মাদ কর্কশকণ্ঠে গান ধরিয়াছে—

"আমি গগনে চিত্র রচনা করিব, মৃণালতন্তুতে বস্ত্র বয়ন করিব, স্বপ্নদৃষ্ট স্বর্ণ সংগ্রহ করিব, হিমের প্রাকার নির্মাণ করিব।"

হর্ষের ছিন্নমুণ্ড লইয়া ঘাতকের দল যখন রাজপথে নৃত্য করিতে করিতে চলিল তখন উদয় শিখর হইতে নীল আকাশ জুড়িয়া রক্ত-রেখার পরে রক্তরেখা আসিয়া পড়িয়াছে— অস্তশিখর পাংশু এবং ম্লান হইয়া গেছে।

যুগ্মতারা

অসিধার নখাঘাতে দিল্লীকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া শ্যেনপক্ষীর মতো নাদির শাহ যেদিন হিন্দুস্থানের তখ্‌তে তাউস ছিনাইয়া লইয়া জয়ডঙ্কা বাজাইয়া চলিয়া গেলেন সেদিন অক্ষম বাদশাহ রঙ্গীলে মহম্মদশাহকে দিল্লীর জগদ্‌বিখ্যাত দেওয়ানি আমে শূন্য রত্নবেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে শুনিয়াছিল অনেকেই—

"— সামতে আমালে মা, ইঁ সুরতে নাদির গ্রিফ্‌ত্‌"

কপাল ভাঙিয়াছে, আমারই কর্মফল নাদির মূর্তিতে দেখা দিয়াছে।

স্বর্গচ্যুত ইন্দ্রের ন্যায় হতভাগ্য সেই মহম্মদ শাহের কপালের দোষ দিয়াছিল অনেকেই এবং তাঁহারই কর্মফল যে ফলিতেছে তাহাও বারবার বলিতে বাকি রাখিল না অনেকেই— সালেবেগ ছাড়া। সালেবেগ ছিল বাদশাহের মুহুরী এবং চিত্রকর। গীতানুরাগী বাদশাহ সারাদিন ধরিয়া যে-সকল গান রচনা করিতেন সেগুলিকে স্বর্ণাক্ষরে সাজাইয়া বিচিত্র চিত্রে ফুটাইয়া বাদশাহের কুতুবখানায় ধরিয়া দেওয়াই তাহার কাজ ছিল। সে ছিল রঙ্গীলে মহম্মদশাহের 'জর্‌রী কলম'— সুবর্ণ লেখনী।

আমদরবারের মণি ভিত্তি আলোকিত করিয়া সোনার অক্ষর জ্বলজ্বল করিতেছে: "ভূস্বর্গ যদি কোথাও থাকে তো এইখানে এইখানে"। ঠিক তাহারই নিম্নে হৃতসর্বস্ব মহম্মদ শাহ এই ছবিটা সালেবেগের প্রাণে তীরের মতো আসিয়া বিঁধিতে বিলম্ব ঘটে নাই, সুতরাং যে সময়ে আর সকলে অদৃষ্টের ফের লইয়া ব্যস্ত সেই সময়ে কথামাত্র না বলিয়া নির্বাক্ বাদশাহকে যথারীতি কুর্নিশ করিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সে দরবার হইতে চলিয়া আসিল ও বাড়ি আসিয়া একটুকরা কাগজে সেইদিনের ছবিটা আর সেই ছবির নীচে মহম্মদ শাহের কাতর অর্ধোক্তিটুকুও লিখিয়া নিজের রঙ তুলি একখানি রুটি এক ছুরি গুছাইয়া লইয়া অবিলম্বে সালেবেগ দিল্লী ছাড়িয়া কাবুলের

পথ ধরিল। সালেবেগের ঘরে এমন কেহ ছিল না যে মহম্মদ শাহের স্বুবর্ণ লেখনীর খবরদারি করে— না বিবি না বেটী। সঙ্গীর মধ্যে ছিল এক পোষা বুল্‌বুল্‌; খাঁচা খুলিয়া দিতেই একদিকে সে উড়িয়া পালাইল। পরদিন কলমের সন্ধানে লোকের উপর লোক আসিয়া যখন বাদশাহকে গিয়া শূন্য খাঁচা ও খালি ঘরের সংবাদ দিল; কলমের কোনো সন্ধানই দিল না, তখন মহম্মদ শাহ বড়ো দুঃখেই বলিয়া উঠিলেন—

"হায়, ব্যথিতের আর্জি দুঃখের নিবেদন লিখিয়া প্রচার করিবার উপায় পর্যন্ত রহিল না, আজ অবধি মনের দুঃখ মনেই থাক্‌ প্রকাশে কাজ নাই।"

চতুরঙ্গ বাহিনী চলিয়াছে, জয় দুন্দুভি বাজাইয়া নাদির চলিয়াছে, মস্থদের মরুভূমির উপর দিয়া খর রৌদ্রের ভিতর দিয়া অসূর্যম্পশ্যা রমণীর মতো মোগল বাদশাহের রমণীয় স্বুখশয্যা ময়ূর সিংহাসন চলিয়াছে; আর চলিয়াছে সেই সিংহাসন স্কন্ধে বহিয়া জর্‌রী কলম সালেবেগ সিপাহীর ছদ্মবেশে। অদূরে খর্জুর বনের স্নিগ্ধ ছায়ায় রোজা ইমাম মুসিরেজা; আরো দূরে মস্থদের স্বুদৃঢ় কেল্লা। নাদিরি ফৌজ শাহার হুকুমে তখ্‌তে তাউস ইমাম রৌজায় উপঢৌকন দিয়া কেল্লায় প্রবেশ করিল। বহু অশ্রুপাত বহু রক্তপাতে কলঙ্কিত ময়ূর সিংহাসন পবিত্র মোকবারায় উপহার দিয়া আপনাকে অক্ষয় স্বর্গের অধিকারী জানিয়া নাদির পরম স্বুখে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন কিন্তু এবার নাদিরি হুকুম তামিল হইল না, মোক্‌বারা হইতে ময়ূর সিংহাসন কে জানে কে উপর্যুপরি তিন রাত্রি টানিয়া ফেলিতে লাগিল। চতুর্থ দিনে ক্রোধান্ধ নাদির তলোয়ার খুলিয়া ইমামের রৌজার সম্মুখে সদর্পে দাঁড়াইয়া বারবার বলিতে লাগিলেন "রজা অজমন্‌ জঙ্গমি ক্ষাহদ্‌" যুদ্ধং দেহি যুদ্ধং দেহি! প্রতিবারেই ইমাম মুসিরেজর শূন্য রৌজা হইতে প্রতিধ্বনি আসিল "অজমন্‌ জঙ্গমি ক্ষাহদ্‌ জঙ্গমি ক্ষাহদ্‌"। সত্য সত্যই সেই রাত্রে স্বুখস্বুপ্ত নাদিরের

নিকট যুদ্ধের আহ্বান পৌঁছিল এবং তাহার জীবন-যবনিকা শোণিতাক্ত করিয়া ঘাতকের তীক্ষ্ণ ছুরি তাহার জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্কে ভীষণ অঙ্কপাত করিয়া গেল।

গ্রীষ্মের সন্ধ্যা। যমুনার উপর দিয়া দক্ষিণবায়ু বহিতেছে— রঙমহালের সুপ্রশস্ত খোলা ছাদের উপরে সুন্দরী কাহারিঁয়াগণের স্কন্ধে সোনার তামদানে মহম্মদ শা সন্ধ্যাবায়ু সেবন করিয়া বেড়াইতেছেন। আকাশে দুইটি মাত্র তারা দুইখণ্ড কোহিনুরের মতো জ্বলিতেছে, নিভিতেছে। ঘরে ঘরে তখনো প্রদীপ জ্বলে নাই। এই সময় তাতারী প্রহরিণী আসিয়া বাদশাহের হস্তে একখানি তসবীর দিয়া জানাইল— নাদির আর নাই; সালেবেগ এইমাত্র মস্যুদ হইতে সে সংবাদ লইয়া পৌঁছিয়াছে এবং বাদশাহের জন্য এই সামান্য উপহার হুজুর দরবারে দাখিল করিয়াছে। মহম্মদ শা তসবীরখানি যত্নের সহিত উঠাইয়া লইলেন। তসবীরের এক পৃষ্ঠায় দেওয়ানী আমের দৃশ্য— শূন্য সভায় হৃতসর্বস্ব মোগল বাদশা! এই করুণ দৃশ্য ঘিরিয়া সোনার অক্ষর জ্বলজ্বল করিতেছে— 'সামতে আমালে মা ইঁ সুরতে নাদির গ্রীফ্‌ত'। তসবীরের অন্য পৃষ্ঠায় নাদিরের রক্তাক্ত দেহের উপরে ছুরিকাহস্তে সালেবেগ, আর সেই ছবি ঘিরিয়া রক্তের অক্ষর মাণিক্যের মতো জ্বলিতেছে—

বয়েক্ গর্দিসে চরখ্ নীলোক্ষরি
না নাদির বজা মুন্দ নে নাদরী।

সুনীল নীলাম্বুজের ন্যায় নীলাকাশ একটিবার মাত্র আবর্তিত হইয়াছে কি না— ইহারি মধ্যে নাদিরের সঙ্গে নাদিরি হুকুম পর্যন্ত লোপ পাইয়াছে।

বাদশাহ যখন তসবীর হইতে মুখ তুলিলেন তখন আকাশে কেবলমাত্র একটি তারা যমুনার জলে ছায়া ফেলিয়া ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছে।

গোরিয়া

সে বনলতাটি আপনার নবকোমল জীবনবৃন্ত দিয়া বাংলার রাজধানী গৌড়ের জীর্ণ কঙ্কালটা জড়াইয়া ধরিয়া, সেন-রাজত্বের চিতাসজ্জার উপরে এক বাদল-দিনের কাজল আলোয় নিজেকে প্রথম বিকশিত করিয়া তুলিয়াছিল; এবং সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইতে আসিয়া এক বিদেশী, গহনে গভীরে— বিরাট অরণ্যের অন্ধতম স্তব্ধতার মাঝখানে, জনশূন্য গৌড় জনপদের পরিত্যক্ত রাজপুরে, পাষাণ-শয্যাশায়িতা সেই বনলক্ষ্মীকে প্রথম সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছিলেন; এইরূপ একটা নবন্যাসের টুকরায়, মনের সহজ অবস্থায়, বিচলিত হইবার কারণ ছিল না। কিন্তু সেদিন বর্ষার প্রভাতে, একটা সুখস্পর্শ শীতলতার মাঝখানে নিজেকে টানিয়া লইয়া, কলিকাতার গলির মাঝে আমাদের বাগানখানির সুগভীর শ্যামলতায় সম্পূর্ণ ডুব দিয়া আমি একা বসিয়াছিলাম; এবং বৃষ্টি-জলে সতেজ পুষ্পপল্লবের বিপুলতার উপরে দিনের উন্মেষ, ও বাগানের একটি গোপন কোণ হইতে নব বর্ষায় সদ্য প্রস্ফুটিত গৌড়ি ফুলের মৃদু গন্ধ আমায় একটা স্বপ্ন দিয়া বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিল। এই অবস্থায় সেদিন যাহা কতকটা দেখিয়াছিলাম, কতকটা বা শুনিয়া-ছিলাম তাহা এই—

পিতা আমার গৌড়-রাজবংশের শেষ বংশধর। ইতিহাস তাঁহাকে জানে না। গৌড়ের রাজসিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইবার পর, দুর্দশা হইতে দুর্দশায়, দুঃখ হইতে দৈন্যে, অনন্যসাধারণ রাজমহিমার গৌরব-শিখর হইতে অনাড়ম্বর একটা সাধারণ পরিসমাপ্তির মাঝে কবে যে পিতা আমার ধূলিধূসর, হীনতায় মলিন, অবজ্ঞা ও অবমাননায় বিশীর্ণ জীবনের ছিন্ন কন্থা বহন করিয়া আপনাকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন তাহাও কেহ জানে না।

আমি সেই দরিদ্র পিতার একমাত্র দুহিতা গৌরী।

মৃত্যুকালে নিঃস্ব পিতা গৌড়-রাজকুমারীগণের স্বাভাবিক গৌর-কান্তির উপরে অনির্বচনীয় পাণ্ডুপ্রভাটুকু ছাড়া আমাকে আর-কিছুই দিয়া গেলেন না বটে কিন্তু নির্বাণের মুখে প্রদীপের সবটুকু যেমন ক্ষীণ একটি শিখায় আপনাকে জাগাইয়া তোলে তেমনি সুবৃহৎ গৌড়-রাজপরিবারের যত মহিমা, যত কালিমা সমস্ত আমার সুপাণ্ডুর গৌড় তনুখানির অন্তর বাহির আশ্রয় করিয়া নূতন তেজে শেষবার জ্বলিয়া উঠিল। সে জ্বালায় আমি নিজেও জ্বলিয়াছিলাম পরকেও জ্বালাইয়াছিলাম।

যে দেবীর নামে আমার নাম তিনি ছিলেন দেবী গৌরী— আর আমি ছিলাম মৃত্যুর ন্যায় পাণ্ডুশ্রী, শোণিতপিপাসিনী একটা রাক্ষসী! কিন্তু তবু আমাকে লোকে বলিত গৌরী— প্রেয়সী— দেবী!

ষষ্টি-সহস্র অভিশপ্ত সগর-সন্তানের মতো আমার পিতৃগণ যখন আমার নারী-জীবনের ক্ষীণ ধারাটুকুর দিকে সতৃষ্ণ চাহিয়া ছিলেন তখন আমি সেটিকে সুপবিত্র সাগরসঙ্গমের দিকে না বহাইয়া দিয়া, গৌড় বাদশাহের রঙমহালের দিকেই লইয়া চলিলাম— কুটিল পঙ্কিল পথে, তরঙ্গায়িত যৌবনের উদ্দাম শক্তিবলে সমস্ত বাধাকে বিচূর্ণ করিয়া।

হায়! প্রমোদ এবং বিলাস-বিচিত্র যবনিকার অন্তরালে সে দিনের কথা আমার আজও মনে পড়ে— যেদিন আমার গৌরী নাম গোরিয়াঁ এই তিনটি অক্ষরের মধুর মদির অলস ছন্দের মাঝে আপনাকে প্রথম ধরা দিয়াছিল।

তারপর যেদিন গৌড়ের দিকচক্রবাল অগ্নিদাহ আর চিতা-ধূমে বেষ্টন করিয়া, দুর্ভিক্ষ আর মহামারী প্রলয় তাণ্ডবে ভীষণ আবর্তের মতো আসিয়া দেখা দিল, সেদিন আমি বা কোথা রহিলাম, কোথা বা রহিল আমার সে স্বপ্নরাজ্যের স্বর্ণ সিংহাসন! ঘূর্ণ জলে দীপালির প্রদীপটির মতো আমার কম্পমান জীবনটুকু লইয়া সহসা একটা অতলের তলে নামিয়া গেলাম।

তার পর, আবার যেদিন প্রভাতের আলোয় ফিরিয়া আসিলাম সেদিন দেখিলাম আমার জীবন-প্রদীপ তার সমস্ত মহিমা, সমস্ত কালিমা লইয়া নিভিয়া গেছে এবং আমি মৃত্যুর একটা অপূর্ব প্রশান্তির মাঝে আমার নিষ্কলঙ্ক পাণ্ডুশ্রী লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছি।

বাস্তুভিটে যাকে বলি। সে কী আশ্চর্য কারখানা! পাখির ডিমের উপরের খোলার মতো পাতলা, হাজার হাজার বছরের পুরোনো চিনেমাটির তার দেওয়াল— এমন হালকা এমন ঠুন্‌কো হয়ে গেছে যে, শব্দের রেশ, বাতাসের পরশ পেলে কাঁপতে থাকে— মনে হয় এখনি বুঝি ফেটে চৌচির হল। এই ঠুন্‌কো পাতলা চিনেমাটির আশ্চর্য বাড়ি পৃথিবীর অষ্টম বিস্ময়। এর মধ্যে হুজুরের চাকর-বাকর যারা কাজকর্ম করে বেড়াচ্ছে তারা আস্তে উঠছে, আস্তে বসছে, আস্তে চলছে, আস্তে বলছে— হুজুরের ভয়ে যত না হোক, পাছে কিছু তারা ভাঙে, পাছে তাদের সেই পুরোনো ঠুন্‌কো দেওয়ালের কোথাও আঁচড় লাগে সেই ভয়েই তারা সর্বদা সাবধানে আছে। শুনেছি এক সময় একজন নতুন চাকর অসাবধানে হঠাৎ চিনের পুতুলের একটু চটা উঠিয়ে ফেলেছিল। যখন তার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালবার হুকুম হল তখন সে বললে— 'অপমানের জন্যে দুঃখু করিনে: অমন পুতুলটি খণ্ডিত হয়ে গেল আমারই হাতে!' প্রাণের চেয়ে পুতুলই ছিল তাদের বড়ো।

এই বাড়ির বাগান— আরো আশ্চর্য! কত বড়ো যে সে বাগান-খানা তা সে বাগানের সর্দার-মালীও বলতে পারে না। কুঞ্জবন সে গিয়ে মিলেছে মহাবনে, মহাবন সে মহাসমুদ্রের ভিতর পর্যন্ত নেমে গেছে— ছাওয়ার মতো হয়ে। এখানে এক-একটি যত্নের গাছে যখন ফুল ধরে, ফল ফলে, তখন তাদের বোঁটায় মালীরা সোনার আর রুপোর ঘুঙুর বেঁধে দেয়; বাতাসে সেগুলি বাজতে থাকে, তবে জানা যায় বাগানে অমুক দিকে ফুল ফুটেছে, অমুক দিকে ফল ফলেছে— এত বড়ো সে বাগান, এমন চমৎকার এমন সৌখিন বাগান।

এই বাগানের একটি দিক— সেদিকের খবর না-জানেন হুজুর, না-জানে তাঁর মালী, কেবল জানে দেশের যত লক্ষ্মীছাড়া আর

তাদের রানী— সে একটি কচি মেয়ে— নীচ জাত। কেউ তাদের চায় না, তাই কেউ যেদিকে যায় না সেইদিকে তারা একলা আছে— একটি প্রকাণ্ড কল্পতরু হেলে পড়ে সমুদ্রের নীল জলের উপরে ছাওয়া দিয়েছে— তারই তলায়। ছোটো জাত, কাজেই রাজবাড়ির সাত তলার একটি তলাতেও তাদের জন্যে জায়গা নেই। দেশের লোকের পায়ের ধুলো-কাদা ধুয়ে নেবার জন্যে রাজার দেউড়িতে দুবেলা হাজির থাকবার হুকুমটাও না। যদিও দেশসুদ্ধ সবাইকে তারাই কিন্তু বরাবর বছরে বছরে নিয়মিত বাগানের খাঁটি পদ্মমধু জুগিয়ে আসছে।

এই-যে কল্পতরু যার পাতা কখনো খসে না, ফুল কখনো ঝরে না, এরই উপরে একটি পাখি। সে যে কী পাখি কেমন পাখি তা তো বলা যায় না— কিন্তু তার গান— সে যে স্বর্গের কিন্নরীদের গানের চেয়ে মিষ্টি। সমুদ্রের এপারে গাইছে সে পাখি, সমুদ্রের ওপার পর্যন্ত তার সুর গিয়ে ঠেকছে—চাঁদনি রাতের আলোর মতো বাতাসের ঢেউয়ের উপর দিয়ে। মাঝি মাঝ-সমুদ্রে জাহাজ থামিয়ে সে গান শুনে গেল, ওপারের লোক সমুদ্রের ধারে দিনের পর' দিন কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে সে গান শুনে মশগুল হয়ে রইল, আর সে গানের কত তারিফ করে তারা বই লিখলে, বর্ণনা দিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিলে সেই চমৎকার আশ্চর্য পাখির কথা ; অথচ সেই ছোটো মেয়েটি আর তার দলের লোক ছাড়া বাগানের মালিক যিনি তিনিও জানেন না, বাগানের মালী যারা তারাও জানে না, হুজুরের সভাসদ পরিষদ লোক-লস্কর পরিবার প্রজা কেউ জানে না এই আশ্চর্য পাখির খবর— যার গানের কাছে সেই চমৎকার বাড়িখানা, সেই অদ্ভুত বাড়িখানা, সেই অদ্ভুত বাগানটিও কিছুই নয়।

চট দিয়ে মোড়া গালামোহর-করা একরাশ বই আজ অনেকদিন হল বিদেশ থেকে হুজুরের তাকিয়ার কাছেই পড়ে আছে— সময় নেই যে তিনি সেগুলো খুলে দেখেন। সেদিন বেলা দুপুরে একটা মশা হঠাৎ কানের কাছে হুল ফুটিয়ে হুজুরের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে।

তাঁর হাতে কোনো কাজ নেই অথচ মশাটা বারে বারে ঘুমও ছুটিয়ে নিচ্ছে। হুজুর হাতের কাছের সেই চট-মোড়া বইগুলো একে একে খুলে দেখতে লাগলেন। বইগুলো তাঁর ঠুন্‌কো বাড়ির কারখানা, অদ্ভুত বাগানের বর্ণনায় ভরা। এর মধ্যে একখানা বই— তার মলাটের ছবিটায় তাঁর চোখ পড়ল— সোনার একটি ফুলের ডালে পাখি গাইছে। হুজুর সেই বইখানা খুলে পড়তে লাগলেন— 'হুজুরের আশ্চর্য পাখির গান।' যিনি প্রকাশক তিনি বিদেশের একজন বিখ্যাত ওস্তাদ। বইখানা পড়তে পড়তে নাকের উপরে কচ্ছপের খোলা দিয়ে বাঁধানো মোতিয়াবিন্দু চশমার বড়ো বড়ো গোল দুখানা পরকলার ভিতর দিয়ে হুজুরের দুই চোখ বিস্ময়ে ক্রমে বড়ো হয়ে উঠছে বেশ দেখা গেল। বাড়ির প্রধান কর্মচারী যিনি কাজের খবরের চেয়ে হুজুরের মেজাজ কখন কেমন তারই খবর ভালো করে রাখেন, তিনি আজ পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখছিলেন। কর্তার চোখ যতই খুলতে দেখা গেল— কর্মচারীর দম ততই বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। আজ কর্তা অনেকটা চোখ খুলেছেন; না জানি আজ কপালে কী আছে এই ভাবতে ভাবতে তত্ত্বাবধানিক যখন তিনশো-তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম জপছিলেন এবং দশ আঙুলে কচ্ছপ-মুদ্রা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কর্তার নাকের উপরে কচ্ছপের খোলায় বাঁধানো চশমাটিকে শাপ দিচ্ছিলেন যেন ওর কাঁচদুখানা এখনই গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যায়— এমন সময় সত্যিই চশমাখানা খুলে কর্তা ডাক দিলেন—'কোই হ্যায়!' কচ্ছপমুদ্রা দেখাতেই হুজুরের চশমা চোখের উপর থেকে সরে গেল, কর্মচারী নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। তিনশো তেত্রিশ কোটিকে একে-একে প্রণাম করবার তাঁর সময় হল না, তিনি দরজার চৌকাটে তিনবার মাথা ঠুকেই খালি পায়ে কর্তার সামনে উপস্থিত হলেন। তখন কর্তার চোখ আবার বারো-আনা বন্ধ হয়ে এসেছিল। তিনি বললেন— 'এই বইখানাতে আমার এ বাগানের একটি পাখির কথা লিখছে, বলছে—আমাদের যত কিছু অদ্ভুত আসবাব আছে সেগুলো কিছুই

নয় এই আশ্চর্য পাখির গানের কাছে।— এ পাখির খবর কিছু রাখ ?'

তত্ত্বাবধানিক দেখলেন হুজুরের চোখ সম্পূর্ণ বন্ধ হতে আর লহমা-দুই বাকি ; তখন তিনি সেই সময়টুকু কাটিয়ে দেবার জন্যে রয়ে-বসে জবাব দিচ্ছেন— 'হে প্রবল-প্রতাপ ! ভবদীয় দাসানুদাসের নিবেদন এই যে— মহারাজ রাজ্যের সংবাদ ও খবর অর্থাৎ যে খবর যথার্থ খবর— খবরের মতো খবর, তা এ দাসের অবিদিত নাই। আজ্ঞাধীন সকল খবরই রাখে মহারাজ, কিন্তু এই কাল্পনিক পাখি, এর গানের ইতিহাস পুস্তক-প্রণেতার কল্পনা— যাকে পণ্ডিতেরা বলেন কবি-কল্পনা — সু-ত-রাং— !'

হুজুরের চোখ তখন পূর্ণ বন্ধ হয়েছে ; তিনি বললেন— 'হুঁঃ কল্পনাই ব-টে—' তারপর আর তাঁর সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। পাখির খবরের দায় থেকে উদ্ধার হয়ে কর্মচারী পায়ে পায়ে সরে পড়েন, এমন সময় সেই দুষ্টু মশা আর-একবার হুজুরের কানে পোঁ করে ভেঁপু বাজিয়েছে। মন্ত্রী প্রায় দরজা পার হয়েছিলেন, কর্তার নিদ্রাভঙ্গ হতেই তিনি দুয়োরের গোড়ায় পাপোঁছখানার উপরেই ঝপ্ করে বসে পড়েছেন। কর্তা আর-একবার চশমা এঁটে কর্মচারীর দিকে ফিরে বললেন— 'সব কথাই তুমি কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে চাও ! বিদেশের কেতাবে যখন এ পাখির কথা উঠেছে তখন এটা মিথ্যে হতে পারে না ; আমি জানি তারা কাজের মানুষ, আবোল-তাবোল বাজে বকা তাদের কুষ্ঠিতে লেখে নি। এই পাখির গান আমার না শুনলেই নয়। আজ সন্ধ্যার সময় তাকে আমার মজলিসে হাজির করবে, আমার গানের ওস্তাদ সবাইকেও নিমন্ত্রণ করবে— যাও।'

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দিচ্ছে, তত্ত্বাবধানিক ভাবতে ভাবতে চলেছেন, কেমন করে পাখির সন্ধান করি ? দেশের কেউ যার খবর জানে না তাকে ধরা তো সহজ নয় ! এমন সময় হুজুর বললেন— 'আমার এ ঘরে মশার উৎপাত হয়েছে। আচার্যিদের দিয়ে মশা হবার

কারণটার তদন্ত অবিলম্বে করবে— পাঁজিতে এ-বৎসর সকল প্রকার মক্ষিকার কোঠায় শূন্য দেখছি অথচ মশার জ্বালায় নিদ্রা হচ্ছে না, এরই বা অর্থ কী।'

কর্তার চোখ খোলবার মূলে এই মশা। এই মশা-বংশ নির্মূল না হলে রক্ষা নেই এটি বেশ করে আচার্যিদের সম্‌ঝে দিয়ে প্রধান কর্মচারী সদ্দার-মালীকে পাখির সন্ধানে পাঠালেন। আজ এই দুটো বড়ো বড়ো কাজ সারতে তাঁর নাওয়া-খাওয়া হতে বেলা দুটো বাজল। ইতিমধ্যে কর্তার খানসামা তিনবার জেনে গেছে পাখি এল কি না।

তত্ত্বাবধানিক অতি গম্ভীর লোক। সকলের চেয়ে তিনি কম কথা বলেন, কম চলা চলেন। পাখি যে কী জানোয়ার এবং মশা যে কী পাখি এটা তাঁর জানবার কোনোদিন প্রয়োজনও হয় নি, সুবিধাও ছিল না— কাজের চিন্তায় তাঁকে এতই ব্যস্ত থাকতে হয়। লোকের দশটা প্রশ্নের উত্তরে তিনি এ-পর্যন্ত মাত্র একটি 'চুট্'— তাও সম্পূর্ণ পরিষ্কার উচ্চারণ না করেই— বলে এসেছেন, আর তাঁকে আজ কর্তার প্রত্যেক প্রশ্নের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে উত্তর দিতে হচ্ছে। এদিকে মালী এসে জানালে পাখির কোনো খবরই পাওয়া যাচ্ছে না। এই-সব উৎপাতে হয়রান হয়ে কর্মচারী যখন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন এবং পাখি না হাজির করতে পারলে মাথা কাটা যাবে এ কথা চুপি-চুপি জানিয়ে উকিল ডেকে বিষয়-আশয়ের বন্দোবস্ত করে একটি উইল লেখবার উদ্যোগ করছেন তখন তাঁর উকিল একটু মাথা চুলকে বললেন— 'বলতে সাহস হয় না— একবার মজলিসি লোকদের নামের লিস্টিখানা উল্টেপাল্টে দেখলে হত নি! যদি পাখি বলে কোনো কেউ হুজুরে কোনো কালে নিমন্ত্রণ-পত্রের জন্য সওগাদ দিয়ে থাকে তবে সহজেই তার ঠিক-ঠিকানা পাওয়া যাবে।'

উকিলের কথামত দপ্তরখানার নামের তালিকা ঘেঁটে দেখা গেল, তাতে 'পা'য়ের কোঠায় ও 'প'য়ের কোঠায় অনেকগুলো পা ও পদবী-ওয়ালা নাম, কিন্তু 'পাখি' কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। তারপর

দেশের সভাসমিতি কমিটি জমিটি এ-সভা ও-সভা এ-সমাজ ও-সমাজের বাৎসরিক রিপোর্টগুলো আনিয়ে কর্মচারী দেখলেন সেখানেও পাখির নামগন্ধ নেই। দেশের গণ্যমান্য বুধ-বৃহস্পতির সভার সদস্য-মণ্ডলী বলে পাঠালেন— 'তাঁদের কমিটির একখানি কীটদষ্ট প্রাচীন রিপোর্টে পাওয়া যাচ্ছে যে, কর্মচারী যাঁর সন্ধান করছেন তাঁকে এই সভা থেকে একবার একটি সম্বর্ধনা ও রুপার তাম্রশাসন ও স্বর্ণলেখনী মায় মস্যাধার দেবার প্রস্তাব উঠেছিল এবং বাৎসরিক হিসাবে-নিকাশে সভা তার একটা চুম্বকও পাচ্ছেন কিন্তু উক্ত রিপোর্টের সন তারিখ ইত্যাদি এমনভাবে কীটদষ্ট হয়েছে যে তার চিহ্নমাত্রও পাওয়া দুষ্কর। হুজুরের তহবিল থেকে কিঞ্চিৎ অর্থ-সাহায্য হলে কীঠ-ভাষা-তত্ত্ববিদ-গণের দ্বারায় এই পুঁথির মাসপঞ্জী ইত্যাদি অংশ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব, অন্তত উক্ত পুঁথির জন্য একখান খেরুয়া বস্ত্র পেলেও আপাতত তাঁরা হুজুরকে ধন্যবাদ জানিয়ে সুখী করতে পারেন।'

কর্মচারী আশা করেছিলেন দেশের সব সভা-সমিতিগুলোর নজির দেখিয়ে তিনি হুজুরের কাছে প্রমাণ করবেন— বিদেশী-মাত্রেই মিথ্যা কথা বলছেন, পাখি সম্বন্ধে তাঁদের কল্পনা ও জল্পনার মূলে কোনো তথ্য— যাকে বলে 'বস্তু'— তা নেই; কিন্তু বুধ-বৃহস্পতি কমিটির স্বর্ণ-লেখনী মায় মস্যাধার ও তাম্রশাসন। পাখিকে কাল্পনিক বলে উড়িয়ে দেওয়া বরং চলে কিন্তু সোনার মস্যাধার, রুপার তাম্রশাসন— এরা যে 'বস্তু', এদের জন্য যে খাতায় জমাখরচ লেখা রয়েছে এর বিল আছে ভাউচার আছে, রসিদ স্ট্যাম্প আছে— এগুলোকে তো ওড়ানো সহজ নয়!

এদিকে বেলা পাঁচটা হয়; ছয়টায় মজলিস। কর্মচারী নিরুপায় হয়ে স-উকিল নিজেই একবার পাখির খবর করতে অগ্রসর হলেন। বলা বাহুল্য, যাত্রার পূর্বে কর্মচারী উকিলের পরামর্শ মতো বুধসভাকে খুব ভয় দেখিয়ে একখানা চিঠি দিয়ে গেলেন যাতে ভবিষ্যতে রিপোর্টাদি বিষয়ে তাঁরা সতর্ক থাকেন এবং তাঁর দ্বিতীয় পত্র না পাওয়া পর্যন্ত এই পাখি সম্বন্ধে কোনো প্রকাশ্য সভায় কোনো

আলোচনা না হয়— কেননা হুজুরের কানে তাঁদের এইঅসাবধানতার কথা গেলে সভার বার্ষিকী ও চাঁদা ও অন্যান্য বাবদে খরচাদি সরকার হইতে বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা আছে।

কর্মচারী তাগা-তিলকাদি নানা ইষ্টিরিষ্টি দিয়ে আপনাকে বেশ সুরক্ষিত করে নিয়ে তবে পাখির সন্ধানে বাড়ির সদর দরজা পার হলেন, সঙ্গে সেই উকিল এবং হুজুরের সংগীতাচার্য ও বুধ-বৃহস্পতি সভার জনকয়েক নামজাদা কবি ও লেখকবৃন্দ। মালীকে উকিল জেরা করে জানলেন যে বাগানের আর সমস্ত অংশই সে তন্ন-তন্ন করে দেখেছে— কেবল ওই দিকটা— যেটা পাণ্ডব-বর্জিত দেশের মতো— ওখানটি গিয়ে সন্ধান করতে সে সাহস পায় নি ; কেননা সে জাতিতে উড়ে ; ওদিকের হাওয়া গায়ে লেগেছে শুনলে তার জাত নিয়ে টানাটানি পড়বে। রাজার তাড়ায় কর্মচারীর জাতের কথা ভাববার সময় ছিল না, তিনি 'চুট্' বলেই সেই নিষিদ্ধ দিকটাতেই অগ্রসর হলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলে চাদরের আড়ালে নাকগুলিকে নিষিদ্ধ দিকের হাওয়া থেকে ঢেকে নিয়ে কোনো রকমে জাতি রক্ষা করে কর্মচারীর অনুসরণ করলেন। কর্মচারীর জাতি লোহার সিন্দুকে চব্‌সের ডবল তালার মধ্যে সুরক্ষিত ছিল, তার উপরে রাজ-আজ্ঞা, সুতরাং তিনি অনেকটা নির্ভয় ছিলেন।

এই পাণ্ডব-বর্জিত দিকে তখন বসন্তের ফুল ফুটেছিল, এত ফুল যে, তার সৌরভ চাদরের শত ভাঁজ দিয়েও ঠেকানো যায় না— কাজেই জাতি জাতীফুলের জাঁতি-কলে বলির পাঁঠার মতো আর্তনাদ শুরু করেছে। কর্মচারী ধমক দিয়ে উঠলেন— 'চুট্'! তাঁর সেই জলদ-গম্ভীর স্বরে একটা শুকনো কুয়োর ঘুমন্ত ব্যাং হঠাৎ বর্ষার স্বপ্নে মক্-মক্ করে খানিকটা বকে উঠল, এবং দূর বনে একটা বাছুর কোনো আকস্মিক উৎপাতের আশঙ্কায় হাম্বা-রবে হরি-স্মরণ করতে থাকল।

কর্মচারী ও তাঁর দলবল— এঁদের কারুর পাখির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় মোটেই ছিল না। কিন্তু 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল, কাননে কুসুম-কলি সকলি ফুটিল'— এর মধ্যে থেকে যে

সার বস্তুটুকু পাবার তা তাঁরা সকলেই পেয়েছিলেন। ফুল যখন ফুটেছে তখন হাম্বা ও মক্‌মক্‌ যে পাখিরই রব সে বিষয়ে তাঁরা একমত হয়ে ওই দুটো জীবকেই গ্রেপ্তার করে নিয়ে চললেন। তখন প্রায় সন্ধ্যা। উকিল সন্ধ্যাকালের রবগুলোকে পাখির রব বলে ধরা যায় কি না এবং একটা পাখি দুটো জীব হয় কী বলে— এ-বিষয়েও একটু আপত্তি করায় 'অধিকন্তু ন দোষায়' এবং রাতি পোহানোটা যে প্রাচীন কবিদের মতে দিবানিদ্রার পরেই সায়ং-সন্ধ্যাটাকেই বলা হয় এটি বুধ-সভার কবি ও লেখকবৃন্দ সকলে মিলে সমস্ত পথটা তর্ক করে বোঝাতে বোঝাতে চললেন। এবং হুজুরের সংগীতাচার্য এই দুই জীবের রবে কোথায় ওড়ব, কোথায় বা খাড়ব ষড়জ গান্ধার মধ্যম ইত্যাদির বিচার করে এদের গান হনুমানের মতে সিদ্ধ ও শুদ্ধ বলেই স্থির করে নিলেন— যদিও কোনো-কোনো ওস্তাদ নন্দিকেশ্বরকে একেবারে ছেঁটে দিতে নারাজ ছিলেন। এক পাখির স্থানে দুই নিয়ে যখন সদলে কর্মচারী হুজুরের মজলিসে দেখা দিলেন তখন চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল এবং দুই পাখির সংগীতের শ্রোতা এত জমে গেল যে হুজুরের উঠোনে সকলের স্থান-সঙ্কুলান দুর্ঘট হয়ে পড়ল। কোনোমতে সকলকে তুষ্ট করে কর্মচারী হুজুরে হাজির হয়েছেন। হুজুরের তাকিয়ার বামপার্শ্বে বাতি ও পুষ্পমাল্য ও তাম্বুলাদি, আর দক্ষিণে অধ্যাপক শাস্ত্রী ও তত্ত্ববাগীশের দল। মজলিস দেশের গণ্যমান্য সংগীতসভা-সংঘ ও সমিতির সদস্যে ভরা। এ ছাড়া খবরের কাগজওয়ালারও শুভাগমন হয়েছিল। অধ্যাপক প্রথমে স্বরচিত স্বস্তি-বাচন পত্রখানি পাঠ করলে পর কর্মচারী নম্বর-এক বিহঙ্গকে হুজুরে দস্তুর-মতো পেশ করলেন; হুজুরও তাঁকে যথাযথ আপ্যায়িত করে গানের জন্য ধরে পড়লেন। নম্বর-এক এতক্ষণ মাথা হেঁট করে ভালোমানুষটির মতো অপেক্ষা করছিলেন। হুজুরের অভয় পেয়ে বরাবর অধ্যাপকদের নিকটে গিয়েই উপবেশন করলেন এবং তাঁদের হাতের কুশ-মুষ্টির দিকে মুখ বাড়িয়ে একটিমাত্র হাম্বারব করেই ক্ষান্ত হলেন। এখানে

হুজুরের দৃষ্টি কর্মচারীর দিকে পড়বামাত্র তিনি দুই নম্বরকে হাজির করলেন। মজলিসে প্রবেশ করেই নম্বর-দুই বাতির চারিদিকে ভ্রাম্যমাণ একটি মশাকে গ্রাস করে ফেললেন; এবং হুজুরকে একবার মক্‌মক্‌ শব্দে আশীর্বাদ করেই আকাশের দিকে দুই চক্ষু পাকিয়ে পুষ্পমাল্যের থালার উপরে গম্ভীর মূর্তি ধরে বসলেন।

সকলের মুখে কেমন একটু নিরাশ ভাব দেখা গেল এবং মজলিসের বাহিরের লোক যারা নিমন্ত্রণ পায় নি তারা যেন একটু টিটকার দেবার উদ্যোগ করলে। সকলকারই মনে হচ্ছে পাখি সম্বন্ধে কোথায় যেন একটু গোল রয়ে গেল। হুজুর পর্যন্ত কেউ তাঁরা পাখিকে কখনো দেখেনও নি, দেখবার চেষ্টাও পান নি। সুতরাং সবাই বিরক্ত হয়ে বসলেন এবং দুই জীবের স্বর লয় তান নাদ নিনাদাদি সম্বন্ধে বিচার ও সুখ্যাতির চূড়ান্ত করে ও বিদেশীরা যে পাখির সুখ্যাতি করেছেন তাকে সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলে উড়িয়ে দিয়ে মজলিস ভঙ্গ করলেন। পণ্ডিত এই সময় কর্মচারীর কানে গিয়ে পরামর্শ দিলেন— 'ওহে, এ-দুটোকে হুজুরে কী বলে হাজির করলে? এর একটি গোবৎস আর একটি কূপমণ্ডুক— কোনো পুরুষে পাখি নয়! একটিকে গো-রক্ষিণীতে পাঠিয়ে দাও, আর-একটি নিয়ে তুমি মশাবংশকে ধ্বংস করো গিয়ে।' কর্মচারী এতগুলো কথার জবাবে বললেন— 'চুট্‌!'

মজলিসের দেউড়ির বাইরে সেই কচি মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল। সে কর্মচারীকে আসল পাখির খবর দিতেই এসেছিল। কিন্তু পণ্ডিতের দুরবস্থা দেখে সে আর কর্মচারীর কাছে যেতে সাহসই পেলে না।

হুজুর ঘরে এসে মিথ্যার ঝুড়ি বিদেশী বইগুলোকে জ্বালিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। কর্মচারীর ঘর থেকেও সেদিন অনেক রাত্রে একটু কাগজ-পোড়া গন্ধ পাওয়া গিয়েছিল আর বুধ-বৃহস্পতি সভায় পুঁথি-রক্ষককে ওখান থেকে ঠিক তেমনি সময়েই পকেটে হাত দিয়ে হাসি-মুখে বার হতে দেখা গিয়েছিল।

বিদেশীর 'সুরসিক সভায়' হুজুরের মজলিসের বিবরণ এবং পাখির সম্বন্ধে উক্ত মজলিসের চূড়ান্ত মীমাংসার খবর পৌঁছেছিল নিশ্চয়ই। কেননা হুজুরের যারা হুজুর এমন সব দেশীয় ছেলে-ছোকরা ও স্কুল-বয়ের দলের সঙ্গে যোগ দিয়ে বুড়ো বুড়ো যত বিদেশীয় মহাপণ্ডিতেরা হুজুরকে একটি রঙচঙে টিনের পাখি প্রাইজ পাঠালেন, তার পেটে একটা গ্রামোফোন ও মোহিনী ফ্লুট পোরা ছিল। শুভদিন দেখে দেশের যত লক্ষ্মী ছেলেরা সেই পাখিটি নিয়ে খুব ঘটা করে হুজুরকে একটি অভ্যর্থনা দিতে এল এবং মজলিসের মধ্যখানে এসে যন্ত্রটায় কষে দম লাগিয়ে দূরে গিয়ে অপেক্ষা করে রইল। দু-চারটে মোটা গলা, দু-দশটা মিহি গলার গানের পর ফোনটা একেবারে চুপ করেই প্রকাণ্ড ঝড়ের মতো একটি হাসি শুরু করলেন— সে একেবারে বিলিতি হাসি, তার চোটে হুজুরের পুরোনো মজলিস-ঘরের দেওয়াল চটে ফেটে চৌচির হয়ে হাওয়ার মুখে তাসের বাড়ির মতো ভেঙে পড়ল— একেবারে হুজুর, তাঁর কর্মচারী ও সদস্যবৃন্দের ঘাড়ের উপরে। ঠুন্‌কো মাটির দেওয়াল, আঘাত মোটেই মারাত্মক হল না, কেবল সকলে বিষম ভয় খেয়ে চিৎকার করতে লাগল— 'ওরে গোহত্যা করলে রে!' এই সময় পাণ্ডব-বর্জিত দিক থেকে যত লক্ষ্মীছাড়া— তারা সেই ছোটো জাতের মেয়েটিকে কাঁধে নিয়ে হুজুরের ভাঙা মজলিসে দল বেঁধে দেখা দিলে। সেই মেয়ের গলায় পাখি গানের সুর হিরের সাত-নলী হারের মতো ঝকঝক করছে।

মাতৃগুপ্ত

কবি মাতৃগুপ্ত উজ্জয়িনীতে রাজা হর্ষবর্ধনের সভায় অতি দুঃখে দিন কাটাচ্ছেন ; রাজার সেবা তিনি প্রাণপণে করেছেন, কিন্তু রাজার সুনজর একদিনও তাঁর উপর পড়েছে এ কথা কেউ বলবে না সেই মলিন-মুখ, ছেঁড়া-কাঁথা মাতৃগুপ্তকে দেখে। ঋতুরাজের মতো রাজা হর্ষ সবাইকে সুখের হিল্লোলে পূর্ণ করলেন ; কিন্তু দুঃখ— সে শীতের মতো কবির চারিদিকে জড়িয়ে রইল। রাজা মাতৃগুপ্তের কবিতা থেকে সেটির ইঙ্গিত পেয়েও উদাসীন রইলেন। এইভাবে কবি কত শীত যে বিনা পুরস্কারে হর্ষবর্ধনের সেবায় কাটালেন তার ঠিক নেই। রাজা যখনই শোধান— 'কবি কী সংবাদ ?' কবি উত্তর দেন ছেঁড়া কাঁথা নিজের গায়ে জড়িয়ে নিয়ে—'বড়ো শীত মহারাজ ! হুতাশের গরম নিশ্বাস বুকের মধ্যে না যদি থাকত, আর যদি হর্ষের কথা দু-একটি মাঝে-মাঝে আগামী বসন্তের আশার মতো শুনতে না পেতেম, তবে নিশ্চয়ই মরেছিলেম।' রাজা মনে মনে কবির কথায় দুঃখ পান ; আর এতদিন কবিকে অনর্থক যে নানা ভোগ ইচ্ছে করে ভোগাচ্ছেন সেটা ভেবেও লজ্জা পান ; কিন্তু মুখে বলেন লক্ষ টাকার কাশ্মিরী শাল নিজের গায়ে জড়িয়ে নিয়ে— 'শীত তো মোটেই বোধ হচ্ছে না কবি !' কবি একটু ম্লান হেসে উত্তর করেন— 'লোকের হর্ষবর্ধন বসন্ত কাল ; শীতের খবর তো তার কাছে পৌঁছতেই পারে না মহারাজ !'

একদিন বসন্তকালে রাজা উপবনে বিহার করছেন, মলিন মুখে মাতৃগুপ্তকে ছেঁড়া কাঁথা মুড়ি দিয়ে আসতে দেখে রাজা বললেন— 'তুমি ও আমি দুজনে কি আজ সমান সুখী নয় ? এই বসন্তকালে শীত তো পালিয়েছে দেশ ছেড়ে, তবে এখনো তোমার মলিন মুখ ছেঁড়া কাঁথা কেন বল তো কবি ?' কবি উত্তর দিলেন— 'মহারাজ, আপনার সঙ্গে কি আমার তুলনা ? আপনি ওই সম্মুখের ক্রীড়া-

পর্বতটির মতো বসন্তের দিনে বাসন্তী ফুলের সাজে সেজে অপূর্ব শোভা বিস্তার করেছেন ; আপনার যশের সৌরভ পেয়ে দিগ্‌দিগন্ত থেকে দেখুন কত মধুকর এসে গুণগান করছে আজ আপনার চারিদিকে আনন্দে হর্ষের মধুবৃষ্টি করে ! আর আমি ওই হিমাচলটির মতো যে শীতে সেই শীতেই ঘেরা রয়েছি এখনো !'

রাজা বললেন— 'তবে কে বড়ো হল কবি ? হিমাচল, না এই ক্রীড়া-পর্বতটি ?'

কবি বললেন— 'ক্রীড়া-পর্বতটি বসন্তের হর্ষবর্ধন, ফুল-ফলের ঐশ্বর্যে, ছায়ার মহিমায় বড়ো ; আর হিমাচলটি কায়ায় যেমন, তেমনি দুঃখেও বড়ো, মহারাজ। শীত ওর আর যাবার নয় দেখছি।'

মহারাজ কিছুদিন যুবরাজের হাতে রাজ্যভার দিয়ে বিশ্রাম করছেন গরমের দিনে ; কাঁথাখানা চার পাট করে স্কন্ধে রেখে কবি উপস্থিত বিষম রৌদ্রে খোলা মাথায়। হর্ষবর্ধন বলে উঠলেন— "এতদিনে শীত দূর হল কবিবরের !'

মাতৃগুপ্ত উত্তর করলেন— 'মহারাজ, শীত একটু অবসর নিয়েছে বটে, কিন্তু দারুণ গ্রীষ্মকে এই হতভাগা কবিটিকে পুড়িয়ে মারবার জন্যই রেখে গেছে। শীতের আমলে কেবল কেঁপেই মরতেম, কিন্তু এ-আমলে হৃৎকম্প আর স্বেদ দুইই হচ্ছে ; মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা পড়ছে মহারাজ।'

রাজা মৃদু হেসে বললেন— 'কবিবর, এই কাঁথাটি স্কন্ধে না রেখে ওটির মায়া ত্যাগ করে যদি আমার হাতে সঁপে দাও, তবে ওটি দিয়ে তোমার জন্যে এমন একটি ছাতা বানিয়ে দিতে পারি বেশ বড়োগোছের, যার ছায়ায় তুমি সুখে থাকতে পারবে !'

মহারাজের সামনে কবি সেই শতকুটি কাঁথা বিছিয়ে তার উপরে বসে বললেন— 'দুঃখের দিনের সম্বল এই কাঁথা দিনে-রাতে শীতে-গ্রীষ্মে কাজ দিচ্ছে এখনো। এমন-কি, প্রয়োজন হলে মহারাজেরও পদধূলি মুছে নেওয়া কিংবা সিংহাসনের গদির আর এক-পুরু খোলসও করা যায় একে দিয়ে একদিন। কিন্তু ছাতা হলে এই

ফুটো-ফাটা কাঁথায় রোদবৃষ্টি মোটেই আটকাবে না; উপরন্তু যে কাজগুলো এখন করছে তাও করতে পারবে না।'

মহারাজ বললেন— 'কবিতা আর কাঁথা আর তার উপর আমি ধরলেম ছাতা!' বলে রাজা উঠে কবির মাথায় রাজছত্র ধরলেন। আনন্দে সভাসদ সবাই ধন্য ধন্য বলে উঠল।

কবি ছল-ছল চোখে বললেন— 'প্রভু, এ দাসকে কোন্ দূরদেশের রাজছত্রের তলায় নির্বাসন দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাচ্ছেন?'

—'বন্ধু, এইখানে।'—বলে রাজা ছাতা রেখে কবিকে বুকে ধরলেন

মাতৃগুপ্ত বললেন— 'বন্ধু, ছাতার আড়াল সরে গিয়ে তোমার পা পড়েছে দীনের কাঁথায়, অমনি খোলা আঙিনায় শেষ পর্যন্ত তোমার ছায়া বিস্তারিত হল দেখ।'

রাজা বললেন— 'বন্ধু, এই ক্রীড়া-পর্বতের তপ্ত মাটি ওই দেখ তোমারও ছায়া পেয়ে অনেক দূর পর্যন্ত শীতল হচ্ছে।'

গ্রীষ্মকাল এইভাবে কাটল। বর্ষা এসে উপস্থিত হল। উজ্জয়িনী রাজপ্রাসাদের চূড়ায় ময়ূর সব পাখা বিস্তার করে মেঘের দিকে চেয়ে কেকারব করছে; আকাশে ইন্দ্রধনু মেঘের উপরে সাত রঙ নিয়ে ফুটে উঠেছে। রাজা বললেন— 'ছাতার দরকার এখনো কি বোধ করছ না কবি?'

কবি বললেন— 'এখনো নয় মহারাজ! কেননা এখনো শুনছি ময়ূরেরা বলাবলি করছে— হায়, অসার ইন্দ্রধনুর রঙ দেখে মেঘ মোহিত হয়ে রইল আর চিত্রবিচিত্র পাখা মেলে আমরা যে তার গুনগান করে কৃপাবারি ভিক্ষা করছি, তার জন্যে মেঘ পুলকবিন্দু যা দিচ্ছে তাতে তৃষ্ণা মেটা দূরে থাক্, পালকগুলো যে ধুয়ে নেব তাও হচ্ছে না। ইন্দ্রদেব যতক্ষণ আকাশ ফুটো করে জল না ঢালছেন ছাতার কথা মনেও আসছে না। এখন কেবল মনে আসছে— সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণম্।'

রাজা বলে উঠলেন— 'যদি তাই হয় তবে— বহুগুণরমণীয়ো যোষিতাং চিত্তহারী, তরুবিটপলতানাং বান্ধবো নির্বিকারঃ। জলদ-

সময় এষ প্রাণিনাং প্রাণভূতো, দিশতু তব হিতানি প্রায়শে বাঞ্ছিতানি।'

এই বলে রাজা মাতৃগুপ্তকে একখানি পত্র দিয়ে বললেন— 'আমার এই পত্র নিয়ে আপনি কাশ্মীরে গমন করুন এই মুহূর্তে!'

মন্ত্রী রাজার কাছে এসে বললেন— 'কবিবরের যানবাহন পাথেয়—'

রাজা ঘাড় নেড়ে বললেন— 'কিছু প্রয়োজন নেই।'

মন্ত্রী অবাক হয়ে কবির দিকে চাইলেন। কবি ছেঁড়া কাঁথায় রাজার শাসন-পত্র বেঁধে নিয়ে পথে বার হলেন— আর কিছু প্রয়োজন নেই বলে।

কবি চলেছেন মেঘে-ছায়া-করা দিনগুলির মধ্যে দিয়ে নদীতীরে তীরে গ্রামে গ্রামে বিশ্রাম করে। বনের পথে পাখিদের গান শুনতে শুনতে, মাঠে-ঘাটে নানা ছবি নানা শোভা দেখতে দেখতে সারা পথ তিনি আনন্দে ভরপুর হয়ে চলেছেন। শেষে একদিন দূরে হিমাচলের পায়ের কাছে কাশ্মীরে এসে কবি উপস্থিত। তখন সেখানে ফুলের সময়। কবি দেখলেন সমস্ত দেশ ফুলে ফলে সবুজে যেন একখানি বিচিত্র রাজাসনের মতো বিছানো রয়েছে। তার উপর বরফের চূড়া শ্বেত ছত্রটির মতো শোভা ধরেছে। কবির পথের ক্লেশ দূর করে পর্বতের বাতাস ফোটা ফুলের সুগন্ধে উপবন আমোদ করছে। ছেঁড়া কাঁথায় মাথা রেখে মাতৃগুপ্ত সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন; কখন দিন শেষ হয়ে সন্ধ্যা আসছে তাঁর খবরেও আসে নি। হঠাৎ স্বপ্ন দেখে যেন জেগে উঠলেন— যেন মনে হল একটি সিংহাসনে তাঁকে বসিয়ে গায়ের কাঁথাখানা কারা কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে আর তিনি প্রাণপণ হাঁকছেন— মহারাজ রক্ষে করুন। আমার কাঁথা আমি কিছুতে ছাড়ব না! মহারাজ কিছু বলছেন না, কেবলই হাসছেন। —কবি চেয়ে দেখলেন সত্যিই এক হরিণশিশু তাঁর কাঁথার উপর আরামে মাথাটি রেখে নিদ্রা দিচ্ছে; কবিকে উঠতে দেখে বনের

হরিণ পালিয়ে গেল। স্বপ্নের অর্থ ভাবতে ভাবতে মাতৃগুপ্ত সে-রাত্রির মতো সুরপুরের চটিতে এসে আশ্রয় নিলেন। তারপর হর্ষবর্ধনের দানপত্র যথাসময়ে কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রীর হাতে দিয়ে মাতৃগুপ্ত প্রত্যুত্তর চাইলেন। তখন মন্ত্রী কবিকে প্রণাম করে বললেন— 'অনুমতি দেন তো অভিষেকের আয়োজন করি। সিংহাসন কেন আর শূন্য থাকে?' কবি আশ্চর্য হয়ে শোধালেন— 'কার অভিষেকের অনুমতি চাচ্ছেন আপনি আমার কাছে?'

মন্ত্রী উত্তর দিলেন— 'হে সুকবি, আপনারই!' কবি বুঝলেন, হর্ষবর্ধন তাঁর মাথায় রাজছত্র না দিয়ে ছাড়লেন না। তিনি মন্ত্রীকে ছেঁড়া কাঁথা দেখিয়ে বললেন— 'মন্ত্রী, এখানা সিংহাসনে বিছিয়ে দিতে বলো, আর অভিষেকের আয়োজন করো।'

মাতৃগুপ্ত কাশ্মীরের সিংহাসনে বসবার অল্পদিন পরে, হর্ষবর্ধন স্বর্গে গেলেন এ-খবর যেদিন কাশ্মীরে পৌঁছল, সেইদিন কবি রাজছত্রের মায়া পরিত্যাগ করে ছেঁড়া কাঁথা স্কন্ধে ফেলে যে পথে এসেছিলেন সেই পথে বারাণসীতে চলে গেলেন।

তোর্‌মান্‌

ঝিলম নদীর মোহানার কাছাকাছি জল-করের একটা মামলা চলেছে— আমি রাজ-সরকার থেকে সেটা নিষ্পত্তির হুকুম নিয়ে বোটের উপরে কাছারি বসিয়ে কাজও করছি, আরামও করছি। এমন সময় কাশী থেকে অনেক দিনের পরে বাল্যবন্ধুর পত্র পেলেম। বন্ধু লিখেছে— সে উকিল হয়েছে এবং কাশী নরেশের দপ্তরে একটা মোটা মাইনেও তার হয়ে যায়, যদি এই সময় একটি প্রাচীন কাশ্মীরের 'তোর্‌মানি' টাকা কাশী-নরেশকে উপহার দেবার জন্য তাকে আমি পাঠাতে পারি। আমার পাশে পণ্ডিতজী বসেছিলেন ; কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাসে তিনি একেবারে পাকা। আমি তাঁকে 'তোর্‌মানি'র কথা শুধোলেম, তিনি পাকা দাড়ি চুম্‌ড়ে বললেন— কাল খবর পাবেন। সে-রাত্রের মতো বোট কিনারায় লাগালেম ; পণ্ডিতজী বিদায় হলেন।

জলে-স্থলে ধানি-রঙেএর আভাটি দিয়ে সন্ধ্যা হচ্ছে, জলের কিনারায়-কিনারায় সবুজ ছায়ার শিহরণটি জানিয়ে দিচ্ছে, ওপারের বাগিচায় রাতের হাওয়া এসে পৌঁছবার খবর। দিনের কাজ শেষ করে বসেছি, শাদা জামাজোড়ার উপরে লাল কম্বলটি মুড়ি দিয়ে ; পণ্ডিতজী হাজির। আমি আমার কাশ্মীরে চাকরটাকে পণ্ডিতের জন্য কিছু ফল আনতে হুকুম করে শুধোলেম— তোর্‌মানি টাকাটার কিছু সন্ধান হল কি, পণ্ডিতজী? তিনি ঘাড় নেড়ে বললেন— এদেশে তো পাওয়া দুষ্কর। কাশীতে পেলেও পেতে পারেন।

কাশ্মীরের মুদ্রা একেবারে দেশ-ছাড়া হয়ে কাশীবাস করছে কেন ?— শুধোলে পণ্ডিতজী উত্তর করলেন, ইতিহাসটা বলি, শুনুন।

কোমল-প্রকৃতি তুঞ্জিন ত্রিশ বৎসর কাশ্মীর শাসন করে পরলোকে গমন করলে পর, তাঁর দুই পুত্র হিরণ্য আর তোর্‌মান্‌ রাজপদ এবং যুবরাজের পদ পূর্ণ করে বসলেন। রাজা হিরণ্য

ওয়ালাহৎ নামে অষ্টধাতুর পয়সা সমস্ত কাশ্মীর-খণ্ডে প্রচলিত করলেন। বহুদিন এইভাবে যায়; তোর্‌মান্ এক সময় নিজের নামে তোর্‌মানি টাকা চালিয়ে, দেশের ওয়ালাহৎ গালিয়ে অষ্টধাতুর এক তোপ প্রস্তুত করতে হুকুম দিলেন। রাজার চর গোপনে একটি তোর্‌মানি টাকার সঙ্গে এই রাজদ্রোহের খবরটা হিরণ্যের কাছে পৌঁছে দিতে বিলম্ব করলে না, তারপরেই তোর্‌মানি টাকা রাজকোষে জব্দ হল, আর তোর্‌মান্ বন্দী হলেন, নগরের ওই যে দেখছেন ওপারে ওই বাগিচাটা, ওইখানে—।

তোর্‌মানের কারাগার নদীর উপরে, বাগিচার মধ্যে। সেখানে যুবরাজ রানীকে নিয়ে সুখেই রইলেন, কিন্তু ফুলবাগানে ঘেরা হলেও সেটা যে কারাগার, এটা তোর্‌মান্ কিছুতে ভুললেন না; তাই কুমার প্রবরসেন যেদিন ভূমিষ্ঠ হলেন, সেদিন তোর্‌মান্ রানী অঞ্জনাকে বললেন— হায়, এক কারাগার থেকে আর এক কারাগারের বন্দী, একে কে মুক্তি দেবে? রানী সেই রাত্রে সবার অসাক্ষাতে কুমারকে বাগিচার মালিনীকে দান করলেন। তোর্‌মান্ যখন শুনলেন— যে এসেছিল, সে রইল না, মুক্তিদাতা তাকে নিজের হাতে মুক্তি দিয়ে গেলেন, তখন যুবরাজ নিশ্বাস ফেলে বললেন— মরেছে, না, বেঁচেছে? অঞ্জনা চোখ মুছে বললেন— বেঁচেছে বাছা আমার। যুবরাজ তোর্‌মানের ফুলবাগিচার কারাগার যেমন কচি মুখের হাসিতে আলো করে দিলে না, তেমনি রাজা হিরণ্যেরও রাজপ্রাসাদ হাজার হাজার সোনার প্রদীপেও আলো হল না— একটি শিশুর অভাবে।

দুই রানীর প্রাণে দুটি ছেলের স্বপ্নই জেগে রইল, আর দুই ভাইয়ের প্রাণ ফুলবাগিচা আর রাজপ্রাসাদে অন্ধকারে মরতে থাকল পলে-পলে।

হায়, আঁধার বুঝি আর ঘুচল না, এই বলে দুই দিকে দুই ভাইয়ের মন যখন বেদনা জানাচ্ছে কেবলি, সেই সময় বিদ্রোহের মশাল হাতে যুবা প্রবরসেন একদিন কাশ্মীরের সিংহদ্বারে এসে

হানা দিলেন। দেখতে দেখতে দিকে দিকে আগুন জ্বলে উঠল। কারাগারের অন্ধকার সে আগুনের আভায় সূর্যোদয়ের মতো রাঙা হয়ে উঠল, আর সোনার রাজপুরী তার উত্তাপে গলে গেল। হিরণ্য তোর্‌মান্‌ দুই ভাই রক্তের আবিরে রাঙা হয়ে পাশাপাশি চললেন কুমারকে দেখতে— বীর যেমন করে চলে বীরের দিকে! তারপর সেইদিন সন্ধ্যা যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের রক্তরাগের সঙ্গে সঙ্গে দুই রানীর ললাটের সিন্দূর মুছে দিয়ে কাশ্মীর দেশের উপর থেকে ধীরে ধীরে পশ্চিম সমুদ্রের পরপারে চলে গেলেন। রানীদের হুকুমে বিদ্রোহীর পথ আগ্‌লে রাজপুরীর সিংহদ্বার ঝন্‌ঝনা দিয়ে বন্ধ হল। বিদ্রোহীর শাস্তি নিয়ে প্রবরসেন নির্বাসনে চলে গেলেন, অঞ্জনার কোল, কাশ্মীরের সিংহাসন দুই শূন্য রইল।

আমি শুধোলেম, আর তোর্‌মানি টাকার কী হলো? পণ্ডিতজী বললেন— সেই অভিশপ্ত টাকা কাশ্মীরের আর কেউ চালাতে সাহস পেলে না। রানীদের হুকুম নিয়ে রাজমন্ত্রী সেই টাকায় কাশীতে একটা স্নান-ঘাট বানিয়ে দিলেন। সে ঘাটও প্রস্তুত হবার ঠিক পরেই সহসা একদিন রসাতলে প্রবেশ করেছিল, শোনা যায় লোকমুখে, ইতিহাসে কিন্তু তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না— বলে পণ্ডিতজী চুপ করলেন। আমি তাঁকে কিছু ফল উপহার দিয়ে বললেম— কাল আবার গল্প বলতে হবে, আসবেন। পণ্ডিত ফলের ঝুড়িতে কম্বল ঢাকা দিয়ে বললেন— কাল আপনাকে মাতৃগুপ্তের ইতিহাস শোনাব, আজ বিদায় হই।

গঙ্গাফড়িং

একে জায়গাটা আদিগঙ্গার পশ্চিমকূলে, তার উপরে একটা রামতুলসীতলাও পাওয়া গেল। গঙ্গাফড়িং মহা আনন্দে সেইখেনে আখড়া বসিয়ে দেশের ফড়িংদের নিয়ে অষ্টপ্রহর সঙ্কীর্তন জুড়ে দিলেন। তুলসীপাতা খেয়ে খেয়ে গঙ্গাফড়িং ক্রমে নবদূর্বাদল-শ্যাম বর্ণটি হয়ে উঠুন, ফড়িংগুলো কাদাগোলা গঙ্গাজল খেয়ে গঙ্গামৃত্তিকার অলকা-তিলকার ছাপমারা হয়ে থাকুন, এদিকে গঙ্গার ওপারে খুদে পিঁপড়ে ডেঁয়ে পিঁপড়ে তারা মাঠের মধ্যে গড়-গোষ্ঠ হাট-বাজার ঘর-কন্না পেতে বসবার জোগাড়ে সকাল থেকে সন্ধে খুদকুঁড়ো সংগ্রহ করে কেবলি খাটছে। বাস্‌রে সে কী খাট্‌নি! রোদে পুড়ে ডেঁয়েগুলো কালো হয়ে গেল, রাঙামাটি খুঁড়তে খুঁড়তে খুদে পিঁপড়েগুলোর গায়ের বর্ণ পোড়ামাটির মতো রঙ ধরলে।

এইভাবে দিন যায়। গঙ্গাফড়িংয়ের 'গঙ্গা গঙ্গা' বলে হুল্লোড় করে দিন যায় আর পিঁপড়ের দিন যায় 'কাজ কাজ', কেবলি কাজ করে। ক্রমে বর্ষা গেল, শরৎ গেল, শীত কাটলে শেষে বসন্ত-কালটাও ফুরালো। খরার দিনে আদিগঙ্গার জল ম'রে তলার মাটি পর্যন্ত ফেটে চটে শুকিয়ে উঠল— মাঠগুলোয় আর ঘাসও গজায় না, গাছও বাঁচে না, কেবলি ধুলো ওড়ে আর আকাশের শেষ পর্যন্ত আদিগঙ্গার দুইপার ধূ ধূ করতে থাকে।

পিঁপড়েরা মাটির তলায় ঢুকছে। সেখানে তাত একটুও নেই, জমা করা খাবারও যথেষ্ট— পিঁপড়েরা আরামেই রইল। আর গঙ্গাফড়িং শুকনো রামতুলসীর তলায় না পান হাওয়া, না পান খাওয়া— তাই একদিন ওপার থেকে এপার ভিখ্ মাগতে চললেন। পিঁপড়েদের খুদে শহরে খুদকুঁড়োর গুলজার বাজার বসেছে— পিঁপড়েরা আসছে, যাচ্ছে, নিচ্ছে, থুচ্ছে— গঙ্গাফড়িংকে দেখেও তারা দেখে না। বেলা বাড়ল, খিদেয় তার পেট জ্বলল, তেষ্টায়

গলা কাঠ হল। এক মুদির দোকানের সামনে— 'ভিক্ষে দাও বাবা' বলে ফড়িং গিয়ে হাত পাতলেন।

মুদির দোকানের খুদে পিঁপড়ে কট্ কট্ করে শুনিয়ে দিলে — 'ভিখ্ পাওয়া যাবে না।'

গঙ্গাফড়িং ধারে খাবার চাইলেন— 'এখন কর্জ দিয়ে প্রাণ বাঁচাও— ফসল ফললে কুঁড়োর বদলে কাঁড়ি দিয়ে ধার শুধব।'

পিঁপড়ে শুধোল— 'খুদ কুঁড়ো কাঁড়ি না করে এ ক'মাস করেছ কী শুনি?'

গঙ্গাফড়িং খঞ্জনী বাজিয়ে গঙ্গামাহাত্ম্য শুরু করে দিলেন। রাত্রি হয়ে এল, মুদি বললে— 'যদি গেয়ে গেয়েই দিনটা গেল তবে না খেয়ে রাতও পোহাক।' বলে সে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করলে।

জেন্তু-সভা বা জন্তু-জাতীয় মহাসমিতি

জেন্তু-সভার প্রথম অধিবেশনের অস্থায়ী সম্পাদক সজারুর চতুষ্পদীকা টিপ্পনী ; যথা—

প্রস্তাবনা

সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা— এ কেবল কথার কথা। জীব-সৃষ্টি হয়ে অবধি মনু আর সেই আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত মানুষরা মুখেই বলে আসছে 'জীবে দয়া', কিন্তু কাজের বেলায় আমাদের কাউকে দেখে জিভে জল আসে— চোখে নয়, এটা জানা কথা, কাজেই মানুষ যতই জিভ নেড়ে বলুক— জীবে দয়া করছে ঠিক এর উল্টোটা। এই কারণে যত জীবজন্তু এমন-কি পোকামাকড় তারা পর্যন্ত জ্বালাতন হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে আর ভাব রাখা চলছে না। বাস্তবিক মানুষের চেয়ে আমরা কমটা কিসে যে চিরদিন তাদের শাসনে চলতে হবে, হুকুমের চাকর ?

মানুষের সঙ্গে কোনো আর বাধ্যবাধকতা না রাখাই স্থির করে, ছোটো বড়ো সব জানোয়ার মিলে এক সভা গঠন করা গেছে, যার নাম হচ্ছে— মনু-তাড়নী জান্তব হিতকারী জাতীয় মহাসমিতি বা জেন্তুসভা।

ইতিমধ্যেই সভাটির প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। গত পূর্ণিমায় আলিপুরের সরকারি চিড়িয়াখানার গোলচানকাতে এই সভার প্রথম অধিবেশনের বন্দোবস্ত করা গিয়েছিল, কেননা পৃথিবীর জীবজন্তুকে একত্র করার পক্ষে এমন স্থান আর দ্বিতীয় নাস্তি। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, সেদিনের সভার কাজ পাশব প্রথা-মতো যতদূর সম্ভব বাঘাড়ম্বর ইত্যাদি দ্বারায় সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার জন্যে প্রাণপণের ত্রুটি হয় নি।

অভিভাষণ

স্বাধীনতার মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে মহাপুরুষ বীর বনমানুষ— তিনি উৎপীড়িত জীব-জগৎকে মুক্তি দিতেই যেন বাসন্তী পূর্ণিমার দিনে

গভীর রজনীতে বিশ্ব যখন ঘুমে ঘুমায়িত, সেই শুভ মুহূর্তে পশুশালার তালাবদ্ধ লৌহ-পিঞ্জরাবলীর অর্গলাদি ও লৌহ-শলাকাসঙ্কুল শৃঙ্খলাবদ্ধ দ্বারাদি উন্মুক্ত করে দিয়ে গেলেন। আজীবন বন্দী, চিরদিন বদ্ধ জীব মুক্তির মধুরাস্বাদ পেয়ে বীর-রসের রুধিরাস্বাদে বলীয়ান হল ও উন্মুক্ত আকাশ-তলে পুনরায় দাঁড়িয়ে সিংহনাদ হ্রেষা বৃংহিত চিৎকার চিচিকার করে একে একে এসে জান্তবীয় ভৈরব চক্রে স্ব-স্ব স্থান অধিকার করে বসল। জাতি-নির্বিশেষে গৃহপালিত গবাদি চক্রের সম্মুখভাগে, শার্দূলাদি বন্যগণ চক্রের পশ্চাতে এবং সরীসৃপাদি ভূচরগণ চক্রের তলদেশে ও জলচর খেচরগণ চক্রের ঊর্ধ্বদেশে আশ্রয় করলেন, আর বিরাট এই জেন্তু-সভার কার্যাবলী নিরীক্ষণ করবার মানসেই যেন চন্দ্রমা সেদিন পূর্ণকলায় উদ্ভাসিত হয়ে, অন্ধকার তরুশিখর ছাড়িয়ে ক্রমে আকাশে আরোহণ করতে থাকলেন। (সাধু! সাধু!) মানুষদের মধ্যে রাষ্ট্রনীতি, সমাজ-সংস্কার এমনি সব ব্যাপার নিয়ে বিরাট সভা অনেক হয়েছে এবং সে-সব সভায় খিটি-মিটি ঝগড়াঝাঁটি হাতাহাতি গালাগালি এমন-কি, জুতো-মারামারিও হতে বাকি নেই, কিন্তু আমাদের এই জেন্তু-সভায় বড়ো বড়ো হাড়-ভাঙা ঘাড়-ভাঙাদের কথা দূরে থাক্, মশা মাছি টিকটিকিটি পর্যন্ত যে শান্তশিষ্ট ভাব দেখিয়েছেন তা কোনোকালে কোনো সভায় গিয়ে মানুষ পারে নি, পারবেও না। হেড়েলের ডাকের মধ্যে কে জানে সেদিন কেমন একটি অপূর্ব কোমল সুর লেগেছিল— অরগানের তিন সপ্তকে যতগুলি কোমল কালো সুর সবগুলি একই সঙ্গে! আর রাজহংসের গলা থেকে কড়ি সুরের ঝরনা কারুণ্য রসে সবাইকে বিগলিত-প্রায় করে দিয়েছিল (বেশ, বেশ! আহা!)

প্রার্থনা

কী অপূর্ব সংগীত, কী স্বর্গীয় সুধাময় সুস্বর! আহা কী দেখলেম, কী শুনলেম, জীবন ধন্য হল, আত্মা পবিত্র হল, দেহ-মন জুড়িয়ে গেল! শান্তিঃ, শান্তিঃ, চারিদিকে শান্তিঃ! উত্তরে শান্তি, দক্ষিণে শান্তি, পুবে শান্তি, পশ্চিমে শান্তি, ঊর্ধ্বে শান্তি, অধে শান্তি, ভিতরে

শান্তি, বাহিরে শান্তি, অন্তরের অন্তরে গভীর প্রেম, বিপুল শান্তি! হে পশুপতি, তুমি কত করুণাময়! তুমিই ধন্য, ধন্য তোমার সৃষ্টি, অবোধ অবোলা জীবজন্তুদেরও প্রাণে এত মায়া, এত ভালোবাসা, এত প্রেম, এমন গভীর পরহিতৈষণা— আহা! মানুষ, ছাখো, শেখো, ধন্য হও, শান্তিরস্তু জীবংচাস্তু!

জাতীয় সংগীত

আর না— আর না—
তোলো রে তোলো ফণা— মেলো রে মেলো ডানা
আর না— আর না—
হাম্বুর হাম্বুর গরজনে,
কাঁপুক অম্বর ক্ষণে ক্ষণে,
ত্রাসিত মানব রণে-বনে
উঠুক ভীষণ কান্না,
আর না— আর না—

(কোরাস)

ঘাসদায়িনী, মাসহারিণী,
শিংঅশালিনী গো!
নখমালিনী হো
ম্যা ম্যা গাঁ গোঁ
পিচকচক্ ক্যাঁ কোঁ!

(করতালি)

ঘুণাক্ষর রিপোর্ট

সভার প্রারম্ভেই ছোটো বড়ো খাদ্য খাদক অভেদে সমস্ত জীব-জন্তুতে মিলে কোলাকুলি, সে এক অভূতপূর্ব অভাবনীয় দৃশ্য, সকলেই এমন আবিষ্ট হয়েছিলেন যে আলিঙ্গন-চুম্বনের হুল্লোড় হয়ে গেল! আর কোলাকুলি গলাগলি পাকড়া-পাকড়ি থেকে দু-একটা রক্তপাত যে ঘটে নি, তা নয়। আমাদের শৃগালভায়া এমনি প্রেমভরে পাতি-

পুকুরের হাঁস-গিন্নীর গলা জড়িয়ে ধরেছিলেন যে তাতে করে গিন্নীর সরু গলা তখনই বাতাহত মৃণালদণ্ডের মতো ভেঙে পড়ল, নেকড়ে-বাঘের সঙ্গে কোলাকুলিতে ভেড়ার, আর গো-বাঘার সঙ্গে জাপটা-জাপটিতে ঘোড়ার ওই একই দশা হয়েছিল। প্রতিপক্ষেরা হয়তো বলবেন, যে খায় আর যাকে খায় এ-দুজনে কোলাকুলি করতে গেলেই এই ফল কিন্তু আমরা জোরের সঙ্গে বলতে পারি প্রেমের আতিশয্যই হচ্ছে এই সামান্য দুর্ঘটনার মূল, তা ছাড়া বৃহৎ কাজে এমন হয়েই থাকে। সুতরাং এ-সব ছোটোখাটো দুর্ঘটনাতে মন না দিয়ে সভ্যগণকে সভার কাজ চালিয়ে যেতে অনুরোধ করে, গগনভেদ পক্ষী— তিনি তারস্বরে যে তিন মহাপ্রাণ জীব জেন্তু-সভার সূত্রপাতেই স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিলেন, তাঁদের অমর আত্মার কল্যাণের জন্য পশুপতি-স্তোত্র পাঠ করে এক মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করলেন।

শ্যাম দেশের মহাস্থবির শ্বেতহস্তীর 'সর্ব জীবে দয়া' নামে প্রবন্ধ পাঠ এবং জীবহিংসা নিবারণ-কল্পে এক পিঞ্জরাপোলের প্রস্তাব করার কথা ছিল, কিন্তু বক্তা বক্তৃতামঞ্চে উঠবার মুখেই তাঁর গোদা-পায়ের চাপনে একটা উইটিপি মায় পিপীলিকা বংশ ধ্বংস হয়ে গেল, শ্বেতহস্তীর সেটা খবরই হল না। কোলাব্যাং কট্ কট্ করে কু-কথা শুনিয়ে হস্তীর দৃষ্টি এই দুর্ঘটনার দিকে আকর্ষণ করায়, সেই মহাকায় নিকায় পাঠ করে অনুতাপ করতে থাকলেন, কাজেই তাঁর ওই প্রস্তাব-দুটোই আর সভাতে উপস্থিত করা হল না।

শেষ

পরিশেষে বক্তব্য যে, তোতারাম বাবাজী যেমন কইলেন, সম্পাদক সজারু চতুষ্পদীতে তাই লিখে নিলেন। এই রিপোর্ট অবিশ্বাসের কোনো কারণ নেই, কেননা এ জানা কথা যে তোতা— তিনি যা শোনেন তাই আউড়ে যেতে একেবারে পাকা। আর মাছি, তিনি মাছি-মারা কাপি যখন নিয়েছেন, তখন এতে ভুল ভ্রান্তি নাই বললেও চলে। সেই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র মাছি ও

তোতারাম, তাঁদের আসল নাম ধাম প্রকাশ করা গেল না, কেননা ইদানীং তাঁরা রাজনীতি সমাজনীতি এ-সব থেকে আড়ালে আবডালে থাকাই মানস করেছেন, কেবল আমার সনির্বন্ধ অনুরোধেই এবারের মতো এঁরা আমাদের সভায় রিপোর্টার ও কাপিইস্ট পদ গ্রহণ করেছিলেন। নিম্নে তোতারামের বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশিত হল।—ইতি

অস্থায়ী সম্পাদক
সজারু

জেন্তু সভার বিস্তারিত বিবরণী

চট্টগ্রামের কুঁকড়ো, কলেজ স্কোয়ারের তোতাপণ্ডিত এবং মিস্টর হনুম্যান অব কলাগাছির দ্বারায় লিখিত ও প্রকাশিত।

সভার স্থান— আলিপুর চিড়িয়াখানার গোলবাগিচা।

কাল— ইলেবন্ থার্ট্টি পি-এম, মুনডে, ফার্স্ট মে পাংচুয়ালি।

কার্য-তালিকা—(ক) সভাপতি নির্বাচন। (খ) মানবজাতিকে জাতচ্যুত করার প্রস্তাব এবং তদ্‌বিষয়ে কী উপায় অবলম্বনীয় সে বিষয়ে গবেষণা। যাঁহারা মানব-জাতির দফা-রফায় মত দিবেন, তাঁহারা বামহস্ত উঠাইবেন, যাঁহারা মানব-জাতির সহিত রফা করিয়া চলিতে চাহেন, তাঁহারা দক্ষিণ হস্ত উঠাইবেন। (গ) প্রধান প্রধান বক্তাগণের নাম সিংহ, ব্যাঘ্র, হয়, হস্তী, হরবোলা, শৃগাল, কুক্কুর ইত্যাদি। (ঘ) চিড়িয়াখানার ডাক্তারের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ ও তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য চাঁদা সংগ্রহ এবং মৃত ডাক্তারের স্থানে মানুষ না হইয়া ওই পদে কোনো পশু কেন না বসিবেন, এই মর্মে পার্লামেণ্ট মহাসভায় শোক-প্রকাশকারী এক ল্যামেণ্টেবল দরখাস্ত প্রেরণ ও এ দেশে রীতিমত অ্যাজিটেশন বা আন্দোলন করার প্রস্তাব।

মুচিখোলার থেকে আরম্ভ করে যেখানকার যত ময়ূর আর বকের পালনকারীদের চিড়িয়াখানা আছে, সবগুলো থেকেই মোড়ল মাতব্বর নামজাদা খগেন্দ্রগণ তো এসেছেনই, তা ছাড়া ঝাঁটা-গোঁফ

লম্বা-দাড়ি ধাড়ি-বাচ্চা চুনো-পুঁটি মাকড়-ধোকড় ফিড়িং-ফড়িং কাগা-বগা কেউ আর আসতে কসুর করে নি।

আলিপুরের অত বড়ো যে বাগান, তার অলি-গলি মাঠ-ময়দান একেবারে জীবে জীবারণ্য হয়ে গেছে— শিং ঝুঁটি আর ন্যাজে গিস্-গিস্ করছে, কিন্তু সভার পূর্বদিকে চিড়িয়াখানার সিবিল সার্জনের হঠাৎ মশার কামড়ে অকালমৃত্যু হওয়ায় সকলের মুখেই— এমন-কি উদ্যানের তরুলতাগুলির উপরেও— যেন কী একটা বিষাদের ছায়া পড়েছে। ওর মধ্যে যারা ডাক্তারকে আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন এমন সব সুসভ্য জানোয়ার, তাঁরা অশৌচ চিহ্ন কাছা পরেই এসেছেন আর হামবড়া নব্য জানোয়ারের দল তারা কাছা কোঁচা দুই বর্জন করে কালোর উপরে কালো এক-একটুকরো ফিতে লাগিয়ে গোম্‌সা মুখে এদিক-ওদিক করছে। এখানে ওখানে হোমরা-চোমরা সভ্য জন্তুরা দল বেঁধে খুব উৎসাহের সহিত সভার কাজ কী ভাবে চলবে, কী কী নিয়ম কানুন হবে, কাকেই বা সভাপতি করা যাবে, এই-সব নানা দরকারি তর্ক-বিতর্কে ব্যস্ত রয়েছেন। হ্যাট কোট চশমাতে ফিটফাট মিস্টর হনুম্যানকে আসতে দেখে গাছতলায় বনমানুষ বলে উঠলেন— 'ইনি যে মানুষের নিকট-সম্পর্ক কেউ, সেটা বোঝাতে এঁর যে বিশেষ চেষ্টা রয়েছে তা বেশই বোঝাচ্ছে ওঁর বেশ।'

বহুরূপী বললেন— 'মানুষের অনুকরণটা কিন্তু করেছে দিব্বি।'

বনমানুষ চোখ মট্‌কে বললেন, 'অনুকরণ এক, হনুকরণ অন্য জিনিস।'

ঘাসের মধ্যে থেকে সাপ ফোঁস করে বলে উঠল— 'ইস, ভঙ্গিমা দেখ! লজ্জা নেই! দুস!'

বুড়ো দাঁড়কাক গাছের উপর থেকে জবাব দিলে— 'ছ্যাঃ, মানুষের চাল-চোল বানরে কখনো সাজে! ভরতচন্দ্র তো স্পষ্ট বলে গেছেন— 'যার যাহা তারে সাজে।'

হুতোম প্যাঁচা দাঁড়কাককে সাধুবাদ দিয়ে হনুর দিকে চেয়ে কেবলই বলতে লাগল — 'হুয়ো, হুয়ো, সাত নকলে আসল ভেস্তা!'

গোদাচিল, সে ছড়াও জানে না পড়াও জানে না, কিন্তু তবু কাকও প্যাঁচার দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়ছে দেখে হরবোলা পাখি চিলকে ঠেস দিয়ে বলে উঠল— 'পণ্ডিতে পণ্ডিতে যুদ্ধ সমস্যা পুরায়, মূর্খে নাহি বুঝে তাহা জুল-জুল চায়।' বহুরূপীর বিশ্বাস ছিল রঙ-তামাসায় তার মতো কেউ নেই, কিন্তু হরবোলা গোদাচিলের সঙ্গে ভালো রঙ করে নিলে দেখে হিংসেতে বেচারা প্রথমে আগাগোড়া রাঙা— তারপর একেবারে নীলবর্ণ হয়ে গেল।

এই সময় ধ্যান ভেঙে কচ্ছপ খোলা থেকে মুখটি বার করে বলে উঠলেন— 'বুঝেচ কিনা, জীবনটা অতি প্রকাণ্ড একটা স্বপ্ন-বিশেষ, এরই জন্যে আবার ঝগড়া-ঝাটি মারামারি! আপনার মধ্যে আপনি একবার তলিয়ে দেখ দেখি, জগৎই বা কী তুমিই বা কে আর— জগৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি'— বলেই কচ্ছপ ঘুমিয়ে পড়লেন। আকাশ থেকে একদল তালচড়াই কিচমিচ করে বলে উঠল— 'হেসে খেলে নাওরে জাদু মনের সুখে!' নতুন-পালক-ওঠা পিঁপড়ে, শোনা যায় না এমন মিহি সুরে একবার বললে— 'কবে যাবে তুমি শিঙে ফুঁকে,' তারপরেই সে আকাশে উড়ে পড়ল আর সঙ্গে-সঙ্গেই তার পিঁপড়ে-লীলাও সাঙ্গ হল। শুঁয়ো পোকা এই দেখে ঝাঁটা-গোঁফ ফুলিয়ে আওড়ালে— 'পিঁপড়ের পালক ওঠে মরিবার তরে।'

এইবার সভার কার্যারম্ভের ঘণ্টা পড়ল। জীব-জন্তু যে যেখানে ছিলেন একে একে গোলচানকাতে এসে তালি দেবার জন্যে ন্যাজ আর বক্তৃতা শোনবার জন্যে কান খাড়া করে বসলেন। সবাই চুপ-চাপ রয়েছেন, এমন সময় গাধা, তিনি হঠাৎ 'গোল হচ্ছে' বলে চিৎকার করে উঠলেন। একটা কানামাছি ছাড়া গাধার কাছে আর কেউ গোল বাধায় নি, গোলচানকাতে সবাই গোল হয়েই চুপচাপ বসে ছিল। কিন্তু তবু গাধা 'চোপ্‌ চোপ্‌' শব্দে আসর সরগরম করে তোলবার চেষ্টা করতে থাকলেন। গাধার বন্ধুবান্ধবরা মিলে তার জন্যে একটা বক্তৃতা লিখে দিয়েছিল, কেবল গলার জোরেই তিনি সবাইকে মাতিয়ে তুলতে পারবেন এই বিশ্বাসে প্রথম বক্তৃতার

ভার গাধার উপরেই পড়েছিল। দু-চার জন দুষ্টু জন্তু কানাকানি করতে লাগল কেমন করে পিছন হটে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে হবে, গাধা এই বিষয়েই বলবেন। যা হোক, গর্দভ, কে কোথায় বাহবা দিচ্ছে তারই একটুও হাততালি যেন না এড়িয়ে যায় এই মতলবে দুই কান খাড়া করে ন্যাজ নেড়ে বক্তৃতা শুরু করলেন—

'লম্বাকান জাতভাইগণ, চার-ঠ্যাং দুই-ঠ্যাং স্বদেশী বিদেশী পাড়াপড়শি ও বনবাসীগণ, আজিকার এই জন্তু-সভায় সভাপতি নির্বাচন হল একটি প্রধান কাজ। এটা কারো জানতে বাকি নেই যে যিনি আজ এ সভায় সভাপতি হবেন, তাঁকে গুরুতর কাজের ভার নিতে হবেই। মানুষের কাছে দাসত্ব করতে দুঃখের বোঝা বইতে বইতে আমাদের চারখানা পা ভেঙে পড়বার জোগাড় হয়েছে, পিঠ ধনুকের মতো বেঁকে গিয়েছে, এ অবস্থায় সব জীবের ভার লাঘব করে নিজের স্কন্ধে নিতে পারে, এমন একজন আমি ছাড়া আর কে আছে? আমরা চতুর্দশ পুরুষেরও চতুর্দশ পুরুষ ধরে ভারই বহন করে আসছি, দেবতা থেকে ধোপার মোট পর্যন্ত কী না আমাদের বইতে হচ্ছে, ভার বইতে বইতে পিঠে কড়া পড়ে গেল এমনি যে, সেটা বংশগত একটা গুণের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল আমাদের। অতএব এসো আর্ত আত্মীয়-কুটুম্ব, এসো দেশী বিদেশী পাড়াপড়শি, যে যেখানে আছ সবাই মিলে সভাপতির গুরুভার আমার উপরে চাপিয়ে দাও। আমি অনায়াসে তোমাদের সব কার্যভার, বিপদভার, আপদভার, আনন্দভার গ্রহণ করছি, দাও! এটা তোমাদের দু-বার করে বলতে হবে না যে, যেমন সইতে তেমনি বইতে, তেমনি আবার গোঁসা করে নিজের গোঁ বজায় রাখতে আর কিছুর উপরে পদাঘাত করতে, গাধার মতো আজন্মসিদ্ধ কেউ নেই—'

গাধা বলে চলেছেন এমন সময় জিরাফ তাঁর রেফের মতো গলাটা উঁচিয়ে বলে উঠলেন— 'চিরকালটা মানুষের গোলামি আর যমের বাড়ির যাত্রীদের গাড়ি টেনে এসে এখন জন্তু সভায় সভাপতি হতে চায় গাধা, এ কী আস্পর্ধা!'

জিরাফের কথায় গাধা ভীষণ চটে অভ্যাসমতো লাথি চালাতে যাবেন, এমন সময় ভাল্লুক 'থামো থামো' বলে এক ধমকে গাধাকে বসিয়ে দিয়ে নিজে বলতে শুরু করলেন—

'ভাই সকল, একে এই কলকাতার দুরন্ত গরমে তিষ্ঠানো ভার, তার উপরে তোমরা সবাই যদি গরম হয়ে উঠে হাতাহাতি লাথালাথি করতে থাকো, তবে আমাকেও পৃথিবীর শেষ বরফের দেশে ফিরে যেতে হবে, যাবার পূর্বে দু-চারটে চড়া কথা শুনিয়ে। বরফের দেশে হিমসিম আমি যথেষ্ট খেতে পাই, কেবল তোমাদের মুখ চেয়েই আমি কষ্ট করে— একরকম উপোস করেই— এখানে কাটাচ্ছি; এখন সবাই যদি মানুষের মতো অগ্নিমূর্তি হয়ে এই সভার মধ্যেকার এবং প্রত্যেকের প্রাণের মধ্যেকার জমাট প্রেমের ক্ষীণ ধারাটি পর্যন্ত শুকিয়ে ফেলবার চেষ্টা করো, তবে ভালো হবে না বলছি।'

বরফের দেশের ভালুকের গলা পেয়ে উত্তর আর দক্ষিণ সাগরের 'সীল' মাছগুলো কাঁপছে দেখে সিংহ 'চোপরাও' বলে ভালুককে থামিয়ে দিলেন। এই ফাঁকে রতা শেয়ালটা কখন গিয়ে বক্তার মাচায় উঠে জাঁকিয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করে দিলে। দু-এক কথায় শেয়াল সব জানোয়ারদের বুঝিয়ে দিলে যে, পশুপতির যেমন ত্রিশূল, ইন্দ্রের যেমন বজ্র, প্রজাপতির যেমন কমণ্ডলু, তেমনি সভাপতির একটা অস্ত্র হচ্ছে ঘণ্টা, আর সেই ঘণ্টা একমাত্র ধর্মের ষাঁড়ের গলাতেই ঝোলানো দেখা যাচ্ছে, অতএব ষাঁড়ই সভাপতি হবার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র।

সর্বসম্মতিক্রমে ষাঁড়ই গলঘণ্টা আর গলকম্বল দুলিয়ে সভাপতির আসনে গিয়ে বসলেন। ডালকুত্তা এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল, ঘণ্টার শব্দে হঠাৎ চমকে উঠে ভাবলে তার মনিব আপিসের বাবুকে ডাকতে বুঝি ঘণ্টা দিলেন, অমনি কুত্তোটা 'কোই হ্যায়' বলে হাঁক দিয়ে চারিদিক চাইতে লাগল। কুত্তোর রকম দেখে নেকড়ে-বাঘ একবার নাক সিঁটকে মুখ ফেরালে। বেড়াল হাঁসের একটা কলম কেড়ে রাতের শিশিরে ভিজে গা একবার ঝাড়া দিয়ে, সটপট নোট নিতে লেগে

গেল। তোতাপাখি গিয়ে বক্তা আর শ্রোতা দুইজনের মধ্যে বসে রিপোর্ট নিতে লাগলেন।

এইবার রক্তমাখা কটা-চুল সিংহ ঝাঁকড়া মাথা ঝাড়া দিয়ে গম্ভীর মুখে সভার মধ্যিখানে উঠে বলতে শুরু করলেন। যেন মেঘ ডাকছে এমনি গুরু-গম্ভীর আওয়াজে সিংহনাদ করে তিনি মানুষের অত্যাচার আর অবিচারের কথা বর্ণনা করে বললেন —'এই মানুষের হাত থেকে বাঁচবার এক রাস্তা, আর সে রাস্তা তোমাদের জন্যে খোলা রয়েছে! এসো আমার সঙ্গে জনমানবশূন্য সুদূর খাণ্ডব বনে। অতি নির্জন সে স্থান, তেপান্তর মাঠে ঘেরা, মরুভূমির মধ্যেকার ওয়েসিস সেটি, বর্বর মানুষগুলো তার ত্রিসীমানায় যেতে পারে না এমন দুর্গম ভীষণ সে স্থান! মানুষের যত বড়াই লোকালয়ের চারখানা দেওয়ালের মধ্যে, ফাঁকায় আর নিরালায় পেলেই আমরা তাদের ঘাড় মটকে রক্তপান করি।' এই সময় বাঘের দিকে চেয়ে একটা গোরু দুবার গলা-খাঁকানি দিল, সিংহ একটুখানি মুচকে হেসে বললেন— 'এ কথা আমি কাউকে ইঙ্গিত কিংবা ঠেস দিয়ে বলছি নে, সত্যিই বলি, মানুষের মধ্যে সিংহবিক্রম এমন কে আছে যে রণে বনে আমাদের সামনে এগোতে পারে!'

সুন্দরবনের বাঘ এই শুনে কাষ্ঠহাসি হেসে ঝাঁটাগোঁফ দুবার মুচড়ে একবার ভাঙা গলায় বাহবা বলে হাততালি দিলে। তারপর সিংহ মরুভূমির চমৎকার শোভা, শান্তি, মুক্তি আর নির্ভয় আনন্দময় জীবনের একটি বিচিত্র বর্ণনা দিয়ে বক্তৃতা বন্ধ করলেন।

হাতি উঠে প্রস্তাব করলেন যে, সকলকে নিয়ে ছোটোনাগপুরে নাগা পর্বতে যাওয়াই ঠিক, কেননা সেখানে হাতি-চোখের গাছ যথেষ্ট পাওয়া যায়, দাঁতে চিবিয়ে খাবার সামগ্রীর কোনোদিন কারুর অভাব হবে না, তবে খাবার জলের একটু কষ্ট হবে, কিন্তু যদি উট মোষ হাতি আর মশা এঁরা মশক কুঁজো পিচকিরি আর নল ভরে ভরে পাহাড়ে তুলে দেন, তবে জলার জল সমস্তই পাহাড়ে উঠবে জালা জালা, জীবের জলকষ্টও সঙ্গে সঙ্গে দূর হবে।'

হাতির প্রতিবাদ করে জল-হস্তী বলে উঠলেন— 'জলার জল জলাতে রাখলেই মঙ্গল, মিষ্টিও থাকবে ঠাণ্ডাও থাকবে, নয় তো হাতিরা সবাই গিয়ে জলার জল তুলতে নামলে জল কাদায় এমন ঘোলা হবে যে, সে জল কারুর আর মুখে দিতে হবে না।'

কুকুর এই সময় হঠাৎ মাথা গরম করে চেঁচিয়ে উঠল— 'তোমরা যাই বল, আমি তো বলি, শহরে থাকায় যেমন সুখ এমন আর কোথাও নয়!'

গো-বাঘা, নেকড়ে আর হেড়েল তিনজনে পড়ে কুকুরের কোটের লেজ ধরে টেনে বসালে। তখন সুন্দরবনের বাঘ হুঙ্কার দিয়ে, মাচায় লাফিয়ে উঠে হ্যাজ আফসে বক্তৃতা আরম্ভ করলে— 'আমরা লড়াই দেব, খুন জখম রক্তপাত করব, মানুষের জাতকে জাত পৃথিবী থেকে লোপ করে দেব! এসো সব বড়ো বড়ো জানোয়ার সেনাপতি হয়ে এগিয়ে এসো, আর ছোটোখাটো জীবজন্তু, তোমরাও ভয়ে পিছিয়ো না। ছোটো হলে কী হয়, গ্রীসের ইতিহাস যদি পড়ে দেখ তবে দেখবে অতবড়ো 'টেরাগোনা', তাকেও জনকতক খরগোস মিলে রসাতলে পাঠিয়েছিল, বীর আলেকজাণ্ডার তুচ্ছ একটুখানি মদের পেয়ালার কাছে পরাভূত হলেন, আর আমাদের হনুমান রাবণের লঙ্কা দগ্ধ করলেন, কাঠবেরালি সমুদ্র বাঁধলেন, এতটুকু লাঙলের ফলায় অত বড়ো যদুবংশটা ধ্বংস হয়ে গেল। ঝোপ বুঝে কোপ মারতে পারলে টুনটুনিও হাতিকে সাবড়ে দিতে পারে, আর আমরা মানুষগুলোকে নির্বংশ করতে পারব না? আর নিস্তার নেই, জগৎ-জোড়া মানব-রাজত্ব এইবার শেষ হল দেখছি। দুরন্ত মানুষ বন সব কেটে কী অত্যাচার না করছে জন্তুদের উপরে! আমাদের ঘরছাড়া করছে, জঙ্গল জ্বালিয়ে দিচ্ছে, মাঠ সব চষে ফেলছে। নিজেদের ঘর ওঠাতে, ক্ষেত বসাতে, গলিজ শহর ওঠাতে, রেলগাড়ি চালাতে, চুলো ধরাতে, গোরূপা পৃথিবী— যিনি জীবজন্তু সবার মায়ের তুল্য, তাঁরও বুকে শাবল আর কোদাল বসাতে মানুষ একটুও ইতস্তত করছে না, আর নিজের গায়ের শক্তি বাড়াবে বলে মানুষ ঘাড় মুটকে পুড়িয়ে ঝলসে

পাখি থেকে আরম্ভ করে জলের তলাকার গুগলিটা পর্যন্ত— কার মাংস যে না খাচ্ছে তা তো জানিনে। দু-হাত ডাইনে বাঁয়ে মানুষ সব জন্তুকে খুন করে চলেছে। হরিণ আর বাঘ মেরে ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে তার উপরে বসে যোগযাগ না করলে তাদের ধর্মকর্মই হয় না, জলের কুমির ডাঙার বাঘ মেরে এদের নখের ইষ্টি-কবচ ধারণ করে আর আমাদের চর্বি মালিশ করে তারা নিজেদের গায়ের বাত সারাতে চলে। চিড়িয়াখানায় আমাদের বন্ধ রেখে তারা মজা দেখে, আর জ্যান্ত অবস্থায় খাঁচায় বন্ধ থেকে যখন আমরা আধপেটা খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে মরি, তখন আমাদের ছালখানার মধ্যে খড় পুরে জাদুঘরে কাঁচের সিন্দুকে তারা নানান ভঙ্গীতে সঙের মতো আমাদের সাজিয়ে রাখে, এমনি বজ্জাত মানুষগুলো! দাও তাদের ঘাড় মটকে, খাও তাদের মাথাগুলো কড়মড়িয়ে চিবিয়ে!'

বাঘের বক্তৃতা শুনে কচি পাঁঠাগুলোর চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগল দেখে বাঘের নিজের জিভেও জল এল, বাঘের নখগুলো এতক্ষণ থাবার মধ্যে গুটিগুটি হয়ে বসে ছিল; পাঁঠার ভক্তি দেখে ধারালো সব নখ যেন সেই ছাগলছানাদের আশীর্বাদ করার জন্যে বেরিয়ে এল। বাঘ ভাবে গদগদ হয়ে ছাগলটির দিকে হাত বাড়িয়ে বলে চললেন— 'আহা বাছা কাঁদবে বই-কি, মানুষ নিজের ছেলেমেয়ের বিয়েতে তোমার মা-বাপ দুজনকেই কালীঘাটে হাঁড়িকাটে বলি দিয়ে নিজের জ্ঞাতি-ভোজন করিয়ে যথেষ্ট আমোদ পেয়েছে, ন্যাজা মুড়ো ছাল চামড়া এমন-কি ক্ষুর কখানাও তারা ফেলতে দেয়নি, এমন চেটেপুটে তারা পাঁঠার ঝোল খেয়ে গেছে যে আমি যে বাঘ— আমিও তেমনি করতে লজ্জা পাই— কী লজ্জা, কী লজ্জা! এই সসাগরা পৃথিবী তো এককালে আমাদেরই ছিল— তখন তো কোনো বালাই ছিল না— খাও দাও সুখে ঘরকন্না কর, মানুষ যেমনি এল অমনি সঙ্গে সঙ্গে এল তার বন্দুক, আর এল হঠাৎ মৃত্যু— হঠাৎ অপঘাত মৃত্যু, অপমৃত্যু, দুঃখ-শোক, ভয় ভাবনা আর যন্ত্রণা বনবাসীদের জন্যে! বন্ধুগণ, একতার ধ্বজা তোলো, ছোটো বড়ো সব ন্যাজ উঠুক

আকাশের দিকে, বলো একস্বরে — জয় জীব-জন্তু জঙ্গলম্। চুলোয় যাক মানুষের প্রতাপ!' হাম্বুর হাম্বুর করে তিনবার হাঁক দিয়ে বাঘ আসন গ্রহণ করলেন।

ঘোড়দৌড়ের মাঠ থেকে পেন্সন-পাওয়া পিঁজরাপোলের একটা বেতো ঘোড়া খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে বললে— 'ভদ্র বনচরগণ, রাজনীতি-ক্ষেত্র আমার নয়, কেননা সবুজ ক্ষেতে আর মাঠে বাজির খেলা নিয়েই আমি সারা জীবনটা প্রায় কাটিয়েছি, অতএব আমি আমার এ জীবনে মানুষের সম্পর্কে এসে কী দুঃখ পেয়েছি, সেইটুকুই কেবল বলি। একদিন ছিল যখন তাজী ঘোড়া বলে মানুষ আমাকে সোনার গামলাতে রাজার হালে দানাপানি দিয়েছে, তারপর একদিন এল যখন কেবলই অনাদর আর চাবুক আর হাড়ভাঙা খাটুনি। ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবার বংশধর আমি, আমার শিরায় শিরায় রক্তের বদলে সোমরস চলেছে— সবুজ ঘাসের, সবুজ পাত্রের কাঁচা আর টাটকা রস। কিন্তু হায়, তবুও আমি আমার মানুষ-মনিবকে ঘোড়-দৌড়ের বাজি খেলায় জুয়াচুরিতে জিতিয়ে দিতে অপারগ হলেম! মনিব হতাশ হয়ে আমাকে গোলামের মতো বাজারে নিয়ে বিক্রি করে এল! কিন্তু তখনো দুর্দশার চরম হয়নি, আমি রাজার ডাকগাড়ি টানবার ভার পেলুম। আর যাই হোক সুখ আর মান-সম্ভ্রমের হানি তখনো বড়ো-একটা হয়নি, কিন্তু যেদিন থেকে মানুষ কলের গাড়িতে ডাক এনে হাজির করলে, সেইদিন থেকে আমার অন্ন গেল, দুঃখের পর দুঃখ, দুর্দশার পর দুর্দশায় আমি মরণাপন্ন হয়ে ঠিকে-গাড়ির আস্তাবল থেকে মুনিষ্যি-পালের ময়লা-গাড়ি টানতে টানতে খোঁড়া হয়ে শেষে পিঁজরাপোলে গিয়ে পড়লেম। এখন মলেই বাঁচি, কিন্তু তার পূর্বে আমি তোমাদের সকলকে অনুরোধ করছি, তোমরা যেমন করে পার কলের গাড়ির রাস্তা বন্ধ করো আর সভা থেকে একটা গোচারণের মাঠের ব্যবস্থা করো— যাতে করে দুর্বল আমরা আর-একবার সবুজ পত্র সবুজ ঘাসের আস্বাদ পেয়ে, নবজীবন লাভ করে জেন্তু-সভাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে পক্ষিরাজ ঘোড়ারূপে

স্বর্গপথে যাত্রা করি। উচ্চৈঃশ্রবার শেষ সন্তান আমরা, বাস্তবিকই আপনাদের কৃপাপাত্র এ বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি।'

সভাপতি ষাঁড় ঘোড়ার দুঃখ-কাহিনী আর গোচারণের মাঠগুলির কথা শুনে এতই কাতর হলেন যে, দশ মিনিটের জন্যে সভার কাজ বন্ধ রাখবার জন্যে তিনি ঘণ্টা দিয়ে একবার বাইরে বিশ্রাম করতে চললেন। জলচরগণ এই সময় একবার খালে বিলে নেমে জলযোগ করে নিতে লাগল; খেচরদের মধ্যে কেউ কেউ উড়ে উড়ে একটু হাওয়া খেয়ে নিলে, আর উভচর স্থলচর, তারা— কেউ স্থলপদ্মের ডাঁটা, কেউ বা মাছের কাঁটা, কেউ মুরগির ঠ্যাং, কেউ বা তার চেয়ে মোটা হাড় দাঁতে ভেঙে চটপট ব্রেকফাস্ট করে নিতে লাগল।

দশ মিনিটের পরে আবার টুংটাং করে গলঘণ্টা বাজিয়ে ষাঁড় মাঠ থেকে এসে মাচায় ঢুকলেন, সবাই যে-যার জায়গায় বসলে, বাঘেশ্বরী রাগিণীতে রায়বাঘিনীদের জাতীয় সংগীত আরম্ভ হল:

(রাগিণী বাঘেশ্বরী)

নীলাং অম্বরাং মেঘৈর্মেদুরাং নমামি তোমারে!
ঘটা-জালিকা মেঘমালিকা বায়ুরূপিকা
হে মা ধরণী জনম-দায়িনী!
জগজন-মন-মোহিনী, পশুপতি-শিশুপালিনী ত্বম্।

(কোরাস)

ফলং জলং ফিড়িং ফড়িং
পী চক্ চক্ ফটিক জল!

মাথার উপরে আকাশ আরো নীল হয়ে উঠুক, নিশাচরদের সুখের রাত্রি নিরাপদ হয়ে থাকুক, মশার গুঞ্জন মাছির ভ্যান ভ্যান দিনেরাতে শোনা যাক, পৃথিবীর বুকে কেঁচোমাটি কুণ্ডলী পাকিয়ে রমণীর খোঁপার মতো শোভা পাক, উইঢিপির কীর্তিস্তম্ভ মেঘও ছাড়িয়ে উঠুক— সুরে এমনি সব নানা প্রার্থনা জানিয়ে চাতকপাখি গান শেষ করার পূর্বেই সবাই চেঁচিয়ে উঠল— 'বাজে বোকো না, কাজের কথা কও, কাজ, কাজ, কাজ!' গাধা বলে উঠলেন— 'ওহে

পক্ষী, ওই রাগিণীতে 'গা' আর 'ধা' দুটো সুরই তুমি একেবারে বাদ দিয়ে গেয়েছ! ওটা ভুল হল, বাগেশ্বরী ওতে ফুটলই না!'

কান্দাহারের উট প্রস্তাব করলে— 'যাতে করে মানুষ নিজের পায়ে হাঁটিতে শেখে ও হাঁটিতে শেখায় অভ্যস্ত হয় এবং ভবিষ্যতে বড়ো বড়ো জানোয়ারদিগের পৃষ্ঠে না ছওয়ার ঐতে পারে ঐরূপ একটা বন্দোবস্ত সভা ঐতে তুরন্ত যাতে করা হয়, আমি তাহার জন্য প্রস্তাব করিতেছি এবং সইভ্যগণের ও সভাপতির দৃষ্টি এবিষয় আকর্ষণ করিতেছি।'

সভাপতি ষাঁড় দেখলেন সত্যিই প্রস্তাবটা উট করেছেন মন্দ নয়, তিনি উৎসাহিত হয়ে উটকে ডেকে শুধোলেন— 'এই ভালো কাজে সভা হাত দিলে তুরস্কের পেরু এবং কাফ্রিস্তানের উটপাখি এঁরা কিছু অর্থ-সাহায্য ও সহানুভূতি করতে রাজি কি না। অস্ট্রিচ ও পেরু দুজনেই গম্ভীর মুখে চুপ রইলেন আর কান্দাহারের উট 'তোবা' বলে দুবার ঘাড় নাড়লে, হ্যাঁ-না কিছুই বোঝা গেল না। শুয়োর উঠে বললেন— 'মানুষগুলো যতদিন না বৈষ্ণব ধর্ম নেয় আর কসাইখানাগুলো বন্ধ হয়ে তাদের মধ্যে কেবল কুমড়ো বলি চলিত হয়, ততদিন জীবের দুঃখু ঘোচা শক্ত। ধর্মের নামে কেউ মারবে গোরু, কেউ শুয়োর, কেউ পাঁঠা— এ হলে জীবের রফা কোনোকালে অসম্ভব।'

বন-বরাহ ঠেস দিয়ে বলে উঠলেন— 'শুয়োর যা বললেন ঠিক বটে, কিন্তু কসাইখানার সঙ্গে আরো সব নানা জায়গায় নানা আবর্জনা মানুষেরা জীবকে দুঃখু দেবার জন্যে জড়ো করেছে, সেগুলো সম্বন্ধে কী বলেন?'

শুয়োর ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে দুবার গলা খাঁকানি দিয়ে বরাহের কথার একটা কড়া জবাব দিলেন, এমন সময় সভাপতি ষাঁড় দুজনকে থামিয়ে বললেন— 'যাক, ঘরে কে কী খায় না খায় সে নিয়ে প্রকাশ্য সভায় আপনাদের উচিত হয় না ঝগড়া করা।'

এইবার শৃগাল উঠলেন— এতক্ষণ তিনি কে কী বলে মন দিয়ে

শুনছিলেন আর নোটবইয়ে টুকছিলেন— আঙুরের লতার মাচায় ভর দিয়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে শেয়াল আরম্ভ করলেন— 'পূর্ব-পূর্ব বক্তারা যা বলে প্রস্তাব করে গেলেন, তারই সম্বন্ধে দু-চারটে কথা বলে আমি ক্ষান্ত হব, কিন্তু সেই-সব প্রস্তাব নিয়ে নাড়াচাড়া করার পূর্বে আমি উপস্থিত সভ্যগণকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। এ জীবনে আমি অনেক সভায় গিয়েছি, কিন্তু এমন একপ্রাণে একমনে ন্যাজ-নাড়া আমি কোথাও দেখিনি, দেখব না। মানুষের নিজের ন্যাজ নেই, তাই অন্যের ন্যাজ দেখলে তারা হিংসেতে জ্বলতে থাকে, মানুষ চায় সবাই তাদের মতো নির্লজ্জ ন্যাজ-কাটা হয়ে থাকুক। কাজেই ঘোড়ার ন্যাজ তারা কাটে, কুকুরের ন্যাজও; গোরুর ন্যাজ, ময়ূরের ন্যাজ কিছুই বাদ দেয় না।'

শেয়ালের কথা শুনে মুড়ো-ন্যাজ ডালকুত্তো চেঁচিয়ে উঠল— 'ঠিক বলেছ দাদা— তোমাকেও তারা ছাড়ে না!' শেয়াল সে কথায় কান না দিয়ে বলে চললেন— 'এখন কাজের কথা হোক···সিংহের প্রস্তাব-মতো খাণ্ডব বনে একটা স্বতন্ত্র পশু-রাজত্ব স্থাপন করলে মন্দ হয় না, কিন্তু এটা আমাদের ভুললে চলবে না যে, খাণ্ডব বন যুধিষ্ঠিরের আমলে যেমন ছিল এখন আর তেমন নিরাপদ নেই; প্রথমত জায়গাটা দুরন্ত গরম, সেই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মধ্যিখানে, যেখানে গরমের দিনে 'লু' চলে। ছাগল ভেড়া খরগোস এমনি সব ছোটো অথচ বড়োদের বিশেষ কাজে লাগে এমন সব জন্তুরা সেখানে টিকতেই পারবে না, এর উপর সেখানে দাবানলের ভয় আছে, প্রায়ই খাণ্ডব-দাহন হয়ে থাকে। কুকুর যে শহরে থাকারই প্রস্তাব করেছেন, সেটা আরামের দিক দিয়ে দেখতে গেলে মন্দ নয়। কিন্তু কুকুর চিরদিনই মানুষ-ঘেঁষা, এখনো খুঁজলে হয়তো তাঁর গলার কলারে একটা বেয়াড়া রকমের নাম দেখা যাবে!' কুকুর কথাটা শুনে ঘাড় চুলকোতে লাগল, হরবোলা পাখি সুর করে বললে— 'কানকাটা না হলে কি মানুষের সঙ্গে কুটুম্বিতে হয় গা?' শেয়াল বলে চলল— 'বাঘের তেজস্বী ভাষা শুনে আমারও একবার মনে হয়েছিল লেগে

যাই কোমর বেঁধে লড়ায়ে! এক হিসেবে মন্দ নয়— লড়ে বেঁচে আসতে পারলে। নয়তো কতকগুলো অনাথ অনাথা নিয়ে না-লড়ার দলকে বড়ো বিপদেই ফেলে যাওয়া হয়। ঘরে ঘরে অনাথ-ভাণ্ডারের চাঁদার খাতা গিয়ে ভদ্র জীবদের বড়োই বিপদ ঘটায়, কাজে-কাজেই বলতে হচ্ছে পুরোপুরি ভালো নয়, ওতে মন্দও মিশেল আছে, বিশেষ সত্যের জয় যে সব সময় তা নয়। শুয়োর যা বলেছেন তার মধ্যে ভালো-মন্দ দুই আছে, আর বরাহের প্রস্তাব হগসাহেবের বাজারের উন্নতির জন্যে তুলে রাখলে মন্দ হয় না। শুয়োর আর বরাহের কথায় যতই সার থাক্ না, রাজনীতি-ক্ষেত্রে সেটা কোনো উপকারে আসবে না। কাজেই সকলে দেখছেন শান্তি কিংবা যুদ্ধ, অথবা সিংহের প্রস্তাব-মতো স্বতন্ত্রতা অবলম্বন— এ তিনই জীব-সমাজের সবার পক্ষে সমান ফল দেবে না। এ কথা একবাক্যে স্বীকার করতে হবে যে, কোথাও একটা গোল আছে এবং সে গোলটা সিধে করা দরকার (সাধু, সাধু!)। আমি যে উপায় বাৎলাব সেটা সম্পূর্ণ নতুন, আর এ পর্যন্ত পশু-সমাজে তার কোনো পরীক্ষা হয় নি (শোনো শোনো! চুপ, চুপ!)— এসো, আমরা সকলে জ্ঞানলাভের জন্যে উঠে-পড়ে লাগি— কেননা জ্ঞানের আর বিজ্ঞানের পথই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পথ, জ্ঞানাৎপরোতর নহি— মানুষেই এই কথা বলেছে। কেননা আমরা মানবজাতির ইতিহাস থেকে এটা শিখে নেব, জাতীয় মহাসমিতিতে থাকবে, আর থাকবে একটা মুখপত্র যেখানে পরে-পরে আমরা নিজেদের অভাব অভিযোগগুলো জগতে বিশ্বসমাজের সামনে ধরে দিতে পারি, আমাদের আশা, উদ্যম, রীতি-নীতি, ঘরের কথা, বাইরের কথা সবই ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হয়ে সবার হাতে পড়বে।

'মানুষের মধ্যে যারা প্রাণীতত্ত্ব নিয়ে নাড়াচাড়া করে, তারা মনে করে দু-একটা মরা জানোয়ার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে আমাদের হাড়হদ্দ সবই জেনে নেবে, সেটা বড়ো ভুল। জানোয়ারের কথা এক জানোয়ারে লিখতে পারে— কিসে তাদের সুখ, কোথায় তাদের ব্যথা সে কেবল তারাই খুলে বলতে পারে, যাদের সুখ-দুঃখ-আনন্দময়

জীবনগুলো মানুষের চাপনে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে!' এইখানে আবেগে শৃগালের কণ্ঠরোধ হল, তিনি একটু আঙুরের রসে গলা ভিজিয়ে আবার শুরু করলেন—'আমাদের দুঃখ-কাহিনী আমাদেরই লিখতে হবে, সেজন্যে এখন থেকে প্রস্তুত হওয়া চাইই চাই।' শৃগাল উৎসাহের সঙ্গে আরো বলতে চলেছেন এমন সময় সভাপতি সভা ভঙ্গের ঘন্টা দিয়ে হঠাৎ মাঠের দিকে প্রস্থান করলেন—সভাপতিকে ধন্যবাদ দেবার প্রস্তাব হওয়ার আগেই অসময়ে সভা থেকে সবাইকে চলে যেতে হল, কোনো প্রস্তাবই সমর্থন, গ্রহণ কিংবা কিছুই হল না।

(ফরাসী হইতে চুরি)

হিন্দবাদের প্রথম সিন্দবাদের শেষ যাত্রা

সিন্দবাদ ছিল এক রকমের মানুষ আর হিন্দবাদ ছিল ঠিক তার উল্টো ধরনের লোক। সিন্দবাদ বারে বারে যায় সাত-সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিয়ে, রত্নগিরি, সলাবত দ্বীপ, বালাশোর বন্দর, কাফ্রিস্তান, নারকেল-নগর, চন্দন-দ্বীপ, কুমারিকা অন্তরীপ, সরন্দিপ এমনি কত দেশ-বিদেশে বাণিজ্যপোত ভেড়াতে ভেড়াতে, কোথাও আর বাকি নেই। আর হিন্দবাদ থাকে বোগদাদে বসে আর গল্প শোনে সিন্দবাদের কাছে; বক পাখির গল্প, মহীরাজের ঘোড়ার কথা, লোমশ মানুষের ইতিহাস, অজগর সাপের কাহিনী, বিষ-লতার, গোলমরিচের ক্ষেতের আরবি পাশার, জিন-লাগাম-শূন্য ঘোড়-সওয়ারের, কবরী কন্যার, ভীষণ বুড়োর, মুক্তোর ক্ষেতের, বোম্বেটে জাহাজের, হাতি শিকারের নানা অদ্ভুত অদ্ভুত খোস গল্প উল্টে পাল্টে কতবার তার ঠিক নেই; আর এক এক গল্প শোনার পরে একশো করে সোনার মোহর সিন্দবাদের কাছে দাবি করে।

সিন্দবাদ এক-একবার বাণিজ্য-যাত্রা করত, আর হিন্দবাদ গালে হাত দিয়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে ভাবত— যদি সিন্দবাদের জাহাজ হঠাৎ কোনো দ্বীপে চিরকালের মতো আটকে যায়, কিম্বা সিন্দবাদ ফিরেই না আসে, কোনো দেশের কোনো রাজকন্যাকে বিয়ে করে সেই দেশেই সংসার পেতে বসে, তা হলে উপায় কী হবে? কিন্তু সিন্দবাদের জাহাজ ডোবে, চড়ায় আটকায়, সিন্দবাদও ধরা পড়ে যায় কখনো কখনো কিছুদিনের জন্যে, আবার কিন্তু ফিরে আসে সিন্দবাদ— নতুন বাণিজ্যপোতে জাহাজ বোঝাই গল্প আর মাল-মাত্তা মাঝি-মাল্লা নিয়ে।

সিন্দবাদ প্রতিবারেই ফিরে আসে আর বলে— এই শেষ, আর যাব না। কিন্তু প্রতিবারেই সমুদ্রের নীল জল আকাশের মতো ঘন নীল হয়ে ওঠে বছরের শেষে, আর সিন্দবাদ জাহাজ সাজিয়ে

হিন্দবাদের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বাণিজ্যে আর গল্প-সংগ্রহে। ক্রমে সিন্দবাদের ফিরে আসা আর যাওয়ার শেষ নেই এই বিশ্বাসই হিন্দবাদের মনে খুব শক্ত হয়ে বসে গেল। সেই সময় একদিন হঠাৎ সিন্দবাদ চুপি চুপি কাউকে কিছু না জানিয়ে একটা ভাঙা জাহাজে একেবারে গল্পের দেশের শেষ দেখতে বেরিয়ে পড়েছে, হিন্দবাদ এর কিছুই জানে না; সে বছরের শেষে গল্প শুনতে সিন্দবাদের দরজায় এসে মোটের ঝুড়িটা নামিয়ে বসল।

তখনো রাত ফরসা হয় নি, বোগদাদের রাস্তার পাথরগুলো হিমে ঠাণ্ডা হয়ে আছে, দোকান পাট সমস্ত বন্ধ, সরু গলির শেষটাতে নীল সমুদ্রের মতো একটা অন্ধকার, আর কিছু নেই— সাড়া নেই, শব্দ নেই, আলো নেই। হিন্দবাদ সিন্দবাদের দরজায় হিম পাথরের চাতালে ঝুড়ির উপরে মাথা রেখে শুয়ে সকালের অপেক্ষায় রয়েছে— কিন্তু সকাল আর আসছে না, সিন্দবাদও দেখা দিচ্ছে না, রাতের বাতাস কেমন যেন ঠাণ্ডা বইছে।

হিন্দবাদ ছেঁড়া কাঁথাটায় সর্বাঙ্গ মুড়ি দিয়ে গলির মোড়ের দিকে চেয়ে সেই এক টুকরো নীলের গায়ে একটা জাহাজের মাস্তুল কখন দেখা দেয় তারি অপেক্ষায় চেয়ে আছে। দূরে একটা যেন জাহাজের আসার ছপ্ ছপ্ শব্দ পাচ্ছে হিন্দবাদের মনের মধ্যে। কবরী কন্যা কেবলি আজ যাতায়াত করছে। প্রকাণ্ড একটা কবর— তার ধারে এক চমৎকার সুন্দরী— কালো চুলে তার ফুলের মালা, ঠোঁটে হাসি লেগে রয়েছে, হাতের আঙুল হেনার রঙে হিঙ্গুল বর্ণ। সেই সুন্দরী কন্যে হাতছানি দিয়ে হিন্দবাদকে ডাকতেই সে তার সঙ্গে চলে গেল গলি পেরিয়ে, বোগদাদ ছাড়িয়ে কতদূর কে জানে?

হঠাৎ কন্যা বলে উঠল— এই ঘুমের দেশ, ওই যে সিন্দবাদ!

হিন্দবাদ চেয়ে দেখবার চেষ্টা করলে কিন্তু ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে গেছে, আর খুলল না।— সেলাম আলেকম্ বলে হিন্দবাদ একবার হাতটা কপাল ছোঁয়াতে চেষ্টা করলে, হাত উঠল না।

বাতাপি রাক্ষস

দণ্ডক অরণ্যের একদিকে অনেক মুনিঋষির আশ্রম ছিল। আর এক-দিকে অনেক ক্রোশ জুড়ে অনেকখানি একটা বাতাপি নেবুর বন ছিল। সেই বনে দুটো অসুর ছিল— এক ভায়ের নাম ইল্বল আর এক ভায়ের নাম বাতাপি। ইল্বল একখানি পাতার কুটিরে তপস্বী সেজে বসে থাকত।

বর্ষার শেষে সেই নেবুর বন সবুজ পাতায়, নেবুর ফুলে, বাতাপি নেবুতে ছেয়ে যেত। কত যে পাখি কত যে ভ্রমর কত যে মধুকর সেই বনে গান গাইত, ফুলে ফুলে উড়ে বসত, পাতার ফাঁকে চাক বাঁধত, তার আর ঠিকানা নাই। সেই সময় দক্ষিণ দিকে ঋষিদের আশ্রম থেকে দলে দলে ঋষিকুমার সেই বনে বাতাপি নেবু পাড়তে আসত। তারা সারাদিন সেই নেবুবনের তলায় কচি ঘাসে শুয়ে পাখিদের গান শুনত, নেবু ফুলের মালা গাঁথত, কত খেলা খেলত, তার পর সন্ধ্যার সময় আঁচল ভরে রাশি রাশি নেবু, সুগন্ধ নেবু ফুল ঘরে নিয়ে যেত। যতদিন সেই বনে নেবু থাকত ততদিন তারা প্রতিদিন আসত, নেবু পেড়ে খেত, নেবু ফুল তুলত। অসুর ইল্বল তপস্বী সেজে বসে বসে সব দেখত, কিছু বলত না। তার পর যখন সব নেবু পাড়া হয়ে গেছে, বনে আর একটি গাছেও নেবু নেই, গাছের পাখি উড়ে গেছে, ফুলের ভ্রমর চলে গেছে, শীতের হাওয়ায় সবুজ পাতা ঝরে গেছে, শিশিরে ঘাস ভিজে গেছে, সেই সময় ভণ্ড তপস্বী ইল্বলের কুটির-দুয়ারে মায়াবী সেই বাতাপি নেবুর গাছ সবুজ সবুজ পাতায় থোলো থোলো ফুলে, বড়ো বড়ো নেবুতে ছেয়ে যেত। সেই গাছে কত পাখি গান গেয়ে উঠত, কত ভ্রমর গুন্ গুন্ করে তার চারিদিকে বেড়াত। সেই সময় সেই ভণ্ড তপস্বী ইল্বল গুটি-গুটি গিয়ে আদর করে সেই ঋষিকুমারদের হাত ধরে সেই মায়া বাতাপির তলায় যেত; পাকা-পাকা বড়ো

বড়ো নেবু পেড়ে তাদের খেতে দিত, তারা মনের আনন্দে তাই খেত। হায়, তারা তো জানত না এ ঋষি ভণ্ড ঋষি, এ ফল মায়াফল। যখন সন্ধ্যা হয়ে আসত, বন আঁধার হত, বাপ-মায়ের কোলে ছোটো ছোটো সঙ্গীদের কাছে যাবার জন্য সেই ছোটো ছোটো ঋষিকুমারদের প্রাণ আকুল হত, তখন সেই রাক্ষস ইল্বল ডেকে বলত, আয় রে বাতাপি বাহিরে আয়। অমনি সেই ঋষিকুমারদের পেট চিরে বাতাপি নেবুর ভিতর থেকে মায়াবী রাক্ষস বাতাপি বাহিরে আসত। তার পর সেই দুই অসুর মনের আনন্দে সেই ঋষিকুমারদের রক্ত পান করে, তাদের সেই বনে মাটিতে পুঁতে রাখত। এক-একটি ঋষিকুমার এক একটি নেবুগাছ হয়ে থাকত।

যারা সেই-সব গাছের নেবু খেত, তারা যেমন মানুষ তেমনি থাকত, আর যারা সেই ভণ্ড তপস্বীর কথায় ভুলে সেই মায়া গাছের মায়া ফল খেত তাদেরি পেট চিরে রক্ত পান ক'রে সেই দুই রাক্ষস নেবু বনে নেবু গাছ করে রাখত। এমনি করে সেই বনে কত যে নেবু গাছ হল তার আর ঠিকানা নেই। শেষে তপোবনে আর একটিও ঋষিকুমার রইল না— সেই দুই রাক্ষস সবাইকে খেয়ে ফেললে। ইল্বল, বাতাপি দেখলে বনে আর একটিও ঋষিকুমার নাই ; তখন তারা সেই ঋষিদের খাবার পরামর্শ আঁটতে লাগল ; সারারাত দুজনের পাতার কুটিরে মিটমিটে আলোয় ফুস্‌ফুস্‌ পরামর্শ চলল। শেষে ভোরবেলা ইল্বল যেমন তপস্বী ছিল তেমনি হল। আর বাতাপি ঘোরানো শিং পাকানো রোম মোটাসোটা একটা ভেড়া হল। সেই ভেড়াকে গাছে বেঁধে ভোরবেলা ইল্বল ঋষিদের আশ্রমে চলে গেল। সেখানে গিয়ে ইল্বল ঋষিদের বললে, আজ আমার বাপ-মায়ের শ্রাদ্ধ— আপনারা সবাই আমার আশ্রমে পায়ের ধুলো দেবেন। সে ঋষিদের সঙ্গে ঠিক ঋষিদের মতো এমনি সব কথা কইলে যে ঋষিরা কিছুতে জানতে পারলেন না যে সে রাক্ষস। তাঁরা মনের আনন্দে তপোবনসুদ্ধ সব ঋষি সেই দুই অসুর ইল্বল-বাতাপির আশ্রমে

উপস্থিত হলেন। ইল্বল আদর করে ঋষিদের আশ্রমে ডেকে নিলে— নেবুর বনে, সবুজ ঘাসে, কুশাসনে তাঁদের বসতে দিলে। তারপর বাতাপি রাক্ষস গাছের তলায় ভেড়া হয়ে বাঁধা ছিল তাকে কেটে যত্ন করে রেঁধে সেই ঋষিদের খেতে দিলে। নেবু বনে ঋষিকুমারেরা নেবু গাছ হয়েছিল, এদেরি তলায় বসে ঋষিরা বাতাপি অসুরের মাংস খেতে লাগলেন। তারা পাতা নেড়ে, ডাল দুলিয়ে ঋষিদের সেই মাংস খেতে কত বারণ করলে, কিন্তু ঋষিরা কিছুই বুঝতে পারলেন না ; আনন্দ মনে সেই মায়া মাংস খেতে লাগলেন। তার পর খাওয়া শেষ হলে ঋষিরা চলে যান, এমন সময় ইল্বল ডাকলে— আয় রে, বাতাপি বাহিরে আয়! অমনি সেই রাক্ষস বাতাপি দয়ার সাগর সেই ঋষিদের পেট চিরে হাসতে হাসতে দেখা দিলে। তার পর দুই ভায়ে সেই হাজার হাজার ঋষির রক্তপান করে তাঁদের নেবু বনে নেবু গাছ করে রেখে দিলে। সে বনে আর একটি মানুষ রইল না।

সেই সুন্দর তপোবন কাঁটা বনে ভরে গেল। পোষা হরিণ বুনো হয়ে বনে চলে গেল ; ঋষিদের কুটিরে বনের জন্তুরা বাসা বাঁধলে। দুই অসুরে ঋষিদের তপোবন একেবারে শ্মশান করে দিলে। দিনে দুপুরে সে বনে আর মানুষ চলত না, যদি কেউ সে বনে যেত তবে সেই দুই রাক্ষস তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে তার রক্ত পান করে সেই নেবু বনে নেবু গাছ করে রেখে দিত। ক্রমে সেই নেবুর বন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নেবুর গাছে একেবারে মহা অরণ্য হয়ে উঠল। নেবুর পাতায়, নেবুর কাঁটায় দিক্‌বিদিক্‌ ছেয়ে ফেললে, মানুষ চলবার পথ রইল না।

তখন সেই দুই রাক্ষস বন থেকে হাতি ঘোড়া বাঘ ভালুক ধরে ধরে খেতে আরম্ভ করলে। শেষে শীতকাল গিয়ে আবার বর্ষাকাল এল ; নেবু বনের মাথা সবুজ পাতায় ভরে গেল। কচি ঘাসের উপর বড়ো বড়ো নেবু ডালপালা নিয়ে লতিয়ে পড়ল ; নেবু ফুলের গন্ধ বন আমোদ করলে। গাছের পাখি, চাকের মধুপ,

ফুলের ভ্রমর আবার দেখা দিলে। গাছে পাখি গেয়ে উঠল, ভ্রমর গুঞ্জন করে উঠল, মধুপ চাক বাঁধতে লাগল ; কিন্তু একটিও মানুষ একটিও ঋষিকুমার সে বনে দেখা দিলে না। পাকা নেবু ডাল থেকে খসে খসে পড়ে গেল। বাতাপি নেবুতে সবুজ ঘাস ছেয়ে গেল, তবু সে বনে একটি মানুষ এল না।

মানুষের আশায় নিরাশ হয়ে সেই দুই অসুর সেই নিঝুম নেবু বনে দিনরাত্রি মেঘের কড়মড় বৃষ্টির ঝর ঝর ঝড়ের হুহু শব্দ শুনতে শুনতে যেন পাগল হয়ে উঠল! পেটের জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়ল। যেদিকে চায় সেইদিকেই নেবু গাছ ; গাছের পর গাছ, যত মানুষ মেরেছে, যত ছোটো ছোটো ছেলে খেয়েছে সবাই নেবু গাছ হয়ে নেবুর পাতায়, নেবুর কাঁটায় দিক্‌বিদিক্‌ ছেয়ে ফেলেছে। এই ঘোর বনে পাতা, লতা, নেবুর কাঁটা ঠেলে মানুষ কি আসতে পারে? কার এত সাহস। সেই দুই অসুর একেবারে হতাশ হয়ে পড়ল। এমন সময় একদিন রাক্ষসদের যম মহামুনি অগস্ত্য তীর্থ করে সেই দণ্ডক অরণ্যে এসে দেখলেন সেখানে সে তপোবন নাই, সে ঋষিরাও নাই, সেই শান্তশিষ্ট ঋষিকুমার— তারাও নাই। পাতার কুটির ভেঙে পড়েছে, মাটির ঘরে ফাট ধরেছে। ধানের ক্ষেত, কুশের বন, ফুলের বাগান কাঁটা গাছে ছেয়ে ফেলেছে। তপোবন যেন শ্মশান হয়েছে। এমন তপোবন কে এমন করেছে? মহামুনি অগস্ত্য সেই কাঁটার বনে ধ্যানে বসলেন ; ঋষিদের কথা, ঋষিকুমারদের কথা, সেই দুই রাক্ষসের কথা, সব জানতে পারলেন। তখন মহামুনি অগস্ত্য এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হয়ে, লাঠি হাতে গুটি গুটি ভর সন্ধ্যাবেলা সেই বাতাপি নেবুর বনে দেখা দিলেন। বনের যত গাছ ডাল দুলিয়ে পাতা নেড়ে তাঁকে ফিরে যেতে বললে! কাঁটা-ঘেরা মোটা ডালে তাঁর পথ আগলে ধরলে। ঋষি তাদের অভয় দিলেন। তখন সেই মানুষের বন শান্ত হল, পাতা নড়া, ডাল দোলা বন্ধ হল, কাঁটা-ঘেরা নেবুর ডাল পথ ছেড়ে দিলে— ঋষি চললেন। এতদিনে সেই বনে মানুষের গন্ধ পেয়ে সেই দুই রাক্ষসের মন চঞ্চল হয়ে উঠল।

বাতাপি তখন এক ভেড়া হল, আর ইল্বল তাকে গাছে বেঁধে তপস্বী সেজে অগস্ত্য মুনির কাছে গেল। তাঁকে আদর করে ঘরে এনে কুশাসনে বসতে দিলে, হাত-পা ধুতে জল দিলে। তার পর যত্ন করে সেই মায়া ভেড়ার মায়া মাংস কলার পাতায় গাছের তলায় সেই ঋষিকে খেতে দিলে, ঋষি খেতে লাগলেন।

রাক্ষস যত দেয় ঋষি তত খান ; খাওয়া আর শেষ হয় না। শেষ যখন সব মাংস খাওয়া হল, তখন ঋষি উঠলেন। ইল্বল ডাকলে, আয় রে, বাতাপি বাহিরে আয়! কিন্তু বাতাপি আর বাহিরে এল না। ইল্বল কত ডাকাডাকি করলে তবু এল না। অগস্ত্য ঋষির পেটে আগুন জ্বলছিল, তাতেই পুড়ে ছাই হয়ে গেল। রাক্ষস ইল্বল ভাই বাতাপির শোকে পাগল হয়ে উঠল ; ভয়ংকর নিজ-মূর্তি ধরে আকাশ পাতাল হাঁ নিয়ে রাগে ফুলতে ফুলতে অগস্ত্য ঋষিকে গিলতে চলল। অগস্ত্য কি সামান্য ঋষি! এক গণ্ডূষে সাগরের জল পান করেন, রাক্ষস কাছে আসতেই তাকে ভস্ম করে ফেললেন। রাক্ষসের পা থেকে মাথা পর্যন্ত পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কতক ছাই হাওয়ায় উড়ে গেল, কতক ছাই জলে ধুয়ে গেল, এক মুঠা রইল। সেই ছাই মুঠা নিয়ে মহর্ষি অগস্ত্য সব নেবু গাছের তলায় ছড়িয়ে দিলেন। যে-সব ঋষিরা যে ঋষিকুমারেরা নেবু গাছ হয়ে ছিল তারা আবার যেমন মানুষ ছিল তেমনি মানুষ হল। আবার সেই কাঁটা-ভরা তপোবন, পাতার কুটির, মাটির ঘরে ছেয়ে গেল ; ধানের ক্ষেত সোনার ধানে ভরে গেল, ফুলের বাগানে ফুল ফুটে উঠল। ঋষিকুমারেরা মনের আনন্দে সেই নেবুর বনে নেবু পেড়ে নেবু ফুলের মালা গেঁথে মনের আনন্দে খেলে বেড়াতে লাগল ; আর রাক্ষসের ভয় রইল না।

আলোয় কালোয়

পুবের পাখি তারা বাসা বেঁধে থাকে মলয় দ্বীপে চন্দন বনে। ঝাঁক বেঁধে ওড়ে পুব আকাশে সোনার আলোয়। ধান-ক্ষেতের কচি সবুজ মেখে নিয়ে সবুজ হল তাদের ডানা, হিঙ্গুল ফলের কষ লেগে হল রাঙা তাদের ঠোঁট।

তার একটি পাখি একদিন ধরা পড়ল। সওদাগর তাকে জাহাজে করে নিয়ে গেল, উদয়াচল ঘুরে পশ্চিম সাগর পার হয়ে আজব শহরে। সেখানে সবুজ নেই— কেবল বাড়ি, কেবল বাড়ি! ইঁট, কাঠ, চুন, সুরকি, কলকারখানা, ধুঁয়া ধুলো আর কুয়াসায় দিক্‌বিদিক্ আকাশ বাতাস পর্যন্ত ঢাকা, দিনরাত্রি সমান অন্ধকার। আলো-গুলো যেন সেখানে জ্বলছে না। কুয়াসায় ভিজে কম্বলমুড়ি দিয়ে রাস্তার ধারে বসে সে জ্বরে কাঁপছে। সূর্যের রথ শহরের পাঁচিলে এসে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যায় শহর ছেড়ে। মলয় বাতাস দুয়োরের কপাট ধরে নাড়া দিয়ে দেখে কিন্তু ঘর খোলা পায় না কোনোদিন।

সবুজ পাখি সেখানে খাঁচায় রইল— কালো লোহার শক্ত খাঁচা —কলের কুলুপে চাবি-দেওয়া খাঁচা। খায় দায় পাখি, থেকে-থেকে কুলুপ নাড়া দেয়; কুলুপ নড়েচড়ে কিন্তু খোলে না। কল-ঘরের এক কোণে পাখির খাঁচা— কলের ধুঁয়া থেকে ভুষো ছিটিয়ে যায় তার গায়ে, সবুজ পাখ্‌না কালো হয় দিনে দিনে! পাখি সেখানে থাকে মনের দুঃখে, শুনতে শুনতে শেখে সব খটোমটো বুলি, যেন লোহার কলের খট্‌খটাং। তাই শুনতে লোক জড়ো হয়। সেই কলের ছাই-ভস্ম-মাখা পাখ্‌না দেখে অবাক হয়ে যায়— এ কী আশ্চর্য পাখি! নাচতে পারে, গাইতে পারে, বলতে পারে, কইতে পারে, পড়তেও পারে! পাখি সে থেকে-থেকে নিজের কথা চেঁচিয়ে বলে— 'ওরে উড়তে পারিনে রে, উড়তে পারিনে— বেঁচে আমি মরে আছি!'

থেকে-থেকে রাগ করে গা-ঝাড়া দেয়— লোকে তার মনের কথা বোঝে না, তামাসা দেখে হাসে, হাততালি দেয়। আজব শহরের মানুষ তারা কেউ বোঝে না মলয় দ্বীপের পাখির কী দুঃখ। তার দুঃখুটা বোঝে শুধু ভোরের আলো। সে কোনোদিন কুয়াসা সরিয়ে কারখানা-ঘরের কোণটিতে এসে দেখা দেয়, সবুজ পাখির গায়ে হাত বোলায়। ভয়ে-ভয়ে আসে আলো, ভয়ে-ভয়ে সরে যায়। পাখি বলে— 'যদি কোনোদিন সিন্ধু-পারে যাও হে আলো, তবে ভুলো না, মলয় দ্বীপের সবুজ ঘরে আমার খবর পৌঁছে দিয়ো ; বোলো আমি বেঁচে মরে আছি!'

আলো বলে— 'যেদিন আমি বড়ো হয়ে উঠব সেদিন নিশ্চয় নিশ্চয় তোমার কথা তোমার আপনার লোকের কাছে জানিয়ে আসব।'

শীত কাটল, পরিষ্কার হল দিনে দিনে আকাশ, আলোর তেজ বেড়েই চলল। আর সে ভয়ে-ভয়ে আসে না ; অন্ধকারের ঘরে আসে রানীর মতো চারিদিক আলো করে, কারখানার কলকব্জা ঝকঝক করতে থাকে আলো পেয়ে। পাখি আলো-মাখা ডানা কাঁপিয়ে বলে— 'আর কেন, এইবার।' আলো বলে— 'থাকো থাকো, আজ রাতের শেষে খবর পাবে!'

খাঁচার পাখি ছট্‌ফট্‌ করে— সকাল কখন হয় তারই আশায়।

সেদিন ভোরের বেলায় কলের খাঁচায় ধরা ক্লান্ত পাখি ঘুমিয়ে গেল— সেই সময় কলখানার বাঁশি ডাক দিল কুলিদের।

পাখির কাছে আলো এসে বললে চুপি চুপি— 'মলয় দ্বীপে গিয়েছিলেম, তাদের তোমার দুঃখের খবর দিলেম!'

পাখি ঘুমন্ত চোখ একটু খুলে শুধোলো— 'তারা কী বলে পাঠালে শুনি?'

আলো খাঁচার মধ্যে এগিয়ে এসে বললে— 'সবাই আহা করলে, কেবল একটি পাখি সে যেমন ছিল তেমনই রইল।'

পাখি ঘাড় তুলে বললে— 'তার পর?'

আলো তার পিঠে হাত বুলিয়ে বললে— 'তার পর সে ঝরা-পাতার মতো গাছের তলায় লুটিয়ে পড়ল ধুলোতে, আর সবাই বললে— 'আহা মরে বাঁচল রে!'

খাঁচার পাখি আর কোনো সাড়া দিলে না।

কল-ঘরের কল চলল বেজে— খট্‌খটাং!

যার পাখি সে খাঁচার কাছে এসে দেখলে— পাখি মরে গেছে, আলো তার উপর পড়ে কাঁদছে।

কারিগর ও বাজিকর

কারিগর যেখানে থেকে কারিগরি করে সে দেশে কাজ হয় আস্তে আস্তে ধীরে সুস্থে। এতটুকু বীজ যেমন হয়ে ওঠে মস্ত গাছ আস্তে আস্তে, গুটিপোকা যেমন আস্তে ধীরে হয়ে ওঠে রঙিন প্রজাপতি, সেইভাবে কাজ চলে কারিগরি-পাড়ায়। হঠাৎ কিছু হবার জো নেই সেখানে। আর বাজিকর-পাড়ায় যেখানে বাজিকর কারসাজি করে সেখানে সবই অদ্ভুত রকমের হঠাৎ হয়ে যায়। হাউয়ের পাঁকাটি ফোঁস করে আকাশে উঠে ঝর-ঝর করে তারা-বৃষ্টি করে পালায়। লাল বাতি হঠাৎ সবুজ আলো দিয়ে দপ্ করে জ্বলেই নেভে— হয়তো কোথাও কিছু নেই একটা বোমা হাওয়াতে ফাটল আর রাতের আকাশ দিনের সমস্ত জানা-অজানা পাখির কিচমিচিতে ভরে গেল।

কারিগরকে কেউ বড়ো-একটা চেনে না, কিন্তু বাজিকরের নাম ছেলে-বুড়ো রাজা-বাদশা ফকির সবার মুখেই শোনা যায়। পয়সাও করে বাজিকর যথেষ্ট আজগুবি তামাসা দেখিয়ে।

এক সময় রাজসভায় কারিগর আর বাজিকর দুজনেরই কাজ দেখাবার হুকুম হল। যেখানে যত কারিগর যত বাজিকর সবাই যে-যার গুণপনা দেখাতে হাজির আপনার আপনার দলের সর্দারকে নিয়ে। দুই দলের মধ্যে এক মাস তেরো দিন লড়াই চলেছে, কোনো দল জেতেও না হারেও না। ভূত-চতুর্দশীর দিন রাজা দিলেন ছুটি দুই সর্দারকে শেষ হার-জিতের জন্য প্রস্তুত হতে।

ভূত-চতুর্দশীর সারা রাত বাজিকরের ঘরে কারো ঘুম নেই। পঁচিশ গণ্ডা চেলা, তারা লোহাচুর করতে বসে গেল, তাই নিয়ে বাজিকর অদ্ভুত সব বাজি করলে যা কেউ কখনো দেখে নি। তার উপর গাছ-চালা নল-চালা থেকে আরম্ভ করে যা-কিছু বিষয় তার

ছিল সব একত্র করে সে একটা মস্ত সিন্দুক ভর্তি করে ভোর না-হতে রাজ-বাড়িতে গিয়ে হাজির হল, সঙ্গে পঁচিশ গণ্ডা চেলা, তারা তাল ঠুকে ডিগবাজি করে যেন সভা চমকে তুললে।

রাজা সভা করে বসে আছেন, রানীরা আড়াল থেকে উঁকি দিতে লেগেছেন। বাজি শুরু হয়, কিন্তু কারিগরের দেখা নেই। রাজা ব্যস্ত হয়ে বলেন— 'গেল কোথায় ?'

বাজিকর হেসে বলে— 'মহারাজ, সে তার একগণ্ডা চেলা নিয়ে বোধহয় রাতারাতি চম্পট দিয়েছে। অনুমতি দেন তো বাজি কাকে বলে দেখাই !'

বলেই বাজিকর একলাফে আকাশে উঠে হাওয়ার উপর তিন-চারটে পাক খেয়ে ঝুপ করে একেবারে রাজার ঠিক সিংহাসনটা বাঁচিয়ে মাটিতে সোজা এসে দাঁড়াল ! সভার চারি দিকে হাততালি আর সাধুবাদ শুরু হয়ে গেল। সেই সময় বাজিকর বিত্তের সিন্দুক খুললে। অমনি চরকি বাজির মতো বন্-বন্ করে, ছুঁচো বাজির মতো চড়-বড় করে বাজির ধুম লেগে গেল এমন যে কারুর চোখে-মুখে দেখবার বলবার অবসর রইল না। রাজা মহা খুশি হয়ে গজমোতির মালা খুলে বাজিকরকে দেন— এমন সময় কারিগর এসে হাজির হল একলা।

রাজা তাকে দেখে বললেন— 'তুমি কোথায় ছিলে, এমন বাজিটা দেখতে পেলে না !'

কারিগর একটু হেসে বললে —'এইবার তবে আমার পালা মহারাজ ?'

বাজিকর তাকে ধমকে বললে— 'তোমার পালা কি রকম ? এতক্ষণ এসে পৌঁছতে পারো নি, বেলা শেষ হয়েছে, যাও !'

রাজা বাজিকরকে থামিয়ে বললেন— 'না, তা হয় না। সময় আছে, এরই মধ্যে যা পারে ও দেখাক কারিগরি।'

একদিকে কারিগর আর-এক দিকে বাজিকর। কারিগর একটা পাখির পালক বাজিকরের হাতে দিয়ে বললে— 'এইটে ওড়াও।'

বাজিকর পালকটা নিয়ে ফুঁ দিতেই সেটা উড়ে গিয়ে সভা ছাড়িয়ে মাঠে পড়ল। সভাসুদ্ধ কারিগরকে দুয়ো দিয়ে উঠল।

তখন কারিগর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বললে— 'এইবার আমায় উড়াও তো দেখি কত বড়ো বাজিকর!'

সভাসুদ্ধ স্তব্ধ হয়ে দেখতে লাগল, কী হয়! বাজিকর ফুঁ দেয়, কারিগর হেলেও না।

খানিক পরে বাজিকর চোখ রাঙিয়ে বললে—'কই তুমিই আমায় ওড়াও তো দেখি কত বড়ো কারিগর!'

কারিগর একটু হেসে বাঁশিতে ফুঁ দিতেই একধার থেকে একটা লোহার পাখি সভার মধ্যিখানে কারিগরের চেলারা এনে হাজির করলে। কারিগর বাজিকরকে বললে— 'এগিয়ে এসো। পাখির পিঠে চড়ে পড়ো, কেমন না-ওড়ো দেখি।'

কলের পাখির বিকট চেহারা দেখে বাজিকর শুকনো মুখে রাজার দিকে চাইতে রাজা বললেন— 'আচ্ছা হয়েছে, আর পরীক্ষায় কাজ নেই, ছেড়ে দাও।'

বাজিকর তখন বললে—'সে কী মহারাজ, ও আমায় ওড়াবে কী? লোকটা আগে নিজেই উড়ুক তো দেখি কেমন পারে! আমি মনে করলে এখনি ওর পাখিসুদ্ধ ওকে পালকের মতো এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে পারি। শুধু ছেলেমানুষ বলে এতক্ষণ রেহাই দিয়েছি। আর না, দেখাচ্ছি মজা এবার!'

কারিগর হাসতে হাসতে আপনার হাতে গড়া পাখির উপর সওয়াল হল। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। পাখি রঙিন আলোয় ডানা মেলে কারিগরকে নিয়ে মাটি ছেড়ে খুব আস্তে আস্তে আকাশে উঠতে আরম্ভ করলে। রাজা সাধুবাদ দিতে যাবেন এমন সময় বাজিকর পাখিটার পেটের তলায় দাঁড়িয়ে একটা মন্তর আউরে চারটে ফুঁ দিয়ে বললে — 'দেখেন মহারাজ। এবার একেবারে উড়ল। যাঃ ফুঁঃ! আর আসিসনে, ভাগ্!'

পাখি সন্ধ্যার অন্ধকারে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। অনেকক্ষণ আর ফিরল না।

রাজা বললেন— 'এ বাজিকরটা যা বললে, তাই তো করলে!'

রাজা বাজিকরকেই বকশিশ দিলেন।

কারিগর খানিকক্ষণ পরে ফিরে এসে দেখে সভা শূন্য। কা কস্য পরিবেদনা। শুকনো মুখে অন্ধকারে শুধু তার একগণ্ডা চেলার মধ্যে মোটে একজন গালে হাত দিয়ে বসে আছে তার প্রতীক্ষায়। বাকি চেলারা বাজিকরের কাছে বিদ্যে শিখতে চলে গেছে।

বড়ো রাজা ছোটো রাজার গল্প

দুই রাজা থাকেন— বড়ো রাজা আর ছোটো রাজা। দুজনে একদিন দিক্ বিজয় করতে চললেন। বড়ো রাজা চললেন বড়ো বড়ো হাতি ঘোড়া কামান বন্দুক সাজিয়ে মস্ত মস্ত জয়ঢাক পিটিয়ে বড়ো বড়ো সেনাপতির সঙ্গে, বড়ো বড়ো রাজত্ব জয় করতে করতে। এদিকে ছোটো রাজা, তিনি চললেন ছোটোলোকের সাজে, ছোটো ছোটো খেলবার কামান বন্দুক হাতি ঘোড়া নিয়ে ছোটো একটি পুটলি বেঁধে ছোটো রাজত্ব জয় করতে— বড়ো রাজার পিছনে পিছনে।

মস্তবড়ো এই পৃথিবী— বড়ো রাজা ক্রমে ক্রমে তা জয় করে ফেললেন— এমন সময় চর এসে খবর দিলে— মহারাজ, শুনে এলুম, ছোটো রাজা ছোটো রাজ্য নিয়ে সুখে রয়েছে।

বড়ো রাজা বললেন— তাকে বলো, আমি পৃথিবীটা জয় ক'রে নিয়েছি, সে রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র যাক্।

দূত গেল ছোটো রাজার কাছে। কিন্তু ছোটো রাজার সে রাজ্য এত ছোটো যে দূত দেখতেই পেল না কোথায় বা রাজা, কোথায় বা রাজত্ব! সে ফিরে এসে বড়ো রাজাকে খবর দিলে— চক্ষুর অগোচর সে রাজত্ব; সেখানে প্রবেশ করা ভারী কঠিন!

বড়ো রাজা বড়োই খাপ্পা হয়ে বললেন— চলো আমি নিজে যাব।

বড়ো রাজা মস্ত মস্ত হাতি ঘোড়া রথ রথী নিয়ে চললেন পৃথিবী কাঁপিয়ে। কিন্তু ছোটো শহর এত ছোটো যে সেখানে হাতি চলে না, ঘোড়া চলে না, মন্ত্রীরা মন্ত্রণা দিলে— সবাই চোখে অনুবীক্ষণ লাগিয়ে যুদ্ধে চলো!

সেনাপতি বললেন— এতে করে চোখ চলবে, গোলাগুলি চলার উপায় হবে না।

রাজা বললেন— দেখাই যাক্‌-না।

যুদ্ধ বাধল— সেনাপতির পায়ের তলা দিয়ে ছোটো রাজার ফৌজ গলে পালাল। তীর কামান আন্দাজ ঠিক করতে না পেরে বাতাসে হানা দিতে থাকল, নয় তো আকাশে ঝুপ্‌ঝাপ্‌ বড়ো রাজার ছাউনির উপর পড়তে লাগল। বড়ো বড়ো অস্তর— সে-সব বড়ো জিনিসকেই লক্ষ্য করে, ছোটোকে দেখতে পায় না। বড়ো রাজা, বড়ো বড়ো মন্ত্রী, বড়ো বড়ো সেনাপতি ফাঁপরে পড়ে ছোটো রাজার সঙ্গে সন্ধি করতে চাইলেন। ছোটো রাজা হেসে বললেন— দাদা, তুমি তোমার মস্ত রাজত্ব নিয়ে সুখে থাকো। ছোটোতে বড়োতে সন্ধি হ'লে কী হয় তা জান না কি?

বড়ো রাজা বললেন— তা কি আর জানিনে?

মন্ত্রীরা বললেন— তা আর জানেন না?

সেনাপতি বললেন— এত বড়ো পৃথিবীটা জয় করে এলেন বড়ো রাজা, ওইটুকু আর জানেন না?

ছোটো রাজা বললেন— তা হলে এবারকার মতো এইটুকু জেনেই ঘরে যান সকলে। আরো কি জানতে চান?

বড়ো রাজা বড়ো রেগে বললেন— ছোটোকে টুঁটি চেপে ধরলে সে কী করে তাই জানতে চাই। বলেই বড়ো রাজা নিজের মস্ত মুঠোয় ছোটো রাজা, মায় তাঁর রাজত্বটা পর্যন্ত কষে চেপে ধরলেন। জল যেমন গলে পালায় তেমনি বড়ো রাজার মোটা মোটা আঙুলের ফাঁক বেয়ে ছোটো রাজা, মায় তাঁর রাজসিংহাসন রাজপুরী সমস্তই বেরিয়ে গেল। বড়ো রাজা হাত খুলে দেখলেন মুঠো খালি; বুড়ো আঙুলের গোড়ায় মৌমাছির হুলের মতো একটা কী বিঁধে রয়েছে। যন্ত্রণায় বড়ো রাজার আঙুলটা ফুলে কলাগাছ হয়ে উঠল দেখতে-দেখতে।

কনকলতা

সুন্দর রাজার কালো মন্ত্রী। মন্ত্রীর সাত ছেলে— তারা কালো-বান্দোর, আর এক মেয়ে— সে নিখুঁত সোন্দর। মন্ত্রী মেয়ের নাম দিলেন— কনকলতা। কালো ছেলেদের কারো নাম দিলেন— রামু, কারো সামু, কারো ধামু! যার যেমন মুখ তার তেমনি নাম— যেন সব কেলে হাঁড়ি আর কেলে হাতা।

মন্ত্রীর কোলে-কোলেই কনকলতা থাকে আর মানুষ হয়, ছেলে-গুলো পড়ে থাকে কাদায় ধুলোয় পাঁকে।

কনকলতা দিনে দিনে বাড়ে আর দাদারা তাকে ডাকে— আয় না, মাটিতে নেমে ধুলো খেলবি। কনকলতা নামতে যায়; মন্ত্রী তাকে ধরে পালঙ্কে শুইয়ে দেয়, মশারি টেনে দেয়— রুপো-সোনার মিহি জাল! সেখান থেকে দেখা যায় বাইরের খেলাধুলো কিন্তু বেরিয়ে আসা যায় না কোনোমতেই। কনকলতা খাঁচার পাখির মতো মশারির মধ্যে বসে কাঁদে আর তার দাদারা ছাড়া-পাখির মতো মশারির বাইরে বসে ডাকে— আয় আয় খেলি আয়!

এমনি করে দিন যায়। কালো হলে কী হয় মন্ত্রীর ছেলে তো বটে; সবার সুন্দর বউ এসে গেল। মেয়ে রইল আইবুড়ি গুড়িসুড়ি— সেই মশারির মধ্যে। বাড়ির ছোটো বউ সে আসে যায় কনকলতার ঘরে, বসে বসে গল্প করে— রাজপুত্তুরের গল্প। কনকলতা বলে— তাকে দেখাতে পারো? ছোটো বউ বলে পারি যদি না থাকে মশারি। কনকলতা কত ফন্দি করে— মশারি খুলতে। সোনা-রুপোর জাল ছেঁড়েও না খোলেও না।

সেকরা একদিন ছোটো বউয়ের গয়না গড়াতে এল— হাতে তার সোনাকাটা কাঁচিখানা। ছোটো বউ চুপিচুপি সেটা লুকিয়ে রাখলে।

একদিন কনকলতার ঘরের মেঝেতে ছোটো বউ একটার পর একটা পদ্মফুলের আলপনা দেয় আর হাসে। কনকলতা দেখে দেখে বলে— হাসছ কেন? ছোটো বউ বলে— আজ তোকে ঘরের বাইরে নেব। কনকলতা চোখ মুছে বলে— জাল যে ঘেরা রইল ভাই। ছোটো বউ ছোট্টো কাঁচি দেখিয়ে বলে— দেখছিস্ এই অস্তরে জাল কাটব। কনকলতা চেয়ে থাকে ছোটো বউ জাল কাটে— মশারি খুলে যায়, মেয়ে নামে ভুঁয়ে। আলপনার পদ্মে পা রেখে রেখে চলে। দুয়োর গোড়ায় এসে ভয় পায়, মশারিতে ঢুকতে যায়। ছোটো বউ তার হাত ধরে বাইরে আনে। রাজপুত্তুরের হাতে সঁপে দেয়— কনকলতাকে। পক্ষীরাজ ঘোড়া উড়ে চলে যায় মন্ত্রীর মেয়ে আর রাজার পুত্তুরকে নিয়ে রাজভবনে। সেখানে দুজনে বিয়ে হয় মালা বদল কোরে।

রাজার ঝি, রাজার বউ, তারা সব সুন্দর। কারো নাম পদ্মমুখী, কারো নাম চম্পাকলি। নতুন বউ দেখে বলে, ওমা এই বুঝি!— তোর নাম কি লা? কনকলতা চোখ মুছে বলে— কনকলতা। 'আমার মাথা'— বলে রাজার ঝি রাজার বউ তারা চলে যায়। মন্ত্রীর মেয়ে রাজপুত্তুরের গলা ধরে কাঁদে আর বলে— ওগো আমি সত্যি কনকলতা। রাজপুত্তুর হেসে বলেন— তা তো জানি, ওরা শুধুই নামে কেউ পদ্মমুখী, কেউ চম্পাকলি। আড়াল থেকে রাজার ঝি, রাজার বউ— তারা বেরিয়ে এসে বলে— আহা কনকলতাকে আমাদের মালঞ্চে পুঁতে দিলে হয় না?— আমরা ফুল পরে বাঁচি! কনকলতা ভুরু কুঁচকে বলে— পুঁতে দেখ না, ফুল ফোটে কিনা— কনকলতায়! রাজার ঝি, রাজার বউ কিনা— যেমন কথা তেমনি কাজ!

সবাই ধরাধরি করে পুকুরঘাটে কনকলতাকে পুঁতে রেখে এল দিনের বেলায়। রাজপুত্তুর নাইতে এসে দেখেন পুকুর-পাড়ে সোনার লতায় থোকা-থোকা ফুল ঝুলছে। তিনি দুটি ফুল তুলে মা-বাপকে দেন, রাজার ঝি, রাজার বউদের পাঠান; আর এক

বোঁটায় ছুটি ফুল নিয়ে যান পুজোর ঘরে। ঠাকুরের পায়ে ফুল দিতে কনকলতা সামনে এসে দাঁড়ায়। রাজপুত্তুর বলেন···তুমি! 'আমিও পুজোয় এসেছি—' ব'লে কনকলতা রাজপুত্তুরকে প্রণাম করে বলে সকল কথা!

রাজার ঝি, রাজার বউ— তারা খোঁপায় সোনার ফুল সাজিয়ে পুজো দিতে আসে— কনকলতাকে দেখে রাজপুত্তুরের পাশে। কনকলতার রূপে তাদের চোখ ক্ষয়ে যায়। বুড়ো রাজা-রানী আসেন মন্ত্রীর সঙ্গে পুজো দেখতে। রূপ দেখে রাজা-রানী অবাক্ হয়— মন্ত্রীর চোখে জল বয় থেকে থেকে!

কোণের ঘর

তার পর চলতে চলতে সে পাখি ?

পাখি আবার চলে নাকি ? কী বিশ্রী গল্প তোমার

চলে না তো পাখি করে কী শুনি

পাখি ওড়ে, পাখি বলে—

পাখি— ওড়ে আর বলে সে

যাব আজ দূরদেশে —

ভারি তো তোমার গান, সুর নেই— খালি কথা— বিশ্রী !

তোমারি বা গল্পের ছিরিটা কেমন— মাথা নেই কথা !

রাজকন্যের কথা শুনে রাজপুত্র ভারি রাগ ক'রে উঠে চলে যান ঘর ছেড়ে। রাজকন্যা সে গোঁসা-ঘরে গিয়ে খিল দিয়ে প'ড়ে থাকেন— তিন দিন, তিন রাত উপোস করেন, কিন্তু রাজপুত্র ফেরে না! শেষে সখী এসে গোঁসা ভাঙায় কন্যের— খায় দায় কন্যে আর থেকে-থেকে কাঁদে, রাজপুত্রের কথা মনে করে। ও-ধারে রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে উধাও—

কে জানে কোন্ খানে

মন তার কে টানে !

দিন গেল, রাত গেল, মাস গেল, বছর গেল ঘুরে, তার পর আরো কত দিন গেল, লাখ কথার পরে লক্ষহীরের দেশ থেকে ফকির রাজপুত্র ফিরে এলেন! এসেই রাজকন্যাকে বিয়ে— লাখ টাকা আর অর্ধেক রাজত্ব যৌতুক নিয়ে!

ছেলে হ'ল, নাতি হ'ল, পুতি হ'ল, সেইসঙ্গে সেই সেদিনের রাজপুত্র রাজকন্যা বুড়ো হয়ে সংসার করতে করতে হয়ে পড়ল— এক মস্ত দাড়িওয়ালা মহারাজা সে, আর পাকা চুলে সিঁদুর পরা মহারানী তিনি!

মহারাজা সোনার পালঙ্কে আড় হয়ে, তাকিয়া হেলান দিয়ে, নবরত্ন-মালা জপ করছন, মহারানী পুরু গদিমোড়া সুখাসনে ব'সে এক দুই তিন মেজরানী সেজরানী ছোটোরানীর সঙ্গে পান্না আর মোতী চুনি আর নীলার ঘুঁটি নিয়ে দশ পঁচিশ খেলতে আছেন, এমন সময় মহারাজার ছোটো নাতি— যেন জরীর সাজ পরা ছোটোখাটো হাতি— রাজামহাশয়ের গলা জড়িয়ে বললে, গল্প বল না, আজা ভাই!

মহারাজা দাড়ি মুচড়ে গোঁফে তা দিয়ে শুরু করলেন— সে কি আজকের কথা, তখন চাঁদটা ছিল ভারি শাদা আর সুয্যিটা ছিল ভারি লাল!

ছোটো নাতনী একটা এই সময়ে কোথা থেকে এসে গল্প শুনতে ব'সে গেল— ভারি সুন্দরী— সে রাজার গলা জড়িয়ে বললে— চাঁদ ছিল, সুয্যিও ছিল!

ছিল বই-কি! চাঁদটি ছিল ঠিক কেমন ধারা জানো!

"না" বলেই নাতনী চুপ করলে।

রাজার নাতি সে দেখতেও মোটা, বুদ্ধিতেও মোটা; বলে উঠল, আমি দেখেছি— কেমন ছিল সে চাঁদ, ঠিক আজা ভাইয়ের দাড়ির মতো শাদা— !

রাজা ঘাড় নেড়ে বললেন, হল না, রঙে মিলল, রূপকে মিলল না একেবারেই; যাও, আমি গল্প বলব না! নাতনী রাজার গলা জড়িয়ে বললে, আমি বলব। চাঁদ ছিল ঠিক যেন রানীদিদির হাসি-হাসি মুখটি! রাজা বললেন, হ'ল না হ'ল না!—

রানী সতরঞ্চের একটা ঘুঁটি কেটে বললেন, কেন ঠিক হবে না, ও তো ঠিক উপমা দিয়েছে!

রাজা বললেন, আগে বুঝি তুমি দেখতে ছিলে চাঁদের মতো! তোমার চোখ দুটো ছিল ঠিক ওই আমার পোষা হরিণটার চোখের মতো একেবারে কাজল মাখা, আর দাঁতগুলি ছিল ঠিক দাড়িমের বিচ, আর ঠোঁট দুটো দিল একেবারে তেলাকুঁচ ফল আর চুল ছিল কাকের পালকের মতো কালো মিস্ আর—

'যাও যাও' বলে মহারানী মাথায় ঘোমটা টেনে বললেন— আচ্ছা, না-হয় তোমারি মতো দেখতে ছিল চাঁদটা, মিছে বোকো না, খেলতে দাও!

ধমক খেয়ে রাজা চুপ, রাজার কোলে নাতনী পিঠে নাতি কাঠের পুতুলের মতো স্থির, কিন্তু চোখ তাদের বলছে, গল্প বলো, গল্প বলো, আজা ভাই!

রাজা বেশিক্ষণ চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না, শুরু করলেন— "তখন চাঁদ ছিল মস্ত, সুয্যি ছিল তার চেয়েও মস্ত, তালগাছ ছিল তার চেয়েও মস্ত আর রাজা রানী দুজন ছিল কিন্তু ভারি ছোট্টো, যেন পুতুল-খেলার রাজা ও রানী। একটা মস্ত আটচালা ঘরের এক কোণে ছিল তাদের একটা গোঁসাঘর, আর-এক কোণে ছিল খাজনা ঘর; আর-দুটো কোণ, তার একটায় ছিল খাঁচায় ধরা পাখি, অন্য কোণে ছিল একটি বীণা— সোনার তার বাঁধা বীণা; সে যেন সোনার তারে ঘেরা পাখি। রাজার ভাব পাখির সঙ্গে আর রানীর ভাব বীণার সঙ্গে!

রাজার পাখি রাজায় বলে — "এক দিন আমি চলব!" "বলি কোথায় চলবে?" পাখি বলে— "সে অনেক দূরে— ওই সে ও কোণে, যেখানে আর-এক পাখি ডাকাডাকি করে আমায় থেকে থেকে!"

"বলি ওই অত দূর! পাখি, তুমি চলতে পারবে কি? শক্ত মাটি বেদনা বাজবে পায়ে পায়ে চলার বেলায়।" পাখি তবু বলে চলব! বলি কত আর ঠেকাই পাখিকে!

একদিন নিরালা ঘরে যে কোণে যা সব আছে; কেবল রাজরানী দুটিতেই নেই সেখানে। কেন নেই, তা এখন আর মনে পড়ে না। হয়তো বীণা বাজাত যে রাজার মেয়েটা, সে গোঁসা-ঘরে খিল দিয়ে ছিল, হয়তো পাখি পুষেছিল যে রাজার ছেলে, সে আপনার খাজনা-ঘরে ব'সে ব'সে কেবলি গুণতে ছিল মোহর আর টাকা টাকা আর মোহর। সেই সময় পাখি খাঁচা খুলে চলতে শুরু করলে— পায়ে পায়ে পায়ে এ কোণ থেকে ও কোণ!

খাঁচায় ধরা নাচন পাখি, সে উড়তে জানে না, এ কোণ ছেড়ে ও কোণে চ'লে যায় নেচে নেচে— তার সে গোপন-পাখির নাগাল চেয়ে নাচন-পাখি বাঁধা বীণার তারে তারে পাখা বুলিয়ে সাধে— "এসো না, এসো না।"

গোপন-পাখি, সে কি আর লুকিয়ে থাকে, বুক তার নাচন-পাখির ডাক শুনে সুরে কাঁপে রী রী, তারই ঝিনিক লাগে বীণার তারে আর সেই নাচন-পাখির নাচনে।

ঠিক সেই সময় সেই কোণে খুঁট ক'রে গোঁসা-ঘরে খিল খোলে, আর এই কোণে খিট ক'রে খাজনা-ঘরের চাবি ফেরে— রাজা বার হন এক দিক থেকে, রানী বার হন আর-এক দিক দিয়ে। তখন সন্ধ্যা হব হব। সেই সময় আনিকে আমাদের আজা এক আনা পয়সায় চিরকালের মতো কিনে ফেললেন, আর আজাকে তোমাদের আনি— আর বলতে হ'ল না সতরঞ্চ খেলা ফেলে মহারানী ধা ক'রে বললেন— এক কানা কড়িতে, এটা কি একটা গল্প না কথা, মাথা আর মুণ্ডু হচ্ছে।

রানীর ঝগড়ার রকম দেখে নাতি-নাতনীরা হেসে বাঁচে না, ঠিক সেই সময় রাজার বিদূষক এসে উপস্থিত—গোলগাল নধর যেন গণেশ-ঠাকুরটি। গল্প গেল তল, বিদূষকের চেহারা দেখেই হাসির রোল উঠল। হেলতে দুলতে বিদূষক মোটা-সোটা রাজার নাতিটিকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "এ কেমন হ'ল জানেন মহারাজ, এ যেন— 'মৌক্তিকং ন গজে গজে'।"

রাজা তামাসাটা ঠিক না বুঝে বলে উঠলেন, "তোমার রহস্য রাখো, গল্পের রসভঙ্গ কোরো না বলছি।"

মহারানী ব'লে উঠলেন, "এমনি ভাঙে যা, তেমন শক্ত রকম রসকথা নাই বলতে, এতক্ষণ ধ'রে কেবল বাজে বকাই হ'ল তোমার!"

রাজা একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই বললেন, "বারে বারে বাধা দিলে গল্প কখনো চলে?"

রানী শ্লেষ ক'রে বললেন, "তোমার গল্প যতটা চলবার চলেছে, এ কোণ আর ও কোণ, তার বেশি আর চলবে না, গল্পের পা আছে না কি যে চলবে?"

"আচ্ছা, পা নেই তো চলুক উড়ে এবারে গল্প" বলেই রাজা শুরু করলেন— "ওই যে পাখি পড়েছিল না-দেখা পাখির ভালোবাসায়, ওই যে সে নাচন-পাখি চলেছিল এ কোণ থেকে ও কোণ, ওই যে বলেছিল বীণার তারে ডানার ঝাপটা দিয়ে দিয়ে— এসো না, এসো না, সেই পাখি আর সেই বীণা— তাদের কথা আর মনে পড়ল না, রাজা খুশি হলেন এক আনি রানী পেয়ে, আর আনি তিনি নাতি পেলেন, স্বর্গে দেবার কত বাতি জ্বলল, ঘরে ঘরে অন্দরে সদরে, তবে আনি খুশি হলেন কি না, তা তাঁর মুখ দেখে বোঝাই গেল না! তিনি একেবারে গম্ভীর হয়ে পড়লেন মহারানী হওয়া মাত্রেই। রাজা ভাবেন— এ কি সেই সেদিনের যাকে আনি বললে মানেই বুঝত না, বলত, কী আনবে?— সোনার ময়ূর না পান্নার গাছে যে মুক্তোর ফল খায় পাখি, তাই? এ কি সেই না আর কেউ?

আর রানী ভাবেন— এ কী আমার সেই রাজা, সাত সমুদ্র পারে যেতে যে ডরাত না, একি সেই না আর কেউ গির্দা ঠেসান দিয়ে পড়েই আছে, নড়েও না, চড়েও না?

এ খোঁজে সেই সেদিনের রাজা ও খোঁজে সেই সেদিনের রানী— পায় না! মস্ত বড়ো নতুন রাজবাড়ি। একখানি পাত্তর তার পুরোনো নয়— সব নতুন। ঝাড় লণ্ঠন গালচে তুলচে নতুন নতুন বদল হচ্চে দিনে দিনে; পুরোনোর একটি কুটোও পাওয়া যায় না সেখানে। তারই মধ্যে রাজা-রানীর চুল পাকল খুঁজে খুঁজে সেই পুরোনো দিনের রাজপুত্র আর রাজকন্যাকে! রাজপুরী ভ'রে উঠল নতুন নতুন লোকজন আত্মীয়স্বজনে; পুরোনোর স্থান হ'ল না সেখানে একটুও।

হঠাৎ একদিন রাজার কী হ'ল, আধারাতে তিনি স্বপ্নের ঘোরে বললেন— "আচ্ছা, সে ঘরটা?" রানী ভয় পেয়ে বললেন, "কোন্

ঘর কী বলছ তুমি ?" রাজা উত্তর না দিয়ে পাশ ফিরে শুলেন। রানীর সারারাত আর ঘুম এল না, কেবলই মনে হতে লাগল— সে ঘরটা!

সেই যে পুরোনো আটচালা— যার এক কোণে গোঁসাঘর, অন্য কোণে খাজনা-ঘর, সে কোণে পোষা পাখি, ও কোণে বাঁধা বীণা, সে ঘর খুঁজতে রাজা বার হলেন যুদ্ধের ঘোড়ায়। রানী চললেন চতুর্দোলে। দেশে বিদেশে খুঁজে হায়রান— কোথাও নেই সে পুরোনো ঘর। হতাশ হয়ে নতুন রাজাবাড়িতে বসেন বুড়ো রাজা-রানী! রাজা বলেন— "হায় আমার সে সোনার খাঁচা!" রানী বলেন— "আহা, আমার সে বাঁধা বীণা!" রাজপণ্ডিত— তিনি থেকে থেকে উপদেশ দেন তুজনকে 'গতস্য শোচনা নাস্তি।'

রাজা-রানী পণ্ডিতের কথায় কানই দেন না; খোঁজাখুঁজি চলে সব কাজ ছেড়ে। রাজমিস্ত্রীরা মাটি খুড়ে পুরোনো ঘরটা খোঁজে, নতুন ভিত ভেঙে দেখে— পুরোনো ঘরটার নাগাল পায় কি না। রাজমন্ত্রীর বেশি বুদ্ধি, তাই তিনি চুপি চুপি রাজমজুর খাটিয়ে একটা নতুন ঘর তুলে তাকে আবার ধুলো-কাদা দিয়ে ঠিক পুরোনো করে, চার-কোণা ঘরটাকে ভাঙা বীণ, ভাঙা খাঁচা, মরচে-ধরা তালা, উইপোকায় খাওয়া সিন্দুক দিয়ে বেশ ক'রে সাজিয়ে রাজারানীকে ভুলিয়ে দেবেন ভেবে মহাসমারোহে একদিন তুজনকে সেখানে নিয়ে উপস্থিত। কিন্তু পুরোনো করা নতুনে কাজ হবে কেন? মন্ত্রীর মন্ত্রিত্ব নিয়ে টানাটানি পড়ল।

পণ্ডিত হারল, মন্ত্রী হারল, ডাক পড়ল তখন চিত্রকরের। পাকা পোটো সে, কামরূপের মন্তর-জানা পোটো, মনের মতোকে ধরার রঙিন ঝুলি কাঁধে সে ফেরে দেশে দেশে। রাজা-রানীর তুঃখ দেখে সে বললে, "মহারাজ, মহারানী, আমার সঙ্গে চোখে কাপড় বেঁধে চলে আসুন, দেখাব সেই ঘর।" চোখ বেঁধে রাজা-রানী চলেন দিনের পর দিন— কিছুই দেখেন না। শুধু দিনই যায় এইটুকু জানেন তাঁরা। থেকে থেকে রাজা শুধোন, "ওহে চিত্রকর, আর

কত দিন ?" পোটো বলে, "দর্শন হ'ল বলে।" এই হতে হতে হঠাৎ একদিন রাজা-রানীর চোখের পর্দা খুলে যায়। তুজনেই দেখেন, সেই কতদিনের ঘরখানিতে অন্ধকারের মধ্যে চিত্রকর সে কোথায় সরে গেছে তুজনকে একলা রেখে! রাজা রানীর হাত ধরে বলেন, "আনী"; রানী রাজার গলা ধরে বলেন— "এই যে আমি।" অন্ধকারে সেই সে পাখি ডাকে— "এসো না এসো না!" বীণার তার সেই আর-এক গোপন-পাখির ডাকে রী রী করে, মনে হয় যেন— সে যে কী মনে হয়, কেউ বলতে পারে না।

সাথী

তেপান্তর মাঠ— চার দিকে ধূ-ধূ করছে, তার মাঝে একটি তাল গাছ, সে একলা বাড়ল। দূরে দূরে মাঠ-ঘেরা বন, সেখানে লতাপাতা সব গলাগলি করে আছে দেখা যায়— ঘন-নীল ছায়ার মতো। মাঠের চেয়ে বড়ো আকাশ— সেখানে তারা সব ঘেঁষাঘেঁষি ঝিলমিল করছে দেখা যায়— কেউ একা নেই। হাওয়া আসে, তার সঙ্গে আসে তার সাথী ফুলের গন্ধ। ঝড় আসে, তার সঙ্গে তার সাথী আসে আঁধি আর বৃষ্টি। মেঘ আসে, তার সঙ্গে আসে বিছ্যল্লতা অপরূপ সুন্দরী!— সাথী ছাড়া কেউ নেই। শরতের মেঘ— তাদের সাথী হয়ে চলে বলাকা— পারিজাতের হারের মতো সার বেঁধে যায় দলে দলে সাথী আর সেথো তারা!

তালগাছ কেবলি তাদের ডাকে— পাতাগুলো নেড়ে নেড়ে; কিন্তু তাকে একলা রেখে যে যার দৌড়ে পালায় খেলতে ছোটে। তেপান্তর মাঠে একলা গাছ নিশ্বাস ফেলে— বৃথা আঁকু-পাকু করে— তাদের সঙ্গে চলতে চায়— পারে না।

একদিন কোথা থেকে ছুটি বাবুই পাখি সেই তালগাছের কাছে আসা-যাওয়া করতে লাগল। পাতার উপর বসে তারা ছুটিতে মিছিমিছি কত কী বকাবকি করে। তার পর একদিন মাঠের থেকে কুটোকাটা নিয়ে তালগাছের প্রাণ যেখানে বাতাসে ঝিল্‌মিল্ করে সেইখানে চমৎকার করে তাদের সুন্দর বাসাটি বেঁধে নেয়।

তালগাছ তাদের দোলা দেয় আর মনে-মনে বলে— মিলল, সাথী মিলল!

তার পর একদিন খেলাঘর ছেড়ে ছোটো ছোটো পাখি তারা একে একে উড়ে যায়। সবুজ পাতার গাঁথা শূন্য বাসা নিয়ে তাল গাছ দোলা দেয় আর চুপ করে কী যেন ভাবে থেকে-থেকে।

ভোম্বলদাসের কৈলাস যাত্রা

সিংহির মামা ভোম্বলদাস নেহাত সেকালের জানোয়ার ; রাজকার্য চালাবার মতো বুদ্ধিও তাঁর ছিল না, গায়ের জোর যে খুব ছিল, তাও নয় ; খোস-মেজাজে সেজে-গুজে সিংহাসনে বসে আয়েস আর আমোদ-আহ্লাদ করতেই তাঁর জন্ম হয়েছিল। রাজকর্ম করবার নাম শুনলে তাঁর জ্বর আসত— লড়াই করা তো দূরের কথা। কিন্তু দেশবিদেশের সবাই তাঁকে খুব মস্ত রাজাই বলে জানত। সবাই বলত— "সিংহির মামা ভোম্বলদাস, বাঘ মেরেছে গণ্ডা দশ !"

যে ভোম্বলদাস ঘরের কোণে আরসোলা উড়লে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে যায়, সে কেমন করে দশ গণ্ডা বাঘ মারলে ? ভোম্বলদাসের একটি মস্ত গুণ ছিল ; সেটি হচ্ছে মন্ত্রী বেছে নেবার। দেখে-দেখে তিনি শেয়ালপণ্ডিতকে আপনার প্রধান মন্ত্রী করে নিয়েছিলেন ; আর তাঁরই পরামর্শে দশ গণ্ডার চেয়েও ঢের বেশি বাঘ মেরে তিনি পশুদের মধ্যে একচ্ছত্র রাজা হয়ে সুখে দিন কাটাচ্ছিলেন।

কিন্তু কপাল ! বনের যত জোরোয়ার জানোয়ার দেশের চারি দিকে সুখ-শান্তি দেখে ক্রমে বিরক্ত হয়ে উঠল। তারা কোথাও একটা লড়াই বাধিয়ে খানিক হাঁকাহাঁকি দাপাদাপি মাথা-ফাটাফাটি করতে ভোম্বলদাসকে ধরে পড়ল। ভোম্বলদাস শেয়ালের সঙ্গে যুক্তি করে বললেন— "আমার শত্রু যারা ছিল সব তো যমের বাড়ি পাঠিয়েছি ; লড়াই হবে কার সঙ্গে ?"

দুষ্টু জানোয়ার, তারা আগে হতেই সড় করে এসেছিল, তারা পিঁপড়েদের ক্ষুদে শহরের উপর চড়াও হয়ে লড়াই দেবার জন্য অনুরোধ করলে। শেয়ালপণ্ডিত বললেন— "এমন কাজ কোরো না ! তারা দেখতে ছোটো কিন্তু কামড়ালে আর রক্ষে নেই !"

সবাই হেসে শেয়ালের কথা উড়িয়ে দিলে। লড়াই বাধল। জীবনের মধ্যে ভোম্বলদাস এই এক ভুল করলেন— বুদ্ধিমানের কথা ঠেলে, গায়ের জোরের মান রাখতে গেলেন। তার ফলও ফলতে দেরি হল না! লড়াই তো যেমন হবার হল কিন্তু ক্ষুদে শহরের একটি ইটও কেউ খসাতে পারলে না। উল্টে সিংহির মামা ভোম্বলদাস বুড়ো বয়সে হাতে মুখে, নাকে-চোখে, কানে ল্যাজে, বুকে-পিঠে, পেটে এমন কামড় খেলেন যে সর্বাঙ্গ ফুলে ঢোল! না পারেন চলতে, না পারেন বলতে। খেয়ে সুখ নেই, শুয়ে সুখ নেই, কাজে মন দিতে গেলে মাথা ঘোরে; জানোয়ারদের মুল্লুকে রাজ-কার্য অচল হল। শেয়ালপণ্ডিত মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন। বাঘা-কোটাল, ভালুক-মন্ত্রী এমনি সব রাজার বড়ো বড়ো আমির ওমরা গো-বদ্যিকে ডেকে রাজার চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করতে লাগলেন, কিন্তু ঘুঁটে-ভস্ম, গোবর প্রলেপ এ-সবে কিছুই হল না। তখন বকা-ধার্মিক এসে ভোম্বলদাস মহারাজকে কৈলাস করবার ব্যবস্থা দিলেন। মহারাজও ভাগ্নে সিংহকে রাজ্যের ভার দিয়ে কিছুদিনের জন্যে কৈলাসের দিকে রওনা হতে প্রস্তুত হয়ে বললেন— "আমি তো চলৎ শক্তি-রহিত, আমাকে কেউ যদি রেখে আসে তো কৈলাসে যাওয়া ঘটে— নচেৎ উপায় নাস্তি!"

বকা-ধার্মিককে রাজার সঙ্গে যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ দেওয়া হল। কিন্তু কৈলাসে দুরন্ত শীত, তার উপর সেখানে মাছ খাওয়া নিষেধ, কাজেই বকা পিছলেন। তিনি গেলে পশুদের ধর্ম-কথা শোনায় কে? বাঘা-কোটালেরও ওই একই কথা। তিনি না থাকলে গৃহস্থের গোরু-জরু সামলায় কে? ভালুক-মন্ত্রী যেতে পারতেন, কিন্তু নতুন রাজা। সিংহকে নিয়ে রাজকার্য চালাবার জন্যে সদরে থাকা তাঁর বিশেষ দরকার। কাজেই তাঁরও যাওয়া হয় না। শেয়াল পণ্ডিতকে রাজা বললেন— "পণ্ডিত, তুমি কী বল?" পণ্ডিত কী জানি কি ভেবে বললেন— "জানোয়ারদের দেশে গায়ের জোরের চর্চাই দেখছি বেশি, বুদ্ধির চাষ কম, সুতরাং

এ রাজ্য থেকে আমি চলে গেলে কোনো কাজই আটকাবে না। গর্দভ রইলেন পাঠশালাগুলোর তদারক করতে। আমি মহারাজকে সশরীরে কৈলাসে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

রাজা খুশি হয়ে শেয়ালকে কৈলাস-যাত্রার আয়োজন করতে তখন হুকুম দিয়ে সভা ভঙ্গ করলেন।

রতা শেয়ালের কথা

শেয়াল নিজের গড়ে গিয়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আরাম করুন, এদিকে হিমে গাছতলায় পড়ে ভোম্বলদাস তপস্যা করতে থাকুন। ওদিকে হয়েছে কী, রাজার চর টিকটিকি, সে নতুন রাজা সিংহের কাছে শেয়ালের এ-সব খবর প্রকাশ করে দিয়েছে; আর অমনি সিংহ হুহুংকার ছেড়েছেন।

তখন ফাল্গুন মাস; হিমালয়ের চুড়োয় বরফ জমাট বেঁধেছে কিন্তু সুন্দরবনে বসন্তকাল নতুন দেখা দিয়েছে— ফুলে-ফলে পাখির গানে মধুর গন্ধে জলস্থল মাতিয়ে তুলে। সবুজ পাতার চাঁদোয়ার তলায় দাঁড়িয়ে সিংহ-সিংহিনী ডাক ছাড়লেন;— নিমন্ত্রণ চিঠি পেতে কারো আর দেরি হল না। জীব-জন্তু যে যেখানে ছিল সব কাজ ফেলে সভায় এসে হাজির হতে লাগল। বকা-ধার্মিক সব-আগে এসে লম্বা পায়ের ধুলো রাজা রানী ছাড়া আর সবার মাথায় বুলিয়ে দিয়ে, ঠোঁটে করে একটুখানি আঁস-জল ছিটিয়ে রাজা-রানীকে "জয় জীব— স্বস্তি স্বস্তি" বলে আশীর্বাদ করে বসলেন। হরবোলা পাখি রাজার বিদূষক, ময়না রানীর সেঙাতনী— দুজনে এসে ভাঁড়ামো জুড়ে দিলে। ভাল্লুক-মন্ত্রীর বাঘা-কোটাল, সেনাপতি গজপতি, খড়্গ-সিং বরকন্দাজ, মহিষ-মহিষী, গোরু-গাধা-ছাগল ভেড়া ছোটো-বড়ো পাত্র-মিত্র সবাই একে একে এসে জুটল।

সিংহ শেয়ালের কথা পাড়লেন— "এক যে ছিল শেয়াল তার বাপ একদিন আমার মামার বাড়ির সদর আর অন্দর দুই মহলের মাঝে একটা দেয়াল দেবার হুকুম পেয়ে রাজ মজুরের কাজ করতে এল। তার নাম ছিল রতা বা রতন। শেয়াল পণ্ডিত তখন খুবই ছোটো, রতার বউ তাকে কোলে নিয়ে চুন-সুর্কির ঝুড়ি বইতে এসেছিল। তখন তাদের অতি দৈন্য দশা।

"রতা-মিস্ত্রি তো দেয়াল তুলে দিলে। গজগীর-ক'রে গাঁথা মোটা দেয়াল। মামার সদর-অন্দরকে দুই ভাগ করে মেঘ ছাড়িয়ে উঠল। মামা তো দেখে ভারি খুশি! কিন্তু মামী সেই দেয়ালের মধ্যে অন্ধকারে পচে মরবার জোগাড়। এদিকে মামারও অন্দরে যাবার পথ বন্ধ। কি উপায় করা যায়? মামা দেওয়াল ভাঙবার হুকুম দিলেন। কিন্তু পর্বতপ্রমাণ দেয়াল, তাকে ভেঙে ফেলা তো সহজ নয়! হাতি এলেন দেয়াল ভাঙতে, কিন্তু দেয়াল যেমন তেমনিই রইল, লাভের মধ্যে হাতি দাঁত ভেঙে ফোগ্‌লা হয়ে ফিরে এলেন। ওদিকে ক্ষিদের জ্বালায় অন্দরের মধ্যে মামী এমন চীৎকার শুরু করলেন যে রাজ্যের লোকের কানে তালা ধরে গেল। ছোটো-ছোটো জানোয়ার তো ভয়েই মারা যাবার জোগাড়। রাজ্যে হুলুস্থুল!

"সবাই মামার দুর্বুদ্ধির নিন্দে করতে লাগল। পশুদের মধ্যে সদর অন্দর— বাড়ির মধ্যে বাইরে— এ-সব কোনো কালে ছিল না; হঠাৎ নতুন-রকম কেতা করতে এ কী বিপদই মামা ঘটালেন! মামা রতা-শেয়ালকে ডেকে বললেন— "তিনদিনের মধ্যে এর উপায় করো, না হলে তোমার প্রাণদণ্ড করব!" কিন্তু হায়, রতা-শেয়াল দেয়াল দিতে-দিতেই বুড়ো হয়ে গেছে! দেয়াল তুলতেই সে পাকা, দেয়াল সরানো বিদ্যেতে সে একেবারেই মজবুত ছিল না। যে দেয়াল সে একবার তুলেছে, তাকে নামানো তার সাধ্য হ'ল না। মামী মামার দেয়ালের মধ্যেই মরে রইলেন!

"অন্দরের মধ্যে মামীর চীৎকার বন্ধ হ'ল কিন্তু বাইরে থেকে মামা ভোম্বলদাস এমন হাঁক-ডাক কান্না-কাটি তম্বি-তম্বা শুরু করলেন যে রতা-শেয়াল ভয়েই মরে যায় বুঝি! আর তাকে ধরে ছাল ছাড়িয়ে মাথা গুঁড়িয়ে একটু একটু করে মারবার সুবিধে হয় না দেখে বাঘা-কোটাল ভারি দুঃখিত হয়ে রাজাকে চুপ করবার জন্য অনুরোধ করতে লাগল। সেই অবসরে রতার ছেলেটা বাপকে বুদ্ধি দিলে। কোটাল এসে রতাকে যখন ধরলে তখন দেখা গেল

রতা মরেছে আর তার বউ আর এই আমাদের রতা-শেয়ালের ব্যাটা শেয়ালপণ্ডিত মাথায় হাত দিয়ে কাঁদছে। রতাকে মেরে হাড়-গুঁড়িয়ে দেবার সুবিধে হ'ল না কিন্তু বাঘ-কোটাল রতার ল্যাজের চামরটা কেটে নিয়ে পতাকার মতো করে সেটাকে ফাঁসি-কাঠে লট্‌কে দিয়ে তবে শান্ত হল।

"ছেলের বুদ্ধি নিয়ে রতা ল্যাজটা মাত্র দিয়ে সে-যাত্রা প্রাণ নিয়ে— রাতা-রাতি কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে সরে পড়ল বটে কিন্তু ল্যাজ তুলে সে দৌড় মারতে পারলে না— এর জন্যে শেয়ালের দলে সে ভারি লজ্জা পেলে। সবাই বললে— এর চেয়ে যে মরাও ভালো ছিল! রতা-বুড়ো কাঁদতে কাঁদতে তার ছেলেকে এসে বললে— তোরই জন্যে আমার এই লাঞ্ছনা! তখন শেয়ালপণ্ডিত গম্ভীর মুখে ভাবতে বসলেন— কী করে সব শেয়ালকে জব্দ করা যায়!

"ছেলেটার অগাধ বুদ্ধি। ভাবতেই তার মাথায় একটা ফন্দি এল। সে চট্‌-করে তার বাপকে সাহেবদের নীল-কুঠিতে নিয়ে এক পোঁচ নীল রঙ মাখিয়ে কানে ফুস-ফুস করে মন্তর দিয়ে ছেড়ে দিলে।

"রতা-শেয়াল ছিল লাল, এখন সে নীল হয়ে বনে ফিরে এসে মহা হৈচৈ বাধিয়ে দিলে— রাজা-উজির মেরে বেড়াতে আরম্ভ করলে! শেয়াল বলে তাকে আর চেনাই যায় না। মামা ভোম্বল-দাস পর্যন্ত ভয়ে তাকে সিংহাসন ছেড়ে দিতে পথ পান না। কৈলাস-পর্বত থেকে পশুপতি ভোম্বলদাসের বোকামোর খবর পেয়ে এই নতুন রাজাকে রাজ্য শাসন করতে পাঠিয়েছেন— এই কথাই বনে-বনে রাষ্ট্র হয়ে গেল।

"মামা একে মামীর শোকে অস্থির, তার উপরে সিংহাসন হারিয়ে পাগলের মতো হলেন। এদিকে রতা, যে একদিন মামার চাকর ছিল, মাইনের জন্যে দু-বেলা ভাল্লুক মন্ত্রীর কাছে ধন্না দিত, মারের ভয়ে বাঘা-কোটালের বাড়ি এঁটো-কাঁটা ফেলে ত্রি-সন্ধ্যা খেটে মরত, বকা-ধার্মিকের জন্যে মাছ কুটে-কুটে হাত খইয়ে ফেলত—

সেই হল হুকুম হাকামের কর্তা! সবার যে কী দুঃখে দিন যাচ্ছে বলা যায় না, কিন্তু রাঙা রতা— সে রঙ বদ্‌লে বেশ সুখেই আছে। সবাই তার কাছে জোড়-হস্ত!

"সেই সময় রতা যদি আরো দিন-কতক নিজের বুদ্ধি না প্রকাশ করে তার পণ্ডিত ছেলেটার কথা-মতো চল্‌ত তবে কোনো গোলই হত না। কিন্তু সিংহাসন পেয়ে রতার মাথা গরম হয়ে গেল। সেইসঙ্গে যেটুকু বুদ্ধি মগজে ছিল, সেটুকুও তার গায়ের রঙের মতো বদ্‌লে বাঁকা-চোরা উল্টো-পাল্টা হয়ে রতা যা-তা করতে আরম্ভ করলে।

"সব জানোয়ারের ল্যাজ থাকবে, কেবল তারই থাকবে না— এটা তার আর সইছে না! তার পণ্ডিত ছেলের উপরই রাগটা বেশি। তারই কথাতেই তো সে ল্যাজ দিয়ে প্রাণ নিয়ে সরেছিল। এখনো সেই ল্যাজ ফাঁসি-কাঠে ঝুলছে। সেটাকে নামিয়ে এনে নিজের পিঠে যে জোড়া দেবে তারও উপায় ছেলেটা রাখেনি!— নীল গায়ে লাল ল্যাজ মেলানো শক্ত! যত দোষ হল শেয়াল-পণ্ডিতের আর সেই অপরাধে সে রাজ্যের জানোয়ারদের ল্যাজ কেটে ফেলবার হুকুম দিয়ে বসল।

"জানোয়ারের দলে সোরগোল পড়ে গেল। সিংহ বেঁকে বসলেন— কিছুতেই ল্যাজ দেব না! দেখাদেখি বাঘও গোঁ ধরলে— ল্যাজ আপ্‌সে বললে— যাক্ প্রাণ, থাক্ ল্যাজ! মোষও চোখ রাঙিয়ে বাঘের কথায় সায় দিলে। ভাল্লুকের ল্যাজ ছিল না বললেই হয়, সে বললে— রাজার হুকুম না মানলে নয়, মুশকিল! বানর তাকে দাবড়ি দিয়ে বলে উঠল— তোমার চাকরি বজায় রাখতে ল্যাজ কাটতে চাও কাটো, কিন্তু আমরা তোমায় এক-ঘরে করব, মনে থাকে যেন! ভাল্লুক ভয়ে চুপ হয়ে গেল। ভাল্লুক যখন চুপ করলেন, তখন খরগোস, কচ্ছপ, হরিণ— যাদের ল্যাজ নজরেই পড়ে না তারা আর উচ্চবাচ্যই করতে পারলে না।

"এদিকে রাজার ইস্তাহার জারি হল— পয়লা তারিখে

শেয়ালদের, দোসরা তারিখে সিংহ— বাঘ এমনি সব হোমরা-চোমরাদের, তেসরা তারিখে গোরু গাধা মোষ এদের, চৌঠো বাকি সব প্রজার ল্যাজ কাটা চাই, নচেৎ প্রাণদণ্ড!

"সব জানোয়ার ধর্মঘট করে অমন রাজার বন ছেড়ে মানুষের রাজত্বে গিয়ে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় থাকবার মতলব করেছে, এমন সময় শেয়ালপণ্ডিত নাপিত-ধূর্তর পাঠশালা থেকে নাকুর বদলে নরুন, নরুনের বদলে হাঁড়ি, হাঁড়ির বদলে ধুচুনি আর ধুচুনির বদলে বাড়ির গিন্নী কেমন করে আনতে হয়, সেই বুদ্ধি শিখে, বউ-সঙ্গে ধুচুনি মাথায় ঢোল পিটতে-পিটতে বনে এসে হাজির। সব জানোয়ার তার বুদ্ধির তারিফ করে ল্যাজ বাঁচাবার একটা উপায় করতে তাকে ধরে পড়ল।

"পণ্ডিত শুনলেন প্রথমেই শেয়ালদের ল্যাজ নামাবার হুকুম হয়েছে। তিনি খানিক গম্ভীর হয়ে থেকে বললেন— তোমরা সবাই নিশ্চিন্ত থাকো, এর উপায় আমি করব। পয়লা তারিখে সব শেয়াল আর জন্তু জানোয়ার যে যেখানে আছ ঠিক সময়ে রাজসভায় হাজির হবে ;— এদিক-ওদিক না হয়! রাজা যখন বলবেন— ল্যাজ কাটো! অমনি সবাই নিজের ল্যাজ দাঁতে চেপে ধরে সিংহাসনের দিকে মুখ ফেরাবে, আর যা করতে হয়, আমি করব। কিন্তু কথা যেন ঠিক থাকে। আর পয়লা তারিখে ছেলে-বুড়ো সব শেয়ালের এক "রা" হওয়া চাই। না হলে সব মাটি!

"সবাইকে বুদ্ধি দিয়ে শেয়ালপণ্ডিত বউ নিয়ে ঘরে যান, এদিকে ভোম্বলদাস, বাঘ-ভাল্লুক এরা আনন্দ করছে ; গাধা আর গোরু এরা ঘাড় নেড়ে বলাবলি করতে লাগল— ভাই শেয়াল-পণ্ডিতের যুক্তি তো ভালো বোধ হয় না। দাঁতে তো লেজ কামড়ে ধরলেম, সেই সময় রাজা যদি এক হুংকার ছাড়েন, তবে দাঁত কপাটি তো লেগে বসে আছে! তখন যদি ল্যাজের গোড়ায় দাঁত একটু চেপে বসে তবে ল্যাজ খসে না পড়ে যায় না! আমাদের তো ভাই ভালো বোধ হচ্ছে না। শেষে ঠকতে না হয়। ভোম্বলদাস দুজনকে ধমকে দিয়ে

বিদায় করে দিলেন। তারা দুই জনে দল ছাড়া হয়ে একজন গেল গোয়াল-ঘরে বাঁধা পড়তে, একজন গেল ধোবার বাড়ি মোট বইতে।

"পয়লা তারিখে নল বনে নীল রাজা কাটা ল্যাজে জরির ফুঁপি আর ময়ূরের পালকের এক রাখী বেঁধে গোম্‌সা মুখ করে ল্যাজ ভাসান্ দেখবার জন্য ঘাড় উঁচু করে রাঙা মাটির সিংহাসনে উঠে বসলেন। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। নদীর জলে যেন রক্তের ঢেউ খেলছে। ধারে ধারে শর বনগুলোর মধ্যে জানোয়ারেরা গুঁড়ি মেরে বসে রাজার দিকে চেয়ে রয়েছে— কখন কী হুকুম হয়! এমন সময়ে শেয়ালপণ্ডিত রাজ্যের খ্যাঁকশেয়াল নিয়ে সভায় উপস্থিত হয়ে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন। নীল রাজা এ পর্যন্ত কারো সঙ্গে কথা বলেননি, পাছে মুখ খুললে শেয়ালের রা ধরা পড়ে যায়। ইশারায় শুধোলেন— কী হল? পণ্ডিত নিজের ঝাঁটা ল্যাজ নিশেনের মতো আকাশে তুলে হেঁকে বললেন— হুয়া! অমনি চারিদিকে শেয়ালের পাল ডেকে উঠল— হুয়া হুয়া! রাজা তাদের ল্যাজের দিকে আঙুল দেখিয়ে ইশারা করলেন—কী হুয়া?— কিছুই হয়নি! কিন্তু শেয়ালপণ্ডিত কেবল বলতে লাগল— হুয়া হুয়া হুয়া উচ্চা হুয়া উচ্চাহুয়া!

"এক শেয়াল ডাকলে সব শেয়ালকেই ডাকতে হবে— এটা বিধাতার নিয়ম। ডাকবার জন্যে রতার প্রাণ আইঢাই করতে লাগল, তবু সে দু'হাতে মুখ চেপে বসে রইল দেখে শেয়ালপণ্ডিত দল-বলকে ইশারা করলেন। ঠিক সেই সময় সূর্যও অস্ত গেলেন। অন্ধকারে শেয়ালের পাল চারি দিক থেকে ডেকে উঠল— হুয়া হুয়া হোতা হুয়া হোতা হুয়া! রতার মুখ আর বন্ধ থাকল না। সে মোটা গলায় চেঁচিয়ে উঠল— ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া? না হুয়া না হুয়া!

"আরে শেয়াল!" —ব'লে ভোম্বলদাস অমনি তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে এক থাপ্পড়ে রতাকে সিংহাসন থেকে জলে ফেললেন। সেখান থেকে বাঘ তাকে মুখে করে তুলে দেখালে— নীল রঙ ধুয়ে বেরিয়েছে— ল্যাজ কাটা রতা শেয়াল, রাজ মিস্ত্রি!

"সেই অবধি শেয়ালপণ্ডিতকে মামা সভা-পণ্ডিত করে রাখলেন আর তারই বুদ্ধিতে চলতে লাগলেন। ছিল সে রাজ মজুরের ছেলে, হল, সে রাজার প্রধান মন্ত্রী। অহংকারে আর মাটিতে তার পা পড়ে না। তারপর বুদ্ধির জোরে সে কী না করলে? তার বাড়ি হল ঘর হল— মামার দৌলতে তার সব হল। এখন সেই মামাকেই সে নিজের গড়ে নিয়ে বন্ধ করবার জোগাড় করেছে— টিকটিকি এই খবর আমাকে দিয়ে গেল। কোন্‌দিন সে মামাকে সারিয়ে-সুরিয়ে ফুস্‌লে-ফাস্‌লে নিয়ে আমারই বা সিংহাসন আবার কেড়ে নিতে আসে।"

সিংহরাজের রাজ্যাভিষেক

সিংহরাজ বললেন— "কোন্‌দিন বা শেয়াল পণ্ডিত ভোম্বলদাস মামাকে নিয়ে আমারই সিংহাসন আবার কেড়ে নিতে আসে!"

ভাল্লুক ঘাড় নেড়ে বললেন— "হতে পারে।"

বাঘ ল্যাজ আপ্‌সে বললে— "এখনি এর একটা বিহিত করা চাই।"

গজপতি বললেন— "এমন কেউ নেই ঐ পাজি শেয়ালটা যাকে অপমান না করেছে।"

মোষ চোখ রাঙিয়ে বললে— "ওটা বিষম ঠক!"

ছোটো ছোটো জানোয়ার, তারা বলে উঠল— "দোহাই মহারাজ, ওর হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুন। কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ওর জ্বালায় ঘর করা দায় হয়েছে।"

সিংহ সবাইকে অভয় দিয়ে বললেন— "ভয় নেই! ওকে আমি রীতিমতো শাস্তি দেব। আসছে মাসে মামীর শ্রাদ্ধ, সেইদিনই ওকে এখানে আনাচ্ছি; তার পর বিচার করে দেখা যাবে কী করা যায়। এখন তোমাদের ওর নামে যদি কিছু নালিশ থাকে প্রকাশ করে বলতে পারো; সজারু সব লিখে নেবেন। আমি তো শেয়াল পণ্ডিতের মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দেশছাড়া করব কিন্তু তোমাদেরও আমার জন্যে কিছু তো করা চাই। মামা তো কৈলাসে গেলেই শীতে মরবেন, জানা কথা, কেবল শেয়াল পণ্ডিতই তাঁকে বুদ্ধি দিয়ে কৈলাস যেতে দিচ্ছে না। এখন মামা শুনছি তপস্যা করে নতুন শরীর পেয়েছেন। শেয়াল তাঁকে রোজ একটা করে পাঁঠার রক্ত খাইয়ে বেশ মোটাসোটা করে আবার যেদিন রাজ্যে ফিরিয়ে আনবে, সেদিন আমাকে তো সিংহাসন ছেড়ে নামতেই হবে, তোমাদেরও যে কারু ল্যাজ সে রাখবে তা বোধ হয় না! তাঁর

নামে তোমরা যে-সব নালিশ রুজু করতে চলেছ, এ খবর তাঁর কাছে পৌঁছবে। অতএব তোমাদের উচিত আজই আমাকে মামার রাজ্যে অভিষেক করা। আমার রাজ্য হলে আমি যা বিচার করব, তার উপর আর মামা এলেও কথা চলবে না— মামার বাবা এলেও নয়!"

এই বলে সিংহ হুংকার ছেড়ে চারি দিক চাইলেন; সব জানোয়ার ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে একসঙ্গে ল্যাজ তুলে জানালে—

"তাই হোক! এখনি আপনাকে অভিষেক করা হোক! বুড়ো ভোম্বলদাসকে চাইনে আমরা— সে তার পণ্ডিতের বুদ্ধিতে চলতে চায় চলুক; আমরা গায়ের জোরে সিংহকে রাজা করব— জোর যার মুলুক তার।"

সিংহরাজ মামার মালখানা খুলে রাজমুকুট, রাজদণ্ড, শ্বেতছত্র, শ্বেতচামর আনতে মন্ত্রীকে হুকুম করলেন। ছুঁচোর কাছে মাল-খানার চাবি থাকত, সে এসে নিবেদন করলে, পণ্ডিতমশাই যাবার একহপ্তা আগে বুড়ো রাজার হুকুম-নামা দেখিয়ে মালখানার চাবি তার হাত থেকে নিয়েছেন; সে চাবি তার কাছে এ পর্যন্ত ফিরে আসে নি। সিংহ এক থাপ্পড়ে ছুঁচোকে যমালয় পাঠান আর কি, এমন সময় ভাল্লুক-মন্ত্রী সিংহকে রাজা না হতেই অবিচার করে ছুঁচো-মেরে হাতে-গন্ধ করে বসতে নিষেধ করলেন।

কিন্তু মালখানার দরজা না খুললে তো কাজ-কর্ম চলে না। সিংহ হুকুম দিলেন—"ভাঙো দরজা।"

দরজা গেঁথেছিল রতা-শেয়াল! হাতি হয়েছিল ফোগলা— তিনি সে কাজে আর এগুলেন না। মোষ গেল, ষাঁড় গেল— সবাই শিং বেঁকিয়ে ফিরে এল। বুনো শূয়োর তার ছিল সোজা, ছুঁচোলো দাঁত, দরজায় ধাক্কা খেয়ে অর্ধচন্দ্রের মতো বেঁকে গেল! গণ্ডারেরও ওই দশা! এদের মধ্যে কেউ দাঁতে-করে কেউ শিঙে-করে কেউ শুঁড়ে-করে না তুলেছেন, না ভেঙেছেন এমন জিনিস নেই, কিন্তু কী গাঁথুনিই গেঁথেছিল রতা— দরজা খুলল না।

এ দিকে এই খবর যেখানে ভোম্বলদাস শেয়াল পণ্ডিতের সঙ্গে বসে শাস্ত্র-আলাপ করছেন সেখানে এসে ফেউ জানিয়ে গেল। মামা তো হেসেই অস্থির; শেয়ালকে বললেন— "ওহে পণ্ডিত, চাবিটা ভাগ্নেকে পাঠিয়ে দাও— আরো কিছু মজা হোক।"

শেয়াল বললেন—"চাবিটা মহারাজ আমি গিয়ে দিয়ে আসি। নতুন রাজা খুশি হবেন— কী বলেন ?"

ভোম্বলদাস চোখ-মটকে বললেন— "যাও, কিন্তু ভাগ্নে যখন উত্তম মধ্যম পুরস্কার হুকুম দেবেন, সে সময় ল্যাজ তুলে তাঁকে আশীর্বাদ ক'রে চটপট ফিরে আসতে ভুলো না।"

শেয়াল যদি গেল বিদায় পেয়ে তো মশা এল ভোম্বলদাসের কানের কাছে ভন্ ভন্ করতে। মশা মিহি সুরে কানের কাছে বললে —"মহারাজ !"

ছুঁচের মতো কথা বিঁধল— ভোম্বলদাসের প্রাণে। তিনি মাথা নেড়ে নিশ্বাস ফেলে বললেন— "আর মহারাজ বলে কেন সম্বোধন কর ? আমার যথাসর্বস্ব গেছে পরের হাতে !"

মশা আর একবার এগিয়ে এসে বললে— "ধন-দৌলত সকলই মজুদ। হুকুম করেন নির্ভয়ে বলতে তো বলি। ওই যে দেখেন উই ঢিবি—"

ভোম্বলদাস ল্যাজ আপ্‌সে উঠে বললেন— "উই ঢিবি কি বল ? ওটা না কৈলাস পর্বত।"

ভোম্বলদাসের হুমকি শুনে মশা তো ভয়ে কম্পমান! তার মিহি সুর আরো মিহি হয়ে গেল। সে কেবলই পিঁ পিঁ করে কী বলতে লাগল কিছুই বোঝা গেল না। ভোম্বলদাস তখন মশাকে অভয় দিয়ে বললেন— "বলে চলো।"

মশার তখন কথা ফুটল। সে যা বলল ভোম্বলদাসকে খুব ছোটো-ছোটো-করে তা শোনা মাত্রই যেন হাজার ছুঁচ ফুটল রাজার গায়ে। তিনি একবারে দন্ত কড়মড় করে চার থাবা দিয়ে নিজের গা আঁচড়াতে থাকলেন রাগে এমন যে নিজের ছাল-চামড়া

কিছু আর রইল না গায়ে। খেয়ে দেয়ে যেটুকু বা রক্ত হয়েছিল গায়ে তাও সবটা বেরিয়ে গেল একদম! খালি রইল হাড়-কখানার মধ্যে ধুক্‌পুক্‌ করতে তাঁর প্রাণটুকু!

রাজ-রক্ত মাটিতে পড়ে মাটি হয় দেখে মশার দল এসে জুটল চারিদিক থেকে। ভোম্বলদাসকে তারা ঘিরে রইল দিনরাত খুব সাবধানে। তাঁর গায়ে ফুঁড়ে ফুঁড়ে সব কড়া ওষুধ দিতে থাকল। কেউ তারা রক্ত পরীক্ষা করে দেখে— ম্যালেরিয়া হল কিনা। কেউ দেখে টাইফয়েড হল কি কালাজ্বর?

এমনি রক্ত শুষতে শুষতে যখন ভোম্বলদাসের লাল চামড়া প্রায় শাদা হয়ে এসেছে সেই সময় শেয়ালপণ্ডিত ধুচুনি মাথায় ডুগ্‌ডুগি বাজাতে বাজাতে হাজির। একেবারে রাঙা চেলি-পরা বরের সাজ কিন্তু নাকটি কাটা। ভোম্বলদাস শেয়ালের সেই চেহারা দেখামাত্রই এমন অট্টহাসি হাসলেন যে তাতেই তাঁর প্রাণ বেরিয়ে গেল! ভাগ্‌নের খবর, সুন্দরবনের কথা শুধোবার কিম্বা ভাঁড়ার-ঘরের চাবি ফিরে চাইবার আর সময়ই হল না।

শেয়ালপণ্ডিত খানিক হতভম্ব হয়ে চেয়ে থেকে একটা নটে গাছের গোড়ায় রাজ-ভাণ্ডারের চাবিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজের গর্তে ঘুমতে গেল; আর একটা ছাগল— ঠিক তেমনি ছাগল, যাদের পাঁটার জুস্‌ খেয়ে ভোম্বলদাস নিজের গায়ের রক্ত করেছিল— সে কোথা থেকে এসে বনের ধারে—নটে গাছটার গোড়াসুদ্ধ মুড়িয়ে খেয়ে দিব্যি আরামে কৈলাস-পর্বতের মতো প্রকাণ্ড উই ঢিবির চূড়োয় তিন লাফে গিয়ে উঠল—

ঠিক দুক্কুর বেলা,
যখন ভূতে মারে ঢেলা।

সেখান থেকে সে শুনলে সুন্দর-বনে নতুন রাজার অভিষেকের দিনে জোড়া পাঁটা গর্দান দেবার আগে তাকে ডাকাডাকি করছে ম্যা ম্যা ব'লে!

দেয়ালা

এক যে ছিল গাছ তার ছিল এক ছাওয়া ; এক যে ছিল মাঠ তার ছিল এক গাছ ; আর এক ছিল যে কুঁড়ে তার ছিল একটা ঝাঁপ— সেটা কখনো খুলত কখনো বন্ধ হত। ঝাঁপ যখন বন্ধ হত তখন ঘরটা কিছুই দেখত না, অন্ধকারে পিদুম জ্বালিয়ে কুঁড়ে নিজের ভিতরটার দিকে চেয়ে চুপ করে বসে থাকতো— পিদুমের আলো ঝিমোতো, ঘরের জিনিস-পত্র ঝিমোতো, ঘরের মধ্যে যে কুঁড়ে মানুষগুলো তারাও ঝিমোত, কিন্তু ঝাঁপ খুললে আর রক্ষে নেই— পিদুমের আলো পিলসুজ ছেড়ে দৌড় দিত— সেই সে মাঠে যেখানে গাছে আর গাছের ছাওয়াতে কথা চলা-চলি করছে। ছাওয়া শুধোচ্ছে গাছকে— ভাই, কী দেখছিস ?

ছোটো গাছ সে এদিকে-ওদিকে চায়, চোখের পাত মেলে আর বলে, মাঠ দেখছি !

মাঠের পরে কী ভাই ?

মাঠের পরে একটা তালগাছ দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে।

তার পর ?—

গাছটা হঠাৎ চুপ করে আর থির হয়ে চেয়ে থাকে ! গাছের ছাওয়া সেও চুপ্ চুপ্ গল্প শোনবার জন্যে সটান শুয়ে থাকে মাটিতে।

ধূ ধূ মাঠের ধুলো মাটি, খোয়াই-জোড়া রাঙা মাটি, বাঁধের ধারের পোড়া মাটি— তারা তো চেনে না ছোটো গাছ আর তার এতটুকু ছাওয়াকে, তারা চলে যায় সেই যে তালগাছ আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে তার কাছে, আর বলে— দেখলে কিছু ?

তালগাছ দাঁড়িয়েই থাকে— হেলে না, দোলে না, বলে না কিছু। তেপান্তর মাঠ স্তব্ধ হয়ে ভাবে— এত উঁচু থেকেও দেখা যায় না ? অবাক হয়ে মাঠ চেয়ে থাকে— খুব উঁচুতে যে নীল আকাশ তারই

পানে, আর মনে মনে বলে— আকাশকে কেমন করে শুধোই ওখান থেকে ও কী দেখতে পাচ্ছে? মাটি শুধোতে পারে না আকাশকে, সে কী দেখছে? আকাশ বলতে পারে না মাটিকে সে যা দেখছে! এইভাবে এ ওর দিকে চেয়েই আছে, দুপুর বেলা সবাই সবার দিকে দেখছে কিন্তু কেউ কিছু বলে না, কয় না!

চুপচাপ থেকে-থেকে গাছের চোখের পাতা ঝিমিয়ে এল, গাছের সাথী ছাওয়া মাটিতে নেতিয়ে পড়ে, ঘুমের ঘোরে দেয়ালা করে বলে উঠল— মাঠের পরে তালগাছ পাহারা দিচ্ছে, তার পর?

ছোটো গাছ হঠাৎ চট্‌কা ভেঙে জেগে উঠে বললে— তালগাছটার মাথার উপরে একটা পাখি উড়ছে, যেন ঘুরে ঘুরে কী খুঁজে চলেছে!

গাছের ছাওয়া ছোট্টো একটা নুড়ির উপরে দাঁড়িয়ে বললে— আমি দেখব।

বাতাস এতক্ষণ চুপ করে ছিল, বলে উঠল— ইস্‌স্‌! ছোটো গাছ হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল।

মাঠের শেষে পাহারা দিচ্ছিল যে উঁচু গাছ সে এইবার মাথা নেড়ে বললে— দেখবেই তো, দেখবেই তো! লজ্জায় ছোটো গাছের ছাওয়া মাথা হেঁট করে মাটিতে মিলিয়ে গেল।

সন্ধ্যার আকাশের কোলে দেয়ালা দিচ্ছিল একখানি মেঘ, একবার সে রঙিন আলোয় রাঙা হয়ে উঠেই আবার ঘুমিয়ে পড়ল— নীল আকাশের আঁচলের আড়ালে। এমন সময় গাছ বলে উঠল— ছাওয়া! সাড়া নেই! গাছ ফিরে-ফিরে দেখে— ছাওয়া পালিয়েছে। গাছ মাটিকে বললে— ছাওয়া গেল কোথা?

মাঠ বললে— এই তো ছিল, গেল কোথায়?

তালগাছ বললে— ছাওয়ার মতো কে যেন ওই পুব মুখে রোদে পুড়তে পুড়তে চলে গেল আমি দেখেছি।

আকাশ বললে— শুধোই তো রোদকে ছাওয়া যায় কোন্‌-খানে?

সেই তালগাছের ওপারে যে তেপান্তর মাঠ, তার ওপারে যে নদী, তারও ওপারে যাকে ঝাপসা দেখা যাচ্ছে, তার কোণে যে রোদ সে দেয়ালা দিয়ে হেসে বললে— বলব না।

তার পরেই আলোর চোখ ঢুলে পড়ল। সবাই এমন-কি গাছের পাতা, ফুল, পাখি, ঘাটে মাঠে হাটে যে যেখানে ছিল বলে উঠল, কোথায় গেল সে? কোন্ দেশে? গাছ আর মাঠ আর আকাশ আর বাতাসের মন ছোটো ছাওয়াকে খুঁজে যখন কোথাও পেলে না তখন তারা মুখ আঁধার করে ভাবতে লাগল— গেল কোথায়, এই ছিল? তার পর সবাই ঘুমিয়ে গেল ঘরে বাইরে; শুধু তারাগুলো থেকে-থেকে দেয়ালা করে চায় আর ভাবে গেল কোথায়?

গাছ ঘুমোয়, গাছের পাতা ঘুমোয়, মাঠ-ঘাট ঘুমোয়, মেঝেয় পড়ে কুঁড়ে মানুষ ঘুমোয়— সবাই স্বপন দেখে ছাওয়া তাদের বড়ো হয়েছে! সেই যে এতটুকখানি ছাওয়া— যে মাঠের শেষ দেখতে চাইত, পাখিদের সঙ্গে পাখি হয়ে উড়ে পালাতে চাইত আকাশের শেষে— সে এখন সেই-সব তেপান্তর মাঠের চেয়ে সেই নীল আকাশের চেয়ে বড়ো হয়ে গেছে! ভয়ে গাছ-পালা মাঠ-ঘাটের গা ঝিম্-ঝিম্ করতে থাকে আর একবার চমকে উঠে তারা স্বপন দেখে, দেয়ালা করে, হাসে, কাঁদে, চায় আর ঘুমোয়। অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে সাঁৎরে চলে একটার পর একটা বাদুর ছাওয়াকে খুঁজতে-খুঁজতে দূর-দূর দেশে! সেই সময় চুপি-চুপি আলো আসে— একটুখানি চাঁদের আলো— বাতাসের গায়ে আলো পড়ে, গাছের শিয়রে আলো পড়ে, ঘুমের ঘোরে সবাই বলে— ছাওয়া? ঘুম-ভাঙানো পাখি ডেকে বলে— ওই যে আলো, ওই যে ছাওয়া! চমকে উঠে গাছ দেখে ছাওয়া!

ছাওয়া বলে— তার পর?

গাছ বলে— ধূ ধূ করছে মাঠ তার মাঝে একটি গাছ পাহারা দিচ্ছে— চুপ করে দাঁড়িয়ে।

ছাওয়া বলে— দেখ-না ভাই ভালো করে তার পরে কী?

গাছ বলে— সেই একটি গাছ তার পরে রয়েছে আলো, না আলো তো নয়, একটা আলো মাখা মেঘ!

ছায়া বলে— সে আবার কী?

গাছ বলে— তা জানিনে ভাই কিন্তু কালো ঠিক তোর মতো ঠাণ্ডা রঙ তার। হঠাৎ ছাওয়ার উপর দু-ফোঁটা জল পড়ে—।

ছাওয়া বলে— ওকি কাঁদছিস্ কেন?

গাছ মাথা দুলিয়ে বলে— কাঁদব কেন?

ছাওয়া বলে— এই দেখ-না জল।

কুঁড়ে তার ঘরের ঝাঁপখানা ঝুপ করে বন্ধ করে দিয়ে বলে— বিষ্টি রে বিষ্টি।

টিপির টিপির জল ঝরে, আকাশ ঝিলিক্ দিয়ে থেকে-থেকে দেয়ালা করে, বাতাস করে সারারাত এপাশ-ওপাশ, তার পর রাত কাটে, সকাল হয়, আকাশ জেগে ওঠে, আলো জেগে ওঠে, গাছপালা জেগে ওঠে, পাখি জেগে ওঠে, সেইসঙ্গে তাদের ছাওয়ারাও জেগে ওঠে।

ছোটো গাছের ছাওয়া বলে গাছকে— আজ কী খবর?

গাছ বলে— আজ দেখছি কী জিনিস?

ছাওয়া বলে— কি?

গাছ বলে— সেই আমাদের পাতায় ঢাকা কুঁড়ি আজ ফুটেছে।

ছাওয়া বলে— তার পর?

গাছ বলে—প্রজাপতি তাকে দেখতে এল সোনার ডানা মেলে।

ছায়া বলে— তারপর— ?

গাছ বলে— রোদ পড়ল তার গায়ে, বাতাস তাকে দুলিয়ে গেল।

ছায়া বলে— ওকে আমায় দে।

গাছ বলে— এই নে দেখ্, কেমন সুন্দর ফুল।

ফুলকে বুকে নিয়ে ছাওয়া বলে— ফুল! ফুল কথা কয় না।

ছাওয়া গাছকে বলে— ফুল কথা কয় না যে?

গাছ বলে — ঘুমিয়ে আছে, জাগাস্‌নি। ফুল ঘুমিয়ে থাকে ছাওয়ার বুকে, ছাওয়া নড়ে চড়ে ফুলকে দেখে। গাছ নড়ে চড়ে শুধোয়— কী করছে?

ছাওয়া বলে— ঘুমোচ্ছে। এক-এক সময় বাতাস এসে ফুলকে ছুঁয়ে যায়, ছাওয়া বলে— দেয়ালা করছে আমাদের ফুল। কুঁড়ের ঝাঁপ খুলে দেখে মানুষ গাছের তলায় ঝরা ফুল, তার গায়ে ছাওয়া হাত বোলাচ্ছে। কুঁড়ে মানুষের ছেলেটা বেরিয়ে আসে, ফুল তোলে, বেড়ায় গাছে গাছে।

গাছ বলে— কী করবি ফুল নিয়ে?

ছেলে বলে— খেলা করব। ফুল তুলে ছেলে চলে যায়। মেয়ে আসে, সে এতটুকু— গাছে হাত পায় না, ছাওয়ায় ছাওয়ায় ফুল কুড়িয়ে বেড়ায়।

ছাওয়া বলে— কী করবি ফুল নিয়ে?

মেয়ে বলে — ওকে মালায় গেঁথে ধরে রাখব।

ছাওয়া বলে— তার পর খেলা হলে ফিরিয়ে দিবি তো?

মেয়ে 'দোব না' বলে ফুল আঁচলে তুলে নেয়।

ছাওয়া তার পা জড়িয়ে বলে— 'নিয়ে যেয়ো না।'

গাছ বলে—যাক-না নিয়ে, কাল সকালে দেখবি তোর ফুল পালিয়ে এসেছে তোর বুকে। দিন কাটে, রাত কাটে, ফুলের স্বপন দেখে গাছ আর গাছের ছাওয়া দুজনে মিলে; সকালে কুঁড়ি ফোটে গাছে, ফুল ফেরে ছাওয়ার কোলে।

মহামাস তৈল

সায়দা-বাদের ময়দা
কাশিম-বাজারের ঘি
একটু বিলম্ব কর লুচি ভেজে দি ?

কিন্তু তর সইল না। ন-পাড়ার মধু খাতাঞ্চির ডানপিটে ছেলেটা রাস্তায় খেলতে খেলতে আদুল গায়ে খালি পায়ে গোরা ফৌজের সঙ্গ নিয়ে সরাসর পাটনায় গিয়ে হাজির। তখন নানা সাহেবের সঙ্গে লড়াই চলেছে ; সেই মরশুমে চাকরি পেয়ে গেল মধু খাতাঞ্চির কালো ছেলেটা— কাপ্তান সাহেবের বুট পালিশের চাকরি, তার সঙ্গে ঘোড়া মলা, চিঠি বওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি অনেকগুলো কাজ যা করতে দু-এক গৎ ইংরিজি শেখা ছাড়া উপায় ছিল না রামধনের। লড়াই যখন শেষ হয়েছে তখন রামধন এতটা ইংরিজি শিখেছে যে সত্যি মিথ্যেয় মিলিয়ে একটা চটি বই লিখেছে— নানা সাহেবের যুদ্ধের ইতিহাস। সেই ইতিহাস সে একদিন সুযোগ বুঝে কাপ্তান সাহেবের খানার টেবিলে ছোটো হাজরীর সঙ্গে পরিবেশন করে বসল। কাপ্তেনের মেম সেটা পড়ে এত খুশি হলেন যে তৎক্ষণাৎ রামধনকে তিনি সাহেবের একজোড়া পুরোনো বুট মায় সিকি বোতল বুটের কালি উপহার দিলেন এবং সাহেবকে বলে কয়ে এক সুট পুরোনো কাপড়ও দেওয়ালেন তাকে।

লড়াই-শেষে রামধন সাহেব সেজে এসে হাজির। বইখানাও তার ছিল ছিরামপুর হতে ছাপা আঠারো শত উনপঞ্চাশ খৃঃ অব্দে পয়লা এপ্রিলে !

হোলদারি বুট আর মাথামুণ্ড নানার কাহিনী— এরি জোরে রামধন হয়ে উঠল দেশের একজন কেষ্টবিষ্টু। তার দপদপার চোটে গাঁয়ের লোক শশব্যস্ত হয়ে তার নামে একটা ছড়া রচনা করে

ফেললে, রচয়িতা কে তার ঠিকানা নেই, কিন্তু নাম হল কবিরাজ মশায়ের—

রামা এলেন গাঁয়ে
বুট্ জুতুয়া পায়ে,
ওরে কে বলিবে কালো
পাটনা থেকে হলুদ মেখে
গা হয়েছে আলো!

খড়ের চালে আগুন যেমন, তেমনি এই গীতটা দেখতে দেখতে ন-পাড়া এবং সারা তল্লাট্টায় ছড়িয়ে পড়ল। ছেলেদের আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না; তারা এ ওর মুখ থেকে লুফে নিয়ে গানটার ধ্বলোট শুরু করে দিলে দু-বেলা পথে ঘাটে এবং বিশেষ করে খাতাঞ্চি সাহেবের কোটা বাড়ির সামনেটাতে!

একটা ভাঙা দোনলা বন্দুক নিয়ে রামা মাঝে মাঝে তাড়া করলে ছেলেদের। তার পর সে পাড়া ছাড়বার আয়োজন করলে, কিন্তু যাবার আগে কবিরাজ মশায়কে একটু শিক্ষা দেবার কুমতলব তার মাথায় এল!

ঈশ্বরগুপ্তের সংবাদপত্র প্রভাকর তখন দেশের সবাই পড়ে। একদিন সকালে কবিরাজ মশায় তামুক ধরিয়ে বাবুদের বৈঠকখানায় বসে গালগল্প করছেন এমন সময় কর্তা এসে বললেন— কবিরাজ মশায় দেখেছেন কাগজে আপনার নামে কী বেরিয়েছে!

কী কী!— বলে কবিরাজ কাগজটা টেনে নিয়ে দেখেন বড়ো বড়ো করে ছাপা— রামা খাতাঞ্চি প্রশংসাপত্র দিচ্ছেন ন-পাড়ার শ্যামনাথ কবিরাজকে যথা:— "ন-পাড়ার কবিরাজ মশায়ের প্রস্তুত মাসতৈল আমি পাটনা হইতে ফিরিয়া পর্যন্ত ব্যবহার করিতেছি। ইহাতে হোল্‌দারি বুট সুন্দর পালিশ হয়, বিশেষতঃ বাত রোগীর জুতা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বাঁকিয়া চুরিয়া গেলে এই তৈল বাঁকাকে সোজা করার পক্ষে বিশেষ কাজে আসে, ইহা আমি পরীক্ষা করিয়া বলিতেছি।"

কবিরাজ ছিলেন বিষম গম্ভীর লোক— রাগলেন কিনা বোঝা গেল না ; কিন্তু তিনি কর্তাবাবুর অনেক পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও প্রভাকরের নামে কিছুতেই মানহানির মকদ্দমা আনতে রাজি না হয়ে গুম্ হয়ে খানিক বসে থেকে বৈঠকখানা ছেড়ে উঠে সোজা বাড়ির দিকে চলে গেলেন দেখা গেল।

যেমন রামধনের গীত তেমনি প্রভাকরের খবরটাও দেখতে দেখতে আগুনের মতো পাড়ায় পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ল। পাড়ার ছেলেরা কোমর বেঁধে কবিরাজ মশায়কে এসে বললে— বলেন তো রামাকে শিক্ষা দিয়ে আসি, আপনার সঙ্গে লাগে এত বড়ো সাহস তার !

কবিরাজ হেসে বললেন— তোরা সব ঘরে যা, এখন ডাক্তারি মালিশের দিন এল, মাস তৈল তো কেউ আর নেবে না, বুট পালিশে যদি লাগে তেলটা লাভ তো কম হবে না বরং বাড়বেই দাম, যা তোরা পাঠশালে যা।

এই ঘটনার পর থেকে তিন রাত্রি যেতেই শোনা গেল রামধন তার বুট পরে দাওয়া থেকে উঠোনে নামতে পা পিছলে পড়ে একেবারে খোঁড়া হয়ে শয্যাগত, উত্থানশক্তি রহিত, বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেছে।

ছেলের দল হোর্‌রা দিয়ে কবিরাজ মশায়কে এই খবরটা দিতে এসে দেখলে কবিরাজ বাড়িতে নেই, দরজায় এই বিজ্ঞাপন আঁটা বড়ো বড়ো করে হাতের লেখায় — "মাস তৈলের অপব্যবহারে বাতও সারে না হাড়ও ভাঙে এইটুকুই জানিয়া আমি কাশীযাত্রা করিলাম, অপব্যবহারীর গঙ্গাযাত্রার ভার বালকদের উপরে রহিল।"

বাবুই পাখির ওড়ন-বৃত্তান্ত

(নানান দেশের সামাজিক গঠন সম্বন্ধে আলোচনা)

তালচড়াইগুলোই বাবু খেতাব পেয়ে হয়েছে বাবুই পাখি। অন্য যে-সব চড়াই পাখি ঘরে ঘরে শহরে দেখা যায় তাদের কেউ বাবুই বলে না। এই ভুলটা যে ঘটেছে তার জন্যে মানুষগুলোই দায়ী। বাবুই হচ্ছে তারা দেখতে যার চড়াই কিন্তু আসলে শহর-ঘেঁষা এক জাতিরই পাখি ; আর যেগুলোকে মানুষে বাবুই বলছে সেইগুলোই হল আসলে চড়াই পাখি। চড়া শক্ত এমন তালগাছের মট্‌কায় তারা থাকে বলেই তাদের তালচড়াই বলা হয়, এ পক্ষীতত্ত্বটা সবাই জানে না বলেই গোল করে। মানুষে যাই বলুক কিংবা খেতাবের ওলট-পালটের দরুন পাড়াগেঁয়ে চড়াইগুলো আপনাদের বাবুই ভাবুন আর যাই ভাবুন, শহরের সাধারণ চড়াই যে অনেক বিষয়ে পাড়াগেঁয়ে তালচড়াইদের চেয়ে তালগাছে না চড়েও উন্নত এবং বিদ্যে বুদ্ধি চটক ফটক সব দিক দিয়ে অগ্রগামী, তা অস্বীকার করবার জো নেই, বাবুই যদি বলতে হয় শহরের দলকে বলাই ঠিক। তালচড়াইকে তাল ঠুকে বাবুই বলো আর যাই বলো তালচড়াই সে তালচড়াই-ই থাকবে চিরকাল তালগাছেই। আমি এই সৌখীন, সব বিষয়ে উন্নত, শহুরে বা মেট্রোপলিটন বাবুই পাখির একজন। ছেলেবেলা থেকে আমি চালাক চতুর, চটপটে, ফুর্তিবাজ বা বাবু-কছমের পাখি কিন্তু উচ্চশিক্ষার ফলে বেশ রাসভারী গম্ভীর-গম্ভীর গোছ দেখায় আমাকে। এর উপর একটু-আধটু কাব্য দর্শন সাহিত্য এমনি সব জিনিসের ক্ষুদকুঁড়ো তাও আমি পরিপাক করতে বাকি রাখিনি— কেননা সব বিষয়ে দশকর্মা মহাপণ্ডিত এমন একজন মানুষের বাড়ির চিলের ছাতে একটা মেটে নলের ভিতর আমি বাসা

নিয়েছি। সেখান থেকে আমি মাঝে মাঝে উড়ে গিয়ে বড়ো বড়ো রাজা-রাজড়ার জানলা দিয়ে উঁকি মেরে ঐশ্বর্যের অনিত্যতা, অসারতা আর আমার মেটে ঘরের প্রতিবেশীর ছোটো বাড়িখানার মধ্যে যে উচ্চ চিন্তা আর সাদাসিদে জীবনযাত্রার অম্লান কুসুমগুলি দিনের পর দিন ফুটে চলেছে তার অমরতা উপলব্ধি করবার খুবই সুযোগ পেতাম। পণ্ডিতের পাতের ক্ষুদকুঁড়ো পেয়ে আমিও বাবুই সমাজে একজন মস্ত লোক বলে খ্যাতি পেলেম। কাজেই বাবুই সমাজটা কী প্রথায় চালালে সকলের সুবিধে হয় সেটা তদন্ত করবার ভার আমার উপর পড়েছে। কাজটা খুবই শক্ত, কেননা বাবুই পাখিরা যদি পাঁচজনে মিলে খালি স্থির হয়ে বসে বিবেচনা তর্ক-বিতর্ক করত তবে আমি তাদের অভাব অভিযোগ শুনে যা-হয় একটা সুব্যবস্থা করতে পারতাম—কিন্তু তা হবার জো নেই। একদণ্ড তারা স্থির হয়ে বসে থাকতে চায় না, কেবলই চুলবুল করে, বাজে কথা নিয়ে কিচিমিচি করা নয় তো অকারণে নিজে নিজে ঝগড়া মারামারি করাই তাদের কাজ; কাজের কথা এলেই সরে পড়ে।

আজকাল বরং বাবুই দলে নানা বিষয় নিয়ে চর্চা করবার একটু চেষ্টা দেখা যাচ্ছে, আমি কিন্তু যে সময়ের কথা বলছি, তখন এ-সব কিছুই ছিল না, বাবুই তখন কেবলি উড়ত, নীতিচর্চা কিংবা ধর্মচর্চার ধার দিয়েও যেত না। এ পাড়ার চিলের ছাতের ওপর বাসাটা নেবার আগে দু-বছর আমি একটা কাঠির খাঁচার মধ্যে বন্ধ ছিলেম। যখনই আমার তেষ্টা পেত তখনই আমায় এতটুকু একটি দড়ি বাঁধা বোক্‌নো করে জল তুলতে হত। সবাই চড়াই পাখির জল তোলা দেখে ভারি আমোদ পেত আর কালো চাপদাড়িওয়ালা মানুষটা এই পাখির তামাসা দেখিয়ে যা রোজগার করত তা থেকে দুবেলা দুগুলি ছাতু ছাড়া আর বেশি কিছুই আমার জন্যে বন্দোবস্ত করত না। খাঁচা ছেড়ে পালিয়ে পাড়ার দু চার জন আলাপী বাবুইকে যখন আমার দুঃখের কাহিনী জানালেম তখন সবাই আমাকে খুব আদর-যত্ন করতে লাগল। সেই সময়েই আমি বেশ করে নানা পক্ষীসমাজের চাল-

চলন নজর করে দেখে নিলেম। আমি দেখেছি পাখিদের আনন্দ শুধু খাওয়ায়-দাওয়ায় নয়। বাবুই হোন চড়াই হোন সবার জীবনের একটা বড়ো দিক আছে। এমনি নানা দিকে নানা বিষয়ে নজর দিতে দিতে ক্রমে পক্ষীসমাজের মধ্যে আমি একজন মাতব্বর হয়ে উঠলেম। দিনের মধ্যে বেশি সময় আমি ময়দানের একটা পিতলের স্বর্গীয় অতিমানুষের মূর্তির উঁচু মাথার টাকটার মাঝখানে বসে উস্কো-খুস্কো পালকের মধ্যে মাথা গুঁজে পৃথিবীর দিকের চোখটা বন্ধ করে আর আকাশের দিকের চোখটা খুলে রেখে পক্ষীসমাজের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান কী ব্যবস্থা হতে পারে, কী বা এ সমাজের কাজ, আর কোথায় বা আমাদের শক্তি সে বিষয়ে চিন্তা করতেম। গভীর সমস্যা আমার মনে উদয় হত। বাবুই আর চড়াইয়েরা কোথা থেকে এল কোথায় বা যাবে, কেনই বা দুঃখু হলে তারা কাঁদে না, কেনই বা তারা কাকদের মতো দল বেঁধে থাকে না, আর কেনই বা বাবুই আর চড়াই বাজে কিচিমিচি ঝগড়াঝাটি না করে পঞ্চায়েৎ করে সমাজের সব সমস্যা মিটমাট না করে নেয়!

দেখা যাচ্ছে শহরে ভারি অদলবদল হচ্ছে। যেখানে ছিল বাগান, সেখানে উঠছে বাড়ি, কাজেই শহরের যত বাবুই আর চড়াই তাদের ফিড়িং ফড়িং পোকা ও মাকড় এমনি সব নানা খাবার জিনিসের ক্রমেই অভাব ঘটছে। এর ফলে মানুষদের মধ্যে বড়োলোক আর গরিবের দুটো আলাদা থাক আর সঙ্গে সঙ্গে উঁচু নিচু একটা জাতেরও ছিষ্টি হয়ে উঠছে। শুধু যে মানুষের মধ্যে এমন হচ্ছে তা নয়, পাখিদের মধ্যেও গরিব-গুর্বো বস্তির পাখিগুলো ছাই-পাঁশ তাও আধপেটা খেয়ে মরছে আর বড়োলোকদের পাড়ার পাখিগুলো ভালো খাওয়া পেয়ে খুবই আরামে রয়েছে। গির্জে, হাইকোর্ট, মনুমেণ্ট, টেলিগ্রাফ, পোস্ট আপিস, গোলদিঘির টোল, কলেজ ইস্ট্রীটের গোলামখানা, হোটেল, হাঁসপাতাল, এমনি সব বড়ো-বড়ো বাড়ির চুড়োয় বাসা বেঁধে সুখে আছে উঁচে তারা। মানুষদের রাজত্বেও এই উঁচু-নিচু থাক-বেথাকের সৃষ্টি হয়ে পড়লে ক্রমশ ভারি গোলমাল

মারামারি এমন-কি রাজবিদ্রোহ পর্যন্ত ঘটে। পক্ষীসমাজে তো একদিন এরূপটা চলা অসম্ভব। কতকগুলো পাখি খেয়ে খেয়ে মোটাবে আর দিব্যি আরামে ঘরকন্না করবে, আর কতকগুলো, তারা রাজ্যের ওঁচা সামগ্রী, তাও আবার আধপেটা খেয়ে দীনহীন অবস্থায় দিন গুজরান করবে এ তো হতে পারে না—ফলে দাঁড়াল, বাবুইয়ের দলে গোল বাধল। চড়াইরা মরিয়া হয়ে বললে— 'আমাদের সামাজিক উন্নতির পথ যেমন করে পারি করে নেব, এতে যদি ঠোঁটের চোঁচ চালাতে হয় তাও আমরা চালাতে প্রস্তুত।' যদিও আমি নিজে বাবুই বটে তবু সত্যি বলতে হবে, চড়াইদের প্রস্তাবটা ভালোই। চড়াইরা দল বেঁধে মাস্‌চটকদের বাড়ির গলিতে এক চড়াইকে দলপতি করে এক বিরাট সভা ডেকে বসল। এই দলপতির স্বর্গীয় প্রপিতামহের অতি-বৃদ্ধপ্রপিতামহ তিতুমিরের কেল্লা দখলের সময় ইংরেজদের বিশেষ সাহায্য করে চতুরজী খেতাব পেয়েছিলেন। এই সভার বিবরণটা দিই শোনো—

সকালবেলা শহরের অলিতে-গলিতে যত চড়াই সবাই দলে দলে ভাগ হয়ে টেলিগ্রাফ আপিস, হাইকোর্ট, গ্র্যাণ্ড হোটেল এমনি সব বড়ো বড়ো জায়গা দখল করে বসল। প্রধান দল গিয়ে চারিদিকে যত বড়ো গাছ ছোটো গাছ দখল করে ফেললে। শহরের লোক তো এই চড়াই পাখির ঝাঁক দেখে অবাক! বাবুইগুলো ভেবেই অস্থির, বুঝিবা এবার অন্ন যায়। এই ভেবেই সব বাবুই একত্র হয়ে যা-হয় একটা মিটমাটের চেষ্টায় আমাকে ডেকে দূত করে চড়াইদের সভায় পাঠালেন। আমার জীবনের সেই দিনটা আমার পক্ষে অতি গৌরবের দিন। সব চড়াই আর বাবুই যখন আমার মুখ চেয়ে বসে, সেই সময় আমি আপনাকে বড়ো ভাগ্যবান বলে ঠাওরালেম। যা হোক, দুই দলে মিলে যাতে একটা উপায় হয় তার ব্যবস্থার ভার আমাকে দিলেন। বড়ো বড়ো চড়াইদের আর বাবুইদের মধ্যস্থ হয়ে আমায় কাজ করতে হল। কী করে সব দিক রক্ষে হয়, তাই নিয়ে দুপক্ষ থেকে নানা প্রশ্ন উঠতে লাগল বাঁচা যায় কী করে, খাওয়া যায় কী করে, শহরের সব

বড়ো বড়ো জায়গাগুলো কি বাবুইদের একচেটে থাকবে, না জাতিভেদ উঠিয়ে দিয়ে চড়াই আর তালচড়াই দুজনের মধ্যে জল চলাচল হবে, আর তাই যদি হয় তবে কী নিয়মে ভবিষ্যতের সমাজ-বন্ধনটা করা সুবিধে— এমনি সব বড়ো-বড়ো প্রশ্ন আমাকে মেটাতে অগ্রসর হতে হল। শেষে প্রশ্ন উঠল— মুড়ি মিছরির এক দর হোক। এতে সব বাবুই আপত্তি করলেন— 'আমরা শহরে থাকি— এ হলে সব চিনি বাইরে যাবে। একে তো শহরের আবহাওয়া ফাঁকার মতো ভালো নয়, তার উপর মিছরি না পেলে আমরা কী সুখে বাঁচি? চড়াই তাঁরা পাড়াগাঁয়ে থাকেন— কিড়িং ফড়িং যথেষ্ট, সেখানে মুদির দোকানের মুড়ি মুড়কিও প্রচুর, তার উপর ফাঁকা হাওয়া যথেষ্ট— এ আব্দার করা তাঁদের অন্যায়, এতে আমরা কিছুতেই রাজি হব না!

অমনি চড়াইয়ের দল ভয়ানক কিচিমিচি আরম্ভ করলেন, দুই দলে বকাবকি শুরু হল। মানুষরা হলে সেদিন একটা বিদ্রোহ আর রক্তপাত না হয়ে যেত না, কিন্তু পক্ষীসমাজে গোলমাল চেঁচামেচি থেকেই ভালো ফলের উৎপত্তি ধরা যায়। হলও তাই, দুই দলে শেষে একত্র হয়ে আমাকে নানা জন্তু-সমাজের নিয়ম-কানুন আচার-ব্যবহার-গুলো বেশ করে খুঁটিয়ে দেখে আসতে পাঠালেন। আমি সেই-দিনই কার্যের ভার নিয়ে বাসা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেম। সমাজের কল্যাণের জন্যে কী না ত্যাগ করা যায়? তা ছাড়া কাজটা খুব সম্মানের কাজ, আর রোজগারও কিছু সেইসঙ্গে ছিল।

* * *

এখন দেশের জনসাধারণের সভায় আমি আমার সমাজ সম্বন্ধে রিপোর্ট ক্রমশ দাখিল করব— প্রতি মাসে 'বেণু' কাগজে; সম্পাদক তাহা প্রকাশ করিতে রাজি হইয়াছেন, নিজ খরচায়।

(পিঁপড়েদের ক্ষুদে সমাজের সঠিক ইতিহাস)

এখন যেমন কলের জাহাজ উড়ো জাহাজ হয়েছে, তখন এসব ছিল না— সদাগরের জাহাজ আর বোম্বেটে জাহাজই চলত বড়ো বড়ো

পাল তুলে। আমি এরই একটা জাহাজের মাস্তুলে চড়ে পিঁপড়েদের ক্ষুদে শহরের দিকে রওনা হলেম, কালাপানি পার হয়ে। সিন্ধবাদ থেকে রবিনসন ক্রুসো যারাই সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে তাদেরই নানা বিপদ আপদ ঘটেছে, আমাদেরও জাহাজ নানা বিপদ কাটিয়ে কখনো বোম্বেটেদের হাতে পড়ে, কখনো অসভ্যদের হাতে পড়ো-পড়ো হয়ে, কখনো জলের তলাকার পাহাড়ে ধাক্কা খেতে খেতে প্রায় ফুটো হয়ে, একটা ঢাউস তিমি মাছের ন্যাজের ঝাপটা খেয়ে প্রায় কাত হয়ে একটা বন্দরে ঢুকল। সেখানে একজন কাঠপিঁপড়ে বসে ছিলেন, তাঁর মুখে শুনলেম এইটেই পিপ্‌লা বন্দর এবং পিঁপড়েদের ক্ষুদে শহরও একটু আগেই আছে। ঠিক জায়গায় এসে পড়েছি দেখে আমি তাড়াতাড়ি জাহাজের মাস্তুল ছেড়ে সমুদ্রের ধারে একটা হোটেলে বাসা নিতে চললেম। গরমের দিনে রোদ ঝাঁঝাঁ করছে, বৃষ্টি হয়-ই না দেশটাতে, কালে-ভদ্রে এক-আধ দিন যদি দু-একটা শিল পড়ে তো লোকগুলো সে-কটা জমা করে বরফজল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়।

পথে দেখলেম দলে দলে পিঁপড়ে, তারা কেউ বেড়াচ্ছে, কেউ হাওয়া খেতে চলেছে, পুরুষদের সবাই আগাগোড়া কালো বনাতের কোট প্যান্ট হ্যাট আর বার্নিশ-করা জুতো পরে। এই গরমে বনাতের কাপড় সয় কেমন করে এদের বুঝলেম না; আর এদের সবারই কি এক সাজ এক ঢঙ! মিশকালো মোটা বনাতের কাপড় পরা দেখে জানলেম এরা ডেঁয়ে পিঁপড়ে, জলে স্থলে ঘাটে মাঠে ঘরে বাইরে সব জায়গায় সব সময়ে এরা ফিটফাট হয়ে চলাচল করছে—গোঁফের আগা থেকে পায়ের বুট পর্যন্ত কোথাও শাদা নেই, চক্‌চক্ করছে কালো। আমার মনে হল বাইরেটায় এদের হয়তো যত চক্‌মকানি ও কালোর বার্নিশ, ভিতরে হয়তো নেহাত শাদা এরা। এই না ভেবে একটা পিঁপড়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে শুধোলেম—'আচ্ছা, যদি তুমি এতটা ফিটফাট হয়ে না বেড়াও, কিংবা সাদাসিদে এই আমার মতো ধুতি-চাদরে বেশ বাবু সাজো তো পিঁপড়ে সমাজে

তোমার কি মানের হানি হবে?' পিঁপড়েটা আমার কথার জবাবই দিলে না, গোম্‌সা মুখে গট-গট করে অত্যন্ত রাগত ভাবে চলে গেল। পরে জানলুম কেউ মাঝে পড়ে আলাপ-পরিচয় না করিয়ে দিলে এরা কারুর সঙ্গে কথা বলা বেদস্তুর মনে করে ভারি চটে।

থাকতে থাকতে প্রবাল দ্বীপের ইন্দ্রগোপ কীটের সঙ্গে আমার আলাপ হল। লাল মূর্তি, মস্ত গোঁফ— তিনি প্রশান্ত মহাসমুদ্রের এক পলা রাজত্বের পত্তন দিচ্ছিলেন, এমন সময় মাছ ধরার জাহাজে করে পিঁপড়েরা ফৌজ পাঠিয়ে তাঁকে বন্দী করে এনেছে। তাঁরই মুখে পিঁপড়েদের রাজত্বের অনেক খবর পেয়েছি। তিনিই বললেন, পিঁপড়েদের রাজা তাঁর প্রজাদের হুকুম দিয়েছেন, যেখানে যত প্রবালদ্বীপ সাত সমুদ্র তেরো নদীর মধ্যে দেখা দেবে সেগুলোকে পিঁপড়ের রাজ্যের সামিল করে নিয়ে এক-একটা উপনিবেশ বসাতে। এটা অতি গোপনীয় খবর— সুতরাং কাউকে যেন বলা না হয়।

বন্দর থেকে একটু যেই পা বাড়ানো, অমনি একদল নতুন ধরনের পিঁপড়ে আমাকে এসে ঘেরাও করলে। শুনলুম তারা কাস্টম পিপীলিকা। তাদের কাজ— যে-কেউ এ দেশে পা দেবে তাকে কষ্ট ভোগানো— পোঁটলা পুঁটলি খুলে দেখা, চোরাই মাল কিংবা আর-কিছু লুকিয়ে বিক্রি করতে এখানে আসছে কি না এরই তদারক করতে গিয়ে এটা-ওটা হারিয়ে দিয়ে নিজের পকেটে পোরা এবং শেষে আবার যার জিনিস তাকেই মাল সরিয়ে ফেলার দরুন দণ্ড করা ও নানা ভোগ ভোগানো কাজে বেশ মোটা মাইনে পাচ্ছে এরা। এই দেশের এরা নিজেদের ছাড়া জগৎসুদ্ধুকে কী চোখে দেখে তা এদের দেশে পা দেবামাত্র বুঝলেম। সব দেখে শুনে যখন কোনো চোরাই মাল এরা আমার পালঙ্কে তোষকের মধ্যে কিংবা ডানার ভাঁজে কোথাও খুঁজে পেলে না, তখন এরা জোর করে আমার দুই ঠোঁট চিরে দেখতে লাগল দূরবীন দিয়ে— গলার মধ্যে করে এদের দেশে আমি লুকিয়ে কিছু আমদানি করেছি কি না। যখন দেখলে আমি খালি চড়াই বই আর কিছু নই, তখন এরা বেশ কিছু

ঘুষ নিয়ে আমাকে তাদের ক্ষুদে শহরে যাবার হুকুম দিয়ে ছেড়ে দিলে। শ্বেত কাকের কথা শুনে পিঁপড়ের দেশ দেখতে এসে প্রথমটাতেই বড়ো জ্বালাতন হতে হয়েছিল।

দেখলেম, এরা রাজারাজড়া থেকে কুলিমজুর পর্যন্ত খেটে খেটে মরে শখ ক'রে ; বাবুয়ানার দিক দিয়ে যেতেই চায় না। এদের দেশে শখের জিনিস যথেষ্ট— ভালো ফল ফুল সবই আছে, কিন্তু নিজেরা এরা সেগুলো ভোগ করতে চায় না একেবারেই। যেদিকে যাই, দেখি দলে-দলে পিঁপড়ে মালপত্তর রসদ পিঠে করে নামাচ্ছে, ওঠাচ্ছে। মিস্ত্রি মজুর তারা মাটির নিচে সব সুড়ঙ্গ চালিয়ে পথ করে দিচ্ছে। পৃথিবীর উপরকার ভার কমাতে সবাই এত ব্যস্ত যে আমাকে দেখেও দেখলে না।

দেখলেম, এদের মধ্যে একদল আছে তারা দালাল পিঁপড়ে। তারা কোথায় কী মাল আছে তার সন্ধানেই ফিরছে। আর এক দল, তারা যেখানে যা পাচ্ছে কুড়িয়ে নিয়ে জমা করছে। অন্য দল তারা খুব লুকোনো জিনিস তারই সন্ধানে গিয়ে রাতারাতি, এমন-কি দিনে-ডাকাতিও করে আসতে ছাড়বে না। এরা নুন ছোঁয় না— কাজেই নিমকহারামি বলে একটা কথা নেই এদের অভিধানে। মুখমিষ্টি জাত বলে এরা জগদ্‌বিখ্যাত। চিনি কিংবা চিনি না, এই দুটো কথা এরা ভারি মান্যি করে। তাই যাকে চিনি না বলে মনে করে এরা, চেনা-চিনি হলেও ফস্‌ করে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে না। এতে করে জগৎসুদ্ধুই এদের কাছে অপরিচিত ; এক চিনির পুতুলগুলিকেই এরা একটু খাতির করে চলে।

এদের ধর্ম আমি যা দেখলেম তাতে এদের ঘোরতর পৌত্তলিক বলতে হয়। এরা ঘরে ঘরে এক-একটা লোহার সিন্দুকের আকারে ছোটো-বড়ো মন্দির খাড়া করে সেখানে সোনা রুপো কোম্পানির কাগজের সিংহাসনে চিনির শেয়ার বলে একটা হাজার হাত মূর্তির পুজো দেয় কেবলই। এই দেবতা কখনো এদের ভক্তিতে বিগলিত হন। তখন মুশকিলে পড়ে পিঁপড়েরা। ভক্তিতে

আটকা পড়ে পালাতে পারে না, চিনির সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়ে মারা যায়।

এই দেবতার আর-এক নাম হচ্ছে 'বাত্-আশা'। ঠিক বলতে পারিনে এটার কী অর্থ, শব্দকল্পদ্রুমে লিখেছে যে 'বাত্' অর্থে মুখের কথা এবং 'আশা' কি, না আশা। এই থেকে এ কথার উৎপত্তি।

এই-সব ব্যাপার দেখে বেড়াচ্ছি, এমন সময় দেখি কতকগুলি পিঁপড়ে পালক নেড়ে যেন উড়ে উড়ে চলেছে। একটা পাহারাওয়ালা পিঁপড়েকে শুধোলেম— 'এরা সব দেখি কাজকর্ম করছে, আর ওরা জমকালো চারখানা পালকের ধড়াচুড়ো এঁটে নিষ্কর্মার মতো রয়েছে কেন?' পাহারাওয়ালা বললে— 'এঁরা হচ্ছেন দেশের আমীর ওমরা, নেতা অধিনেতা অধিরাজ,— রাজা মহারাজাও বললে চলে; খুব পুরোণো বংশের ঘুণ পিঁপড়ে এঁরা।' আমি আবার শুধোলেম— 'ঘুণ পিঁপড়ে কাকে বলে?' পাহারাওয়ালা বললে — 'এঁরা হলেন দেশের মাথা, আজন্ম এঁরা পালকের গদি আর পালকের সাজসজ্জা করে থাকেন। সুয্যির আলো না দেখা দিলে ঘর থেকে বেরোন না, পাছে ভিজে আর চক্‌মক্ না করে। আঃ! এঁরা বড়ো আরামেই থাকেন, এক দুঃখ— এঁদের অকাজে দিনগুলো কাটাতে কাটাতে এমন অরুচি হয় যে ভেবেই পান না কী নিয়ে বেঁচে থাকেন। কেবলই তখন শুনি এরা বলেন— দিন যে যায় না কী করি!'

এই-সব পালকের গদিতে গদিয়ান ওড়ন্বা পিঁপড়ের বিষয়ে একটু জানবার ইচ্ছে হল আমার। কেননা দেখলেম এরা যেন একটু সৌখীন গোছের এবং বাবু কছমের, কিন্তু খবর নিয়ে জানলেম এদের ঘরে এরা কিছুই জমা করে না; দোকান-ঘরের উপরে একটু বাসাটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে এরা থাকে কাচ্চাবাচ্চাদের শিক্ষা দীক্ষা নিয়ে। কোনো কিছুতে এদের মন নেই, কেবল কতগুলো ওড়ন্বার দলে ঘুরে ঘুরে মরে এরা। এদের বুদ্ধি না-মোটা না-সূক্ষ্ম, কেমন একটা বেঢক গোছের। নিষ্কর্মার ধাড়ি বলে এদের সবাই জানে।

আমাদের কথা হচ্ছে, এমন সময় এক পালক-ওঠা পিঁপড়ে

সেইদিক দিয়ে চলে গেল ; পাহারাওয়ালা আর মিস্ত্রি মজুর পিঁপড়ে-গুলো দুধারে পথ ছেড়ে দাঁড়াল। পিঁপড়ের রাজত্বে দেখছি সচরাচর পিঁপড়েগুলো অত্যন্ত গরিব, জমিজমা যা কিছু সবই ওই পালক-ওঠা পিঁপড়েগুলোই দখল করে বেশ ছোটো-খাটো এক-একটি পাহাড়ের মতো পিঁপড়ের ঢিবি বানিয়ে সুখে আছে! এই-সব সৌখীন পিঁপড়েদের জন্যে দেখলেম, বড়ো বড়ো বাগানে সব পালে পালে মাছি পোষা রয়েছে তারা সেগুলোকে মাঝে মাঝে শিকার করে— আমোদও পায়, পেটও ভরায়। গরিব পিঁপড়েরা দেখলেম তাদের রাজ্যের ছানাপোনাগুলির ভারি আদর-যত্ন করে থাকে। ছেলেদের শিক্ষা-দীক্ষার খুব ভালো বন্দোবস্ত করেছে দেখলেম। আর আমার মনে হয় এইজন্যেই পিঁপড়ে জাত এত বড়ো হয়েছে। এক-একটা বাড়িতে দেখলেম ছেলের পাল— ষষ্ঠীতলার ষেটের বাছার দল তারা।

একধারে দাঁড়িয়ে আমি এ-সব চিন্তা করছি এমন সময় এক জাঁদরেল-গোছের পিঁপড়ে দেখলেম একটা ঢিপির উপরে উঠে হাত-পা নেড়ে আর পাঁচজনকে কি হুকুম দিলেন— অমনি দেখলেম দলে দলে পিঁপড়ে-ফৌজ কেল্লা ছেড়ে খড়কুটো, পাতার ভেলা ভাসিয়ে সমুদ্রের ওপারে চলল। শুনলুম কোথায় একটা লড়ায়ে এদের হার হবার জোগাড় হচ্ছে তাই আরো সৈন্য সেখানে যাচ্ছে ; দুই জাঁদরেল পিঁপড়েতে কথা হচ্ছে দেখে আমি কান পেতে শুনে খবর পেলুম কোন্ এক দেশের ছারপোকারা নাকি কতকালের উই-ধরা পুরোনো একটা রাজতক্তের তলায় সুখে অনেক কাল বাস করছিল আশি যুগের রাজাদের গায়ের রক্ত খেয়ে খেয়ে। সেই অপরাধে নাকি খটমল দেশটাকে উজোড় করে দিয়ে তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্যেই এরা অগ্রসর হচ্ছে। আমি আস্তে আস্তে জাঁদরেলদের বললুম— 'খটমল দেশের গোটাকতক ছারপোকাকে শাসন করতে গিয়ে আপনাদের একে তো যথেষ্ট খরচ হবে, তা ছাড়া সেখানে বনে জঙ্গলে কষ্ট পেয়ে অনেক পিঁপড়ে মারাও যেতে পারে।'

তাঁরা দুজনেই বললেন— 'বিশ্বের কল্যাণের ভার যখন আমরা

নিয়েছি তখন কিছু তো ত্যাগ স্বীকার করা চাই, তা ছাড়া আমাদের সৈন্যগুলো নিষ্কর্মা থেকে থেকে ক্রমে লড়াই করা ভুলেই যাচ্ছে। আর খটমল দেশটাও শুনেছি খুব বড়ো দেশ— সেখানে ছারপোকা-গুলোর রক্তেও অনেক চিনি আছে। শুষে নিতে পারলে বেশ আয় আদায়ের সম্ভাবনা। এই লড়াইটাতে যত খরচ তার দশগুণ লাভ নিশ্চয়ই আমরা করে নিতে পারব।'

আমি এখন খটমল দেশটাকে একবার দেখে নেবার আশায় জাঁদরেলের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করে বিনা ভাড়াতে যুদ্ধজাহাজে চড়ে খটমল রাজত্বের দিকে চলে গেলেম।

জাহাজ তো নয়! দেখলেম যেন একটা কেল্লা। পল্টনে ঠাসা, বারুদ গোলা-গুলি আর বন্দুকে ভর্তি। দেখে আমার ভয় হল, যদি এক ফুলকি আগুন কোনো রকমে লাগে তো রক্ষে নেই। ভয় হল, এ জাহাজে চড়ে পড়াটা ভালো হল কি না। ভাবছি, এমন সময় লালমোহনের সঙ্গে দেখা। তিনি তাঁর কঞ্চি কাগজের বিশেষ সংবাদ-দাতা হয়ে খটমল দেশে চলেছেন একটা লাল খাতা হাতে।

এক যাত্রায় পৃথক ফল ভালো নয়— এটা শাস্ত্রের কথা, কিন্তু আমার মনে হল যে দুজনে একই কাজে খটমল দেশে না গিয়ে তিনি যান এই বারুদ-ঠাসা জাহাজটায় সেখানে, আর আমি চলি পথের মাঝে যে মৌচাক রাজত্বটা আছে মধুবনে, সেখানের খবরাখবর আনতে। তা ছাড়া দেখলেম লাল পল্টনের একটা কাপ্তেনের সঙ্গে লালমোহনের মোহনবাগান ক্লাবে ভাব-সাব আছে। কথাও কয় লালমোহন ওদের ভাষায় আমার চেয়ে ভালো। সুতরাং খটমল দেশের ভার তাকে দিয়ে আমি যুদ্ধজাহাজ ছেড়ে 'মধুকর' বলে একটা দেশি কোম্পানির ইস্টীম-জাহাজে মৌচাকপুরের দিকে চলে গেলেম।

(মৌমাছিদের রাজতন্ত্র)

মৌমাছিদের রাজতন্ত্র সম্বন্ধে রিপোর্ট এবং থিসিস লিখতে হবে জেনেই আমি আমাদের তালতলীর লাইব্রেরি থেকে তালপাতায় এবং

ছাপা কাগজে ইস্তক নাগাত মৌমাছি সম্বন্ধে লেখা হয়েছে সংগ্রহ করে বেরিয়েছিলেম মৌচাকপুরের তথ্য সংগ্রহ করে আনতে, সরেজমিনে original research করাই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বিধাতার চক্রে উইপোকার উৎপাতে তালপাতার পুঁথি ও ছাপা বই সমস্তই একরাত্রে অদৃশ্য হয়ে গেল কাজেই স্বচক্ষে দেখে যা পারি তাই নোট করে পাঠালেম— এ ছাড়া আর একটা দুর্ঘটনা ঘটল তাও বলি—

মৌচাকপুরে খবরের কাগজ নেই, ভৃঙ্গদূত আছে। তারাই মুখে দেশবিদেশের খবর নিয়ে আসে। মধু মোদকের দোকানঘরই হল এখানের পোস্ট অফিস, সেখানে মিষ্টি মিষ্টি কথায় গুন-গুন করে শুনিয়ে চলে খবর ভৃঙ্গদূতেরা একে একে। দেশের খবর অনেকদিন পাইনি কাজেই মৌচাকপুরে পৌঁছেই ছুটলেম মধু মোদকের আড্ডায়। সেখানে চায়ের বদলে মধু আর মোমাই রুটি খেয়ে বসে গেলেম দেশের খবর দিতে।

আহমদাবাদ জলে ভেসেছে, দামোদরের বাঁধ ভাঙে-ভাঙে, চৌরঙ্গীর ব্রজনাথকে কলকাতার পুলিশ রাতারাতি সিংহাসনচ্যুত করেছে, জেন্ত-সভার অনুকরণে কলকাতায় এক দল একটা সভা খুলে বসে পুরোনো ঘি জমি থেকে উদ্ধারের চেষ্টায় অজস্র অর্থ ব্যয় করেছে —শোনা যাচ্ছে সেই ঘিয়ে তারা নতুন রকম মৃতসঞ্জীবনী ওষুধ বানিয়ে মানুষকে অমর করবে এই মতলব। কথাটা শুনে চিন্তা উপস্থিত হল, ঠিক সেই সময় ভ্রমর দূত এসে খবর দিলে তালবনীতে বিষম কাণ্ড হয়ে গেছে, একটা মানুষ তালগাছে চড়ে বাবুই পাখির যে-কটা বাসা এবং সংসার ছিল একরাত্রে কাচ্চাবাচ্চা-সমেত লুট করে পালিয়েছে, চিহ্নমাত্র নেই বাবুই-পাখির।

আমি এই খবর শুনে তখনই বিশেষ সংবাদদাতা একজনকে পাঠালেম জেন্ত-সভায়, পুনরায় সংসার পাতবার জন্য অর্থসাহায্য চেয়ে। কিন্তু জেন্ত-সভা বললেন আমাকে রিলিফ কমিটিতে আবেদন করতে; রিলিফ কমিটি বললেন কংগ্রেস কমিটিতে প্রস্তাব আনতে। এমনি ঘোরাঘুরিতে হয়রান হয়ে আমি কর্ম পরিত্যাগ করে নতুন

চাকরির সন্ধানে দেশে এসে উপস্থিত হয়েছি এবং জেন্তু-সভার সঙ্গে সব সম্পর্ক তুলে দিয়েছি ও কবিতা লিখতে অগ্রসর হয়েছি। কথিত সম্পাদকের কাছে প্রতিজ্ঞা আমি পালন করব বলে ইচ্ছা ছিল কিন্তু মৌমাছি সম্বন্ধে মানুষ এত লিখেছে যে তার তর্জমা দিয়ে কোনো লাভ দেখি না। সুতরাং এবার থেকে original কবিতাই দেব। লেখা ও সুর সবই original এবং বিনা অনুমতিতে পুনর্মুদ্রণ হইবে না জানিবেন। পুষ্পবনের মধ্যে মক্ষীরানী মোম্‌তাজ মহল বানিয়ে বাস করেন, রানী মক্ষী মোমের পুতুলী; ইনি অতি বুদ্ধিমতী; মৌচাকে মধু জমা করতে এঁর মতো জুটি নেই। তা ছাড়া বাদলা দিনের আগেই ইনি সাবধান হতে জানেন, আর বিদেশেও ইনি কতক-কতক মধু জমা করেছেন।

এক নবাবপুত্তুর মধুপুর থেকে একটি মধুমুখী কন্যাকে বিয়ে করতে চান, তিনি এসে মধু মোদকের দোকানে খবর চাইলেন, বিয়ের যুগ্যি কোনো রাজকন্যে এখানে পাবার সম্ভাবনা আছে কি না। মুদি তাঁকে সেলাম ঠুকে বললে— 'কুমার বাহাদুর, আমাদের রানীর এক মেয়ের বিয়ের উদ্যোগ হচ্ছে যে— যান, যদি ঘটকালি করে সম্বন্ধ করতে চান তো এইবেলা। আপনাকে দেখতে শুনতে ভালো, গায়ের জামাগুলো নতুন হলেই বেশ বর-বর দেখাবে।'

এদের রাজকন্যের বিয়ের ধূমধামটাও আমার দেখার সুবিধে হয়ে গেল। কালো আর হলদে কাপড় পরে আটজন বাগ্নিকর মক্ষীরানী পুরানো বাড়ি মোম্‌তাজপুর ছেড়ে বার হল। এদের পিছনে আর পঞ্চাশজন গড়ের বাগ্নি-বাজিয়ে; এমন তাদের সাজ ঝকঝকে, মনে হল যেন হিরে মানিক জ্যান্ত হয়ে বেরিয়েছে। তারপর এল মাথাটার হুল আর শূল উঁচিয়ে বরকন্দাজ মাছি তারা প্রায় দুশো হবে— কাতারে কাতারে বার হল — আগে আগে তাদের পর্দার বুকে মোম্‌তাজপুরের একটা মোমের তকমা ঝুলিয়ে। তারপর সব রানীর ঝাড়ুদার, আগে আগে ঝাঁটার কাঠির ঝাড় উঁচু করে তাদের জমাদার। তার পর এল খড়কেধারী, আর বাসনমাজুনী সঙ্গে আট ক্ষুদি দাসী,

কেউ মধুর বাটি কেউ খড়কে কেউ পান কেউ চিনি এমনি সব নানা সওগাত বয়ে; তারপর এলেন রানীর প্রিয় দাসী তসরের কাপড় মস-মস করে, সঙ্গে বারোজন ছোটোবড়ো সেবাদাসী; সবশেষে বার হলেন কন্যে জরি কিংখাপের ওড়নায় সেজে— এই ওড়না কেবল শোভার জন্যে, ওড়বার কাজে কোনোদিন লাগবে না। কন্যার পাশে দেখলেম তার মা মক্ষীরানী, মোটাসোটা, আগাগোড়া মখমলে আর হিরের টুকরোয় সাজানো, রানীর পিছনে পিছনে একদল মধুকর বিয়ে উপলক্ষে বাঁধা গান গাইতে গাইতে চলেছে ঐকতান বাদ্যির সঙ্গে। তার পরেই বারোজন বুড়ো মাছি গুন-গুন করে মন্তর আওড়াতে আওড়াতে বেরিয়ে এল। এরাই হল আচার্যি, পুরিৎ, ঘটক, এমনি সব। রানী এসে বাইরে দাঁড়াতেই দশ-বারো হাজার মাছি তাকে ঘিরে দাঁড়াল, রানী তাদের একটা বক্তৃতা শোনালেন— 'প্রজাগণ, তোমাদের যখনি উড়তে দেখি তখনই আমার অত্যন্ত আনন্দ হয়। কেননা, তোমাদের ওড়া মানে এই মোম্‌তাজপুরে দেশবিদেশের মধু ক্রমে জড়ো হওয়া ও রাজসংসারের সুখ শান্তি বৃদ্ধি পাওয়া। প্রজাপতিও ওড়ে বটে—' এই সময় এক বুড়ো আচার্যি, বিয়ে উপলক্ষে প্রজাপতির সম্বন্ধে কটাক্ষ করলে রাজোচিত কাজ হবে না— কানে-কানে বলে দিলে রানী সামলে নিয়ে বললেন— 'প্রজাপতিকে ধন্যবাদ দিই যে তিনি এই পৃথিবীকে মধুভরা ফুল দিয়ে ছেয়ে রেখেছেন। আমার বিশ্বাস মোম্‌তাজপুরের প্রজারা অপব্যয় না করে সেই মধু এই রাজদরবারের কল্যাণসাধনের জন্যই জমা করবেন আর সেই কল্যাণের ফলে প্রজাপতির আশীর্বাদ লাভ করে সুখে থাকবেন। তোমরা রানীর কল্যাণ করতে কোনোদিন ভুলো না— কিসে তাঁর আয় বৃদ্ধি, মান বৃদ্ধি, ও সুখসমৃদ্ধি বাড়ে তারই চিন্তা যেন সর্বদা তোমাদের ব্যস্ত রাখে আর এ কথাও তোমাদের ভুললে চলবে না যে মোম্‌তাজপুরের রাজত্বটা তোমাদের অচল রাজভক্তির উপরেই অটল থাকতে পারে।

'ধর্ম এবং রানী এই দুয়ের জন্যে প্রাণ না দিলে তোমাদের রাজ্য

একদিনও বাঁচতে পারবে না এটা নিশ্চয়। রানীর চলবে না তোমাদের ছাড়া, তোমাদেরও চলবে না রানী না হলে, সেই বুঝেই আমি আমার এই মোমের পুতুলী মেয়েটিকে তোমাদের রানী করে দিলেম, এঁকে তোমরা যত্নে রাখো সুখে রাখো এই আমার ইচ্ছে।'

রানীর বক্তৃতা শুনে প্রজা মৌমাছি সব আনন্দধ্বনি করতে লাগল। নতুন রানী সমবয়সী মৌমাছিদের সঙ্গে একদিকে আমোদ আহ্লাদ করতে চলে গেলে পর নবাবপুত্তুর বুড়ো রানীর কাছে গিয়ে বললে— 'রানীমা, প্রজাপতি আমাকে মধু সংগ্রহ করবার মতো বিদ্যে-বুদ্ধি কিছুই দেন নি। কিন্তু আমি বেশ গুছিয়ে সংসার করতে মজবুত। যদি অল্পসল্প যৌতুক আর দানসামগ্রী দিয়ে কোনো একটা কালো-কোলো মেয়েকে পার করবার ইচ্ছে থাকে তবে আমি খুশি হয়ে তাকে নিতে রাজি আছি। আর—'

রানীর প্রিয় সখী তার কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠল— 'রাজকুমার, তুমি জানো না— এ দেশের রানীর সোয়ামীর কপাল বড়োই মন্দ হয়। তাকে এরা একটা উৎপাত বলেই মনে করে আর সেইজন্য আদর-যত্ন করে না, রাজকার্যে তার কোনো কথা চলে না এবং কতকটা বয়সের বেশি আমরা তাকে কিছুতে বাঁচতে দিই নে। কাজেই ভেবে দেখ এ দেশের রানীর জামাই হতে চাও কি না।'

বুড়ো রানী বলে উঠলেন— 'কোনো ভয় নেই, আমি তোমার পক্ষে রইলেম, তুমি আমার কাছে থাকো। তুমি দেখছি বড়ো-ঘরের ছেলে, আর তোমার মন যখন হয়েছে তখন আমার এক মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব, তুমি আমার রাজত্বে ভালোই করবে বলে বিশ্বাস হচ্ছে। এসো।'

যত নবাব একেবারে নির্বুদ্ধি ছিল না। সে বেছে বেছে সবচেয়ে সুন্দরী রাজকন্যার প্রেমে পড়ে গেল। অজানা মৌমাছি সে কোন্ দেশ থেকে উড়ে এসে সুন্দরী মক্ষীরানীর কন্যের রূপের আলোর মধ্যে ঘুরে ফিরে কন্যের সঙ্গে এক ফুলে মধু খেয়ে ছায়ার মতো তার পিছে পিছে ফিরে শেষে তার হৃদয়টি অধিকার করে নিলে। মৌমাছির

প্রেমের এই বিচিত্র ইতিহাস মনে করলেও এখন আমার নিজের বিয়ের দিনগুলি যেন চোখের সামনে উদয় হয়। আমার মনে হয় মৌমাছি আর মানুষের ভালোবাসার তত্ত্বটা তলিয়ে দেখার জন্যে পশুসমাজ থেকে একটা বিশেষ কমিশন বসানো দরকার।

আপনারা শুনে সুখী হবেন, আমার নাম এদেশে এমন প্রচার হয়েছে যে রানীর ওখান থেকে আমার জন্যে একটা বিশেষ মজলিসের নিমন্ত্রণ চারি দিকে পাঠানো হয়েছে। কার্ডে লেখা হয়েছে— সম্ভ্রান্ত বিদেশীকে অভ্যর্থনার জন্য রানীর হুকুমে সকলে এরা মধুপানাদি করবে। যা-হোক, রানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চলেছি— দরবারের দেউড়িতে জনকতক হোমরা-চোমরা মাছি এসে আমাকে বেশ করে দেখে শুঁকে স্থির করে নিলে এমন কোনো বিদেশী গন্ধ আমার ভিতরে বাইরে আছে কি না যাতে করে সভাটা নোংরা হতে পারে।

আমাকে খরচ করে তারা সভায় হাজির করলে পর মৌচাকেশ্বরী এসে এক ফুলের সিংহাসনে বসলেন, আমি নমস্কার করে বললেম— 'মহারানী, আমি একজন বাবুই দর্শনসভার প্রধান সদস্য। জেন্তু-সভার পক্ষ থেকে নানা রাজতন্ত্র সমাজতন্ত্রের হিসেব জোগাড়ে নিযুক্ত হয়ে বেরিয়েছি।' মহারানী হেসে বললেন— 'আপনি অতি বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, আপনি দেখতেই পাচ্ছেন আমার দিন কাটানো ভার হত যদি না রাজ-কাজ থেকে বছরে দুবার করে আমাকে ছুটি নিতে না হত। আমাকে মহারানী বলবার কোনো আবশ্যক নেই, রাজনন্দিনী কিংবা মক্ষী বললেই আমি খুশি হব।'

আমি বললেম— 'রাজনন্দিনী, এদেশে দেখলেম আপনার প্রজারা চাকরের মতো কেবলই খাটছে আর আপনি বেশ আরামে রয়েছেন। এই বড়ো-ছোটো ভেদটা কি ভালো?'

রানী বললেন— 'তা তো বুঝি। কিন্তু রাজ-আইনটা এইরকমই যখন, তখন সেটা মানাই হচ্ছে প্রজার ধর্ম। নাহলে রাজা প্রজা সম্পর্কই উঠে যায়, রাজত্বই থাকে না।'

আমি বললেন— 'এতে দেখছি আপনার প্রজার খাটুনিই সার। লাভটা আপনারই।'

রানী বললেন— 'এ ছাড়া আর কী হতে পারে। রাজা, রাজত্ব, রাজতন্ত্র সবই যখন আমি, তখন প্রজারা আমাকে না রাখলে এর একটাও পাবে না। অন্য দেশে কেমন জানি নে কিন্তু আমার রাজত্বের ব্যবস্থা আর আইন দুয়ের দ্বারাই সবাই দেখ সুখে রয়েছে। মৌমাছিদের একটা রানী থাকার সুবিধে— আর পিঁপড়েদের দেখ রানী নেই, হাজার আমীর— তাদের যেমন খুশি চালাচ্ছে।'

আমি রানীকে রাজা প্রজা উঁচু নিচু থাকার অসুবিধেগুলো কী তাই বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করামাত্র রানী বললেন— 'তবে এখন বিদায়, প্রজাপতি আপনাকে শুভবুদ্ধি দিন, সত্যের আলো পাঠান সবার জন্যে।' আমি তাড়াতাড়ি শুধোলেম— 'আচ্ছা এত মধু চাকে জমা করে আপনাদের কী লাভটা হচ্ছে? কোনোদিন এ মধু তো আপনাদের কারু কাজে আসবে না। মানুষ একদিন তো চাক ভেঙে সবই লুঠ করে নিয়ে যাবে— হুলও মানবে না, কামড়ও গ্রাহ্য করবে না। এটা তো আপনার প্রজাদের জানিয়ে দেওয়া উচিত রানী হয়ে।'

রানী রেগে বললেন— 'চুপ! চুপ! এ-সব শুনলে প্রজাদের মাথা বিগড়ে যেতে পারে!' বলেই রানী বোঁ করে উড়ে পালালেন।

আমি থতমত খেয়ে মাথা চুলকে চলে যাব, এমন সময় আমার মাথা থেকে একটা উকুন লাফিয়ে পড়ে আমায় নমস্কার করে বললে— 'মশায়, আমি এক নেকড়ে বাঘের পিঠে চড়ে এখানে হাজির হয়েছি। এতক্ষণ আপনার কানের কাছে বসে আপনার মাথা থেকে যেসব উপদেশপূর্ণ কথা বেরিয়ে রানীকে চমকে দিয়েছে সেগুলো হজম করবার চেষ্টা করছিলেম। আপনার মনোমত রাজ্য সমাজ যদি কোথাও দেখতে চান তো পূর্বস্থলীতে চলুন। আপনি দেখবেন নেকড়ে বাঘের রাজতন্ত্র ঠিক আপনার কল্পনার সঙ্গে মিলে যাবে। নেকড়ে-বাঘ পায়ে পায়ে যায় সত্যি কিন্তু এ পর্যন্ত তারা পাখি খেতে শেখেনি। কাজেই সে দেশে যাওয়াতে আপনার কোনো বিপদ

ঘটবার সম্ভাবনা নেই। বরং উল্‌টে তারা আপনাকে মাথায় রাখতেও প্রস্তুত। সুতরাং কিছুমাত্র সংকোচ না করে আজই সেখানে রওনা হোন।' এই বলে উকুন সরে উড়ল।

সংসারটা ছারখারে যাওয়াতে আমি যতটা না মর্মাহত হয়েছিলেম, জেন্তু-সভা নতুন সংসার পাতবার সাহায্য না করতে তার চতুর্গুণ বেদনা বাজল আমাকে। কাজেই আমি সব ছেড়ে মাছিক সাহিত্য-জগতে কিছু দান করে যাবার জন্যে কৃতসংকল্প হয়ে বেণু-বনে বাসা নিয়েছি!

মৌচাকপুরে রাজকন্যার বিয়েতে যেদিন তুবড়ি ফুলঝুরি পোড়ে, সেদিন আমি একটা গান বেঁধে বরকন্যাকে আশীর্বাদ করেছিলেম। সুর ও কথা দুইই নিজের কল্পিত। কোনো বাবুই এর পূর্বে এটা রচনা করেন নি। আপনারা না বিশ্বাস করতে পারেন, মৌচাকপুরে একটা লতাকুঞ্জে বসে ছোটো একটা ফুলঝুরির আলো জ্বেলে, সেটা নেভবার পূর্বেই রচনা সাঙ্গ করেছিলেম! এবং মৌচাকপুরের তরুণ সাহিত্যিকের দলে এই রচনা বেশ একটু ঈর্ষা জাগিয়ে দিয়েছিল। এবং ভিতরে ভিতরে 'বোলতাই' কাগজে গোপনে সমালোচনা ছাপিয়ে আমাকে অপদস্থ করবারও চেষ্টায় ত্রুটি করেনি।

কিন্তু আমাদের পূর্বপরিচিত মধু মোদক খুশি হয়ে এক ভাঁড় মধু অমনি পাঠিয়ে দিয়েছে, কলাপাতার মোড়কে নিজের একটি কবিতার সঙ্গে। কবিতাটি দেখি আমা থেকেই চুরি। কাজেই এটা আমার নামেই ছাপালেম।

সুর মৌ মল্লার

বাজির ধূমেধামে
বাদর ঝরে না।
মরমর চাতকে
রাখে পিয়াসী
বারহ মাস-ই।

তুবড়ি ফুলে ভরি
আনে না মধু,
জানে তা মধুপাই মৌমাছি—
বাদলা পোকারাই
বলে উড়ে উড়ে—
মধুমাস এল কাছাকাছি!
চলে যায় হাউই
আঁকতে বাঁকতে
সাপের মাথার মণি কাড়তে
লুকোনো মানিক তারকা-পুরে
থাকেই লুকোনো—
হাউই ফেরে শুধু
মুখটা পুড়োনো।
বলছে চর্‌কি—
ঘুরবে মস্ত
ভূমণ্ডলএ উদয় অস্ত!
জাঁতাটা ঘুরিয়েই
হয় সে কুপোকাৎ,
একটি পা-ও চলে না—
(কোরাস) নানানা—নানানা—তানানা!

ভূঁই পটোকা
বাজাতে মৃদং
মাটিতে মাথা ঠুকছে হরদম্‌!
মৃদঙ্গের কিছুই বাজছে না—
(কোরাস) নানানা—তানানা—নানানা!
দোদমা চাইলে
পেটাবো দামামা—

সুরে বলতেই
      সারে-গা-ধাপামা—
নিজেই ফেটে
      হয় চৌচির!
করে কান বধির—
      জান বাহির।*

* এই গানের স্বরলিপি দিবার প্রয়োজন দেখি না। কেননা গানের সুর ও কথা এমন নিপুণভাবে রচিত যে, সকল কণ্ঠেই ইহা সকল প্রকার সুরে বেসুরে গাহিয়া গেলেও শ্রুতিকটু ঠেকিবে না।

—ইতি সম্পাদক

আষাঢ়ে গল্প

বাঁশের মই, তার ঘাড়ে পা রেখে সবাই উঠে যায় উপরে খুব উঁচুতে—কেউ উঠে যায় মই বেয়ে স্বর্গে, কেউ যায় নেমে মই বেয়ে পাতালে—এই চলেছিল সত্য ত্রেতা দ্বাপর তিন যুগ ধরে।

অরূপ-সুন্দরী কন্যা— তাকে চুরি করে নিতে দৈত্যপুরী থেকে রাজপুত্র চলে গেল মই বেয়ে গগনস্পর্শী কেল্লার বুরুজ ঘরে। চিলে-ঘরের ছাতের কানাচে পাখির বাসা, পাঠশালার ছেলে সে-ও সেখানে উঠে গেল মই বেয়ে অধরা পাখির বাচ্চা ধরতে! মেঘ-ছোঁওয়া গাছের ফল-ফুল পাড়তে উঠে গেল— বাঁশের মই বেয়ে মেয়েরা ছেলেরা সবাই! চিলও হার মানে যাকে ডিঙিয়ে যেতে এমন দুর্জয় পাহাড়ের পাঁচিল তাকেও টপ্‌কে গেল বাচ্ছা সিন্দবাদ আর চোর চক্রবর্তীর দল— মই বেয়ে! মই বেচারা সে আড় হয়ে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়েই থাকল— উঠতে পেলে না কোনো দিন আপনাকে ছাড়িয়ে একটুখানিও উপরে!

যে মাটিতে মই দাঁড়িয়ে থাকে সত্য ত্রেতা দ্বাপর— সেই মাটি কলির আরম্ভে হঠাৎ একটা ভূমিকম্পে তলা থেকে একটা বিষম ধাক্কা দিয়ে মইখানাকে আধ আঙ্‌ল উপরে তুলে দিয়ে মজা করলে; মই সেই সময় চকিতের মতো নিজের মাথার উপরে না-দেখা যা-কিছু তাই দেখে নিয়ে কাত হয়ে পড়ল মাটিতে—উঁচু থেকে নীচে পড়ার ধাক্কায় চুরমার হয়ে গেল সে সেদিন ঘন বর্ষার শেষ রাতে! তিন কেলে বুড়ো পাকা বাঁশের মই জলে না ভেজে সেইজন্যে বেঙ রাজা দিলেন, ওকে ছাতা দিয়ে মুড়ে রাখতে। সেদিন থেকে আপনার কাজ বন্ধ করে পড়ে রইল মই আকাশের দিকে চেয়ে!

পাখি উড়ে চলে উপর থেকে উপরে। ছাগলছানা লাফিয়ে ওঠে পাহাড়ের চুড়োয়। আটাকাটি দিয়ে ধরে পাখি ছেলেরা,

বাঁশের আঁকশি দিয়ে উঁচু ডালের ফুল পেড়ে নেয় মেয়েরা, উড়ো কলের পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে চলে যায় রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালের পুত্র, কত পুত্র মিত্র তার ঠিক-ঠিকানা নেই— আজব-দেশের দিকে মেঘ ছাড়িয়ে, সাত সমুদ্র পেরিয়ে! মইখানা এই-সব কাণ্ড-কারখানা দেখে আর দুঃখ পায়। বাঁশের ছিপ দিয়ে যখন টেনে তোলে অতল জলের তলা থেকে মৎস্য-কন্যাকে মেছুয়ার দল— মই দেখে আর দুঃখু পায় আর মনে মনে বলে— আর কি আমার কাজ আছে বেঁচে থেকে?

এমনি দুঃখের ঘুণ বাঁশের মইকে ভিতরে ভিতরে ফোঁপরা করে যখন দেয় তবে সে দেখতে পায় সুখ-দুঃখের উপরের বাসায় ধরা আছে যত-কিছু অধরা অজানা না-দেখা তাদের।

খোকাখুকি

আদরপুরের রাজার ঘরে মানুষ হয় খোকা; আর খুকি— সে মানুষ হয় অনাদরপুরে কাঙালের ঘরে! সে কাদের খোকা, কাদেরই বা খুকি তা তো জানতে পারছি নে, শুধু দেখতে পাচ্ছি —খোকা আছেন রাজার হালে, সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে দুধিভাতি খেয়ে; আর খুকি— সে রয়েছে উপবাসে ছেঁড়া কাঁথায়, ভিজে মাটির উপর!

ঠাকুর পাঠিয়েছিলেন খোকাখুকি দুজনকেই এই পৃথিবীতে দুটি রূপের ফুল হয়ে ফুটে উঠতে আপনা আপনি; কিন্তু রাজাটা ভাবলে, আদর না পেলে যত্ন না পেলে ছেলের বাঁচা মুশকিল— ফুলকে নিয়ে সে সোনার কৌটোতে ভরে রাখলে। আর কাঙাল— সে গোড়া থেকেই ভেবে নিলে ফুল তো শুখোবেই, কাজেই মেয়ের মরা-বাঁচার ভাবনা-ই সে ছেড়ে বসল একেবারে গোড়া থেকে!

গামলার গাছে গোলাপফুল যেমন বাড়ে তেমনি বাড়তে থাকল রাজপুত্তুর আর পাঁকে পড়ে পদ্ম যেমন বাড়ে, তেমনি বাড়তে থাকল দিনে দিনে কাঙালিনী কন্যা। একেও দেখে লোকে বলে আহা, ওকেও দেখে লোকে করে আহা, কিন্তু রাজার ছেলে যখন আবদার করে তখন তার মন জোগাতে লোকে পথ পায় না— গাঁঠের কড়ি খরচ করে অকাতরে, যার গাঁঠ কাটা গেছে সে-ও ধার ক'রে রাজপুত্তুরকে খুশি করতে চলে। আর কাঙালিনী সে মুষ্টি ভিক্ষে চেয়ে দুয়োরে দুয়োরে ঘোরে— কোনোদিন পায় দুমুঠো ক্ষুদ, কোনোদিন পায়ও না! যেদিন বা পায়, সেদিন চোখের জলের নুন দিয়ে সে ভিক্ষের চাল একটু একটু করে ভিজিয়ে খায়।

মড়ক আসে— সে আদরপুরেও আসে, অনাদরপুরেও আসে! আঁচিল পাঁচিল ঘেরা সাতমহলের মাঝ থেকে এক রাতে রাজপুত্রের সাত বোনকে নিয়ে চলে যায় সব বাধা ঠেলে! কাঙালের ঘরে

তার আসার কোনো বাধা নেই, তবু সে আসে, কিন্তু খুঁজে পায় না কাকে নেবে। কাঙালিনী কন্যাকে কাঁদিয়ে তার পোষা এতটুকু পাখিটাকে মেরে চলে যায়!

পাখির প্রাণ আর সোনার খাঁচায় ধরা রাজকন্যাদের প্রাণ বাতাস ধরে ভাসতে ভাসতে চলে যায়— বিষ্টির মেঘের আড়াল দিয়ে, আপনজনকে ডাকতে ডাকতে, চোখ-ভেজানো বুক-ফাটানো সুরে!

রাজপুত্র হন রাজকন্যাদের জন্য থেকে থেকে আন্‌মনা, অমনি তাঁকে ভোলাতে আসে নতুন নতুন খেলনা, নীলার ময়ূর, সোনার টিয়ে, শিকল-বাঁধা বাঘের ছা, হাঁস, ঘোড়া কত কী! দুধ আসে, ক্ষীর আসে, মোতিচুর আসে, মিহিদানা আসে— রাজপুত্র ভুলে যায়, আবার ভোলেও না! আর কাঙালের মেয়ে, তার আন্‌মনা হবার সময় নেই— সে নিয়মিত ভিক্ষে করে বেড়ায়, আর কাঁদে পাখির জন্যে! লোকে বলে— মেয়েটা মায়া-কান্না কাঁদছে, বেশি করে ভিখ্ পাবে বলে।

ঠাকুর থাকেন বসে টল-সমুদ্রের কিনারায়, পায়ের তলায় তাঁর অপার জল টল টল করে জীবন নদী সমস্ত দিনরাত গড়িয়ে চলে ঠাকুরের পা ধুয়ে অকূল-সাগরে মিলতে! ঠাকুরের হাতে একখানি পদ্মপাত, তারি মাঝে টল টল করে জগৎ সংসার— একটি ফোঁটা জলবিন্দু! সেই পদ্মপাতায় ধরা জলবিন্দুর পাশে আর একটি ছোটো ফোঁটা এসে লাগল, যেন কার চোখের জলে গড়া একটি মুক্তো! ঠাকুরের দৃষ্টি— যেমন করে শিশিরের উপর পড়ে সকালের আলো— তেমনি পড়ল এতটুকু জলের ফোঁটায়।

ওদিকে আদরপুরে সকাল থেকে রাজপুত্রের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। রাজবেশ পড়ে আছে ধুলোয়— সোনার পালঙ্ক শূন্য! লোক ছুটল চারিদিকে, সৈন্য ছুটল, সামন্ত ছুটল, খুঁজল সবাই রাজ্যে রাজ্যে— পেলে না! যদি শিকারে গিয়ে থাকেন— বনে বনে খুঁজলে, কোথাও নেই! বিদেশে যদি গিয়ে থাকেন— দেশ

বিদেশ খুঁজলে, সন্ধান হয় না রাজপুত্রের। আদরে মানুষ রাজার ছেলে, অনাদরপুরে সে যে যেতে পারে, এ কথা কারো মনেই এল না!

অনাদরপুরে গোধূলির বেলা নবীন ভিখারী একতারা বাজিয়ে চলেছে— ঘরে ঘরে দুয়োর ভেজানো দেখে। চলতে চলতে এসে দাঁড়ায় ভিখারী কাঙালিনীর পাশে— গান গায় ভিখারী, ভিক্ষা দেয় কাঙালিনী— চোখের জলে ভেজা একটুখানি আদর!

ঠাকুরের হাতে পদ্ম পাতায় পাশাপাশি দুটি জলের ফোঁটা এক হয়ে মেলে— শুক-তারা আর যেন সন্ধ্যা-তারা।

গ্রন্থপরিচয়

শকুন্তলা

আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস থেকে 'শকুন্তলা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে। প্রথম এই সংস্করণ ছিল লেখক কর্তৃক চিত্রাঙ্কিত। ঠাকুর-পরিবার আয়োজিত 'বাল্যগ্রন্থাবলী' গ্রন্থমালার এটি প্রথম বই। গ্রন্থরচনার ইতিহাস প্রসঙ্গে 'জোড়াসাঁকোর ধারে' বই থেকে নিম্নোদ্ধৃত স্মৃতিচারণটুকু উল্লেখযোগ্য :

> একদিন আমায় উনি [রবীন্দ্রনাথ] বললেন, 'তুমি লেখো-না, যেমন করে তুমি মুখে গল্প কর, তেমনি করেই লেখো।' আমি ভাবলুম বাপরে, লেখা—সে আমার দ্বারা কস্মিন্‌কালেও হবে না। উনি বললেন, 'তুমি লেখোই-না; ভাষায় কিছু দোষ হয় আমিই তো আছি।' সেই কথাতেই মনে জোর পেলুম। একদিন সাহস করে বসে গেলুম লিখতে। লিখলুম একঝোঁকে একদম শকুন্তলা বইখানা। লিখে নিয়ে গেলুম রবিকাকার কাছে, পড়লেন আগাগোড়া বইখানা, ভালো করেই পড়লেন। শুধু একটি কথা 'পল্বলের জল' ওই একটিমাত্র কথা লিখেছিলেম সংস্কৃতে। কথাটা কাটতে গিয়ে 'না থাক' বলে রেখে দিলেন। আমি ভাবলুম, যাঃ। সেই প্রথম জানলুম, আমার বাংলা বই লেখার ক্ষমতা আছে। এত যে অজ্ঞতার ভিতরে ছিলুম, তা থেকে বাইরে বেরিয়ে এলুম। মনে বড় ফুর্তি হল; নিজের উপর মস্ত বিশ্বাস এল। তারপর পটাপট করে লিখে যেতে লাগলুম—ক্ষীরের পুতুল, রাজকাহিনী ইত্যাদি। সেই যে উনি সেদিন বলেছিলেন 'ভয় কি আমিই তো আছি' সেই জোরেই আমার গল্প লেখার দিকটা খুলে গেল।

Sakountala (Racontie a la Jeunesse) Suivi de Nalaka নামে 'নালক' ও 'শকুন্তলা'র মিলিত একটি ফরাসী অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে। অনুবাদ করেন আঁদ্রে কার্পেলে, তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী। 'শকুন্তলা'র গুজরাটী একটি অনুবাদও ছাপা হয় ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে।

ক্ষীরের পুতুল

বাল্যগ্রন্থাবলীর তৃতীয় গ্রন্থ হিসাবে 'ক্ষীরের পুতুল' প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে। প্রকাশ করেন আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস। প্রথম এই সংস্করণে যুক্ত ছিল ছটি রঙিন ছবি।

'ক্ষীরের পুতুল' বইটি নানা ভাষায় অনূদিত হয়। এই অনুবাদগুলির একটি বিবরণ নিচে দেওয়া হল :

ইংরেজী

The Cheese Doll, tr. Nilima Devi, Signet Press, Calcutta, 1945.

Caramel Doll, tr. Bishnu Dey and Pranati Dey, Kutub, Bombay, 1946.

ফরাসী

La Poupée de Fromage, tr. Andrée Karpeles and Amiyachandra Chakravarty, Pubications Chitra, Alpes-Maritimes, 1933.

সুইডিশ

Ostdockan, tr. Ella Myrin Hillbom, Stockholm, 1949.

হিন্দী

Khoye Ki Gudiya, Signet Press, Calcutta, 1945.

Khir Ki Gudiya, tr. Maya Gupta, Publications Division, Government of India, Delhi, 1957.

মারাঠী

Bahula Nawara, tr. Venkates Vakil, Yugavani Prakasan, Bombay, 1949.

ফরাসী অনুবাদটির দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হয় ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে। ফরাসী এবং সুইডিশ অনুবাদে যুক্ত ছিল Selma Lagerlöf লিখিত একটি ভূমিকা।

রাজকাহিনী

'রাজকাহিনী'র প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন হিতবাদী লাইব্রেরী, ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে। প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত ছিল: শিলাদিত্য, গোহ, বাপ্পাদিত্য, পদ্মিনী। বইটির দ্বিতীয় খণ্ড ছাপা হয় ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে। প্রকাশক ছিলেন গ্রন্থবিহার। এই খণ্ডের অন্তর্গত হয়: হাম্বির, হাম্বির (রাজ্যলাভ), চণ্ড, রানা কুম্ভ, সংগ্রামসিংহ। পরে খণ্ডদুটি একসঙ্গে প্রকাশ করেন সিগনেট প্রেস।

গ্রন্থভুক্ত হবার আগে 'রাজকাহিনী'র কাহিনীগুলি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, ভারতী ১৩১১ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ শ্রাবণ আশ্বিন, ভারতী ১৩১৫ বৈশাখ ভাদ্র আশ্বিন, পার্বণী ১৩২৫, রংমশাল ১৩২৭ ও রংমশাল ১৩২৮।

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে 'রাজকাহিনী'র গুজরাটী অনুবাদ প্রকাশ করেন আমেদাবাদের কমল প্রকাশন মন্দির, অনুবাদ করেন রমনলাল সোনী।

ভূতপত্‌রীর দেশ

ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে 'ভূতপত্‌রীর দেশ' প্রকাশ করেন। 'জোড়াসাঁকোর ধারে' বইটির এই বর্ণনাংশ এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য:

> পুরীতে অনেক দিন আছি, ভেবেছি সব আমার নখদর্পণে। একদিন হাঁটতে হাঁটতে চক্রতীর্থ পেরিয়ে গেছি সমুদ্রের ধার দিয়ে, রাস্তা ছাড়িয়ে বালির উপর ধপাস ধপাস করে চলেইছি। কত দূর এসে পড়েছি কে জানে। হঠাৎ চটকা ভাঙল, দেখি সূর্যাস্ত হচ্ছে। যেদিকে চাই চতুর্দিকে ধু ধু বালি। না নজরে পড়ে জগন্নাথের মন্দির, না রাস্তা, না কিছু। শুধু শব্দ পাচ্ছি সমুদ্রের। কোন্‌দিকে যাব ঘোর লেগে গেছে। তারা ধরে চলব, তারও তো কোনো জ্ঞান নেই। একেবারে স্তম্ভিত। শেষে সমুদ্রের শব্দ শুনে সেইদিকে চলতে লাগলুম। খানিক বাদে দেখি এক বুড়ি চলেছে লাঠি হাতে; বললে, 'কোথায় যাচ্ছ?' বললুম, 'চক্রতীর্থে'। ভাবলুম চক্রতীর্থে পৌঁছতে পারলেই এখন যথেষ্ট। বুড়ি বললে, 'তা

যেদিকে যাচ্ছ সেদিকে সমুদ্র। আমার সঙ্গে এস, আমি যাচ্ছি চক্রতীর্থে।'
বুড়ির সঙ্গে চক্রতীর্থে ফিরে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। নয় তো সারারাত সেদিন
ঘুরে বেড়ালেও কিছু খুঁজে পেতুম না। 'ভূতপত্রী'তে আছে এই বর্ণনা।

উমা দেবীর 'বাবার কথা' থেকে নিম্নোদ্ধৃত অংশটুকুও এখানে
প্রণিধানযোগ্য :

আর একবার বাবার সঙ্গে পুরী গেছি। সমুদ্রের ধারে 'পাথার
পুরী' বাড়িতে তখন ওঁরা গিয়ে থাকতেন। বাড়িটার নাম বাবাই
দিয়েছিলেন। সেবার বাবার সখ হল কোনারক দেখতে যাবার। মা
জিজ্ঞেস করলেন বাবাকে যে, তিনি একলা যাবেন না কি! বাবা বললেন
যে, মা, আমার মেজো বোন করুণা আর আমিও যাব।......
এই কোনারক যাত্রার পর বাবার 'ভূতপত্রীর দেশ' বইখানি লেখা
হয়। এই বইটির মধ্যে যে রোমাঞ্চকর পথের বর্ণনা আছে পাল্কী চড়ে
যাবার, সেটার উৎস হল কোনারক যাবার ভূতুড়ে পথ। যাবার সময়
যেমন গা ছমছম করেছিল, পড়লেও তেমনি ভয়মেশানো বিস্ময় জাগে
মনে।

নালক

১৩২২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত
হয় 'নালক'। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে 'নালক' গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন ইণ্ডিয়ান
পাব্লিশিং হাউস। এ-বইয়ের একটি ফরাসী অনুবাদ হয় ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে।
অনুবাদটির বিবরণ প্রসঙ্গে 'শকুন্তলা'র গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য।

সংযোজন

বিভিন্ন সাময়িক পত্র থেকে সংকলিত কয়েকটি রচনা এই অংশে বিন্যস্ত
হল। রচনাগুলির উৎস এবং প্রকাশকাল এই রকম :

আলেখ্য	ভারতী ১৩১২ বৈশাখ
আইনে চীন্-ই	ভারতী ১৩১৬ বৈশাখ
জয়শ্রী	ভারতী ১৩১৯ কার্তিক

সূত্রপাত	ভারতী ১৩১৯ অগ্রহায়ণ
বাপুষ্টা	ভারতী ১৩১৯ পৌষ
উদয়াস্ত	ভারতী ১৩১৯ ফাল্গুন
যুগ্মতারা	ভারতী ১৩২০ বৈশাখ
গোরিয়াঁ	ভারতী ১৩২০ আশ্বিন
চৈতন চুটকি	ভারতী ১৩২৩ আশ্বিন
মাতৃগুপ্ত	ভারতী ১৩২৫ চৈত্র
তোরমান	ভারতী ১৩২৬ বৈশাখ
গঙ্গাফড়িং	পার্বণী ১৩২৭
জেন্তসভা বা জন্তুজাতীয় মহাসমিতি	ভারতী ১৩২৭ কার্তিক
হিন্দবাদের প্রথম সিন্দবাদের শেষ যাত্রা	রংমশাল ১৩২৯
বাতাপি রাক্ষস	মৌচাক ১৩২৯ আশ্বিন
আলোয় কালোয়	মৌচাক ১৩৩০ কার্তিক
কারিগর ও বাজিকর	প্রাচী ১৩৩০ পৌষ
বড়ো রাজা ছোটো রাজার গল্প	মৌচাক ১৩৩২ বৈশাখ
কনকলতা	মৌচাক ১৩৩২ আশ্বিন
কোণের ঘর	বার্ষিক বসুমতী ১৩৩৩
সাথী	বার্ষিক শিশুসাথী ১৩৩৩
ভোম্বলদাসের কৈলাসযাত্রা	মৌচাক ১৩৩৩ কার্তিক
বুড়া শেয়ালের কথা	মৌচাক ১৩৩৩ অগ্রহায়ণ
সিংহরাজের রাজ্যাভিষেক	মৌচাক ১৩৩৩ পৌষ
দেয়ালা	মৌচাক ১৩৩৪ বৈশাখ
মহামাস তৈল	বেণু ১৩৩৪ বৈশাখ
বাবুই পাখির ওড়ন বৃত্তান্ত	বেণু ১৩৩৪ আষাঢ়-ভাদ্র
আষাঢ়ে গল্প	বার্ষিক শিশুসাথী ১৩৩৭
খোকাখুকি	খোকাখুকু ১৩৩৭ কার্তিক

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে 'একে তিন তিনে এক' নামে অবনীন্দ্রনাথের একটি গল্প-সংকলন প্রকাশ করেন। উপরে উল্লিখিত রচনা-গুলির মধ্যে গঙ্গাফড়িং, হিন্দবাদের প্রথম সিন্দবাদের শেষ যাত্রা, বাতাপি রাক্ষস, বড়ো রাজা ছোটো রাজার গল্প, কনকলতা, সাথী, ভোম্বলদাসের

কৈলাসযাত্রা, রতা শেয়ালের কথা, সিংহরাজের রাজ্যাভিষেক, দেয়ালা, মহামাস তৈল, আষাঢ়ে গল্প এবং খোকাখুকি ওই গ্রন্থে সংকলিত হয়।

১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত অভ্যুদয় প্রকাশমন্দিরের 'রংবেরং' গ্রন্থের অন্তর্গত হয় যুগ্মতারা, চৈতন চুটকি, মাতৃগুপ্ত, জেন্তসভা বা জন্তুজাতীয় মহাসমিতি, আলোয় কালোয়, কারিগর ও বাজিকর এবং বাবুইপাখির ওড়ন বৃত্তান্ত।

আলেখ্য, আইনে চীন্-ই, জয়শ্রী, সূত্রপাত, বাপুষ্টা, উদয়াস্ত, গোরিয়াঁ, তোরমান এবং কোণের ঘর এই প্রথম গ্রন্থভুক্ত হল। ছোটোদের জন্য লেখা অবনীন্দ্রনাথের অন্যান্য গল্প রচনাবলীর পরবর্তী খণ্ডে গৃহীত হবে।